বিদ্রোহী ভারত

সুপ্রকাশ রায়



বিদ্রোহী ভারত

সুপ্রকাশ রায়

বুক ওয়ার্ল্ড
৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৩

প্রাপ্তিস্থান
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

মূল্য
আঠাশ টাকা

বুক ওয়ার্লডের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ৫৫বি কবি সুকান্ত সরণী, কলিকাতা ৭০০০৮৫ হইতে মুদ্রিত ॥

লেখকের কথা

পৃথিবীর অন্য বহু দেশের মত ভারতবর্ষের গণ-বিদ্রোহের ইতিহাসও অতি দীর্ঘ। সমাজে শোষণ-উৎপীড়ন থেকেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসনের অতি নিষ্ঠুর, বর্বরসুলভ শোষণ-উৎপীড়নের ফলে ভারতের গণ-বিদ্রোহ সংখ্যায় ও ব্যাপকতায় অন্য বহু দেশকেই ছাড়িয়ে গেছে। এই সব গণ-বিদ্রোহ নিয়েই গড়ে উঠেছে বিদ্রোহী ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস।

বাংলা ও বিহারের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' থেকেই আধুনিক যুগের বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ। এর পর থেকে সারা ভারতে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের 'মহাবিদ্রোহ' ভারতের ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। ১৮৯৮ সাল থেকে আরম্ভ হয় ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং তা চলে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আরম্ভ হয় ভারতে শ্রমিক-শ্রেণীর বিদ্রোহ। ১৯২৮ বা ১৯৩০ সাল থেকে আরম্ভ হয় ভারতের পাঁচ শত দেশীয় রাজ্যের সর্বশ্রেণীর প্রজা-বিদ্রোহ।

স্বাধীনতা লাভের পরেও এই গণ-বিদ্রোহের ঝড় দুর্বার গতিতে চলেছে। প্রায় সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছে আদিবাসী কৃষক ও তথাকথিত 'হরিজন' অর্থাৎ হিন্দু-সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত, অগণিত অস্পৃশ্য মানুষ। এরা সাধারণভাবে কৃষি-শ্রমিক। স্বাধীনতা লাভের পরেও শত শত বছরের শোষণ-উৎপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আজ এরা জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছে।

ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অসংখ্য বিদ্রোহ থেকে ২৮টি বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। এই গ্রন্থ কোন একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে রচিত নয় বলেই সাধারণভাবে ভারতের জনসাধারণের বিদ্রোহের ইতিহাস অর্থাৎ 'বিদ্রোহী ভারত' নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল।

গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে একটি কথার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। পঞ্চাশের দশকে 'বিদ্রোহী ভারত' নামে আমার একখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ভারতবর্ষের ছয়টি প্রধান বিদ্রোহের কাহিনী সংকলিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের নামকরণে তিন দশক পূর্বে প্রকাশিত ঐ বইটির কথা স্মরণ করা হয়েছে।

অনবধানতাবশত এ গ্রন্থে দুটি গুরুতর মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে গেছে। পৃ. ৩ এবং পৃ. ১০৬-তে অধ্যায়ের নামের পাশে যে যে সালের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিতে যথাক্রমে ১৭৮৩-১৮০০-র পরিবর্তে ১৭৬৩-১৮০০ এবং ১৮৩০-৩২-এর পরিবর্তে ১৯৩০-৩২ হবে।

আশা করি আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মতই এই গ্রন্থখানিও পাঠক-সমাজে সমাদৃত হবে।

অক্টোবর ১৯৮৩ — **সুপ্রকাশ রায়**

কলিকাতা

বিষয়-সূচী

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের পত্তন যুগের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যার আরম্ভ) থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর কালের গিরিজন বিদ্রোহ (১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব) পর্যন্ত সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীরও অধিক কালব্যাপী নির্মম শাসন-শোষণ ও অন্যায় অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে আপামর ভারতবাসীর নিরলস বিদ্রোহ ও সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল।

প্রথম অধ্যায়

পরাধীনতার শৃঙ্খল

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলা ও বিহার ইংরেজ বণিকের পদানত হয়, ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যেতে আরম্ভ করে। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পরাজয় ভারতের কেবল ভাগ্য-বিপর্যয়ই নয়, যুগ-পরিবর্তনেরও সূচনা করেছে। এই বিপর্যয় ও পরিবর্তনের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল মোগল-শাসনের মধ্যভাগ থেকে। মোগল-সাম্রাজ্যের বাহ্যিক জাঁকজমকের অন্তরালে ভারত এক সর্বাত্মক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছিল। সেইদিন দেশের ব্যবসায়ী-ধনিকশ্রেণী তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে মধ্যযুগীয় সামন্ত-প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের পথ খুঁজতে ব্যস্ত ছিল, আর দেশের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি কৃষক ছিল মধ্যযুগের ধ্বংসপ্রায় সামন্ত-প্রথার শত বন্ধনে আবদ্ধ এবং নিরঙ্কুশ শোষণের ফলে শক্তিহীন ও নির্জীব। তখন একদিকে বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল, অপরদিকে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও সর্দারগণের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সেই সাম্রাজ্য দ্রুত তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছিল।

বাংলার নবাবী শাসন ছিল সারা ভারতের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। একদিকে নবাব এবং অপরদিকে ব্যবসায়ী-ধনিকশ্রেণী ও উপসামন্ত সর্দারগোষ্ঠীর আত্মঘাতী অভ্যন্তরীণ কলহ সারা বাংলাকে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। স্বেচ্ছাচারী নবাবী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যবসায়ী-ধনিকশ্রেণী ও উপসামন্তগোষ্ঠী খাল কেটে কুমীর আনার মত বিদেশী ইংরেজ বণিককে ডেকে আনল।

সেইদিন একটিমাত্র শক্তিই বাংলাকে এই দেশী ও বিদেশী শোষকদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে পারত। সেই শক্তি ছিল বাংলার কৃষক-শক্তি। কিন্তু সেই শক্তি তখন পর্বত-প্রমাণ সামন্ততান্ত্রিক বোঝার চাপে পিষ্ট ও আদিম স্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজপ্রথার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে কৃষকগণকে কেউ ডাক দিল না, দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের এই ঘনঘটা থেকে বহু দূরে বসে তারা নির্লিপ্তভাবে নীরব দর্শক হয়ে রইল। রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শক্তিতে বলীয়ান বিদেশী ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও গ্রাস থেকে বাংলা ও ভারতকে রক্ষা করতে পারে, এমন কোন শক্তি সেইদিন দেখা গেল না।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের মাটিতে বহু যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলির তুলনায় পলাশীর যুদ্ধ একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। কিন্তু এর তাৎপর্য ছিল অতি গভীর ও সুদূরপ্রসারী। পূর্বেও বিদেশীরা বহুবার ভারত আক্রমণ করেছে, ভারতের অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে পরাজিত করে লুণ্ঠন ও নরহত্যার বন্যা বইয়েছে। কিন্তু তারা

সকলেই হয় একবার লুণ্ঠন করে এদেশ ত্যাগ করেছে, না হয় এই ভারতের মহামানবের মহামেলায় বিলীন হয়ে গিয়ে ভারতবাসীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বণিকের দল একবার মাত্র লুণ্ঠনের পরেই এদেশ ত্যাগ করতে বা এদেশের অধিবাসীরূপে বাস করতে আসেনি, তারা প্রথমে বাংলাদেশে জেঁকে বসল এবং ধীরে ধীরে ভারতের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে তা দ্বারা ইংলণ্ডকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে গড়ে তুলতে লাগল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে ইংরেজ বণিকগণ ভারতের বিশাল ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠা করল ভয়ঙ্কর শোষণের ও শাসনের একচ্ছত্র ব্যবস্থা। ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বাংলার বিপুল ধনসম্পদই তাদের শক্তিকে দুর্বার করে তুলল এবং বিপুল সামরিক ও আর্থনীতিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গ্রাস করল। এইভাবে ভারতের পূর্বকোণ থেকে একখণ্ড কালো মেঘ উঠে ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলল, সূচীভেদ্য অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল স্বাধীন ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাস।

ইংরেজের ভারত-শোষণের মূল কথা হল, ভারতের কৃষক জনগণকে শোষণ, আর এই কৃষক জনগণকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তারা গড়ে তুলেছে তাদের আইন-আদালত, পুলিস, ফৌজ প্রভৃতি নিয়ে একটা বিরাট শাসনযন্ত্র। এই শাসনযন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্যই ভারতের জনগণের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে।

প্রথম থেকেই ইংরেজ-রাজের অবাধ শোষণ ও উৎপীড়নের আঘাতে ভারতের সুপ্ত কৃষক-শক্তি জেগে উঠেছে। ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতি নিষ্ঠুর কৃষক-শোষণ আরম্ভ হয় এবং তার ফলেই কৃষক জনগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরাধীন ভারতের বুকে স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বালাবার জন্য এগিয়ে আসে। সেই প্রদীপ বারংবার নিভে গেলেও তারই অস্পষ্ট আলোকে ভারতের মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত পথের সন্ধান লাভ করেছে। কৃষক-জনগণের সেই প্রচেষ্টার কাহিনী—শত শত বিদ্রোহের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে বিদ্রোহী ভারতের অমর ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৮৩-১৮০০)

বিদ্রোহের পটভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' প্রথমে নবাব নামধারী কয়েকজন সাক্ষীগোপাল শাসককে সম্মুখে রেখে দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ভার নিয়ে বাংলা ও বিহারের বুকের উপর জেঁকে বসল। রাজস্ব আদায়ের নামে বাংলা ও বিহারের উপর চলল অবাধ লুণ্ঠন। বিদেশী ব্যবসায়ী শাসকগণ পরাজিত বাংলা ও বিহারের মানুষের উপর চেপে বসে সর্বস্ব লুণ্ঠনের দ্বারা তাদের শ্বাসরোধ করে মারবার উপক্রম করল। জনৈক ইংরেজ লেখকের ভাষায়, "যেন একটা মহাবলশালী রক্তপিপাসু দানব উন্মত্ত হয়ে এর ধরাশায়ী শিকারের দেহের সমস্ত রক্তটুকু নিঃশেষে পান করতে আরম্ভ করেছে।" ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেই ভয়ঙ্কর লুণ্ঠন মানব-সভ্যতার ইতিহাস চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করে রেখেছে।

বণিক-শাসকগোষ্ঠী বাংলা ও বিহারের ধনসম্পদ তিন প্রকারে লুণ্ঠন করতে লাগল। প্রথম লুণ্ঠন চলল, রাজস্ব আদায়ের নামে। ইংরেজ-শাসনের পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ফসলের এক-চতুর্থাংশ, ইংরেজ বণিক-শাসক তা বাড়িয়ে করল দ্বিগুণ। এমন কি, কোথাও কোথাও তা তিনগুণ চারগুণ পর্যন্ত উঠল। দ্বিতীয় লুণ্ঠন চলল, ব্যবসায়ের নামে। কৃষকগণ তাদের কাঁচা মাল ইংরেজ বণিকদের কাছে সস্তাদামে বিক্রয় করতে ও ইংলণ্ডের পণ্য অসম্ভব চড়াদামে ক্রয় করতে বাধ্য হল। কৃষকের কুটির-শিল্প জোর করে ভেঙে দেওয়া হল এবং তা ইংরেজ-বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ধ্বংস হল। তার ফলে আদিম কালের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তৃতীয় লুণ্ঠন হল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ-কর্মচারী ও দেশীয় গোমস্তাগণের ব্যক্তিগত অবাধ লুণ্ঠন।

কোম্পানীর স্থানীয় কর্ম-কর্তা ও কর্মচারিগণ ছিল, যেন এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। ভারতের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভারতবাসীর উপর যে অবাধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করল, যে-ভাবে ভারতবাসীর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে দেশে গিয়ে বিলাস-ব্যসনে গা ভাসাতে লাগল এবং 'নবাব' আখ্যা লাভ করল, তা তৎকালীন ইংলণ্ডের জনসাধারণ, এমনকি শাসকগণও, বরদাস্ত করতে পারেনি। আবার সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা শাসন ও ভারতের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডের কুখ্যাত গুণ্ডাদের ধরে ধরে ভারতবর্ষে পাঠাতে লাগল। ইংলণ্ডের তৎকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ইংলণ্ডের পিতামাতারা

তাদের উচ্ছন্নে যাওয়া গুণ্ডা-বদমায়েস সন্তানদের বাগ মানাতে না পেরে এদেশে পাঠাত, "হয় ভারতবর্ষের ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ায় মরবার জন্য, না হয় ভারতবর্ষ থেকে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে 'নবাব' হয়ে ফেরার জন্য"।* ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতিকেও তাদের পিতামাতা এদেশে পাঠিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় মরবার জন্য, অথবা 'নবাব' হয়ে দেশে ফেরার জন্য। তাদের কেউই ম্যালেরিয়ায় মরেনি বরং তারা 'নবাব' হয়ে দেশে ফিরেছিল।

এই অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ সব হারিয়ে পথের ভিখারী হল, অত্যাচার ও শোষণের ফলে চাষীরা জমি-জমা হারিয়ে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গেল, বিদেশী ইংরেজদের লুণ্ঠনে দেশে হাহাকার পড়ে গেল। কিন্তু এতেও বণিক-শাসকগণের ক্ষুধা মিটল না, তারা এবার আরও বেশী মুনাফার জন্য দেশীয় ধনপতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাংলা ও বিহারের জনগণের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলল। এই ষড়যন্ত্র ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোন দৈব দুর্বিপাকের ফলে ঘটেনি, ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও বাংলার জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক ধনপতিরা একত্রে মিলিত হয়ে তাদের মুনাফার সীমাহীন ক্ষুধা মিটাবার জন্যই সেই মন্বন্তর সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ বণিকেরা এবং বাংলা ও বিহারের ধনপতিরা একচেটিয়া মুনাফার জন্য বাংলা ও বিহারের সমস্ত খাদ্য কিনে রাখল। মানুষের সৃষ্টি-করা এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে সারা বাংলা ও বিহার শ্মশানে পরিণত হল।

এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বাংলা ও বিহারের কোটি কোটি মানুষ প্রথমে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিল। কিন্তু কে দেবে ভিক্ষা, সকলেরই ত অবস্থা একই। চাষীরা গরু-লাঙ্গল বেচল, বীজ ধান খেয়ে ফেলল, তারপর পুত্র-কন্যা বিক্রয় করল। লোকে গাছের পাতা খেতে লাগল, তারপর খেতে আরম্ভ করল গ্রামের কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর। ফলে দেখা দিল, ভয়ঙ্কর মহামারী। অনাহারে ও মহামারীতে বাংলা ও বিহার উজাড় হয়ে গেল—বাংলা ও বিহারের গ্রাম জনশূন্য হয়ে শ্মশানে পরিণত হল। ইংরেজ কর্মচারীদের হিসাবেই দেখা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষে কেবল বাংলাদেশেই মরেছিল এক কোটি লোক, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, আর বিহারে মরেছিল প্রায় এগার লক্ষ।

এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর গ্রাস থেকে যারা বাঁচল, তারাও ইংরেজ-রাজের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেল না। ইংরেজ-রাজের কর ও খাজনা দিতেই হবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের মধ্যে খাজনা বেড়ে গেল, নানারকম করের বোঝা জনসাধারণকে পিষে মারতে লাগল। খাজনা আদায়ের জন্য গ্রামে সৈন্যদল ঢুকে কৃষকের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিল, তাদের ঘরবাড়ী ভেঙে আগুন জেলে দিল। সর্বস্বান্ত কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য ইংরেজ-রাজ সীতাব রায়, দেবীসিংহ, মহম্মদ রেজা খাঁ, হরেরাম প্রভৃতি বিহার ও বাংলার কুখ্যাত গুণ্ডা ডাকাতদের নিযুক্ত করল।

* রেজিনাল্ড রেনল্ডস্—"হোয়াইট সাহিবস ইন ইণ্ডিয়া।"

তাদের অত্যাচারে কৃষকগণ গ্রাম ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিল। সারা বাংলা ও বিহার কৃষকের মরণ আর্তনাদে ভরে গেল। বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস ইংলণ্ডের মালিকগণের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে সদম্ভে ঘোষণা করল: "দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয় নি, বরং এবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়েছে।"

এইভাবে সোনার বাংলা ও বিহার জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হল, আর সেই শ্মশানের বুকের উপর ইংরেজ-রাজের শোষণ ও উৎপীড়নের রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

ইংরেজ-রাজ ও তাদের দেশীয় অনুচরদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ এবং কৃষকেরা রুখে দাঁড়াতে লাগল। বাংলা ও বিহারের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল। বাংলা ও বিহারে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্য জেগে উঠল।

ভারতবাসীকে তাদের পরাধীন ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসক বারংবার সদম্ভে ঘোষণা করেছে: "আমরা তরবারির বলেই ভারত জয় করেছি, তরবারির বলেই ভারতবাসীকে দাবিয়ে রাখব।" ভারতবাসী, ভারতের কৃষক, কোনদিন সেই সত্য অস্বীকার করেনি বা ভুলে যায় নি। ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ কাল থেকেই ভারতের কৃষক সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা—তরবারির দ্বারা—নিজেদের অধিকার ও ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত বিদ্রোহই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষকদের ও কর্মহারা কারিগরগণের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে, পলাশী যুদ্ধের মাত্র ছয় বৎসর পরে, ইংরেজ-রাজের শোষণ ও উৎপীড়নের কবল থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলা ও বিহারকে বাঁচাবার জন্য বাংলা ও বিহারে কৃষক-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ, হিন্দু-মুসলমান চাষী হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়াল। লাঠি, বন্দুক, তরবারি যে যা কিছু পেল, তা নিয়েই তারা দল বাঁধল। বাংলা ও বিহারের কয়েকজন বীর নেতা বিদেশী ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য ডাক দিলেন, তাদের কানে দিলেন স্বাধীনতার অগ্নি-মন্ত্র, বুকে দিলেন সাহস, তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন দেশভক্তি। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতি-শোধ গ্রহণের জন্য বাংলা ও বিহার পাগল হয়ে উঠল। বিহার ও বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে দাঁড়ালেন মজনু সাহ, অনুপনারায়ণ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, নুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস প্রভৃতি কয়েকজন বীর নেতা। তাঁদের নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে রীতিমত সৈন্যদল গড়ে উঠল, তাঁরা সেই দলগুলিকে যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন এবং পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করলেন।

ইংরেজ শাসকগণ এই বিদ্রোহীদের 'সন্ন্যাসী' বা 'ফকির' নামে অভিহিত করেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা ফকিরও নয় কিংবা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও নয়।

এরা ছিল গৃহবাসী সাধারণ মানুষ, বাংলা ও বিহারের আজীবনের দুঃখ-লাঞ্ছনার ভারে প্রপীড়িত কৃষক-কারিগর জনসাধারণ। উইলিয়াম হান্টার, টমসন্ গ্যারাট প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহীদের জমিহারা, গৃহহারা কৃষক ও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ সৈন্যবাহিনীর কর্মহারা সৈনিক বলে উল্লেখ করেছেন।

তখন মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভেঙে চুরে খান্‌খান্ হয়ে গিয়েছে। সেই সকল কর্মহারা সৈন্যগণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে অন্নের জন্য সারা ভারতে ঘুরে বেড়াত। তারাও কৃষকের সন্তান। তাই তারা বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে সংগঠিত রূপ দিয়ে পরিচালিত করেছে। এই অভিজ্ঞ সৈনিকদের যোগ্য পরিচালনার ফলে, এই বিদ্রোহ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল. বিদ্রোহী বাহিনীর নিকট ইংরেজ সৈন্যগণকে বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল এবং এই বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

মজ্‌নু সাহ ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক এবং এই বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ। সেদিন তাঁর নাম সারা বিহার ও বাংলার জনসাধারণের মনে অভয় জাগিয়ে তুলত, তাঁর নামে ইংরেজ শাসক ও তাদের অনুচরবর্গ ভয়ে শিউরে উঠত। বিদেশী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিহার ও বাংলার জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্য মজ্‌নু বিহারের প্রান্ত থেকে বাংলার ময়মনসিংহ জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে ঘুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা অসংখ্য কৃষক-বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সেকালের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি এমন কি রানী ভবানী প্রভৃতি জমিদারগণকেও এই বিদ্রোহে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু জমিদারগণ তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া দেননি, বরং বিদ্রোহ দমন করবার জন্য তারা তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল দ্বারা ইংরেজ শাসকদের সাহায্য করেছে।

এইভাবে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে এক এক জন নায়কের অধীনে কৃষক-বিদ্রোহীরা ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হল। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের বুকে প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল।

বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তার

ইংরেজী ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পরের কথা। বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ করল পূর্ব বাংলার ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকার কুঠিগুলির উপর। তখন ইংরেজদের কুঠিগুলি ছিল এক-একটা শয়তানের ঘাঁটি। এই কুঠিগুলি থেকেই ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করত। এইগুলিই ছিল তখনকার ইংরেজ-রাজের শোষণ ও শাসনের বনিয়াদ। সেই জন্য ভারতের বুক থেকে এই শয়তানদের উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যরূপে এ কুঠিগুলি বেছে নিল। বাংলাদেশে ঢাকার কুঠির স্থান ছিল কলিকাতার পরেই। সেইজন্য, বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠিকেই প্রথমে নিশ্চিহ্ন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

ঢাকার কুঠির উপর বিদ্রোহীদের প্রথম আক্রমণ আকস্মিক ঘটনা নয়। তখন এদেশের শিল্পজাত পণ্য নামমাত্র মূল্যে আত্মসাৎ করে মুনাফা লুঠতে গিয়ে ইংরেজ বণিকেরা রাজশক্তির সাহায্যে বাংলা ও বিহারের উন্নত কুটির-শিল্পটিকেই ধ্বংস করে ফেলতে আরম্ভ করেছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের শিল্পের উপর ইংরেজ বণিকদের আক্রমণ তখন পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হয়েছে। এই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তন্তুবায় কর্মচ্যুত হয়ে ধ্বংসের পথে চলেছে, ঢাকার অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ঢাকার কুঠির উপর আক্রমণ তারই পরিণতি।

বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠির উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা বহু পাইক, বরকন্দাজ ও কয়েকটি কামান দ্বারা কুঠির রক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করে তুলেছে। কাজেই বিদ্রোহীরা সতর্ক হয়ে রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি এগিয়ে চলল কুঠির দিকে। তারা নিঃশব্দে কুঠিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ আরম্ভ করল। এই আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব হয়ে মাত্র এক ঘণ্টার যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত ও বন্দী হল। বিদ্রোহীরা তাদের সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করল। বহু টাকা, কামান ও বন্দুক বিদ্রোহীদের হস্তগত হল।

এই আক্রমণের পর ইংরেজগণ সতর্ক হয়ে গেল। ঢাকা শহর সুরক্ষিত করবার জন্য তারা বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এল এবং পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করল। বিদ্রোহীরা হটে গিয়ে চারদিক থেকে উত্তরবঙ্গে মিলিত হতে লাগল। এই সময় থেকে উত্তরবঙ্গই হল বিদ্রোহী-বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি।

সে সময় উত্তরবঙ্গে কুচবিহারের রাজার অত্যাচার ও শোষণ চরম আকার ধারণ করেছিল। কুচবিহারের রাজার মুরুব্বি ছিল ইংরেজ। ইংরেজদের সাহায্যে খাজনা ও কর আদায়ের জন্য রাজা গরীব কৃষকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে তাদের জীবন অসহনীয় করে তুলেছিল। বিদ্রোহীরা কুচবিহারের রাজার অত্যাচার দমন করবার জন্য প্রস্তুত হল। রাজা ভীত হয়ে ইংরেজ-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ফলে, একটি ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কুচবিহারে এসে ছাউনি ফেলল।

এদিকে বিদ্রোহীরা উপযুক্ত আয়োজন করে কুচবিহার আক্রমণ করল। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। একদিকে বিদ্রোহী বাহিনী এবং অপরদিকে রাজার ও ইংরেজদের সৈন্যদল। স্থানীয় কৃষকগণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। রাজা ও ইংরেজ তাদের শত্রু, সেইজন্য এই যুদ্ধ তাদেরই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাজার ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হল। বিদ্রোহীরা কুচবিহার দখল করে রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করল।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। বিহারের সারন জেলায় বিরাট মেলা বসেছে। হাজার হাজার নরনারী এসেছে মেলা দেখতে। ইংরেজদের অনুচর শয়তান-তুল্য দেবীসিংহও বহু পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে উপস্থিত। সে এসেছে মেলার যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করতে। যারা মেলায় আসবে, তাদেরই কর দিয়ে যেতে

হবে। এই অন্যায় জুলুমে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। দেবীসিংহের জুলুম্ বন্ধ করবার জন্য বিহারের বিদ্রোহীরা প্রস্তুত হল।

পাঁচ হাজার বিদ্রোহী-সৈন্য সন্ন্যাসী বেশে মেলার জনসমুদ্রে মিশে রইল, তাদের সেনাপতি স্বয়ং মজনু সর্দার। দেবীসিংহের ফৌজ এসে সমগ্র মেলা চারদিক থেকে ঘিরে ধরল, তারপর আরম্ভ হল মেলার যাত্রীদের নিকট থেকে বল-পূর্বক কর আদায়। পাইক-বরকন্দাজগণ সকলের টাকাকড়ি কেড়ে নিতে লাগল। হঠাৎ সেনাপতি মজনু সর্দারের বাঁশী বেজে উঠল, পাঁচ হাজার বিদ্রোহী-সৈন্যের তরবারির আঘাতে শত্রুর সকল সৈন্য নিহত হল। মেলার ময়দানের উপর দেবী-সিংহের ফৌজের রক্তের স্রোত বইল। তাদের সেনাপতি হাসান খাঁ বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। রাজসাহীতে তাদের প্রধান ঘাঁটিটি তারা মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ও চারদিকে গড়খাই কেটে একটা বিরাট দুর্গে পরিণত করেছে। বিরাট দুর্গ যেন একটা শহর। দুর্গের মধ্যে বসেছে বহু কামারশাল, সেখানে দিনরাত কামান, বন্দুক, ঢাল, শড়কি প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সব কামারশালে দেশের শত শত দক্ষ কারিগর দিবারাত্র কাজ করছে।

এবার বিদ্রোহী-নেতারা স্থির করলেন, উত্তরবঙ্গের সব ইংরেজ কুঠি ধূলিসাৎ করে দেবে। প্রথমে বিদ্রোহীরা রাজসাহীর কুঠিগুলি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। তারপর তাদের আক্রমণ চলল দিনাজপুরের কুঠিগুলির উপর। সেই আক্রমণে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কৃষক, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করল। ক্রমশ রাজসাহী ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল কুঠিয়াল ইংরেজ বণিকদের কবল-মুক্ত হতে লাগল, সেখানে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে এল।

এবার বিদ্রোহীদের অভিযান আরম্ভ হল রংপুরের দিকে। রংপুরের দিকে বিদ্রোহী বাহিনীর অভিযানের সংবাদে ইংরেজগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠল। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাস বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছুটে চলল রংপুরের দিকে। টমাসের বাহিনী চলছে এক গোপন পথে। কিন্তু তাদের রংপুর পৌঁছাবার বহু পূর্বেই স্থানীয় আদিবাসীদের মারফত বিদ্রোহীরা ইংরেজ-বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে গেল। বিদ্রোহীরা স্থির করল ইংরেজ-বাহিনী রংপুর পৌঁছাবার পূর্বেই তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। রংপুরের পথে জাফরগঞ্জ নামক স্থানে বিদ্রোহী-বাহিনী ইংরেজদের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ভোরের দিকে জাফরগঞ্জের নিকটে দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটল। প্রথমে আক্রমণ করল ইংরেজ বাহিনী। বারবার পরাজয়ের পর এবার তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিদ্রোহী-বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র উত্তরবঙ্গ থেকেই তাদের দখল, তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাদের শোষণ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। তা হলে সমগ্র বাংলাদেশেই তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। কাজেই ইংরেজরা প্রাণপণে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় মাত্র

দেড় হাজার। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে তারা ক্রমশ পিছু হটতে লাগল। বিদ্রোহীদের পিছু হটতে দেখে ইংরেজ-বাহিনী জয়ের উল্লাসে মত্ত হয়ে তাদের সকল গোলা-বারুদ নিঃশেষ করে ফেলল। বিদ্রোহী-বাহিনীর চতুর সেনাপতিদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, ইংরেজদের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, শীঘ্রই তাদের গোলা-বারুদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। বিদ্রোহীরা আরও কিছুক্ষণ পিছু হটতে লাগল। ক্রমশ ইংরেজদের আক্রমণ নিস্তেজ হয়ে এল। এবার বিদ্রোহীদের পালা। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে ইংরেজ বাহিনীর উপর হঠাৎ পাল্টা-আক্রমণ করে তাদের ঘিরে ফেলল। ইংরেজ-সৈন্যরা যুদ্ধ করে দলে দলে প্রাণ দিল। বহু ইংরেজ-সৈন্য পালিয়ে বনে, জঙ্গলে ও গ্রামে ঢুকল। কিন্তু বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাদের খুঁজে বের করে বন্দী করল। সেনাপতি টমাস স্বয়ং যুদ্ধে নিহত হল।

বিদ্রোহীরা একে একে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা উদ্ধার করতে করতে এগিয়ে চলল। এইভাবে রাজসাহী, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বৃহদংশ ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত হল। এবার বগুড়া জেলার পালা। বিদ্রোহীদের বিভিন্ন দল বগুড়া জেলায় প্রবেশ করে ইংরেজ-বণিকদের বহু কুঠি নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। বিদ্রোহীদের এই অগ্রগতির সংবাদ পেয়ে ইংরেজ শাসকগণ পূর্বের অপেক্ষাও শক্তিশালী এক বাহিনী পাঠাল বগুড়ার দিকে। এই বাহিনীর নায়ক হয়ে এল ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সেনাপতি ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস্। ইংরেজ-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আট হাজার, আর বিদ্রোহীদের সংখ্যা মাত্র চার হাজার। কাজেই বিদ্রোহীরা সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে সমগ্র ইংরেজ-বাহিনীটাকে বিপর্যস্ত করবার মতলব আঁটল। তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণের সঙ্গে এমনভাবে মিশে রইল যে, ইংরেজরা একজন বিদ্রোহীকেও খুঁজে পেল না।

এইবার ইংরেজরা বিরাট আয়োজন করেছে। তাদের সৈন্যদলের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি কামান, আর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। এই বাহিনীর পরিচালনায় আছে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বয়স্ক সেনাপতি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস্ স্বয়ং। শত্রুর এই বিপুল শক্তি দেখে বিদ্রোহীরা বগুড়া জেলা থেকে পিছু হটে অন্যদিকে আক্রমণ করল। তারা কুচবিহারের অন্তর্গত সন্তোষপুরের দুর্গ ধ্বংস করে ফেলল, তারপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা ইংলণ্ড থেকে বহু সৈন্য আমদানি করল এবং এদেশ থেকেও বহু সিপাহী সংগ্রহ করল। তারপর তারা একযোগে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ করল।

এইভাবে একই সময়ে চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বিদ্রোহীরা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গেল। এখন তারা অন্তত কিছুদিনের জন্য সম্মুখ-যুদ্ধ বন্ধ করে গেরিলা-পদ্ধতিতে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এই সময়ে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয়েছিল দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট অঞ্চলে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ ও

গেরিলা-যুদ্ধ—এই উভয় যুদ্ধ-কৌশলই প্রয়োগ করল। এই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাদের সেনাপতি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস্ বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হয়।

দিনাজপুরের এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরেজ-সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। বিদ্রোহীদের গেরিলা-যুদ্ধের ফলেও তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গেল। যে শত্রুদের চোখে দেখা যায় না, তাদের উপর আঘাত হানা চলে না। ইংরেজ বাহিনী এই যুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, উত্তরবঙ্গ থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত তাদের আর কোন উপায় রইল না। ইংরেজ বাহিনীর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা আবার চারদিকে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে লাগল। এই সুযোগে তারা উত্তরবঙ্গে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করল। দুর্গে কামান-বন্দুকের ছোট ছোট কারখানা বসল, জল-যুদ্ধের জন্য বজরা আর ছিপ তৈরী হতে লাগল। বড় বড় নদীর বাঁকে বহু নৌ-কেন্দ্র গড়ে উঠল। এবার স্থল-যুদ্ধের মত জল-যুদ্ধেরও বিপুল আয়োজন চলল।

সে সময়ে এদেশে বর্তমান কালের মত রাস্তা-ঘাট ছিল না, রেলপথ তো নয়ই। তখন জলপথই ছিল যাতায়াতের একমাত্র পথ। সেকালের নদীগুলি ছিল অন্য রকম, বর্তমান কালের মত হাজা বা মজা নদী নয়। বড় বড় নদীই ছিল পূর্ববঙ্গে যাতায়াতের একমাত্র পথ এবং ছিপ, বজরা বা নৌকায় যেতে হত। তাই পূর্ববঙ্গের ইংরেজ-রাজত্বের উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা বহু নৌ-ঘাঁটি, বজরা ও ছিপ তৈরি করল। এইভাবে তাদের বড় একটা জল-বাহিনীও গড়ে উঠল।

উত্তরবঙ্গে ইংরেজ-শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে এবার বিদ্রোহীরা একটা প্রকাণ্ড নৌ-বাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা করল। ঢাকা তখনও ইংরেজদের বড় ঘাঁটি। এই ঘাঁটি ধ্বংস করে এই অঞ্চলের জনসাধারণকে ইংরেজদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে বিদ্রোহীরা প্রতিজ্ঞা করল। বিদ্রোহীদের নৌ-অভিযানের সংবাদ ইংরেজদের কানে পৌঁছুতে বিলম্ব হল না। তারা অবিলম্বে ঢাকার কুঠির শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলল, কুঠিতে আরও বহু সৈন্য, বহু কামান-বন্দুক এল।

বহু ছিপ ও বজরা নিয়ে বিদ্রোহীরা ঢাকার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল। তারা পথের উপর সবগুলি ইংরেজ-কুঠি লুণ্ঠন করে ধূলিসাৎ করে দিল। বিদ্রোহীদের এই নৌ-অভিযানে বাধা দেবার জন্য ইংরেজরাও বহু বজরা ও ছিপ নিয়ে একটা বড় নৌ-বাহিনী পাঠাল। উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হল গোয়ালন্দের নিকট। বিদ্রোহীরা বিপুল বিক্রমে ইংরেজদের নৌ-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাল। গোয়ালন্দের পদ্মা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদের রক্তে বিশাল পদ্মার জল লাল হয়ে গেল। জল-যুদ্ধে নিপুণ বিদ্রোহীদের আক্রমণে ইংরেজ-পক্ষের সকল বজরা ও ছিপ পদ্মার গর্ভে ডুবে গেল।

এই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীদের নৌ-বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে ঢাকার কুঠির উপর আক্রমণ করল। মাত্র আধঘণ্টার যুদ্ধেই কুঠির সকল সৈন্য নিহত হল। কুঠির বড়কর্তা লিস্টার সাহেব কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠি লুট করে বহু টাকা, বিপুল খাদ্য ও পণ্য এবং বহু বন্দুক হস্তগত করল।

এদিকে ইংরেজদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীরা কিছুদিন চুপ করে ছিল। ইংরেজদের আক্রমণে ভাটা পড়লে বিদ্রোহীরা আবার কিছুদিন পরেই নূতন উদ্যমে শত্রু-ঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। বিদ্রোহীদের অন্যতম সেনাপতি নুরুল মহম্মদের অধীনে একটি বড় বাহিনী রাজসাহী জেলায় ইংরেজ বণিকদের প্রধান ঘাঁটি রামপুর-বোয়ালিয়ার উপর আক্রমণ করে কুঠির বহু টাকার সম্পত্তি হস্তগত করল। কুঠির প্রধান কর্তা বেনেট সাহেব স্বয়ং বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হল। এই সময়ে বিদ্রোহীদের আর একটি বাহিনী রংপুরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করল। কুঠির বড়কর্তা মার্টেল সাহেব প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিহত হল।

উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীরা কিছুদিন চুপচাপ থাকার ফলে ইংরেজরা ভেবেছিল যে, বিদ্রোহীরা বুঝি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই সকল আক্রমণে তারা ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠল। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করবার জন্য আবার তারা বিপুল আয়োজন করে। বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জি রংপুরের দিকে যাত্রা করে। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি ছিল সে যুগের ইংরেজ সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। এবারও ইংরেজরা সঙ্গে এনেছে বহু কামান ও গোলা-বারুদ। ইংরেজরা ভাবল যে, এবার আর উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীদের রক্ষা নেই। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি তার এই অভিযানের সংবাদ খুব গোপন রাখল এবং প্রকাশ্য পথে না চলে সসৈন্যে চলল এক গোপন পথে। সে স্থির করল, হঠাৎ রংপুর আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

তার আয়োজন হল নিখুঁত, কিন্তু বিদ্রোহীদের নিকট তার সকল গোপন কথাই প্রকাশ হয়ে গেল। তাদের পথের দুই পাশের জনসাধারণই বিদ্রোহীদের নিকট সকল সংবাদ পৌছে দিল। ইংরেজদের সৈন্য এবং অস্ত্র-সংখ্যাও বিদ্রোহীরা জেনে ফেলল। শত্রুর এই বিরাট অভিযানের সংবাদ পেয়ে তারা রংপুর ত্যাগ করল, আর সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি দ্রুত রংপুর দখল করে ফেলল। সে চারদিক খুঁজে একজন বিদ্রোহী সৈন্যেরও সন্ধান পেল না।

ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর এল লেফ্‌টনান্ট স্মিথ। সেনাপতি স্মিথও বহু অনুসন্ধানের পর বিদ্রোহীদের কোন সন্ধান না পেয়ে সসৈন্যে ফিরে চলল। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি ফিরছিল একাকী, কিন্তু স্মিথ ফিরে চলল সসৈন্যে। বিদ্রোহীরা কিন্তু সেনাপতি স্মিথকে নিরাপদে যেতে দিতে নারাজ। তারাও লুকিয়ে থেকে ইংরেজ বাহিনীর পিছু নিল। ইংরেজ বাহিনী চলেছে নেপালের কাছাকাছি দুর্গম তরাই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড বেগে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই আকস্মিক-আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে ইংরেজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। সেনাপতি লেঃ স্মিথ স্বয়ং বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হল। বিদ্রোহীরা আবার রংপুর দখল করে নিল।

এবার রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করতে এল ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড। এডওয়ার্ড বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বীরদর্পে রংপুরে প্রবেশ করে দেখল, রংপুর জনশূন্য, বিদ্রোহীরা পালিয়েছে। সে কোন বিদ্রোহী সৈন্যকেই খুঁজে পেল না।

শত্রুর বিপুল শক্তি দেখে বিদ্রোহীরা সম্মুখ-যুদ্ধ এড়িয়ে ছদ্মবেশে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিশে রইল। তারা চুপ করে থেকে সুযোগ মত বেরিয়ে ইংরেজ-সৈন্যদের ছোট ছোট দলের উপর আক্রমণ করে ও কুঠি, রসদ, গোলা, বারুদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লুটপাট করে উধাও হয়ে যায়। ইংরেজ-সৈন্যরা বিদ্রোহীদের নাগাল পায় না, চোখেও দেখে না, অথচ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ইংরেজ বীরেরা ভারত জয় করতে আরম্ভ করে এমন সাংঘাতিক শত্রুর সম্মুখীন কোন দিন আর হয়নি।

এইভাবে বিদ্রোহীরা সেনাপতি এডওয়ার্ডের সৈন্যবাহিনীকে হয়রান ও দুর্বল করে অবশেষে একদিন অকস্মাৎ তাদের সম্মুখীন হল। সেনাপতি এডওয়ার্ডের বাহিনীতে ইংরেজ-সৈন্যও ছিল, আবার দেশীয় সিপাহীও ছিল। সিপাহীরা এ-দেশীয় কৃষকের সন্তান, কেবল অন্নাভাবে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাদের সহানুভূতি ছিল সকল সময়েই কৃষক-বিদ্রোহীদের প্রতি। এই যুদ্ধে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল। সেনাপতি এডওয়ার্ড তখন নিরুপায় হয়ে কেবল ইংরেজ সৈন্যদের নিয়েই যুদ্ধ করল। এই যুদ্ধে সেনাপতি এডওয়ার্ড স্বয়ং এবং তার দলের প্রত্যেকটি ইংরেজ-সৈন্য নিহত হল।

এই পরাজয়ের ফলে ইংরেজ-শাসকগণ ভীষণ শঙ্কিত হয়ে উঠল। বঙ্গদেশে এবার কোম্পানীর রাজত্ব বুঝি যায়, বাঙ্গালীরা বুঝি এবার পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলে নেয়। ইংরেজ-শাসকগণ এবার মরিয়া হয়ে উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সচেষ্ট হল। দেশীয় সিপাহীদের উপর আর ভরসা না করে তারা এবার দেশ থেকে বহু সৈন্য নিয়ে এল এবং বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও ইংরেজ সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে একত্রে সমবেত করল। এইভাবে একই সময়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য তাদের বিপুল আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলল। সুদূর ইংলণ্ডেও এই অভিযানের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

ইংরেজ বাহিনী কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে উত্তরবঙ্গের দিকে এগিয়ে চলল। সমগ্র উত্তরবঙ্গকেই যেন এবার তারা বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। ইংরেজ বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে বিদ্রোহীরা তাদের কয়েকবার বাধা দেবার চেষ্টা করে পরাজিত হল। স্বয়ং মজনু সর্দার বগুড়ার নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিহারে পলায়ন করলেন। সেই অভাবনীয় জয়লাভের পর পাঁচটি ইংরেজ সৈন্যদল উত্তরবঙ্গ চষে ফেলতে লাগল। জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার-উৎপীড়ন চলল। বিদ্রোহীরা তখন তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তিস্তা নদীর তীরে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেনাপতি নুরুল মহম্মদ পালিয়ে গেলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অপর সেনাপতি পীতাম্বর করতোয়া নদীর তীরে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন। ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের পরিবর্তে সম্মুখযুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার ফলেই বিদ্রোহীরা এইভাবে চারদিকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল।

ইংরেজ বাহিনীর এই আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বিদ্রোহীদের কয়েকটি দল ইংরেজ বাহিনীর বেড়াজাল ভেদ করে পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হল। তাদের একটি দল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এমন কি ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখনকার কোম্পানীর কর্মচারীদের বিবরণ থেকেই তা জানা যায়। এইভাবে বিদ্রোহীদের কয়েকটি দল পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, রায়পুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদিকে বিদ্রোহীদের পর পর কয়েকবার পরাজয়ের ফলে ইংরেজরা ধরে নিল যে, বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু মাত্র এক বৎসর শেষ হতে না হতেই বিদ্রোহীরা আবার নূতন শক্তি নিয়ে দেখা দিল। মজ্নু সর্দার বিহার থেকে এক বড় সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে বাংলাদেশে ফিরে এলেন। মুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, ভবানী পাঠক প্রভৃতি বিদ্রোহী সেনাপতিরাও বঙ্গদেশ থেকে দুইটি সৈন্যবাহিনী গঠন করে মজ্নুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

অবিলম্বে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রথমদিকে কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যদল একে একে পরাজিত হল। সমগ্র উত্তরবঙ্গ পুনরায় বিদ্রোহীদের পদভরে কেঁপে উঠল। রাজসাহীর দুর্গ-শীর্ষে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড়তে লাগল। আবার নূতন আশায় বাংলার জনসাধারণ বুক বাঁধল।

ধ্বংসের পরিবর্তে নূতন শক্তিতে বিদ্রোহীদের আবির্ভূত হতে দেখে ইংরেজ শাসকগণ প্রমাদ গণল। আবার তারা প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগল। কলিকাতা থেকে নূতন নূতন ইংরেজ বাহিনী ছুটল উত্তরবঙ্গের দিকে। এবারে প্রথম যুদ্ধ হল রংপুরের পশ্চিমদিকে। একদিকে মুরুল মহম্মদের বিদ্রোহী বাহিনী, অপর-দিকে ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনে বড় একদল ইংরেজ সৈন্য। পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঘোরতর যুদ্ধ চলল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ-বাহিনী কামান থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে অগ্রসর হতে লাগল, আর বিদ্রোহীরা সেই গোলাবর্ষণের বেগ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ইংরেজদের গোলা নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর আরম্ভ হল বিদ্রোহীদের আক্রমণ। ইংরেজ সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল এবং সেনাপতি টমাস্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাল।

এই অভাবনীয় জয়লাভের ফলে বিদ্রোহীরা উৎসাহে মেতে উঠল। তাদের সেনাপতি মুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর জয়ের উল্লাসে মত্ত হয়ে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি খাস কলিকাতার উপর আক্রমণের জন্য ছুটে চললেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি মজ্নু সর্দার এখনই কলিকাতা আক্রমণ উচিত বলে মনে করলেন না। আরও কিছুকাল গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ করে ইংরেজদের শক্তি ক্ষয় করতে তিনি পরামর্শ দিলেন। মুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই ছুটলেন কলিকাতার দিকে।

এই সংবাদ পেয়ে ইংরেজরা কলিকাতা রক্ষার সমস্ত আয়োজন করল। বড় বড় ইংরেজ সৈন্যদল কলিকাতার প্রত্যেকটি পথের উপর ঘাঁটি করল, আর সেই সব সৈন্যদলের সঙ্গে রইল বড় বড় কামান। বিদ্রোহী-বাহিনী কলিকাতার নিকটবর্তী হবার পূর্বেই মাঝপথে তাদের ছত্রভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজ বাহিনী

গোপনে যাত্রা করল। এই বাহিনীর নায়ক ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি লেফ্‌টনান্ট ম্যাকডোনাল্ড। বিদ্রোহীরা কলিকাতার দিকে এগিয়ে আসছিল যশোরের পথে।

লেঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর বাহিনী চুপি চুপি যশোরের পথে অগ্রসর হল। নুরুল ও পীতাম্বরের অধীনে বিদ্রোহী বাহিনী দ্রুত কলিকাতার পথে এগিয়ে চলেছে। দুই বিদ্রোহী সেনাপতি তখন তাঁদের পূর্বের জয়ের উল্লাসে এতই মত্ত যে, ইংরেজ বাহিনীর গোপন সংবাদ নেবার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করলেন না। তাঁরা তখন পলাশীর পরাজয়ের প্রতিশোধ ও বাংলার স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। এদিকে ইংরেজ বাহিনী তাঁদের নিকটবর্তী হল।

সন্ধ্যার দিকে বিদ্রোহী-বাহিনী যশোরের কাছে মোগলহাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলল। সারা দিনের পথশ্রমে সৈন্যরা শ্রান্ত-ক্লান্ত। তারা অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করল শেষ রাত্রে। এই অতর্কিত আক্রমণে ও তাদের শক্তিশালী কামানের প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে বহু বিদ্রোহী সৈন্য প্রাণ দিল। বীর বিদ্রোহী সেনার পবিত্র রক্তে মোগলহাটের শস্যক্ষেত্র রঞ্জিত হয়ে গেল। সেনাপতি নুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর বাংলার স্বাধীনতার জন্য বীরের মত যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। মোগলহাট বাংলার দ্বিতীয় পলাশী হয়ে রইল।

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর বিদ্রোহীরা সর্বত্র পরাজিত হতে লাগল। উত্তর-বঙ্গে মজ্‌নু সর্দার পর পর কয়েকবার পরাজিত হলেন। অবশেষে মজ্‌নু ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও আহত হয়ে বাংলাদেশ থেকে পলায়ন করলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি রাজসাহীর দুর্গ ইংরেজদের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর সারা বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তি ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল। এর পরেও বিদ্রোহী সেনাপতি ও নেতারা তাঁদের শক্তি গড়ে তোলবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেননি। এর পর বিদ্রোহী সৈন্যগণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বাংলা ও বিহারের সর্বত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এইভাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইসব বিদ্রোহী সৈন্যদল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। সেই সংগ্রামও অবশেষে একদিন ইংরেজ শাসকদের বীভৎস অত্যাচারের ফলে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিদ্রোহী নেতারা একে একে ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা পড়ে বন্দুকের গুলিতে ও ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। স্বয়ং মজ্‌নু সর্দার বিহারে তাঁর নিজ গ্রামে মারা যান।

এইভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বাংলা ও বিহার তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে বাঙালী ও বিহারবাসীদের রক্তে লেখা আরম্ভ হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়
বারাণসী বিদ্রোহ (১৭৮১)

ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের মত বিহার প্রদেশও ছিল "ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা"। অনেক ইংরেজ লেখকও তা স্বীকার করেছেন। বিহার প্রদেশে বারাণসী রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী অযোধ্যা রাজ্য ছিল শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিতে সবচেয়ে উন্নত। এই রকম দুইটি অঞ্চল ইংরেজ-রাজের ধ্বংসকারী হস্তের স্পর্শে মাত্র কয়েক-বৎসরের মধ্যে শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ বণিকরাজের লোভাতুর দৃষ্টিতে পড়ল এই দুই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, তারপর থেকেই ইংরেজ বণিকেরা নির্মম শোষণে অবাধে চাষীদের পিষে মারতে লাগল।

বারাণসী জাগীর পূর্বে ছিল অযোধ্যার নবাবের অধিকারভুক্ত। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকগণ এই জাগীর দুর্বল অযোধ্যার নবাবের হস্ত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের অধিকারভুক্ত করে। পূর্বে এই জাগীরের শাসন-ভার ছিল বলবন্ত সিংহ নামক এক ব্যক্তির উপর। ইংরেজ শাসকগণ তাঁরই পুত্র চৈৎসিংহকেই বারাণসী রাজ্যের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। আর বারাণসী রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও ইংরেজের স্বার্থরক্ষার শর্তে চৈৎসিংহ তাদের নিকট থেকে লাভ করলেন মুদ্রা তৈরি, সৈন্যদল গঠন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের অধিকার। ইংরেজ শাসকগণ বারাণসী রাজ্যের বাৎসরিক কর ধার্য করল ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। বারাণসীর মত একটি ছোট রাজ্যের উপর ধার্য করা এই বিপুল করভারে চাষীদের জীবনে দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়।

রাজা চৈৎসিংহ ইংরেজ-রাজের করের সকল অর্থই আদায় করত চাষীদের নিকট থেকে। তার ফলে চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসল, তাদের চাষবাস, শিল্প-বাণিজ্য সমস্ত ধ্বংস হয়ে গেল। রাজা চৈৎসিংহের ও ইংরেজদের কর যোগাবার জন্য চাষীরা ক্ষেতের সমস্ত ফসল ইংরেজ বণিক, মহাজন ও জমিদারদের নিকট বিক্রয় করে অনাহারে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে লাগল।

কিন্তু এতেও তাদের অব্যাহতি নেই। ইংরেজরা তখন দাক্ষিণাত্যের মারাঠা-শক্তি ও মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। অন্যদিকে বঙ্গদেশে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের আলোড়নে সেখানকার কর আদায় করা অসম্ভব। তার ফলে ইংরেজ শাসকগণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং ইংরেজ শাসকগণ বারাণসী রাজ্য থেকে অর্থ অধিক সংগ্রহ করবার সিদ্ধান্ত করল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংস চৈৎসিংহের নিকট দাবি করল তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্যের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সাধারণ কর বাবদ আরও পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ টাকা। করের পরিমাণ বেড়ে হল সাতাশ লক্ষ টাকা, আর এই টাকাও চৈৎ-সিংহকেই আদায় করতে হত। কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাও তাঁর জানা ছিল।

চৈৎসিংহ উপায় না দেখে ইংরেজ প্রভুদের এই দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, তাদের নিকট অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। তখন চৈৎসিংহ প্রজাদের কাছে ইংরেজ শাসকদের নূতন জুলুমের কথা, অতিরিক্ত অর্থের দাবি প্রভৃতি সব জানালেন। তারপর বিশেষ কর হিসাবে বাৎসরিক ১৫ লক্ষ টাকা চাষীদের নিকট থেকে আদায় করে ইংরেজদের হাতে দিলেন। এইভাবে চলল তিন বৎসর। তাতেও কিন্তু গভর্নর হেষ্টিংসের ক্ষুধা মিটল না, সে চৈৎসিংহকে অবিলম্বে নিজের খরচে প্রথমে দুই হাজার, তারপর আবার দেড় হাজার, পরে আরও এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাবার আদেশ দিল; স্বভাবতঃই চৈৎসিংহ আরও সৈন্য পাঠাবার অক্ষমতা জানালেন। এতে হেষ্টিংস ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চৈৎসিংহকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করল, তারপর বারাণসীর দিকে যাত্রা করল চৈৎসিংহকে তাঁর অবাধ্যতার জন্য কঠিন শাস্তি দিতে।

হেষ্টিংসের বারাণসী যাত্রার সংবাদ পেয়ে চৈৎসিংহ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে সাহায্যের জন্য প্রজাদের নিকট আবেদন জানালেন। প্রজারা জানত, তাদের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ হল ইংরেজ বণিক শাসকগণ আর তাদের বড় কর্তা গভর্নর জেনারেল হেষ্টিংস। সুতরাং হেষ্টিংসকে উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্য বারাণসী রাজ্য, অযোধ্যা রাজ্য ও বিহারের একটা বিরাট অঞ্চলের চাষীরা প্রস্তুত হয়ে রইল।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যভাগে হেষ্টিংস এসে বক্সারে উপস্থিত হল। চৈৎসিংহ ভয় পেয়ে ইংরেজ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করে অবিলম্বে ২০ লক্ষ টাকা দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু হেষ্টিংস এই সকল কথায় কান না দিয়ে চৈৎসিংহকে কঠোর শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করল। হেষ্টিংস রুদ্রমূর্তিতে বারাণসী উপস্থিত হল।

হেষ্টিংস বারাণসীতে এসেই চৈৎসিংহের নিকট বহু অভিযোগ সম্বলিত এক দীর্ঘ অভিযোগ-পত্র পাঠাল এবং অবিলম্বে তার লিখিত জবাব চাইল। স্বভাবতঃই চৈৎসিংহ সকল অভিযোগ অস্বীকার করলেন। জবাব পেয়ে হেষ্টিংস ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চৈৎসিংহকে বন্দী করবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাল। চৈৎসিংহকে তাঁর প্রাসাদেই বন্দী করে রাখা হল।

দেখতে না দেখতে চৈতসিংহের গ্রেপ্তারের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চাষীরা পূর্ব থেকেই এইরূপ একটা ঘটনার অনুমান করে নিকটেই কোথাও সমবেত হয়েছিল। এবার তারা তাদের রাজাকে বন্দী করার সংবাদ পাওয়ামাত্র বারাণসী নগরীর মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল নগরীর সাধারণ মানুষ। বারাণসী এক বিশাল সশস্ত্র জনসমুদ্রে পরিণত হল। চাষী ও সাধারণ মানুষের বহু দিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিদ্রোহের আকার ধারণ করল। সশস্ত্র জনতা চৈৎসিংহের প্রাসাদ ঘিরে ফেলে ইংরেজপক্ষীয় সকল সৈন্যকে হত্যা করল।

যখন বাইরে ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী প্রজাদের রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছিল, তখনই চৈৎসিংহ তাঁর মাথার পাগড়ীর সাহায্যে প্রাসাদের পিছন দিকের

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নৌকাযোগে গঙ্গার পথে পলায়ন করলেন এবং নিকটবর্তী রামনগরের সুরক্ষিত প্রাসাদে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

চৈৎসিংহের পলায়ন ও ইংরেজ-পক্ষের সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার পর বিদ্রোহীরা কি করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। তাদের নির্দেশ দেবার মত কেউ ছিল না। চৈৎসিংহের পলায়নে ও ইংরেজ সৈন্যদের হত্যা করতে পারায় বিদ্রোহীরা তখন আনন্দে আত্মহারা, তাই তারা ভুলে গেল যে, নগরীর মধ্যেই মাত্র এক মাইল দূরে তাদের ও ভারতের প্রধান শত্রু গভর্নর জেনারেল বসে আছে। হেস্টিংসকে তারা এত নিকটে প্রায় একাকী পেয়েও তার কথা ভুলে গেল। সুতরাং বিদ্রোহীরা বারাণসীতে আর কিছু করবার মত কাজ না পেয়ে চৈৎসিংহকে উদ্ধার করতে রামনগরের দিকে ধাবিত হল। বারাণসী নগরী প্রায় জনশূন্য হয়ে রইল।

এদিকে হেস্টিংস বারাণসী নগরীতে বসেই ষোল মাইল দূরের চুনার দুর্গে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাবার জন্য নির্দেশ পাঠাল। নির্দেশ পেয়ে চুনার থেকে এক বিরাট ইংরেজ বাহিনী বারাণসীর দিকে ছুটল। লক্ষ্ণৌ থেকে হেস্টিংসকে উদ্ধার করতে সৈন্য এল। কিন্তু হেস্টিংস এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে বাংলাদেশ থেকে কর্ণেল মুর নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে আর এক দল সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ জানাল। এই তিনদল সৈন্য এসে পৌছাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন মেক্ষেয়ারের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য রামনগর যাত্রা করল চৈৎসিংহকে বন্দী করবার জন্য।

অন্যদিকে বারাণসীর ঘটনা শুনে ঐ রাজ্যের সমস্ত চাষী চারদিক থেকে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রামনগরে সমবেত হল। ইংরেজ বাহিনী রাজাকে বন্দী করতে আসছে শুনে তারা রামনগর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হল।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট সকাল বেলা ইংরেজ বাহিনী রামনগরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। কৃষক-বাহিনী তাদের ভিতর থেকেই সেনাপতি নির্বাচন করেছিল। সেই সেনাপতির নেতৃত্বে তারাও প্রচণ্ড বিক্রমে পাল্টা আক্রমণ করল। দ্বিপ্রহরের দিকে এক ভয়ঙ্কর খণ্ড যুদ্ধে সেনাপতিসহ সমগ্র ইংরেজ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই জয়লাভের পর বিদ্রোহী বাহিনী বারাণসী নগরীতে প্রবেশ করে হেস্টিংসকে গ্রেপ্তার করবার সিদ্ধান্ত করল। ইতিমধ্যে চৈৎসিংহের আচরণ ক্রমশ সন্দেহজনক হয়ে উঠতে লাগল। সামন্তরাজ চৈৎসিংহ যেন এখন কৃষক-বিদ্রোহীদের ভয়ের চোখে দেখতে লাগলেন, আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া তাঁর নিজের স্বার্থেই বিপজ্জনক মনে করলেন। কারণ, তিনি নিজেও তো কৃষক-শোষণকারী, হয়ত এই বিদ্রোহী-কৃষকেরা একদিন তাঁর বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করবে। সেইজন্য চৈৎসিংহ অবিলম্বে ইংরেজদের সঙ্গে আপস করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ইংরেজ বাহিনী রামনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের মধ্যে মেজর মর্গানের বাহিনী রামনগরের নিকটবর্তী হওয়ামাত্র চৈৎসিংহ গোপনে মেজর মর্গানের মারফত হেস্টিংসের নিকট শান্তি ও আপসের প্রস্তাব পাঠালেন। হেস্টিংস এই আপস-প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে সেই রাত্রেই অর্থাৎ ২০শে আগস্ট

রাত্রিকালে বিদ্রোহীদের বেড়াজাল অতিক্রম করে গোপনে বারাণসী থেকে পলায়ন করে যোল মাইল দূরে সুরক্ষিত চুনার দুর্গে আশ্রয় নিল ।

রামনগরে ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় ও ধ্বংসের পর সারা বারাণসী ও অযোধ্যা রাজ্যের, এমনকি, বিহার প্রদেশেরও একটা বিরাট অঞ্চলের চাষী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ ও জাগরণ দেখা দিল। যে বিদেশী ইংরেজ এ-অঞ্চলের কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংস, তারা আজ সেই শত্রুকে করতলে পেয়েছে। তাই আজ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বারাণসী, অযোধ্যা ও বিহারের কৃষকগণ যে-কোন একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে হাজারে হাজারে রামনগরে ছুটে এল। রামনগর হয়ে উঠল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

বিদ্রোহীরা চৈৎসিংহকেই তাদের প্রধান নায়ক বলে মেনে নিয়ে তাঁর সম্মান রক্ষার্থে পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। কিন্তু চৈৎসিংহের মনে তখন দেখা দিয়েছে এক প্রচণ্ড ভয় ও উদ্বেগ। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, কি ইংরেজদের দয়া ভিক্ষা করবেন, তা তিনি স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে ইংরেজদের সঙ্গে আপসের সিদ্ধান্তই তিনি মনে মনে গ্রহণ করলেন এবং গোপনে হেস্টিংসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আপসের জন্য নূতন প্রস্তাব পাঠালেন।

কিন্তু চৈৎসিংহের আপসের প্রস্তাবে কোন কাজ হল না। তখন বিশাল ইংরেজ বাহিনী এসে পড়েছে এবং হেস্টিংসও বারাণসী থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় চুনার দুর্গে গিয়ে উঠেছে। কাজেই ইংরেজরা এবার চৈৎসিংহকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হল।

এদিকে বিদ্রোহীরা হেস্টিংসের পলায়নের সংবাদ পেয়েও নিরুৎসাহ হল না। কিন্তু তারা তখনও জানত না যে, তাদের প্রধান নায়ক চৈৎসিংহ স্বয়ং গোপনে ইংরেজ শত্রুর সঙ্গে আপস-মীমাংসার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই বিদ্রোহীদের উৎসাহ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪০ হাজার সশস্ত্র জনতায় পরিণত হল এবং এই বিপুল শক্তি নিয়ে তারা ইংরেজ বাহিনীর উপর পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল।

অন্যদিকে হেস্টিংস-এর নিকট থেকে তাঁর শেষ প্রস্তাবের কোন জবাব না পেয়ে চৈৎসিংহ তখন বিষম সংকটে পড়েছেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও হেস্টিংস তাঁর আপসের প্রস্তাব গ্রহণ করছে না, আর বিদ্রোহী কৃষকদেরও তিনি রীতিমত ভয় করেন। চৈৎসিংহ বুঝতে পারলেন, অবিলম্বে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে না পারলে ইংরেজদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করে রাজ্য ফিরে পাওয়ার কোন আশা নেই। অথচ বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে অবিলম্বে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। চৈৎসিংহ যেন তাঁর বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে বন্দী!

এবার বিদ্রোহী জনতা চুনার দুর্গ অবরোধ করবার সিদ্ধান্ত করল। তারা চৈৎসিংহকে সঙ্গে নিয়ে চুনারের নিকটবর্তী শিকার নামক স্থানে এসে ঘাঁটি স্থাপন করল। ইতিমধ্যে চুনারের তিনদিক থেকে তিনটি শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনী মিলিত

হয়েছে এবং সুবিধামত স্থানে বহু কামান সন্নিবেশ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বিদ্রোহী জনতার বিপুল সংখ্যা দেখে তারাই প্রথম আক্রমণের সিদ্ধান্ত করল। তারা জানত, যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচালকহীন বিদ্রোহী জনতার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

২৯শে আগস্ট ইংরেজ সেনাপতি মেজর পপ্‌হামের নেতৃত্বে কামান বন্দুকে সজ্জিত একটি বিরাট বাহিনী বিদ্রোহীদের ঘাঁটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল। বিদ্রোহী জনতা সেই আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, তাদের বহুলোক নিহত ও আহত হল। তারা চৈৎসিংহকে সঙ্গে নিয়ে চুনার দুর্গ থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী পতিতা নামক স্থানে পৌছে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

২০শে সেপ্টেম্বর মেজর পপ্‌হামের বাহিনী বিদ্রোহীদের অধিকৃত পতিতা শহরের উপর আক্রমণ করে আবার তাদের পলায়ন করতে বাধ্য করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। বহু শত কৃষক নিহত ও কয়েক সহস্র আহত হয় এবং অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে চৈৎসিংহ লতিফগড়ের দুর্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজ-বাহিনী পিছু তাড়া করে এসে লতিফগড়ের দুর্গের উপরেও আক্রমণ করে। দুর্গের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল তখনই চৈৎসিংহ কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে দুর্গ থেকে পালিয়ে বিজয়গড়ের পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং শেষ বারের মত হেষ্টিংসের নিকট আপসের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু এবারেও আপস প্রস্তাবের কোন জবাব এল না। লতিফগড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও চৈৎসিংহের পলায়নের ফলে বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে গেল, চরম হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল। কিছুদিন পর ইংরেজ বাহিনী চৈৎসিংহের আশ্রয়স্থল বিজয়গড় আক্রমণ করতে অগ্রসর হল। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র চৈৎসিংহ সেখান থেকে পালিয়ে সুদূর গোলকোণ্ডা রাজ্যে আশ্রয় নেন। চৈৎসিংহ বিজয়গড়ে রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও মাতাকে। এই দুই বীর রমণী অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিরাট ইংরেজ বাহিনীকে বাধা দিলেন, কিন্তু দুর্গ রক্ষা করতে পারলেন না। ইংরেজরা দুর্গ দখল করে তাঁদের প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করল এবং তার ফলে চৈৎসিংহের মাতা ও স্ত্রী আশ্রয়চ্যুতা হলেন।

এদিকে চৈৎসিংহ ইংরেজদের ভয়ে গোলকোণ্ডা থেকে পালিয়ে গেলেন গোয়ালিয়র রাজ্যে। গোয়ালিয়র রাজ্যে পৌছাবার পর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর পর ইংরেজ শাসকগণ চৈৎসিংহের কোন এক ভাগিনেয়কে বারাণসীর রাজা বলে ঘোষণা করল। এই রাজাটি হল সাক্ষী গোপালের মত, ইংরেজরাই হল প্রকৃত শাসক। তারা এই সুযোগে বারাণসী রাজ্যের বাৎসরিক কর সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে করল চল্লিশ লক্ষ টাকা। আর চৈৎসিংহ যে কর বাকী ফেলেছিলেন, তাও তারা আদায় করে নিল।

এইভাবে 'বারাণসী-বিদ্রোহের' সমাপ্তি ঘটল। কোন কোন ঐতিহাসিক এই

বিদ্রোহকে অভিহিত করেছেন 'চৈৎসিংহের বিদ্রোহ' বলে। কিন্তু হেন্‌রি বিভারিজ, জেম্‌স্ মিল, ও'ম্যালী প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে কৃষক-বিদ্রোহ বলেই উল্লেখ করেছে। কোন কোন সময় সামন্ত রাজারা ইংরেজের উৎপীড়নে ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজাদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিলেও তারা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী প্রজাদের ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে অথবা মিলাবার চেষ্টা করেছে, আর এইভাবে বিদ্রোহের ব্যর্থতা অনিবার্য করে তুলেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৭০)

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' ব্যর্থ হয়ে গেলেও ভারতের বিদ্রোহী মানুষ কোনদিন শান্তভাবে ইংরেজ শাসনকে মেনে নেয়নি; বাংলা ও বিহারের 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের' আগুন জ্বলে-উঠেছে, সেই আগুন কখনও কখনও সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়লেও আবার নূতন ইন্ধন পেয়ে তা বারবার বিভিন্ন আকারে জ্বলে উঠে ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করবার উপক্রম করেছে।

'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ'-এর অবসানের পূর্বেই, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলের পাহাড়িয়া আদিবাসীদের বিদ্রোহ উদ্ধত ইংরেজ শক্তিকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল। 'চোয়াড়' নামক আদিবাসীদের বিদ্রোহ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া থেকে আরম্ভ হয়ে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন অচল করে তুলেছিল। মারাঠাদের কাছ থেকে দখল করা উড়িষ্যার* 'খুড়দা-বিদ্রোহ' ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার 'পাইক-বিদ্রোহ' ও 'খোন্দ জাতির বিদ্রোহ' প্রদেশ থেকে ইংরেজ শাসন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

এইভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকার সময়েই অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তেতাল্লিশটি বছর ধরে ইংরেজরা প্রথমে বাংলা ও বিহার এবং পরে উড়িষ্যা প্রদেশের ধন-সম্পদ শোষণ করে সেই বিপুল শক্তির সাহায্যে পাঞ্জাব ব্যতীত গোটা ভারতবর্ষই গ্রাস করে ফেলল। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এত বড় একটা দেশকে গ্রাস করা কঠিন। তাই ধূর্ত ইংরেজ অজগরের শিকার গেলার মত ভারতের জনগণের শক্তি ক্রমশ চূর্ণ করে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে লাগল। ভারতবাসী, বিশেষ করে ভারতের কৃষক জনসাধারণ এই বিদেশী শত্রুকে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এই শক্তিমান ও খল শত্রুর সঙ্গে যুঝে উঠতে পারেনি। এক একটি অঞ্চল দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসকগণ তাদের দখলভুক্ত অঞ্চলের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ

* পলাশীর যুদ্ধের সময় থাস উড়িষ্যা ছিল মহারাষ্ট্র-শক্তির দখলে। সেই সময়ে হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ইংরেজেরা এই তিনটি জেলা দখল করে নেয়। পরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ মারাঠাদের নিকট থেকে উড়িষ্যা প্রদেশ দখল করে। তার পর উড়িষ্যায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়।

গ্রাম-সমাজ ভেঙে চুরমার করে জনগণের জীবনযাত্রার উপায়সমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে, তার ফলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ উচ্ছন্নে গেছে, তারা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে। ইংরেজ শাসকগণ সেই সকল অঞ্চলে জমিদারী-প্রথা প্রভৃতি শোষণ ও উৎপীড়নমূলক অর্থনীতি চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইংরেজগণ ভারতে যে শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করল, তার প্রধান শিকার হল সংখ্যাধিক মুসলমান চাষী। এছাড়া, ইংরেজরা মুসলমান-শাসকদের হাত থেকেই এদেশের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। তারা প্রথমে বাংলা ও বিহার দখল করেছে মুসলমান নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার হাত থেকে। তারপর দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে শেষ মোগল-সম্রাটের কাছ থেকে। তাই ভারতের মুসলমানগণ কোনদিন এই বিদেশীদের ক্ষমা করেনি। তারা ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিদেশী শাসকদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। সেই হেতু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়, তখন প্রধানত হিন্দুরাই ইংরেজ শাসকদের সহিত সহযোগিতা করে এবং প্রায় সকল জমিদারিই হিন্দুদের হস্তগত হয়। এর ফল দাঁড়াল এই যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু, আর তাদের অধীনস্থ চাষীদের অধিকাংশই মুসলমান। তখন থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসক, জমিদার-মহাজন ও অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীলগণ এই সুযোগ গ্রহণ করে বাংলা ও বিহারের প্রায় সকল কৃষক-বিদ্রোহকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়েছে। ফলে বহু কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বিদেশী ইংরেজগণ ভারতের মুসলমানদের হাত থেকেই ভারতের বিরাট সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। তাই ভারতের সকল মুসলমান এই বিদেশীদের চির-শত্রুরূপে গ্রহণ করেছে। ভারতের মুসলমানরাই ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী বিদ্রোহ করেছে, ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ-রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করেছে। তাই মুসলমানদের শান্ত করতে এবং তাদের সহযোগিতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে ভারতের বড়লাট লর্ড মেয়ো এই হতাশাময় খেদোক্তি করেছিল: 'মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন?' লর্ড মেয়ো'র এই খেদোক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যে বিদেশী ইংরেজগণ মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের বিশাল সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মুসলমানগণ তাদের 'ধর্মের অনুশাসন' হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহ'-এর যে আগুন সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে ভারতের ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, তাও প্রথমে মুসলমানগণের ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই আরম্ভ হয়ে ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জমিদার-মহাজন-বিরোধী শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

*　　*　　*

তখন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। এক পাঞ্জাব ব্যতীত সারা ভারতের বুকের উপর দিয়ে ইংরেজ-রাজের অত্যাচারের তাণ্ডব ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভেঙে চুরমার করে ছুটে চলেছে, ভারতের সাধারণ মানুষ মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন উচ্ছন্নে গিয়েছে। এমন সময় মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের সংকল্প নিয়ে রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি মক্কা থেকে ফিরে এলেন। তিনি মক্কা থেকে নিয়ে আসেন ওয়াহাবী আন্দোলনের নূতন আদর্শ। ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শ ছিল মুসলমানদের ভিতর থেকে তখনকার প্রচলিত বহু কুসংস্কার দূর করে মুসলমান ধর্মকে নূতন করে গড়ে তোলার আদর্শ। 'ওয়াহাবী' শব্দের অর্থ 'নবজাগরণ'। আরবের আবদুল ওয়াহাব এই আদর্শের প্রবর্তক। তাঁর নাম অনুসারেই এই আন্দোলনের নাম হয়েছিল 'ওয়াহাবী আন্দোলন'। ধর্মের ব্যাপার হলেও এই আদর্শের ভিতরে ছিল তখনকার প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের আহ্বান। এই বিদ্রোহের আহ্বান নিয়েই সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি মক্কা থেকে ফিরে আসেন।

সৈয়দ আহম্মদের জীবন-কাহিনী ভারতের বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই কাহিনী। তিনি কৈশোরে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখেছিলেন। তারপর ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি পিণ্ডারী কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহী পিণ্ডারী কৃষকদের এক সৈন্যদলের সেনাপতি-রূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পিণ্ডারীরা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হস্তে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর পর সৈয়দ আহম্মদ তীর্থ করবার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন।

মক্কা থেকে ফিরে সৈয়দ আহম্মদ তাঁর নূতন ওয়াহাবী আদর্শ চারদিকে প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই নূতন আদর্শের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল বটে, কিন্তু এই গোঁড়ামির ফলেই বিদেশী ইংরেজ রাজ হল ভারতের মুসলমানদের প্রধান শত্রু। ইংরেজরা তখন সবেমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর জেঁকে বসেছে। তারা মুসলমান-বাদশাহের কাছ থেকে ভারতের শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। ইংরেজ-রাজের কৃষিব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—জমিদারী প্রথা) মুসলমান চাষীকে শোষণের চাকার তলে পিষে মেরেছে। ইংরেজরা গোটা ভারত-বর্ষই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, ভারতবর্ষ বিদেশী ইংরেজের কুক্ষিগত। তাই সৈয়দ আহম্মদ ভারতবর্ষকে 'শত্রুর দেশ' (অর্থাৎ শত্রু-কবলিত দেশ) বলে অভিহিত করলেন। সৈয়দ আহম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত ওয়াহাবী মুসলমানগণ এই বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদ করে সকল প্রকার অত্যাচারের মূলোৎপাটন ও 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করল।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহম্মদ ভারতের উত্তর অঞ্চল ঘুরে তাঁর এই নূতন ধর্মমত প্রচার করলেন। সমগ্র উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ

মুসলমান আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এর পর তিনি সারা বিহার ঘুরে বিহারের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করে তুললেন। বিহারের পাটনা হল ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দ্র। কালক্রমে পাটনা নগরীই সারা ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এর পর সৈয়দ আহম্মদ কলিকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা দেশে তাঁর নূতন আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেন। বাংলার মুসলমানগণ প্রায় সকলেই চাষী, আর তারা তখন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত। এ পূর্বেই বাংলার চাষীদের মধ্যে নিজ থেকেই একটা বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। সৈয়দ আহম্মদের এই নূতন আদর্শ বাংলার চাষীদের মধ্যে নূতন আশার আলোক জেলে দিল। বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান চাষী সৈয়দ আহম্মদের এই নূতন ধর্মপ্রচারের মধ্যে শুনল এক বিদ্রোহের আহ্বান। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ গিয়ে উপস্থিত হলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের ওয়াহাবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। আপাতত তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে কর্মকেন্দ্র স্থাপনের পিছনে ছিল একটা গভীর উদ্দেশ্য।

তখন পাঞ্জাবে চলছিল রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখদের অখণ্ড আধিপত্য। বাংলাদেশের মতই পাঞ্জাবের অধিকাংশ লোক, বিশেষত অধিকাংশ চাষীই, মুসলমান। মুসলমান চাষীদের উপর শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের নিরঙ্কুশ অত্যাচার ও শোষণ মুসলমান চাষীদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তারা শিখ জায়গীরদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সুযোগ খুঁজছিল। ঠিক এই সময়ে আহম্মদের প্রচারের ফলে পাঞ্জাবের মুসলমান-চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

সৈয়দ আহম্মদ কেবল একটি নূতন ধর্মমতের প্রচারক নন, তিনি মনে-প্রাণে বিদ্রোহী, তাঁর ওয়াহাবী আদর্শ বিদ্রোহেরই আদর্শ। তিনি একদিকে যেমন এক বিদ্রোহী আদর্শের প্রচারক, তেমনি অন্যদিকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণেও সক্ষম। পাঞ্জাবের মুসলমান চাষীদের বিদ্রোহে তিনি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই বিদ্রোহ ক্রমশ ভীষণ আকার ধারণ করল। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধের, অর্থাৎ "জেহাদের" রূপ গ্রহণ করল। কেউ কেউ যে ওয়াহাবী বিদ্রোহকে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন বলে ব্যাখ্যা করেন, এ হল তার একটি কারণ। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহই ছিল এই আন্দোলনের মূল কথা। অবশ্য এই ধর্মযুদ্ধ বা "জেহাদ"-এর ফলে শিখ-চাষীদের আন্দোলন বিদ্রোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে ওয়াহাবীদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। আহম্মদ উত্তর ভারতে যে বিরাট ওয়াহাবী কর্মিসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, এবার এই ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি সেই কর্মীদের আহ্বান করলেন। এই ধর্মযুদ্ধের সংবাদ শোনা মাত্র সারা ভারতের ওয়াহাবীরা উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে শিখরা ওয়াহাবীদের নিকট কয়েকবার পরাজিত হল। রণজিৎ সিংহের শিখ রাজ্যের উপর ওয়াহাবীদের আক্রমণ চলতেই লাগল। ওয়াহাবীদের একটা বিরাট বাহিনী পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার দখল করল।

কিন্তু ওয়াহাবীরা বেশীদিন পেশোয়ার দখল করে রাখতে পারল না। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ও উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে ওয়াহাবী বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শিখদের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং নিহত হলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে ওয়াহাবী বাহিনীর মধ্যে সাময়িকভাবে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াহাবীদের হতাশা ও বিশৃঙ্খলা কেটে গেল। তাদের মধ্যে আবার উৎসাহ ফিরে এল। ওয়াহাবী বাহিনী আবার পূর্ণোদ্যমে শিখদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। এই আক্রমণের ফলে শিখরাজ্য টলে উঠল। এই যুদ্ধের মধ্যেই পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মাঝামাঝি সিতানা নামক স্থানে ওয়াহাবীরা এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে। এবার এই দুর্গই হল সারা ভারতের ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। এই দুর্গ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কেবল পাঞ্জাবেই নয়, সারা ভারতে ওয়াহাবীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এবার সেই বিদ্রোহের আঘাত পড়তে লাগল ইংরেজদের উপর, সেই আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসন কেঁপে উঠল।

এতদিন ইংরেজ শাসকগণ একটা গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়াহাবীদের আন্দোলনে ও প্রচারে বিশেষ কোন বাধা দেয়নি। ইংরেজ শক্তি তখন পর্যন্ত পাঞ্জাব বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারেনি। 'পাঞ্জাব কেশরী' রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্য পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ ও তা অধিকার করে নেবার সাহস ও শক্তি তখন ইংরেজদের ছিল না। ইংরেজরা একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছিল। শিখ ও ওয়াহাবীদের এই ভ্রাতৃবিরোধকে ধূর্ত ইংরেজ তাদের পাঞ্জাব জয়ের পক্ষে সুযোগ বলে মনে করল। ওয়াহাবীরা যখন শিখ রাজ্য আক্রমণ করে, তখন ইংরেজরা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এমন কি তারা তখন শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের আক্রমণ পরোক্ষভাবে সমর্থনও করেছিল। ইংরেজরা মনে করেছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের এই আত্মঘাতী যুদ্ধের ফলে ওয়াহাবীরা ও শিখরা উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন পাঞ্জাব জয় করা ও ওয়াহাবীদের দমন করা দুই-ই সহজ হবে।

কিন্তু ওয়াহাবী মুসলমান চাষীর কাছে শিখ জায়গীরদার ও জমিদারগোষ্ঠী শত্রু হলেও তাদের চেয়েও বড় শত্রু বিদেশী ইংরেজ রাজ। তাই ওয়াহাবীরা সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানতে আরম্ভ করল। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াহাবীদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের নিষ্ক্রিয়তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। এবার ধূর্ত ইংরেজ রাজনৈতিক খেলা শেষ করে পূর্বের মত পশুশক্তি নিয়ে দেখা দিল।

সারা উত্তর ভারতে, বিহারে, বাংলায় ওয়াহাবী বিদ্রোহের আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসন এক মহা সংকটের মুখে এসে পড়ল। ইংরেজ সেনাপতি সিড্নি কটনের সেনাপতিত্বে এক বিরাট ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র সিতানার দুর্গটিকে ধূলিসাৎ করতে ছুটে এল। পনের দিন ধরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াহাবীদের ঘোরতর যুদ্ধ হল। কিন্তু বিদ্রোহীদের অস্ত্রশক্তি সামান্য, তাই উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে বেশীদিন দাঁড়াতে না পেরে বিদ্রোহীরা পিছু হটতে লাগল। অবশেষে তারা সিতানার দুর্গ পরিত্যাগ করে কিছু দূরে মহবান্ নামক পার্বত্য প্রদেশের মলকা নামক একটা উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ওয়াহাবীদের সংগ্রাম বন্ধ হল না, তারা এই অঞ্চলে গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ চালাতে লাগল। এ ছাড়া বিদ্রোহীরা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বাংলাদেশে প্রাণপণে আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজদের অস্থির করে তুলল।

বিহার

সিতানার দুর্গের পতনের পর ওয়াহাবীদের যুদ্ধের শেষ না হলেও এর পর থেকে সিতানার দুর্গের পরিবর্তে বিহারের পাটনাই ওয়াহাবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমশ পাটনার সঙ্গে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ব্রিটিশ-শক্তির উপর আক্রমণ চলতে থাকে। ওয়াহাবীরা পাটনায় এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠা করে বসে। বিহারের কয়েকটি জেলা ইংরেজ-শক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়। আর সেই সকল জেলায় বিদ্রোহীদের স্বাধীন সরকার জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে। এই সকল জেলায় ইংরেজদের নানাবিধ শোষণ-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। বিদ্রোহী সরকারের কর্মচারীরা স্বাধীন সরকারের নামে ট্যাক্স্ আদায়, জমির নূতন বিলি-ব্যবস্থা প্রভৃতি করতে থাকে। জেলায় জেলায় বিদ্রোহী সরকারের বিচারালয়, সরকারী দপ্তরখানা প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল জেলার প্রধান কেন্দ্র পাটনা। যে জেলাগুলিতে বিদ্রোহীরা ইংরেজ-শক্তিকে উৎখাত করতে পারল না, সেখানে তারা জনসাধারণের ভিতরে গোপন আন্দোলন চালাতে থাকে।

বঙ্গদেশ

ওয়াহাবী বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে বাংলাদেশে। সৈয়দ আহম্মদ্ যখন বাংলাদেশে প্রচার করতে আসেন, তার পূর্ব থেকেই এই আন্দোলন বাংলাদেশে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রদেশে এই আন্দোলনের স্রষ্টা হলেন ফরিদপুরের মৌলভী শরিয়তুল্লা। সৈয়দ আহম্মদের বহু পূর্বেই তিনি মক্কা গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল বাস করেছিলেন। মৌলভী শরিয়তুল্লা মক্কায় থাকতেই ওয়াহাবী আদর্শের সমর্থক হন এবং দেশে ফিরে এসেই ওয়াহাবী আদর্শ অনুসারে ইসলাম ধর্মের সংস্কারে মন দেন। ওয়াহাবী আদর্শই তাঁকে বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরোধী করে তোলে।

ভারতে বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ তাঁর কাছে মুসলিম ধর্মের সংস্কার ও "ধর্মরাজ্য" প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি "ফরাজী" নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়টিকে তিনি ইংরেজ বিরোধী জঙ্গী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং সেইভাবেই তিনি সারা বাংলাব্যাপী এক শক্তিশালী গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। বাংলাদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করার পূর্বে বিশেষ গোপনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের শক্ত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেলায় জেলায় কর্মী পাঠিয়ে তাঁর আন্দোলন বিস্তারের ব্যবস্থা করেন এবং প্রচার করেন যে, ওয়াহাবী আদর্শ কার্যকর করার পক্ষে বিদেশী শাসন হল প্রধান অন্তরায়; সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধেই মুসলমানদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য। মৌলভী শরিয়তুল্লা তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্রোহের আয়োজন করলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভ হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদুমিঞা বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁর পিতার ন্যায় নিজ গ্রাম বাহাদুর-পুরেই এই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করে প্রচার ও সংগঠন বাড়িয়ে তুলতে থাকেন। দুদুমিঞার সুযোগ্য নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন ও সংগঠন ক্রমশ ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় এই আন্দোলন ক্রমশ কৃষকের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে পরিণত হয়। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক একত্র হয়ে সংগঠিতভাবে প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক দুদুমিঞার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর নির্দেশে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যে-কোন সময়ে জমিদার ও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করত না।

তখন বিদেশী ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষিত জমিদার ও নীলকুঠির মালিকদের অবাধ অত্যাচার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের উপর দিয়ে সমানভাবেই চলেছে। এদের অত্যাচারে বাংলার চাষী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা ওয়াহাবী নেতাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধ্বনি ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে দুদুমিঞার নেতৃত্বে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। সংঘবদ্ধ চাষীরা জমিদার, নীলকুঠির মালিক ও ইংরেজ শাসকদের অগ্রাহ্য করতে লাগল। তারা লাঠির বদলে লাঠি তুলল, খুনের বদলে খুন এবং অত্যাচারের বদলে অত্যাচার আরম্ভ করল। বাংলার বিদেশী শাসক ও তাদের সহচরগণ আবার একটা ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সম্মুখীন হল।

এইভাবে বাংলার ওয়াহাবীরা বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করে ছোট ছোট অঞ্চলে স্থানীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করল। ফরিদপুর, খুলনা, বিক্রমপুর, চব্বিশ পরগনা ও যশোহর জেলার বহু গ্রামাঞ্চলের সংগঠিত ওয়াহাবী চাষী ইংরেজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। বিদ্রোহীরা এই সকল স্বাধীন গ্রামাঞ্চলে

জনসাধারণের সরকার, বিচারালয়, পুলিশ ও ফৌজ তৈরি করে ফেলল। এই স্বাধীন সরকার জনসাধারণের নিকট থেকে ট্যাক্সও আদায় করতে লাগল। কিন্তু ওয়াহাবীদের মধ্যে দুদুমিঞা ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত নায়ক না থাকায় বাংলার এই স্বাধীন গ্রামাঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে সেখানে একটি সুগঠিত শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তা হলেও বহু গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন সরকার কিছুদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে একাকী ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল। এক এক করে সবগুলি ইংরেজ শাসক, নীলকুঠির মালিক ও জমিদারদের মিলিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বাংলার কোন দরদী ঐতিহাসিক এই সকল সংগ্রামের ইতিহাস লিখে যাননি। তাই এই সকল গণ-বিদ্রোহ ও গণ-সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ-ঐতিহাসিকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওয়াহাবী-বিদ্রোহের একজন নায়কও সেই নায়কের পরিচালিত বিদ্রোহের কাহিনী বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করে গিয়েছে। তখনকার বাংলা ও ভারতের শাসক প্রবল-পরাক্রান্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে কলিকাতার নিকটবর্তী এক গ্রামাঞ্চলের সেই সামান্য চাষী-নেতার বিদ্রোহের কাহিনী চিরদিন বাংলা তথা ভারতের চির-বিদ্রোহী সাধারণ মানুষের স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকবে। সেই বিদ্রোহী চাষী নায়ক তিতুমিঞা বা তিতুমীর।

* * *

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। তখন সৈয়দ আহম্মদ তাঁর ওয়াহাবী আদর্শ প্রচার করতে কলিকাতায় এসে পৌঁছেছেন। এই বিদ্রোহী নেতাকে দেখবার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার লোক আসছে, তাঁর কথা শুনছে, তাঁরা সকলে নূতন একটা বিদ্রোহী আদর্শ, তাদের নিপীড়িত জীবনে একটা নূতন আশার আলো নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একদিন আহম্মদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ মুসলমান যুবক। যুবকের বীরোচিত দেহ, চোখের নির্ভীক দৃষ্টি আহম্মদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। তিনি যুবকের সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করলেন। যুবক এক নূতন প্রেরণা, নূতন সংকল্প নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এই যুবকই তিতুমীর।

তিতু চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামের এক গৃহস্থ চাষীর ছেলে, খেটে খাওয়া মানুষ; বাল্যকাল থেকেই জমি-জমায় কাজ করার ফলে লোহার মত শক্ত তাঁর দেহখানি। তখন জমিদার, চোর-ডাকাতের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই তিতু আত্মরক্ষা ও পাড়া-পড়শীদের বাঁচাবার জন্য শিখলেন মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি খেলা, অসি খেলা, তীর ছোঁড়া প্রভৃতি। শক্তিমত্তায় তিতুর জুড়ী নেই। তিতু তাঁর দৈহিক শক্তি ও গুণের জন্য নদীয়ার জমিদারের অধীনে চাকরি পেলেন। কিন্তু জমিদারের গোলামী তাঁর ভাল লাগল না, তিনি চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরলেন। ঠিক এই সময় সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। এই সাক্ষাতের পর তিনি যেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সন্ধান পেলেন।

তিতু ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত, ওয়াহাবী আদর্শ তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য পাগল করে তুলল। বিদ্রোহের সংকল্প নিয়ে তিনি একটা দল গড়তে শুরু করলেন। তখন কৃষকের উপর অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য তিতু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। তিতুর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদার ও হিন্দু জমিদারগণ একজোট হল। তিতু ও তাঁর দলের লাঠির ভয়ে তারা ইংরেজ শাসকদের আশ্রয় নিল। ইংরেজ শাসকগণ এই প্রকারের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। চাষী-বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ইংরেজ সরকারের পুলিস এল, তিতুর নামে হুলিয়া বের হল। তখনও তিতুর বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি গা ঢাকা দিলেন। তিতু লুকিয়ে থেকেই বিদ্রোহের আয়োজন করতে লাগলেন।

তিতু কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনায় তাঁর গোপন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করলেন এবং সেখান থেকে চাষী-আন্দোলন ও বিদ্রোহের সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। ফরিদপুরের দুদুমিঞার মত তিতুও লাঠির বদলে লাঠি, অত্যাচারের বদলে অত্যাচার চালাতে লাগলেন। চাষী-আন্দোলন ও তিতুর শক্তি দেখে জমিদারগোষ্ঠী ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেল। যেখানেই চাষীর উপর জমিদারদের অত্যাচার হত, সেখানেই তিতুর গোপন বাহিনী জমিদারদের উচিত শিক্ষা দিত।

তিতুর কাছে জমিদারের জাত বিচার নেই, ধর্মের প্রভেদ নেই। জমিদার চাষীর শত্রু, জমিদার হিন্দুই হোক অথবা মুসলমানই হোক, চাষীর উপর অত্যাচারের প্রতিফল তাকে পেতেই হবে। তিতু অত্যাচারীর যম—আর সেই অত্যাচারী হল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল জমিদার ও তাদের মুরুব্বি ইংরেজ শাসক।

তিতুর সংগঠন ও শক্তি ধ্বংস করবার জন্য জমিদার ও পুলিস একত্রে দল বাঁধল। চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ ও পুলিসের মিলিত বাহিনী প্রবেশ করে চাষীদের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করল। তারা চাষীদের ঘর-বাড়ী জালিয়ে তাদের শস্য, থালা-বাসন, বিছানা-পত্র কেড়ে নিতে লাগল। এই অমানুষিক অত্যাচারে চব্বিশ পরগনার চাষীরা পাগল হয়ে উঠল। তিতুও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না, চাষীদের নিয়ে গড়া তিতুর বাহিনী জমিদারদের উপর পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করল। জমিদারদের টাকাকড়ি ও বাড়ি লুট হতে লাগল। জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজগণ তিতুর বাহিনীর হাতে মার খেয়ে চাকরি ছেড়ে পালাতে লাগল। চব্বিশ পরগনার চাষীরা এবার মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গ্রামের চাষীরা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল, তারা তাদের স্বাধীন সরকার গঠন করল, পুলিস-ফৌজ তৈরি করল, জনসাধারণের বিচারালয় বসাল।

তখন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ। সারা বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা চাষী-বিদ্রোহের অগ্নিস্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষকের মৃত্যু-ভয়হীন সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাতে বিদেশী শাসকের গদি টলমল করে উঠেছে। এই প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে বুঝি ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ

চুরমার হয়ে যায়। চব্বিশ পরগনার চাষী-বিদ্রোহী তিতুমীরের চাষী-বাহিনী বাংলা তথা ভারতের ইংরেজ শাসকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল। শাসকগণ তাদের সকল শক্তি দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করবার আয়োজন করল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে এক ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী তিতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। সংবাদ পেয়ে তিতুও তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হলেন। ইংরেজ বাহিনী গোবরডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, আর তিতুর বাহিনী চারদিকে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে থাকল। অবশেষে গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী এক ময়দানে তিতুর বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিতুর সৈন্যদের হাতিয়ার হল বিষাক্ত তীর-ধনুক আর ঢাল, তরবারি ও বর্শা, অপরদিকে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে রয়েছে উন্নত ধরনের রাইফেল। কিন্তু তিতুর বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সকল ইংরেজ সৈন্য নিহত হল। সেনাপতি আলেকজাণ্ডার আহত হয়ে পালিয়ে বাঁচল।

১৭ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যদের আর একটা বড় দল এল নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে। তিতুর কাছে পরাজিত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও সসৈন্যে পালাতে বাধ্য হল। এই পরাজয়ের সংবাদে কলিকাতার বড় সাহেবরা প্রমাদ গণল। এবার এক হাজার সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী এল তিতুর বিরুদ্ধে। তারা সঙ্গে আনল কয়েকটি কামান আর এক হাজার বন্দুক। গোবরডাঙ্গার ময়দানে নির্ভীক তিতু তাঁর ঢাল-বর্শা ও তীর-ধনুকে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এবার ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনীর নিকট তিতু পরাজিত হলেন। তিতু তাঁর হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

এই পরাজয়ের পর তিতু তাঁর ছত্রভঙ্গ বাহিনী গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ তেতুলিয়া গ্রামে জড় করতে লাগলেন। তারপর বিদ্রোহীরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলেন, ইংরেজ বাহিনীকে বাধা দিতেই হবে। কিন্তু খোলা ময়দানে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই রাতারাতি একটা কেল্লার মতো কিছু তৈরি করা স্থির হল। তখন তিতুর সৈন্যসংখ্যা মাত্র পাঁচশত। তিতু পার্শ্ববর্তী গ্রামের চাষীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। গ্রামের শত শত চাষী এসে তিতুর বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করল। তিতুর সৈন্যরা আশ-পাশের বাঁশের ঝাড় উজাড় করে হাজার হাজার বাঁশ কাটল। সেই বাঁশ দিয়ে তৈরী হল এক অপূর্ব কেল্লা। বাঁশের কেল্লার মধ্যে তিতুর বাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করল।

এদিকে বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী তাড়া করে আসছে। তিতুর বিদ্রোহী চাষী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্য তারা আসছে এক হাজার সৈন্য আর কয়েকটা কামান নিয়ে। ইংরেজ বাহিনী চলেছে তেতুলিয়া গ্রামের পথে। হঠাৎ তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হল, ইংরেজ বাহিনী থমকে দাঁড়াল। বাঁশের কেল্লা থেকে এসে পড়ছে অসংখ্য বিষাক্ত তীর, সেই তীরে বিদ্ধ হয়ে বহু ইংরেজ সৈন্য প্রাণ দিল।

বাঁশের কেল্লায় থেকে তিতু আর তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুমের পরিচালনায় বিদ্রোহী বাহিনী ইংরেজ শত্রুকে স্তব্ধ করে দিল। এবার ইংরেজ বাহিনী তাদের কামানের মুখ ঘুরাল কেল্লার দিকে। কেল্লাটাকে অবিলম্বে উড়িয়ে দিতে না পারলে তাদের সর্বনাশ। তীর-ধনুক আর বর্শায় সজ্জিত তিতুর বীর বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনী কামানের লড়াই আরম্ভ করল। কয়েকটা কামান অবিশ্রান্তভাবে গোলা-বর্ষণ করতে লাগল বাঁশের কেল্লার উপর। অন্যদিকে সেই গোলা-বর্ষণ উপেক্ষা করেই বিদ্রোহীরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল। বিদ্রোহীদের বিষাক্ত তীর বিঁধে বহু ইংরেজ সৈন্য প্রাণ দিল। এ এক অপূর্ব যুদ্ধ, অদ্ভুত এই বাঁশের কেল্লা। বর্বর, মদমত্ত ইংরেজরাও বাঙালী বীর তিতুর অদ্ভুত সাহস আর রণ-নৈপুণ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোন তুলনা নেই।

এইভাবে যুদ্ধ চলল প্রায় আড়াই ঘন্টা। তিতু একটা ধনুক নিয়ে প্রাণপণে তীর ছুঁড়ছিলেন। সহসা কামানের গোলার আঘাতে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে পড়ে গেলেন। সেনাপতি গোলাম মাসুমও বন্দুকের গুলিতে ভীষণ আহত। বিদ্রোহীরা বুঝি যুদ্ধে হেরে যায়। প্রচুর রক্তপাত সত্ত্বেও তিতু লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন, সৈন্যদের সাহস দিতে লাগলেন। নূতন উদ্যমে ইংরেজদের উপর তীরবৃষ্টি আরম্ভ হল। ভয়ে ইংরেজ সৈন্য দিশাহারা হয়ে গেল। সহসা আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ভীষণ ঝড় উঠল। সেই ঝড়ে তিতুর বাঁশের কেল্লা ভেঙে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড বাঁশ এসে পড়ল তিতুর মাথায়, তিতু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। ইংরেজ বাহিনী পৈশাচিক উল্লাসে সেই ভাঙা-কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করে যাকে পেল তাকেই হত্যা করতে লাগল। আহত অবস্থায় তিতু ও তাঁর সেনাপতি গোলাম মাসুমকে ইংরেজরা ঘিরে ধরে বেয়নেট-বিদ্ধ করে হত্যা করল।

বাঙ্গালী চাষী যুবক, বিদ্রোহী বীর তিতুমীরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরাজিত ও ব্যর্থ হয়ে গেল। এইভাবে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী বংশধরদের জন্য তিতু দান করে গেলেন তাঁর বিদ্রোহী জীবন ও অতুলনীয় দেশভক্তি। তিতুর অপূর্ব বাঁশের কেল্লা পরাধীন ভারতের দুর্যোগের আঘাতে উড়ে গেছে বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে তাঁর বাঁশের কেল্লা বিদ্রোহের ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়রূপে ভারতের কোটি কোটি কৃষককে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করবার জন্য প্রেরণা যুগিয়ে আসছে।

* * *

তিতুমীরের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবার বাংলাদেশ থেকে আবার পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। পাটনার সদর দপ্তর আবার কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। এই সময় পাটনা কেন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহম্মদের দুইজন যোগ্য শিষ্য—উলায়েৎ আলী ও এনায়েৎ আলী। উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলীর নেতৃত্বে পাটনা আবার সারা ভারতের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলী বাংলা ও সমগ্র দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করে বিদেশী ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে থাকেন। এনায়েৎ আলী মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, নদীয়া, ফরিদপুর এবং পাটনার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বাংলাদেশে আবার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি হল—যদি নরক-যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পেতে চাও, তবে হয় বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম কর, আর না হয় এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও। জেলায় জেলায় প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের প্রচার চলতে থাকে।

এই দুই নেতার চেষ্টায় বাংলাদেশে ওয়াহাবীদের কার্যকলাপ আবার জঙ্গীরূপ ধারণ করে। বাংলাদেশে এই আন্দোলন ক্রমশ বারাসাত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল স্থানে কৃষকেরা জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন শুরু করে দেয়।

এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও আবার ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা মাথা তুলতে থাকে। এই সময়ে ওয়াহাবীরা সিতানার দুর্গ দখল করে এবং সেখানেই ঐ অঞ্চলের কেন্দ্র স্থাপন করে পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শিখশক্তির পতন ঘটেছে। ইংরেজরা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র পাঞ্জাব দখল করে নিয়েছে। ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করবার পর ওয়াহাবীরা আবার নূতন করে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ শাসনের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে।

এইভাবে সৈয়দ আহম্মদের দুই শিষ্য উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলীর নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ নূতন শক্তি সঞ্চয় করে সারা ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এই দু হাজার মাইলের মধ্যে বহু বিদ্রোহের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব কর্মকেন্দ্রে প্রচারকদের প্রচার শিক্ষা এবং সৈনিক ও সেনাপতিদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে প্রচার ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারত একটি বিরাট আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিদেশী শাসকদের শক্তি ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীরা ইংরেজ শত্রুর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়, ইংরেজরাও তাদের সকল শক্তি নিয়ে বিদ্রোহীদের ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টা করে। ইংরেজ শাসকেরা ১৮৫০ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই ষোলটি অভিযান এবং ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও বিশটি অভিযান চালনা করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এই সকল আক্রমণের সময় সারা ভারতের ওয়াহাবীরা ধনবল ও জনবল দিয়ে তাদের সাহায্য করে।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন পথের

সম্মান দিয়ে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওয়াহাবী বিদ্রোহ সেই সংগ্রামের পরেও পূর্ণোদ্যমে চলেছে। ওয়াহাবীরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অভ্যুত্থানেও তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে যোগদান করেছিল। অবশ্য সিপাহী-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, কিছুদিনের জন্য ওয়াহাবী আন্দোলনেও স্তব্ধতা দেখা দেয়। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহাবীরা আবার ইংরেজ শক্তির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়। সিপাহী-অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করে ইংরেজ-শাসকগণ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই শক্তি নিয়ে তারা সিপাহী-অভ্যুত্থানের মত ওয়াহাবী বিদ্রোহকেও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করে ফেলবার জন্য বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ করে তোলে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইংরেজরা সর্বত্র ওয়াহাবীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার নেভিল চেম্বারলেন প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করল। আম্বালা গিরিসঙ্কটে ওয়াহাবী বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হল। দুইদিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। ইংরেজ বাহিনী কামান-বন্দুকের জোরে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও তাদের ক্ষতি হল অপূরণীয়। দুইদিনের যুদ্ধের পর দেখা গেল, ইংরেজদের অতি অল্প সৈন্যই বেঁচে আছে। তাই এই জয় ইংরেজদের কাছে অর্থহীন হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকলহের ফলে ওয়াহাবীরা তাদের আক্রমণ-শক্তি, এমন কি সংগ্রাম-শক্তিও হারিয়ে ফেলে। এই সুযোগে ইংরেজরা কূটনীতির সাহায্যে ওয়াহাবী-দের শক্তি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এবার তাদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খলা। তার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা আর একটা সামরিক অভিযান চালিয়ে উত্তর-পশ্চিমের ওয়াহাবীদের শক্তি চূর্ণ করে ফেলে।

এই অঞ্চলের ওয়াহাবীরা আবার তাদের ছত্রভঙ্গ শক্তি সংহত করে তুলতে থাকে এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার তারা ইংরেজ শাসকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র শাসকগণ কূটনীতির মারফত ওয়াহাবীদের সমর্থক উপজাতীয় মুসলমানদের ওয়াহাবী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের জঙ্গীলাট স্বয়ং একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ওয়াহাবীদের পার্বত্য ঘাঁটি আক্রমণ করে। প্রথম দিকে ওয়াহাবী-দের নিকট জঙ্গীলাটের পরাজয় ঘটবার উপক্রম হয় এবং ইংরেজ বাহিনী পিছু হটতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা সহসা ওয়াহাবীদের সাহায্য বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়লাভ করে। প্রাণপণে যুদ্ধ করেও ইংরেজদের উন্নত সমর-কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের কাছে ওয়াহাবী সেনা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ওয়াহাবীদের পক্ষে এই পরাজয়ের ফল হল মারাত্মক। এই অঞ্চলের ওয়াহাবী বাহিনী এই সামরিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। এর পর তাদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হল।

এই সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সারা ভারতের ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের মধ্যে দারুণ হতাশা দেখা দেয়। সারা ভারতের বিদ্রোহীরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই যুদ্ধ

জয়যুক্ত করে তোলবার জন্য সমগ্র শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তাদের মনে আর জয়ের কোন আশাই রইল না। অন্যদিকে, বিজয়ী ইংরেজরা বিদ্রোহীদের হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে দেখে তাদের ধ্বংসাবশিষ্ট শক্তি শেষ আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবার আয়োজন করল। তারা একই সময়ে সারা ভারতব্যাপী আক্রমণ আরম্ভ করল। হতাশাচ্ছন্ন বিদ্রোহীরা সেই আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। চারদিকে বিদ্রোহী নেতারা ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা পড়তে লাগলেন। শাসকরা বড় বড় বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেপ্তার করবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করল।

ঠিক এই সময়ে ওয়াহাবী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে ধরা পড়ে গেল। এই সকল গোপন তথ্য শত্রুর হস্তগত হবার ফলে বিদ্রোহীদের সকল আশা নির্মূল হল। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের সকল কেন্দ্রের শক্তি-সামর্থ্যের হিসাব, মূল সংগঠক ও নেতাদের নাম-ধাম, তাঁদের প্রচার-কৌশল, প্রচারের পুস্তক-পুস্তিকা, কোষাগার প্রভৃতির খবর জেনে গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে চলল চারদিকে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার। বিদ্রোহীদের সকল আশা নির্মূল হল। এইভাবে ভারতের বিদ্রোহী মুসলমান কৃষক প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে বিদেশী ইংরেজ শক্তিকে প্রাণপণে বাধা দিয়ে অবশেষে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে বিদেশী শত্রুর উন্নততর শক্তির কাছে পরাজিত হল।

এইবার বিদ্রোহী নেতাদের নিয়ে আরম্ভ হল বিচারের প্রহসন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের আম্বালা শহরে একদল বিদ্রোহী নেতার বিচার আরম্ভ হয়। এই মামলার এগার জন বিদ্রোহী নেতার প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মামলা পাটনায় আরম্ভ হয়। ১৮৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানেও মামলা চলে। এই সকল মামলার বিচারেও প্রায় সকল বিদ্রোহী নেতারই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল, কলিকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁর মামলা। এই মামলা সারা ভারতে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল। আমীর খাঁ কলিকাতার হাইকোর্ট অবধি লড়েছিলেন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিল বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এড্ভোকেট অ্যানেষ্টি সাহেব। স্বদেশী ও বিদেশী বহু ভুয়া ঐতিহাসিকের মন-গড়া ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, ওয়াহাবী বিদ্রোহ কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। এই বিদ্রোহ ভারতের বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের কোটি কোটি মানুষের বিদ্রোহ। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যানেস্টি সাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেই সকল তথ্য যে স্বদেশী যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা দিয়েছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সেই কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

কলিকাতার মামলার বিচারে আমীর খাঁ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন

এবং তাঁর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব ওয়াহাবীদের গুলিতে নিহত হয়। এর কিছুদিন পর, তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান ভ্রমণে গিয়ে দ্বীপান্তরিত ওয়াহাবীদের একজনের ছুরিকাঘাতে প্রাণ দেয়। ইংরেজ-শাসকেরা এই বিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমন করলেও বিদ্রোহীরা ছড়িয়ে রইল জেলের মধ্যে, বাইরে, এখানে-ওখানে, সর্বত্র। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হলেও বিদ্রোহীদের মনকে দমন করা, তাদের সংগঠন চূর্ণ করা ছিল ইংরেজ শাসকদের সাধ্যাতীত।

* * *

ওয়াহাবী বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা-আন্দোলন কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি যে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে রায় দেবার সময় ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর না করে, কেবলমাত্র নিজেদের ও অপরের অনুমানের উপরই নির্ভর করেছেন, তার বহু প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের ধর্মের ধ্বনি এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণের অন্যতম। বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধ্বনির ফলেই এই বিদ্রোহ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করতে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগণকে এর মধ্যে টেনে আনতে পারেনি। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ধনতন্ত্র ও শিল্পবিকাশের পূর্ব-যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশে এই প্রকার ধর্মীয় ধ্বনির সাহায্যেই কোন যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ব্যাপক জন-সমাবেশের পন্থা গ্রহণ করা হত। এ হল অনগ্রসর সামাজিক স্তরেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তখন ভারতবর্ষ চলেছিল এক ভয়ঙ্কর অরাজক ও হতাশাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে। বিদেশী অক্রমণের ফলে তখন ভারতের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় জনগণের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে এক চরম দুর্যোগ নেমে এসেছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহের নায়কগণের দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং তৎকালীন অবস্থায় জন-সমাবেশের জন্য ধর্মের ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণই ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা।

ভারতের ইতিহাসের এই দীর্ঘতম বিদ্রোহ বিফল হলেও, তা ভারতের কোটি কোটি মানুষের জন্য রেখে গিয়েছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে রক্তরাঙা এক সংগ্রামের পথ। আজ অবধি কোটি কোটি কৃষক, সাধারণ মানুষ সেই পথে চলে এসেছে। আজও তাদের সেই পথ চলা শেষ হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭)

বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলা আর বিহারের ভাগলপুর জেলার মাঝখানের অঞ্চলের নাম ছিল 'দামিন-ই-কো'। অধিবাসীরা আদিবাসী, নাম সাঁওতাল। মানুষগুলির গায়ের মিশমিশে কালো রংয়ের মতোই তাদের মন সেদিন পর্যন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতার আলো সেখানে কোনদিন প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি। এই মানুষগুলি ছিল যেন ঘুমের ঘোরে অচেতন। তাদের এই ঘুম বহু কালের, তাই স্বাভাবিক নয়। কেউ যেন এদের কোন বিশেষ যাদুমন্ত্রের বলে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। তারা যেন এদের জাগরণে ভয় পেত, তাই বহু কৌশলে এদের ঘুমে অচেতন করে রাখা হয়েছিল।

তাদের এই ভয় খুবই স্বাভাবিক। একবার এই মানুষগুলি মাত্র কিছুদিনের জন্য জেগে উঠেছিল। সেই মাত্র কয়দিনের জাগরণ বিদ্যুৎ-চমকের মত আলোকিত করে তুলেছিল পরাধীনতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতের পূর্বাঞ্চল। সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদল-ধ্বনিতে ভারতের ইংরেজ-শাসন সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাই সাঁওতাল নামক এই মানুষগুলির জাগরণে শত্রুরা এত ভয় পায়, তাই এদের গভীর ঘুমে অচেতন করে রাখার এত চেষ্টা!

খেটে খাওয়া মানুষ এরা। দামিন-ই-কো অর্থাৎ সাঁওতাল পরগনার দুর্গম বন সাফ করে এরা ঘর বেঁধেছে, যে মাটিতে কোনদিন কোন মানুষের পা পড়েনি, সেই মাটিতে এরা সোনা ফলিয়েছে—অবশ্য অপরের জন্য, নিজেদের জন্য নয়। এরা বনের বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। প্রকৃতির সঙ্গে চলে এদের অবিরাম লড়াই, তাই প্রকৃতি এদের নিজের মত করে গড়ে তুলেছে। এরা প্রকৃতির কোলে মানুষ, তাই প্রকৃতির মতই এদের মন অনাবিল সরলতায় পূর্ণ; প্রকৃতি-বিরুদ্ধ "সভ্যতার" সহজাত ছল, প্রতারণা, বঞ্চনা ও ধূর্ততা এদের অজানা। তাই অনাবিল সরলতা ও সততা এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার গোষ্ঠী এই অঞ্চলের মালিক। সেই জমিদারগণই এক সময় এই অঞ্চলের দুর্গম বনভূমি সাফ করার কাজে লাগাবার জন্য হাজার হাজার সাঁওতাল দিন-মজুরকে পশ্চিম থেকে আমদানি করেছিল। এরা এই অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এইভাবে যাদের নিয়ে আসা হল তাদের বসবাসের জন্য এই অঞ্চলেরই বনভূমি নির্দিষ্ট হল। সেই থেকে এরা এই অঞ্চলের গভীর বন সাফ করে জমি চাষ করে, সোনার ফসল ফলায়, আর সেই ফসল জমিদারগোষ্ঠী নিঃশেষে কেড়ে নেয়।

এই গরীব মানুষগুলিকে শোষণ করবার জন্য জমিদার ব্যতীত আরও একদল মানুষ এসে জুড়ে বসে। তারা মহাজন। তারা সাঁওতালদের টাকা ঋণ দেয়। যারা ঋণ গ্রহণ করে, তারা মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সাঁওতালদের ক্রীতদাসে পরিণত করবার একটি সহজ উপায় তারা প্রথম থেকেই চালু করে। উপায়টি জেনে রাখবার মত।

"অধিকাংশ সাঁওতালেরই এমনকি সামান্য ঋণ শোধ করবার মত জমি বা ফসল থাকে না। যদি কোন সাঁওতালের পিতা মারা যায়, পিতার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য তাকে জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে কয়েকটি টাকা ঋণ করতেই হবে। কিন্তু টাকা কয়টির জামিনস্বরূপ বাঁধা রাখবার মত তার কোন জমিও নেই বা ফসলও নেই। তাই সে জমিদার বা মহাজনের কাছে লিখে দিতে বাধ্য হয় যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে এবং তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার জমিদার বা মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। এই কথা লিখে দেবার পরদিনই সেই সাঁওতাল পরিবারকে জমিদার বা মহাজনের গোলামী করতে যেতে হয়। এ জীবনে তার সেই ঋণ শোধ হবার কোন উপায় থাকে না। কারণ, যে টাকা ঋণ বাবদ নেওয়া হয়, প্রতিদিনই তার সুদ বেড়ে যায়, আর সুদে-আসলে বেড়ে মোট ঋণ পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে। কোন ক্রীতদাস পুরা সময়, অর্থাৎ দিন-রাত জমিদার বা মহাজনের কাজ করতে অস্বীকার করলে পুলিস ও সরকারী কর্মচারীরা এসে ঐ সাঁওতালকে জেলের ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে। সাঁওতালটি কখনও জঙ্গলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, অবিলম্বে পুলিস এসে হাজির হয়, তারপর সাঁওতালটি জেলে যায়। জেল থেকে ফেরার পর আবার আরম্ভ হয় মহাজনের দাসত্ব।"

এ সকল কথা কোন দরদী ভারতীয় ঐতিহাসিক লিখে যায়নি, লিখে গিয়েছে একজন খাস ইংরেজ সাহেব।* অবশ্য এই সকল কথা লেখবার পিছনে ছিল সাহেবের এক দুষ্ট মতলব। ঐ সাহেব কোথাও ইংরেজ শাসনের নামও করেনি, অথবা সাঁওতালদের এই চরম দুর্দশার জন্য ইংরেজদের দায়ীও করেনি। সাঁওতালদের উপর ইংরেজ শাসকদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ গোপন করে রাখবার জন্যই ঐ সাহেব সকল দোষ ইংরেজ শাসকদের ভাড়াটে দালালের উপর চাপিয়েছে। কিন্তু ঐ সাহেবই আবার স্বীকার করেছে যে, ঐ অঞ্চলের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণ যে কেবল খাজনা আদায় করেই সাঁওতালদের সর্বস্বান্ত করত, তাই নয়, তাঁরা সরাসরি সাঁওতালদের সর্বস্ব লুটের বখরাও আদায় করত। সে যাই হোক, উক্ত সাহেবের ঐ বিবরণটি সাঁওতালদের চরম দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কথা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

সোনার ভারতের বুকের উপর এই অপূর্ব ইংরেজ শাসনের মহিমায় জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, মহাজন আর ইংরেজ সরকারের পুলিস, আমলা, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলে মিলে নিরীহ ও দরিদ্র সাঁওতালদের উপর অভাবনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাত—"শতকরা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত সুদ

* স্যার উইলিয়াম হাণ্টার—"অ্যানাল্স্ অফ রুরাল বেঙ্গল।"

আদায়, বে-আইনী কর আদায়, জোর করে জমি দখল, শারীরিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা, খুন, জখম" সকলই অবাধে চলত। সেই অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের জ্বালায় এই সাঁওতাল মানুষগুলিরও একদিন দীর্ঘকালের নিদ্রা ভেঙে গেল। সেই জাগরণে সারা ভারতের ইংরেজ শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

* * *

তখন বিদেশী ইংরেজ বণিক-রাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলবার উপক্রম করছে। বিদেশীরা ভারতের জনসাধারণের পুরাতন জীবিকা ধ্বংস করে ফেলছে, ভারতের ধনসম্পদ দুই হাতে লুটে নিচ্ছে। এক বিরাট পেষণ-যন্ত্রের নীচে পড়ে ভারতের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ধূলিসাৎ হচ্ছে, গোটা দেশ ইংরেজ-রাজের উদর-গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ গেছে, আর পাঞ্জাবও যাবার পথে। তাই মাঝখানের এই দামিন-ই-কো বা সাঁওতাল অঞ্চল তাদের গ্রাস থেকে বাদ পড়ল না। তারপর ইংরেজ শাসকেরা যেমন আর সকল প্রদেশে জমিদার-মহাজন-পুলিস, বিচারক প্রভৃতি শয়তানের অনুচরদল সৃষ্টি করে তাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে, তেমনি নিরীহ সাঁওতালদের বিরুদ্ধেও উত্তেজিত করল এই অনুচরদের। সাঁওতালদের বাসভূমির উপর অত্যাচারের বন্যা বইতে লাগল।

সেই অসহনীয় অত্যাচারে সাঁওতালরা তাদের নিদ্রা থেকে জেগে উঠল। তারা চোখ খুলে দেখতে পেল, ইংরেজ শাসকদের, আর তাদের অত্যাচার ও শোষণের চিরসঙ্গী জমিদার-মহাজন-পুলিস বিচারক ও পেয়াদাদের। এরা সকলে রয়েছে সামনে, আর তাদের পিছনে রয়েছে তাদের সৃষ্টিকর্তা ইংরেজ-রাজ। এই আসল শত্রু ইংরেজ-রাজকে চিনে নিতে, এমনকি একশত বৎসর পিছিয়ে পড়া সাঁওতালদেরও এক মুহূর্ত বিলম্ব হল না।

সাঁওতালগণ জেগে উঠে দেখল যে, ইংরেজ শাসকদের ভারতগ্রাসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্য ওয়াহাবী বিদ্রোহের ঢেউ সারা ভারতের ইংরেজ শাসনকে কাঁপিয়ে তুলেছে, ভারতের বুক থেকে এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য ওয়াহাবী বিদ্রোহীরা প্রাণপণে সংগ্রাম করছে। সাঁওতাল পরগনার দুইদিক থেকে বাংলা ও বিহারের ওয়াহাবী বিদ্রোহের দামামা-ধ্বনি সাঁওতালদের কানে এসে বাজছে, নব জাগ্রত সাঁওতালদের মন সেই বিদ্রোহের পাগলকরা আহ্বানে সাড়া দিতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সাঁওতাল পরগনায় আগুন জ্বলে উঠল।

* * *

অত্যাচার, অবিচার ও শোষণই বিদ্রোহ সৃষ্টি করে, আর সেই বিদ্রোহের ভিতর থেকেই জন্ম নেয় তার নেতৃত্ব। সাঁওতাল পরগনার সেই ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য থেকে বের হয়ে এল সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ।

সিদু আর কানু দুই ভাই। সাঁওতাল পরগনার রাজধানী বার্নহাইট-এর নিকটবর্তী ভাগনাদিহি গ্রামের মোড়ল তাঁরা। দাদা-ভাই মিলে পরামর্শ আঁটলেন ঐ শাদামুখো শয়তান আর তাদের সাগরেদ জমিদার, মহাজন, পুলিস, পাইক-

পেয়াদা আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের সাঁওতালদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। তারপর নিজেদের নির্বাচিত দলপতির অধীনে সাঁওতালদের স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে হবে। তখন সাঁওতালরাই হবে জমির মালিক। তাই হল সাঁওতাল বিদ্রোহের মূলধ্বনি। সিদু আর কানু অবিলম্বে কাজ শুরু করলেন। তখন ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হয়ে ১৮৫৫ সাল শুরু হয়েছে।

সিদু আর কানু জানতেন সাঁওতালদের চেতনা কত দূর। তাই সাধারণ সাঁওতালদের বোঝাবার জন্য তাঁরা একটি সহজ উপায় গ্রহণ করলেন। তাঁরা প্রথমে তাঁদের নিজ গ্রামে প্রচার করলেন যে, তাঁরা স্বপ্নে ভগবানের কাছ থেকে তাঁর নির্দেশ লেখা একখানি কাগজ পেয়েছেন। তাতে ভগবান বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য সাঁওতালদের নির্দেশ দিয়েছেন। সিদু আর কানু অনেকগুলি কাগজে সেই নির্দেশ লিখলেন। তারপর সেইগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হল। প্রত্যেক গ্রামে সেই কাগজের সঙ্গে পাঠান হল একটি করে শাল গাছের ছোট শাখা। শাল গাছের শাখা একতার প্রতীক। এর অর্থ—'সকলে সংঘবদ্ধ হও, ইংরেজ-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর।' সাধারণ সাঁওতালরা সরল মানুষ, তারা সিদু আর কানুর নির্দেশের সরল অর্থ বুঝে নিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন। সিদু আর কানুর গ্রাম ভাগনাদিহিতে বিরাট সভা বসেছে। চারশত গ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল সেই সভায় উপস্থিত। প্রথমে সিদু তারপর কানু বক্তৃতা করলেন। দুই নায়কের এতদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ফেটে পড়ছে তাঁদের বক্তৃতায়। তাঁরা একে একে বললেন, সাঁওতালদের জীবনের দুঃখের কাহিনী, ইংরেজ-জমিদার-মহাজন-পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী, জমিদার-মহাজনদের নিকট সাঁওতালদের দাসত্বের কাহিনী, তাদের দ্বারা সাঁওতালদের স্ত্রী-কন্যার ইজ্জৎনাশের কাহিনী। আজীবন দুঃখ অত্যাচার লাঞ্ছনার ভারে পীড়িত, আজন্ম পদদলিত দশ হাজার সাঁওতাল গর্জে উঠল। তারা সংকল্প নিল—তারা আর জমিদার-মহাজনের, ইংরেজ শাসকের, পুলিস, পাইক-পেয়াদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের নিপীড়ন সহ্য করবে না, কারও ক্রীতদাসত্ব মানবে না। দশহাজার সাঁওতাল একবাক্যে শপথ গ্রহণ করল—তারা সাঁওতাল পরগনা থেকে সকল অত্যাচারীকে বিতাড়িত করে সমস্ত জমি দখল করবে এবং নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। বিদ্রোহী সাঁওতালদের ঘোষণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এই সভার সংবাদ পুলিসের কর্তাদের কানে পৌঁছুতে বিলম্ব হল না। সংবাদ পাওয়ামাত্র দিহি থানার দারোগা একদল পুলিস সঙ্গে নিয়ে সিদু ও কানুর গ্রাম ভাগনাদিহিতে এসে উপস্থিত হল। পুলিস দেখেই গ্রামের লোকরা বুঝল, তাদের পিছনে শয়তান লেগেছে। গ্রামের ক্রুদ্ধ জনতা পুলিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিদুর ঘুষি খেয়ে দারোগাসাহেব সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। দারোগার সঙ্গে মরল আরও নয় জন পুলিস, বাকী সকলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। তারা বুঝল, সাঁওতাল পরগনায় তাদের অত্যাচারের দিন শেষ হয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল।

বিদ্রোহের নেতারা ভাল করেই জানতেন যে, এর পর ইংরেজের পুলিস ও ফৌজ

গোটা সাঁওতাল অঞ্চলটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্য তাড়া করে আসবে। তাই তাঁরা অবিলম্বে সাঁওতালদের সশস্ত্র করে তুলতে লাগলেন। যে অস্ত্রই পাওয়া গেল, তাই সাঁওতালদের হাতে তুলে দেওয়া হল। সেই অস্ত্র দিয়েই তারা ইংরেজের ফৌজ ও পুলিসকে বাধা দেবে, স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। এইভাবে সাঁওতাল বাহিনী তৈরী হল। বাহিনীর সৈন্যরা ইংরেজের কামান বন্দুকের সঙ্গে লড়বার জন্য হাতে নিল ধনুক আর বিষাক্ত তীর, কুঠার, তরবারী, আর সামান্য কয়েকটি বন্দুক। বিদ্রোহের নেতারা মনে করলেন, এই যথেষ্ট। বিদ্রোহের সব চেয়ে বড় হাতিয়ার হল শত্রুর প্রতি ঘৃণা, অনমনীয় দৃঢ়তা ও সংগঠন। সেদিক থেকে সাঁওতালদের শক্তি ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী।

এদিকে দারোগা হত্যার সংবাদ পেয়েই, ইংরেজ শাসনকর্তারা এক বিরাট সশস্ত্র পুলিসদল পাঠাল ভাগনাদিহি গ্রামের দিকে। শত্রুবাহিনী আসছে—এই সংবাদ শোনামাত্র নেতারা সাঁওতাল অঞ্চলের ভিতরের শত্রু, অর্থাৎ জমিদার, মহাজন ও পুলিসদের বেছে বেছে হত্যা করতে লাগল। তারা জমিদার-মহাজনদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিতে লাগল, ধানের গোলা, গরু-মোষ প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে গরীব সাঁওতালদের মধ্যে বিলি করল। সাহেবদের কুঠিগুলি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হল। তখন বিদ্রোহীরা দীর্ঘকালের অবাধ অত্যাচার ও শোষণের প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। নেতাদের নির্দেশে রেল লাইন তুলে ফেলা হল, যে কয়েকটি পাকা রাস্তা ইংরেজরা সবেমাত্র তৈরী করেছিল, সেইগুলি ভেঙে বিদ্রোহীরা শস্য-ক্ষেত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দিল। এইভাবে ইংরেজদের কোন বাহিনীর পক্ষে দ্রুত সাঁওতাল অঞ্চলে আসবার পথ বন্ধ হল।

সাঁওতালদের এই জাগরণ ও বিদ্রোহের সংবাদ এদিকে বাংলাদেশে আর ওদিকে বিহারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বাংলা ও বিহারের উপর দিয়ে তখন ওয়াহাবী বিদ্রোহের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী সাধারণ মানুষ সাঁওতালদের পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল। বিদ্রোহী সাঁওতালদের সহায় হল বাংলা ও বিহারের গরীব জনসাধারণ। সাঁওতালদের সাহায্য দিতে এগিয়ে এল বাংলাদেশের বহু কামার, চামার, ডোম প্রভৃতি, মোমিন সম্প্রদায়ের গরীব মুসলমান ও গরীব হিন্দু জনসাধারণ। এরা বিদ্রোহী সাঁওতালদের গুপ্তচরের কাজ করত, কামারেরা সাঁওতালদের জন্য তীর, ধনুক, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি তৈরি করে দিত। অবশ্য প্রয়োজন হলে তারা নিজেরাই হাতিয়ার নিয়ে সাঁওতালদের পাশে দাঁড়াত। সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবল সাঁওতালদেরই বিদ্রোহ নয়, অথবা সামান্য একটা স্থানীয় ঘটনাও নয়, এই বিদ্রোহ ইংরেজ শাসন ও শোষণে ভারতের পূর্বাঞ্চলের দলিত-পিষ্ট দিন-মজুর, গরীব চাষী ও কর্মহারা কারিগরদের মিলিত বিদ্রোহ, আর বিদেশী ইংরেজ শাসন ও জমিদার-মহাজনগোষ্ঠী এই বিদ্রোহের সাধারণ শত্রু।

ইংরেজ সরকারের সশস্ত্র পুলিস ও ফৌজ এসে সাঁওতাল অঞ্চলে প্রবেশ করল। সশস্ত্র পুলিস ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এসে গ্রামে গ্রামে, বাজারে বাজারে হানা

দিতে আরম্ভ করল। সশস্ত্র সাঁওতালেরাও সুযোগমত এই সকল পুলিসদলের এক একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই একজন দারোগার নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিসের একটি বৃহৎ দল এসে পাঁচকোটির বাজারে হানা দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিদ্রোহীরা সংবাদ পেয়ে পুলিসের দলকে ঘিরে ফেলে। বিদ্রোহীরা দারোগাসহ সবকটা পুলিসকে হত্যা করে তাদের বন্দুকগুলি হস্তগত করে। পুলিস বাজারে ঢোকার পর তাদের অভ্যর্থনা করেছিল বাজারের পাঁচজন মহাজন। বিদ্রোহীরা তাদেরও হত্যা করে দেশদ্রোহিতার শাস্তি দিল। বিদ্রোহীরা এখানেই থামলনা, তারা সাঁওতাল অঞ্চলের রাজধানী বার্নহাইটের বাজার আক্রমণ করে বাজারের সকল ধনী মহাজনকে হত্যা করল এবং সেই ধনী মহাজনদের দোকান লুট করে সকল জিনিসপত্র গরীব সাঁওতালদের মধ্যে বিলি করে দিল।

এইভাবে বিদ্রোহ ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পাশেই ঐ অঞ্চলের অত্যাচারী পাকুড়ের জমিদারের প্রাসাদ। পাকুড়ের জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত সাঁওতালরা পাকুড়ের রাজবাড়িটিকে ধূলিসাৎ করে দেবার আয়োজন করল।

বিদ্রোহের দুই নায়ক ভৈরব ও চাঁদের নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী ১২ই জুলাই রাত্রিকালে পাকুড়ের রাজবাড়ী আক্রমণ করল। পাকুড়ের রাজা সপরিবারে পলায়ন করল, বিদ্রোহীরা রাজবাড়ী দখল করে সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিল। পাকুড়ের কাছেই রয়েছে আর একজন অত্যাচারী জমিদার। এবার তার পালা। সে হল অম্বর পরগনার জমিদার। ১৩ই জুলাই রাত্রিকালে বিদ্রোহীরা অম্বর পরগনার জমিদারের :কাছাড়ী-বাড়ী, বহু গুদাম ও গোলা লুণ্ঠন করল।

এইভাবে সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলের সাঁওতালরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালিয়ে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বাংলাদেশের বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের একটা বড় অঞ্চল দখল করে ফেলল। এই আক্রমণের ফলে ঐ সকল অঞ্চলের ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অঞ্চলের জমিদার, মহাজন ও নীলকর-সাহেবরা দূরবর্তী ইংরেজ শাসকদের আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এই সকল অঞ্চলে ইংরেজের সৈন্যবাহিনী ও পুলিস বহু খণ্ড-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে পূর্ব-ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হল।

* * *

বিদ্রোহীদের শক্তি দেখে ইংরেজ শাসক আর তাদের অনুচর জমিদার, মহাজন, রাজা-মহারাজ-নবাবের দল আসন্ন ধ্বংসের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ইংরেজরা এবার প্রাণপণে বিদ্রোহ-দমনের আয়োজন করতে লাগল। মেজর বরোজ নামক এক ইংরেজ সেনাপতি একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বহু কামান-বন্দুক নিয়ে কলিকাতা থেকে এল বিদ্রোহ দমন করতে। সিহু ও কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সেনা ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হল। দুই দলের মধ্যে আরম্ভ হল তুমুল যুদ্ধ।

বিদ্রোহীরা যুদ্ধের ময়দান চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হল। এই বিজয়ের দিনটি ছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই।

এই পরাজয়ের ফলে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে ভীষণ ত্রাস দেখা দিল। এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে ইংরেজ শাসনকে বাঁচাবার জন্য স্বয়ং বড়লাট লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে এক বিরাট সৈন্যদল দানাপুরের সামরিক ঘাঁটি থেকে ছুটে এল, কলিকাতা থেকে এল অপর একটি সৈন্যদল। রাণীগঞ্জে এই দুই সৈন্যদল মিলিত হল। ইংরেজদের অভিজ্ঞ সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লয়েড হল এই মিলিত বাহিনীর পরিচালক। এদিকে সাঁওতাল সেনাপতি সিদু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ পরামর্শ করে এই ইংরেজ বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে চূর্ণবিচূর্ণ করবার মতলব করলেন।

কামান-বন্দুকে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনী নিঃশঙ্ক মনে এক গ্রামের পাশে তাঁবু ফেলেছে। মধ্য রাত্রির গভীর অন্ধকারে সাঁওতালগণ ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুবাহিনীর উপর। এই আকস্মিক আক্রমণে দিশেহারা ইংরেজ বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তাদের সকল কামান বিদ্রোহীদের হস্তগত হল। এই অভাবনীয় জয়লাভের পর বিদ্রোহীরা আরও উৎসাহিত হল এবং গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হয়ে কলগং থেকে গলশা পর্যন্ত আর রানীগঞ্জের একটি অঞ্চলও অধিকার করে ফেলল।

বিদ্রোহী বাহিনীর এই একের পর এক জয়লাভ ও আক্রমণের ফলে শাসকগোষ্ঠী ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কোথাও বিদ্রোহীদের আক্রমণের সংবাদ শুনলেই তারা আতঙ্কে পালাতে আরম্ভ করে। বড়লাট লর্ড ডালহৌসি থেকে প্রত্যেকটি সাধারণ ইংরেজ আসন্ন ধ্বংসের ভয়ে কাঁপতে লাগল। সারা ভারতের ইংরেজগণ আত্মরক্ষা ও প্রতিহিংসার জন্য পাগল হয়ে উঠল; তারা প্রতিহিংসার জন্য সমস্বরে চিৎকার আরম্ভ করল। তাদের সেই চিৎকারের প্রতিধ্বনি করে ইংরেজদের 'ক্যালকাটা রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রিকায় লেখা হল: "এই অসভ্য কালো ভূতগুলির মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তোলা ব্যতীত এই বিদ্রোহ দমনের অন্য কোন উপায় নেই। প্রত্যেকটি পরাজয় ও হত্যার প্রতিশোধ যেন অতি ভয়ঙ্কর হয়, ভবিষ্যতে তারা যেন আর কোন দিন বিদ্রোহ করতে সাহসী না হয়। কেবল বিদ্রোহের নায়কদেরই নয়, সকল বিদ্রোহী সাঁওতালকেই বর্মার ভয়ঙ্কর জঙ্গলে নির্বাসিত করতে হবে, না হয় গুলি করে বা ফাঁসী দিয়ে হত্যা করতে হবে।" 'সুসভ্য' ইংরেজরা প্রতিহিংসার বশে যে কি ভয়ঙ্কর পিশাচে পরিণত হতে পারে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার এই চিৎকারই তার জলন্ত প্রমাণ।

এবার ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতের সমস্ত ধনবল ও জনবল একত্র করে এক বিরাট অভিযানের আয়োজন করতে লাগল। ইংরেজরা বিদ্রোহী সাঁওতাল আর তাদের সঙ্গী গরীব বাঙ্গালীদের জমি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে রক্ত বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ শাসকদের এই যুদ্ধের আয়োজনে যোগ দিল বাংলা ও বিহারের দেশদ্রোহী জমিদার ও মহাজনদের দল। নীলকুঠির ইংরেজ সাহেবরা তাদের সমগ্র ধন-সম্পদ সরকারের হাতে তুলে দিল।

দলে দলে ইংরেজ সৈন্য বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করল। বাংলার জমিদার ও মহাজনগণ অর্থভাণ্ডার, পাইক বরকন্দাজ দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করল। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁর নিজের খরচে পঞ্চাশটি হাতী পাঠালেন। এই বিরাট অভিযান চালনা করতে এল ইংরেজদের এক বিখ্যাত সেনাপতি। তারপর আরম্ভ হল ইংরেজদের ধ্বংস-যজ্ঞ। মোট তেরটা খণ্ডযুদ্ধ হল বিদ্রোহীদের সঙ্গে। শত্রুর কামান-বন্দুকের মুখে তীর ধনুক লাঠি তরবারি বর্শায় সজ্জিত বিদ্রোহী বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হল। মৃত্যুভয়হীন বিদ্রোহীরা হাজারে হাজারে প্রাণ দিল। বিদ্রোহের দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের যুদ্ধে বীরের মত প্রাণ দিলেন। সিদু ও কানু ছত্রভঙ্গ সাঁওতাল বাহিনীকে আবার একত্র করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। বহু নূতন নেতা নিহত নেতৃবৃন্দের স্থান গ্রহণ করলেন।

বড় ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানো কঠিন বুঝে কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বাহিনী বীরভূমের সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করল। এদিকে ভাগলপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ বাহিনী বহু ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সাঁওতাল অঞ্চলটিকে চষে ফেলতে লাগল। হাজার হাজার সাঁওতাল বৃদ্ধ ও শিশু সেই ইংরেজ বর্বরদের হাতে নিহত হল। মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রেরিত পঞ্চাশটি হাতীকে পাগল করে সাঁওতাল অঞ্চলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। পাগলা হাতীর পায়ের নীচে পড়ে শত শত সাঁওতাল প্রাণ হারাল। সাঁওতালদের হাজার হাজার কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এক দিকে যখন সাঁওতাল অঞ্চলের উপর দিয়ে ইংরেজ বাহিনীর এই রক্ত-কলুষিত অভিযান অব্যাহত গতিতে চলল, তখনই অপর দিকে কানু ও অন্যান্য নেতাদের পরিচালনায় বহু শত্রুসৈন্য বিদ্রোহীদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বীরভূমের ইংরেজ ও ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত বাহিনী সাঁওতালদের হাতে পরাজিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আর একদিকে, সাঁওতাল অঞ্চলের উত্তর সীমান্তে মুর্শিদাবাদ ও কলগং থেকে রাজমহল অবধি গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর সিদুর নেতৃত্বে সাঁওতালদের আক্রমণ চলতে লাগল। রাজমহলের পশ্চিমদিকের সকল নীলকুঠি ও ইংরেজদের ঘাঁটি বিদ্রোহীদের আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমন করতে এল মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। তারা একদল ইংরেজ সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। ঔরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানের মধ্যবর্তী স্থানে মহেশপুর গ্রামের পার্শ্বে এক তুমুল যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়লাভ করল। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে কানুর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল।

মহেশপুরের এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর সাঁওতাল বাহিনীর মধ্যে কিছুদিনের জন্য হতাশা দেখা দেয়। ঠিক এই সময়ে ইংরেজরা বীরভূমের সাঁওতাল বাহিনীর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তার ফলে সাঁওতাল বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু হটে এসে বিদ্রোহীদের পক্ষে সাঁওতাল অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন

হল। তখন এক ইংরেজ বাহিনী সাঁওতাল অঞ্চলটিকে চষে ফেলছে, নির্বিচারে সাঁওতালদের হত্যা করছে। সেই শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর সামনে সাঁওতালদের দাঁড়ানো অসম্ভব। তবু বিদ্রোহীরা সাঁওতাল অঞ্চলেই প্রবেশ করল। কারণ, সাঁওতাল জনসাধারণকে ইংরেজদের বর্বরতার মুখে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাও সম্ভব নয়।

বীরভূম থেকে পিছু হটে সেনাপতি সিদু তাঁর বাহিনী নিয়ে সাঁওতাল পরগনায় প্রবেশ করলেন। তাঁর বাহিনী ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেখানে সম্ভব সেই-খানেই ইংরেজ সৈন্যদের বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তখন ইংরেজ সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচারে সাঁওতালদের এক অংশের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে, তারা তখন যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। এই অবস্থায় একদিন সাঁওতাল বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক সিদু ইংরেজ সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যান। হতাশাচ্ছন্ন একদল সাঁওতাল সিদুর গোপন আড্ডার খবর ইংরেজদের জানিয়ে দেয়। ইংরেজরা সিদুকে একাকী গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করে হত্যা করে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, সাঁওতাল নেতা সিদু এইভাবে বিদেশী শাসকদের হাতে প্রাণ দিয়ে বিদ্রোহী ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

সাঁওতালদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক কানু এবং আরও অনেকে তখনও জীবিত। তাঁরাই এখন সাঁওতালদের হতাশা কাটিয়ে আবার ইংরাজ বাহিনীকে বাধা দেবার আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁদের চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ সাঁওতাল সৈন্যেরা আবার ছোট ছোট দলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। এই সকল সৈন্যদল এবার গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ করে ইংরেজ বাহিনীকে অস্থির করে তুলল। তাদের আকস্মিক আক্রমণে ইংরেজ বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হল। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা সর্বত্র সাঁওতালদের দলে দলে গুলি করে হত্যা করতে লাগল। সাঁওতাল অঞ্চলের পথ ঘাট সাঁওতালদের মৃতদেহে ঢেকে গেল।

কিন্তু সাঁওতালদের এই গণ-বিদ্রোহ থামল না। সাঁওতালরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদ্রোহের পতাকা উচ্চে তুলে রাখল, ইংরেজ শাসকদের শত চেষ্টাতেও সেই পতাকা অবনমিত হল না। ইংরেজ শাসক ও জমিদার-মহাজনদের অবাধ অত্যাচার ও শোষণ সাঁওতালদের মধ্যে যে আগুন জালিয়েছে, সেই আগুন সহজে নিভবার নয়। বিদ্রোহীদের যুদ্ধ সমানে চলতে লাগল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে চলল ইংরেজদের অত্যাচার। কিন্তু সেই অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা যে সাহস, যে দৃঢ়তা, যে বীরত্ব দেখিয়ে গেছে, তা অতুলনীয়। নিম্নোক্ত কাহিনীটিতে বিদ্রোহী সাঁওতালদের বীরত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এই 'অসভ্য' সাঁওতালদের জন্য যে কোন দেশ গর্ব অনুভব করতে পারে ঃ

পঁয়তাল্লিশ জন সাঁওতাল সৈন্য সারা রাত্রি ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত দেহে এক কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। এক গুপ্তচরের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ডোনাল্ড একশত সৈন্য নিয়ে সাঁওতাল সৈন্যদলের

আশ্রয়-স্থল ঘিরে ফেলল। ইংরেজ সেনাপতি তাদের বাইরে এসে আত্মসমর্পণ করবার জন্য সগর্বে নির্দেশ দিলেন। বীর সাঁওতাল সৈন্যেরা ইংরেজ সেনাপতির এই স্পর্ধার জবাব দিল ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে। বিষাক্ত তীরে পনের জন ইংরেজ সৈন্য নিহত হল। ইংরেজ সৈন্যও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাল। গুলির জবাবে এল আর এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর। সেই তীরে আরও দশজন ইংরেজ সৈন্য নিহত হল। ইংরেজ সৈন্যরা মরিয়া হয়ে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। এবার আর ঘর থেকে গুলির জবাব এল না। ইংরেজ সৈন্যরা বীর দর্পে ঘরে প্রবেশ করল।

তারা দেখল, চুয়াল্লিশ জন সাঁওতালের মৃতদেহ পড়ে আছে, আর সেই মৃতদেহের মধ্যে তীর ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল। ইংরেজ সেনাপতিও বৃদ্ধ সাঁওতালটিকে অস্ত্রত্যাগ করতে হুকুম করল। বৃদ্ধ সাঁওতালটি কোমর থেকে তরবারি খুলে সম্মুখের ইংরেজ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইংরেজ সেনাপতি গুলি করল। বৃদ্ধ সাঁওতালের মৃতদেহ গড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী সাঁওতাল আত্মসমর্পণ করতে শেখেনি।

এইভাবে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল ধরে বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলার ইংরেজ রাজ ও জমিদার-মহাজন গোষ্ঠীর অত্যাচারী রাজত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলা ও বিহারের গরীব জনতার সহায়তায় 'অসভ্য' বলে কথিত সাঁওতালেরা নিজেদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পশুশক্তির নিকট তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। সাঁওতাল বিদ্রোহ পরাধীন ভারতের বুকে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে অবশেষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্রোহী সাঁওতাল সেইদিন ইংরেজের কাছে দয়া ভিক্ষা করেনি; অথবা শত্রুকে ক্ষমাও করেনি। প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত হয়ে এলেও তা একেবারে নিবে যায়নি। তাই দেখতে পাই, আবার সাঁওতালেরা সুযোগ বুঝে ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছে এবং সেই পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন দ্বিতীয়বার জ্বলে উঠেছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮০-৮২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহও প্রথমবারের মতই ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। তখন ইংরেজরা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে তাদের শক্তি সংহত করে তুলেছে। তা ছাড়া সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি তখনও তারা ভুলে যায়নি। তাই এই বিদ্রোহ ধূমায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সেনাপতি স্যার টমাস গর্ডনের নেতৃত্বে বহু কামানসহ চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী এসে সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলটি ঘিরে ফেলল। ইংরেজ বাহিনী ছয়মাস কাল সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলে কুচ-কাওয়াজ করে ঘুরে ঘুরে বহু বিদ্রোহী সাঁওতালকে গুলি করে হত্যা করে এবং সাঁওতালদের সেই গণ-বিক্ষোভকে কামান-বন্দুকের মুখে স্তব্ধ করে দেয়।

তার পর থেকে আর সাঁওতাল বিদ্রোহের মাদল-ধ্বনি শোনা যায়নি। আত্ম-

বিস্মৃত এই আদিবাসী সম্প্রদায় অত্যাচার-অবিচারের আঘাতে একবার মাত্র জেগে উঠে বিদেশী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান ঘোষণা করে গেছে। সেই আহ্বান সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়ে ভারতের বৃহত্তম স্বাধীনতা-সংগ্রাম অর্থাৎ অর্ধ ভারত-ব্যাপী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের কামান-গর্জনের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। বিদ্রোহী সাঁওতালদের অসমাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদ্রোহী ভারতের জনগণ নিজেদের সংগ্রাম বলে গ্রহণ করেছে, আর সাঁওতালেরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির উজ্জ্বল রক্তের স্বাক্ষর রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) ঃ
ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরের কথা। এই একশত বৎসরের ইংরেজ-রাজের রক্তকলুষিত শাসন আমাদের সোনার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করেছে। সারা ভারতের চেহারাই বদলে গেছে। ইংরেজ-রাজের ভারত-গ্রাস ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল বাংলা ও বিহার থেকে, পাঞ্জাব দিয়ে সেই গ্রাস শেষ হল। তখন দেশের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

তখন দেশীয় রাজারা নামমাত্র স্বাধীনতা নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যের গদি আকড়ে ছিল। ইংরেজরা এবার দেশীয় রাজ্যগুলিকেও গ্রাস করতে প্রস্তুত হল। ইংরেজ-রাজের এই রাক্ষুসে ক্ষুধা মিটাবার ভার নিয়ে লর্ড ডালহৌসি বড়লাট হয়ে এসেছে। বড়লাট সাহেব ছলে-বলে-কৌশলে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে। ইংরেজ-রাজের গ্রাসে গেল পেশোয়া রাজ্য সাতারা, ভোঁসলারাজা নাগপুর, রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর ঝাঁসী, নিজামের বেরার, মারাঠাদের সম্বলপুর, তাঞ্জোর, মুসলমান রাজ্য কর্ণাটক, আর সকলের শেষে শিখদের পাঞ্জাব। ইংরেজ-রাজ শতখণ্ডে ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করবার পিছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, এক রাজনৈতিক ও অপরটি অর্থ নৈতিক। প্রথমত, শতখণ্ডে বিভক্ত ভারতকে একটিমাত্র শাসনের অধীনে আনতে পারলে এই বিশাল দেশের জনসাধারণের বিরোধিতা চূর্ণ করা সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের ধনদৌলত ও কৃষিজাত দ্রব্য (শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল) ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যে সকল দেশীয় রাজ্য গ্রাস করল, সেই গুলির গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজাত দ্রব্য ছিল শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দুই রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সমগ্র ভারতকে গ্রাস করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা এদেশে রেলপথ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। বিদ্রোহী ভারতকে চূর্ণবিচূর্ণ করে তাকে শোষণ করবার জন্য এবার এই দেশে রেলপথ হল ইংরেজ-রাজের প্রধান হাতিয়ার। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রথম রেলপথ তৈরী হয়েছিল বিদ্রোহী ভারতের তখনকার প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, আর রেলপথ তৈরী হয়েছিল বাংলাদেশে। বেরার ও নাগপুর দখল করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের তুলা ইংলণ্ডে চালান হতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের কাপড়ের কারখানার কেন্দ্র ম্যানচেস্টার তখন ফেঁপে উঠেছে,

ম্যানচেস্টারের তুলার চাহিদা মিটাবার জন্যই ইংরেজ শোষকদের প্রয়োজন হয়েছিল বেরার ও নাগপুর। ম্যানচেস্টারের কাপড়ের কলে বেরার ও নাগপুরের তুলা দিয়ে তৈরী সস্তা কাপড় এসে ভারতের বস্ত্রশিল্পকে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে ইংলণ্ড হয়ে উঠল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ।

একথা সত্য যে, ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকেই দেশীয় রাজ্যের রাজা ও মহারাজের দল ইংরেজের রাজশক্তির নিকট মাথা নত করে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। যখন ভারতের বিদ্রোহী সাধারণ মানুষ এই বিদেশীদের প্রাণপণে বাধা দিয়েছে, এই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, তখন দেশীয় রাজ্যের রাজারা এই বিদেশী শক্তির পায়ে মাথা নত করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা এই শক্তির হুকুমে ভারতের বিদ্রোহী সাধারণ মানুষের সংগ্রাম-শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করবার জন্য তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছে। তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে প্রত্যেকটি বিদ্রোহের মধ্যে।

কিন্তু এত করেও যখন ঐ সকল দেশীয় রাজ্য ইংরেজ-রাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে রক্ষা পেল না, তখন এই সকল রাজা-মহারাজ তাদের পুরাতন স্বেচ্ছাচারী সামন্ততন্ত্রের বনিয়াদকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শেষ চেষ্টা হিসাবে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ব্যতীত অন্য কোন পথ খুঁজে পেল না। চিরকালের বিদ্রোহ-বিরোধী, প্রজা-বিরোধী সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় রাজারা অবশেষে সাধারণ মানুষ-প্রবর্তিত বিদ্রোহের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হল।

ইংরেজ-রাজের একশত বৎসরের রক্ত-কলুষিত শাসন ও শোষণে জর্জরিত সাধারণ মানুষ তখন মরিয়া হয়ে সারা ভারত জুড়ে আর একটা বিদ্রোহের আয়োজনে ব্যস্ত। ওয়াহাবী বিদ্রোহ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর একটানা চলে তখন সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে। সেই বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানে-ওখানে দেখা যায় মাত্র। এইবার এই আসন্ন গণ-বিদ্রোহের সঙ্গে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ নূতন শক্তি। সেই শক্তি হল ইংরেজ-রাজের ভারতীয় সিপাহী। ভারতীয় সিপাহীরা পেটের দায়ে বিদেশী ইংরেজ শাসকদের চাকরি গ্রহণ করলেও তারা কোন দিনই জনসাধারণের উপর এই বিদেশীদের বর্বরসুলভ অত্যাচার মেনে নেয়নি। 'সন্ন্যাসী' বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ করতে বার বার অস্বীকার করে তারা প্রমাণ করেছে যে, পেটের দায়ে ইংরেজের গোলামী করলেও তারা মনে প্রাণে বিদ্রোহী জনসাধারণেরই পক্ষে। ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম তাদের মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সিপাহীরা কৃষকের সন্তান। তাই ভারতের কৃষক যখন ইংরেজ-রাজের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল, তখন তা ভারতের কৃষকের সিপাহীর বেশধারী সন্তানগণ সহ্য করেনি। তারাও ভারতের বিদ্রোহী কৃষক-জনগণের পাশে এসে তাদের বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই হল এই বিদ্রোহের মূলভিত্তি। এছাড়া, ইংরেজ শাসকদের দুর্ব্যবহার, ইংরেজ সৈন্য ও সিপাহীদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য, বেতনের পার্থক্য, সিপাহীদের শারীরিক শাস্তির

ব্যবস্থা, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার যুদ্ধে সিপাহীদের বলপূর্বক ভারতের বাইরে পাঠাবার চেষ্টা প্রভৃতি সিপাহীদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে ধূমায়িত অসন্তোষ বিদ্রোহের দাবাগ্নিতে পরিণত হবার পক্ষে ইন্ধন যোগাল। এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। হাতে অস্ত্র ছিল বলেই ইংরেজ-রাজের বেতনভুক সিপাহীরা রইল তাদের সম্মুখভাগে, আর কৃষক জনগণ রইল তাদের ঠিক পিছনেই।

এই বিদ্রোহের নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, এ কেবল ইংরেজ-রাজের সৈন্যদলভুক্ত সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়। এই বিদ্রোহ বিদেশী ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সারা ভারতের গরীব জনসাধারণের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে যে বাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, সেই বাহিনীর সিপাহী কেবল ইংরেজ-রাজের সৈন্যদল-ভুক্ত সিপাহীই নয়, সারা ভারতের কৃষক জনসাধারণই ছিল এই বিদ্রোহী-বাহিনীর সিপাহী। ইংরেজ-রাজের সৈন্যদলভুক্ত সিপাহীরা ছিল সেই বিদ্রোহের বিরাট বাহিনীর (অর্থাৎ কৃষকের) একটি অংশমাত্র। তারাও ইংরেজ-রাজের সামরিক পোশাকে ভারতীয় কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। এই বিদ্রোহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক জনগণ যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিল, তারাই যে এই সংগ্রামের প্রাণ-শক্তিরূপে কাজ করে এই বিদ্রোহকে অর্ধ-ভারতের প্রতি গ্রামে, প্রতি কোণে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা গ্রামবাসী কৃষক জনগণের উপর ইংরেজদের ভয়াবহ অত্যাচারের বিবরণ থেকেই প্রমাণিত হয়। বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক সেই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

আর এক নূতন শক্তি এসে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। এই নূতন শক্তি ভারতের বহু রাজ্যহারা সামন্তরাজ। তখন তাদের রাজ্য ইংরেজ-রাজের অধিকার-ভুক্ত। তারা এতদিন কৃষক জনসাধারণের সর্বস্ব শোষণ করে এসেছে, দলিত, পিষ্ট কৃষকের মুমূর্ষু দেহের উপর বিলাসের সৌধ গড়ে তুলেছে। আজ তারা রাজ্য হারিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করতে এসেছে। তাদের উদ্দেশ্য কৃষক জনসাধারণের উপর থেকে ইংরেজ-জমিদার-রাজা-মহারাজদের অত্যাচার ও শোষণের অবসান করা নয়, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ-রাজশক্তির কাছ থেকে তাদের হারান রাজ্য ফিরে পাওয়া, যে সামন্তরাজ ও জমিদার-গোষ্ঠী 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ', সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী বিদ্রোহ দমন করবার জন্য তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল দিয়ে বিদেশী ইংরেজদের সাহায্য করেছে, তারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের নিজ নিজ রাজ্য ইংরেজদের কাছ থেকে ফিরে পাবার জন্য, নিজ রাজ্যের কৃষক জনসাধারণকে শোষণ করবার শাশ্বত অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

এই সামন্ত-রাজগণ এসেই নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিদ্রোহের নেতৃত্ব হস্তগত করবার চেষ্টা করল। কারণ, তারা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরে-ছিল যে, আপাতত ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও একদিন এই বিদ্রোহ ভারতের সামন্ত-রাজগণের উপরও প্রচণ্ড আঘাত হানবে।

ভারতীয় কৃষকদের এই বিদ্রোহ সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও এই বিদ্রোহ

পরিচালনার জন্য কৃষকদের নিজস্ব কোন সচেতন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি অথবা উন্নত বিপ্লবী চেতনা বিদ্রোহীদের মধ্যে দেখা দেয়নি। তখনকার সমাজের স্তরে তা ছিল অসম্ভব। সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও তার বিপ্লবী-নেতৃত্ব গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তাই এই অর্ধ-চেতন বিদ্রোহী কৃষকের উপরে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সামন্ত-রাজদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। এইভাবে সামন্ত-রাজারাই হয়ে বসল সিপাহী বিদ্রোহের নেতা। এই দুই পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার ফলে, সিপাহী বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণের সূচনা করলেও, একটি সম্পূর্ণ নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেলেও, প্রথম থেকেই এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই বিদ্রোহ আরম্ভ হবার কিছুকাল আগে থেকেই ভারতের কৃষক অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচবার জন্য বিদেশী ইংরেজ-রাজকে একটা চরম আঘাত দেবার আয়োজন করছিল। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল ধরে চলবার পর ওয়াহাবী বিদ্রোহ তখন সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়েছে। তার ফলে কৃষকদের উপর শোষণ ও উৎপীড়নের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আবার বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করা ব্যতীত কৃষক জনগণের আত্মরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। ফলে সিপাহী বিদ্রোহীদের আয়োজনে কৃষক জনসাধারণ আবার আশায় বুক বাঁধল। তারা উৎসাহের সঙ্গে বিদ্রোহ সফল করে তোলবার আয়োজনে মেতে উঠল। কিন্তু তাদের সেই উৎসাহ কমে এল বিদ্রোহের নেতৃত্বের দিকে তাকিয়ে। তারা দেখল, তাদের শোষকেরাই এই বিদ্রোহের পরিচালক। আর পরিচালকগণ চাইলেন, এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সিপাহীদের ও রাজা-মহারাজদের অনুগৃহীত অনুচরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। এই সকল কারণে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বিস্তৃত জনগণের সমর্থন হারিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এখানেই দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দুর্বলতা।

কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও যেখানেই সম্ভব হল সেখানেই কৃষকগণ ইংরেজদের আঘাতে আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, ইংরেজদের ঘৃণিত শাসন অচল করে দিয়েছে। সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সারা ভারতে সিপাহী ও কৃষক জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে ওঠে, তারই ফলে ইংরেজ-শাসনের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছিল। অত্যাচারী ইংরেজ সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল যে, তারা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললেও ভারতের বিদ্রোহী মানুষ কোনদিন তাদের পায়ে মাথা নত করেনি, অথবা তাদের শাসন মেনে নেয়নি। তারা সেদিন বুঝেছিল যে, বিদ্রোহী ভারত চিরদিন একটা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির মত মাথা উঁচু করেই থাকবে, সুযোগ পেলেই সেই আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে ছুটে বের হবে গণ-বিদ্রোহের অগ্নিপ্রবাহ, আর সেই অগ্নিপ্রবাহে প্লাবিত হয়ে ভারতের ইংরেজ-শাসন একদিন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

* * *

সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে, চাষীদের গ্রামে গ্রামে গোপন সভায় স্থির হয়ে গেল, বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। এই তারিখটির পিছনে লুকিয়েছিল ভারতের চরম দুঃখ-লাঞ্ছনার এক বেদনাময় ইতিহাস। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য ডুবতে আরম্ভ করেছিল ঠিক একশত বৎসর পূর্বে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। ভারতের মানুষ কোনদিন ঐ তারিখটি ভুলে যায়নি, আর ভোলেনি তাদের শত্রুকেও। সেইজন্য প্রতি বৎসর ঐ তারিখে গ্রামে গ্রামে সভা বসত, বৎসরের ঠিক সেইদিন পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প গ্রহণ করত। সিপাহীদের ব্যারাকে গোপন-বৈঠক বসত। তারাও প্রতি বৎসর নূতন করে প্রতিজ্ঞা করত—পলাশীর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ চাই।

বিদ্রোহের তারিখ স্থির হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন। ঐদিন পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী। ঐদিন ভারতের সর্বত্র একযোগে সিপাহী ও জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ, ব্যারাকে ব্যারাকে সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হল।

ভারতে তখন ইংরেজ-সৈন্যের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার, আর ভারতীয় সিপাহীর সংখ্যা দুই লক্ষ পনের হাজার। তাই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ নিশ্চিতরূপে ধরে নিয়েছিলেন যে, সামান্য আঘাতেই ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারণা নিয়েই প্রথমে নেতারা বিদ্রোহের আয়োজন আরম্ভ করেন। কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজন ও সংগঠনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ কোথা থেকে আসবে? বিদ্রোহের নেতারা হলেন রাজ্যহারা সামন্ত-রাজ। তাঁরা অর্থের কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না। সিপাহীদের অর্থের প্রয়োজনে বিদ্রোহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত বাদশাহ বাহাদুর শাহ জবাব দিলেন, 'আমার কোষাগার নেই, আমি তোমাদের বেতন দিতে পারব না।'

আসন্ন বিদ্রোহ ও মুক্তির আনন্দে আত্মহারা সিপাহীরা জবাব দিল, 'আপনার চিন্তার কারণ নেই; আমরা ইংরেজ-রাজের কোষাগার থেকে অর্থ লুঠন করে অর্থ এনে দেব। তা দিয়েই চলবে আমাদের বিদ্রোহের আয়োজন।'

বিদ্রোহের নেতারা স্থির করলেন, ভারতের সকল সিপাহী একই দিনে বিদ্রোহ করে ভারতের সকল ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করবে, জেলের দরজা ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্ত করবে, সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করবে, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলবে, রেল লাইন তুলে ফেলবে এবং ইংরেজদের অস্ত্রাগার ও তাদের অধিকৃত দুর্গসমূহ দখল করবে। এই সব কাজ শেষ হয়ে গেলে, প্রয়োজন হলে জনসাধারণকে বিদ্রোহে যোগদান করবার জন্য আহ্বান করা হবে। এইভাবে বিদ্রোহে জনসাধারণের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করে রাখা হল।

বিদ্রোহের পরিচালকগণ এও স্থির করলেন, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করা হবে। সামরিক পরামর্শদাতারা যুক্তি দিলেন, ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী সুশৃংখল ও অভিজ্ঞ বলে যুদ্ধের সময় তাদের সম্মুখীন হওয়া উচিত হবে না।

শত্রুদের বহু কামান রয়েছে, কামানের বিরুদ্ধে কামান ব্যতীত সম্মুখ যুদ্ধ করা চলে না। সুতরাং ইংরেজ বাহিনীকে পিছন থেকে আঘাত করতে হবে এবং তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

বিদ্রোহের নায়কগণ ইংরেজদের যুদ্ধ-কৌশল উত্তমরূপে বোঝবার এবং আয়ত্ত করবার জন্যও চেষ্টা করেন। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গদিচ্যুত মারাঠা-নেতা, পেশোয়া নানাসাহেব এই জন্য বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা আজিমুল্লা খাঁকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। নানাসাহেবের পরামর্শে আজিমুল্লা ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য লাভের চেষ্টাও করেছিলেন। এইভাবে সব দিক থেকে বিদ্রোহ সফল করে তোলবার আয়োজন করা হল।

বিদ্রোহের আয়োজন দ্রুত চলতে লাগল। সকলের মুখেই এক কথা—২২শে জুন। সিপাহীরা বিদ্রোহের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে। তখন মার্চ মাস।

একদিন আকস্মিকভাবে একটি ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা থেকেই সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল। জুন মাস পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা সিপাহীদের পক্ষে আর সম্ভব হল না।

মার্চ মাসে একদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতার নিকটস্থ ব্যারাকপুরের সৈন্য-ব্যারাকে দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিদের এক বৈঠক চলছিল। সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারী ব্যারাক পরিদর্শন করতে এল। অন্য সিপাহীরা তখন অবসর সময়ে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। তারা ইংরেজ-কর্মচারীটিকে দেখেও দেখল না। কর্মচারীটি এতে অপমানিত বোধ করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে ক্রুদ্ধ হয়ে নিকটস্থ এক সিপাহীকে ঘুসি মারল। এই আকস্মিক আক্রমণে সেই সিপাহী আহত হল এবং এর ফলে অন্যান্য সিপাহীরা ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। মঙ্গল পাণ্ডে নামক বাহিনীর একজন সৈনিক অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীটিকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। ইংরেজ-কর্মচারীর নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এই সংবাদ শোনামাত্র এই অঞ্চলের সকল ইংরেজ-সৈন্য তাড়া করে এল দেশীয় সিপাহীদের শাস্তি দিতে। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করা হল। এর সাতদিন পর মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসীকাষ্ঠে হত্যা করা হল। এই ফাঁসির সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সিপাহীরা বীর মঙ্গল পাণ্ডের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই ঘটনা থেকেই আরম্ভ হয়ে গেল ভারতের যুগান্তকারী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান।

এই সময় ছোট একটি দেশীয় সৈন্যদল ছিল বহরমপুরে। তারা মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির সংবাদ শুনেই ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু বাংলা-দেশে কৃষক ও জনসাধারণের সঙ্গে সিপাহীদের কোন যোগাযোগ না থাকায় এবং বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণী এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করায় কৃষক ও জনসাধারণ এই বিদ্রোহ থেকে দূরে রইল। বাংলাদেশের এই সিপাহী বিদ্রোহ প্রধানত ব্যারাকপুর ও বহরমপুর—এই দুইটি শহরের ঘটনা হয়ে রইল। এই দুই শহরের সংখ্যাল্প সিপাহীরা কয়েকদিন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও গণ-সাহায্য না পেয়ে

পরাজিত ও বন্দী হন। চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে নোয়াখালি ও আসামে ছড়িয়ে পড়ল এবং কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এইভাবে বঙ্গদেশে সিপাহী বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।

কিন্তু ব্যারাকপুরের ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ১০ই মে মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মীরাটের সব ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করে। এর পর মীরাটের সিপাহীরা দিল্লীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। এদিকে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লী অভিযান করে। স্থানীয় কৃষকরা তাদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগদান করে রেল লাইন তুলে ফেলে, টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দেয় এবং ইংরেজ-সৈন্যদের ব্যারাক ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে।

এই বিদ্রোহের সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন-হারা-মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর সিপাহীরা ও মুসলমান জনসাধারণ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে মেনে নেয়। তখন থেকে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ হলেন বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক ও কেন্দ্রস্বরূপ। এইভাবে বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থান সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে বিস্তার লাভ করে ভারতের ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তোলে।

জুন মাসে কানপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কানপুরের সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন গদিচ্যুত-পেশোয়া নানাসাহেব। কানপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নানাসাহেবের সাথে যোগ দিলেন গদিচ্যুত অযোধ্যার বেগম ও সম্পত্তিহারা জায়গীরদারগণ। তাঁদের যোগদানের ফলে এই অঞ্চলের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে।

মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ঝাঁসীর গদিচ্যুত-রানী লক্ষ্মীবাঈ। রানী নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। বিহারের কুমার সিংহ নামে একজন জায়গীরদার পাটনার বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শোলাপুর এবং কাল্পী নামক মধ্যপ্রদেশের একটি দেশীয় রাজ্যের রাজাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন।

এইভাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বাংলাদেশের ব্যারাকপুর থেকে আরম্ভ করে দ্রুত বহরমপুর, আম্বালা, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, রুড়কি, কাশী, আজমগড়, জৌনপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, বিঠুর, মিয়ামী, ফিরোজপুর, গোবিন্দপুর, পেশোয়ার ঝিলাম, শিয়ালকোট, পাটনা, দানাপুর, আরা, জগদীশপুর, আটক, মৈনপুর, সাহারানপুর, বদায়ুন, ইন্দোর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্রোহ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণও সকল শক্তি নিয়ে তাতে যোগদান করেন। সেই সময় ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন সাময়িক-ভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। 'সিপাহী বিদ্রোহ' আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে

ওয়াহাবীদের মধ্যেও আবার উৎসাহ দেখা দেয়। তারা সিপাহীদের সঙ্গে একযোগে সাধারণ শত্রু ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে আরম্ভ করে।

বিদ্রোহ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের জনসাধারণ এবং কৃষকগণও তাতে যোগদান করে। যে সব অঞ্চলের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সেই সব অঞ্চলের কৃষকেরা নিজে থেকেই রেল লাইন তুলে ফেলে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, ইংরেজ-সৈন্যদের ব্যারাক জ্বালিয়ে এবং তাদের রসদ লুঠ করে ইংরেজ বাহিনীকে অচল করে দেয়। বিদ্রোহের নায়কগণ কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদানের জন্য আহ্বান না করলেও, তারা নিজে থেকে এগিয়ে এসে শত্রুর পশ্চাতে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যায়। কিন্তু তারা যতই স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে, তাদের আর এক শত্রু, অর্থাৎ পুরাতন সামন্ত-রাজগণ কেবল নিজেদের স্বার্থেই এই বিদ্রোহ পরিচালনা করছে, ততই তাদের উৎসাহ হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে, এই বিদ্রোহ ক্রমশ ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ না করে ধীরে ধীরে গণ-সমর্থন হারিয়ে ফেলতে থাকে।

* * *

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে নানাসাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া তোপী ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলকের কাছে পরাজিত হন। সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর দখল করে। তিন মাসের অবরোধের পর সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ বাহিনী সম্রাট বাহাদুর শাহের কাছ থেকে দিল্লী অধিকার করে। সেনাপতি হ্যাভলক ও আউটরাম একত্রে লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে। লক্ষ্ণৌ ইংরেজ বাহিনীর হস্তগত হয়।

এই আশাতীত জয়লাভে ইংরেজরা বর্বর উল্লাসে মেতে ওঠে। তারা যে শহর অধিকার করে, সেই শহরের প্রত্যেক অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে। দিল্লী অধিকার করবার পর ইংরেজ সৈন্য পাঁচ দিন ধরে রাজপথে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক যাকে পেল, তাকেই গুলি করে হত্যা করল। মুমূর্ষু সিপাহীরাও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। ইংরেজদের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভারতীয়রা ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও ইংরেজ-সেনাপতি হাড্‌সন স্বহস্তে তাঁদের হত্যা করে প্রকাশ্য রাজপথে ঝুলিয়ে রাখে। দিল্লী নগরীতে প্রায় ছয় হাজার নরনারী এইভাবে নিহত হয়।

* * * * *

ইংরেজদের এই পৈশাচিক তাণ্ডব শীঘ্রই বাধাপ্রাপ্ত হল। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের ফলে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীরা প্রাণপণ চেষ্টায় আবার একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের উপর আক্রমণ করে। কানপুরের যুদ্ধের পরাজয়ের পর নানাসাহেব একদল সৈন্য সংগ্রহ করে অযোধ্যার ইংরেজ বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। নানাসাহেবের বাহিনী লক্ষ্ণৌ-এর পথে সেনাপতি হ্যাভলকের বাহিনীকে পরাজিত করে কানপুর পুনর্দখলের জন্য যাত্রা করে। তাঁর সঙ্গে তাঁতিয়া তোপীর বাহিনী যোগদান করে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। দুইজনে একত্রে কানপুর দখল করবার সঙ্গে সঙ্গে

নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর এই জয়লাভের সংবাদে আবার সারা ভারতের বিদ্রোহীদের মধ্যে উৎসাহ ফিরে আসে।

এদিকে ইংরেজদের আক্রমণে ঝাঁন্সীর রানীর বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই সংবাদ শুনে রানীকে সাহায্যের জন্য ছুটে আসে তাঁতিয়া তোপীর সৈন্য-বাহিনী। কিন্তু রানী ও তোপীর মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংরেজ-সৈন্যবাহিনী কানপুর পৌছাবার পূর্বে নানাসাহেবের বাহিনী ইংরেজদের বাধা দেয়। কিন্তু নানার বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। এর পর নানাসাহেবের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিকে ঝাঁসীর রানী ও তাঁতিয়া ঝাঁসীর নিকটবর্তী কোন স্থানে দাঁড়াতে না পেরে এক নূতন পরিকল্পনা স্থির করেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করে তাতে আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হন। গোয়ালিয়রের রাজা সিন্ধিয়া ছিলেন ইংরেজদের পক্ষে। রানী ও তোপীর মিলিত বাহিনীর নিকট সিন্ধিয়া পরাজিত হন। বিজয়ী বাহিনী গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করে।

ইংরেজরা এই সংবাদে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তারা এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হয়। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে রানী লক্ষ্মীবাঈ নিহত হন এবং দুর্গের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, তোপী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। পলায়নের পথে তোপীর বাহিনীর সাথে ইংরেজদের চারবার যুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি যুদ্ধে তোপীর বাহিনী পরাজিত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পর তোপীর এক অনুচর সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তোপীকে ইংরেজদের হস্তে ধরিয়ে দেয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ইংরেজরা তোপীকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। এই চরম সংকটের সময় বিদ্রোহের প্রধান পরামর্শদাতা আজিমুল্লা খাঁ ফল-বিক্রেতার ছদ্মবেশে লক্ষ্ণৌ দুর্গে ঘোরাফেরা করবার সময় একদিন ধরা পড়ে যান। ইংরেজরা তাঁকেও গুলি করে হত্যা করে।

কুমার সিংহের নেতৃত্বে পাটনা, আরা ও দানাপুরের বিদ্রোহীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা পাটনায় ইংরেজদের কোষাগার ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এবং পাটনার জেলখানা থেকে হাজার হাজার কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়। এর পর কুমার সিংহ একদল সৈন্য নিয়ে আরার দুর্গ অবরোধ করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা দুর্গ অধিকার করে ফেলে। এই দুর্গ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরা অঞ্চল বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়। কিন্তু কয়েক-দিনের মধ্যেই বহু কামান, বন্দুক ও একটি বিরাট সৈন্যদলসহ একজন ইংরেজ সেনাপতি আরায় এসে উপস্থিত হয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর কুমার সিংহের বাহিনী পরাজিত হয়।

এই পরাজয়ের পর কুমার সিংহ আবার বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগঠিত করে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল আজমগড়ের ইংরেজ-সৈন্যদলকে পরাজিত করেন। কিন্তু

ইতিমধ্যে আর একটি নূতন সৈন্যদল এসে পরাজিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর পর আর জয়ের আশা নেই দেখে কুমার সিংহ সসৈন্যে পশ্চাদপসরণ করেন। মান্নাহার নামক স্থানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কুমার সিংহের বাহিনী আবার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই সময় কুমার সিংহ ইংরেজদের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হন। এর পর তাঁর ভাই অমর সিংহ বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জগদীশপুর নামক স্থানে ইংরেজ সেনাপতি গ্রাণ্ডের সৈন্য-বাহিনী বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হয়। কুমার সিংহ আহত অবস্থাতেই সৈন্য পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি গুলির আঘাতে কুমার সিংহ নিহত হন। এই যুদ্ধের পর বিহারে বিদ্রোহী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর পর ধীরে ধীরে সিপাহী যুদ্ধের আগুন নিভে আসে।

এইভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত ভারতের একশত বৎসরের ইংরেজ-শাসনকে ওলট-পালট করে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মাত্র দুই বৎসরের অভ্যুত্থান স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেল, ভারতের ইংরেজ-শাসনের প্রকৃত রূপ। এই বিদ্রোহ যদি ধ্বংসোন্মুখ পুরাতন সামন্ত-রাজগণের নেতৃত্বে ও স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে প্রকৃত বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারতের অগণিত জনসাধারণের, অগণিত কৃষকের স্বার্থে পরিচালিত হত, তবে হয়ত বিদ্রোহের পরিণতি ভিন্নরূপ ধারণ করত। পূর্বের প্রত্যেকটি বিদ্রোহের তুলনায় এই অভ্যুত্থানের ব্যাপকতা সর্বাপেক্ষা অধিক হলেও এর স্থায়িত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। উপযুক্ত গণ-সমর্থন ও অংশগ্রহণের অভাবই এর প্রধান কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহী সিপাহিগণ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখে রেখে গেল এক নূতন পথের সন্ধান।

সপ্তম অধ্যায়

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১)

একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত আত্মপ্রকাশ করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ আবার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওয়াহাবী বিদ্রোহও তখন প্রায় শেষ হবার পথে। এই দুই বিরাট বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে বাংলার নীল-চাষীরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে। নীল দানবের হাত থেকে তাদের বাঁচার উপায় কি? দানবদের কবল থেকে কে তাদের বাঁচাবে? এক একটি নীলকর-সাহেব যেন এক একটি মূর্তিমান শয়তান, আর নীল কুঠিগুলি হল শয়তানের ঘাঁটি।

ইংরেজ-শাসনের পূর্বে ছিল নবাবের রাজত্ব, আর নীল-কুঠির মালিক ইংরেজ সাহেবরা তাদের চেয়েও বড় নবাব। ইংরেজদের 'ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র রাজত্বে নীলকর-সাহেবরা অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার পেয়ে গেছে। তারা শোষক, প্রকৃত শাসকও তারাই, আর তারাই বাংলার নীল-চাষীদের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলায় নীলের চাষ জেঁকে উঠতে আরম্ভ করে। তখনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল-কারখানায় নীল তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সেদিন বাংলার চাষীরাই তাদের জমিতে নীলের চাষ করে পৃথিবীর নীলের চাহিদা মিটাত। ধূর্ত ইংরেজ বণিকের দল তা বুঝে মুনাফার রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে বাংলার বুকে পালে পালে এসে জেঁকে বসল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যশোহর, নদীয়া, পাবনা, ঢাকা, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা নীল কুঠিতে ছেয়ে গেল। বাংলার জমিদারগোষ্ঠীও মুনাফা লোটবার এক নূতন পথের সন্ধান পেয়ে গেল। ইংরেজ আর বাঙালী জমিদার নীলকরের দল বাংলার চাষীর লাল রক্ত শুষে নীল করে ফেলল, আর সেই নীল থেকে তারা একচেটিয়া মুনাফার পাহাড় গড়তে লাগল।

নীলকর-সাহেবরা মোটা টাকা দিয়ে জমিদারদের কাছ থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমি লীজ নিয়ে তাতে নীলের চাষ আরম্ভ করল। তারা অগ্রিম দাদন দিয়ে চাষীদের ক্রীতদাসে পরিণত করল। নীলকর-সাহেবরা সেই ক্রীতদাসদের সঙ্গে 'চুক্তি' করত। তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে নীলকর-সাহেবদের হাতে চাষীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল দিতেই হত। নীলকর-সাহেবরা এই চুক্তিপত্রে চাষীদের স্বাক্ষর করতে বাধ্য করত। কেউ স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে, তার জন্য ব্যবস্থা ছিল লাঠি, গুলি ও জেল। চাষীরা এই চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ নীল না দিতে পারলে, তাদের ভাগ্যে জুটত অমানুষিক শাস্তি, জরিমানা এবং আজীবন দাসত্ব।

নীলকরদের হাতে থাকত পাইক-বরকন্দাজ, কয়েদখানা, নানা রকম শারীরিক

শাস্তির ব্যবস্থা, আর অবাধ্য চাষীদের গুলি করে হত্যা করবার জন্য অসংখ্য বন্দুক। এক কথায়, নীলকর-দস্যুরাই ছিল বাংলার শাসক এবং প্রকৃত মালিক।

এইভাবে বাংলার চাষীর ধরাশায়ী দেহের উপর চলল নীলকর-সাহেব ও জমিদার-দের পৈশাচিক তাণ্ডব, নীলকরদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে সোনার বাংলা ছারখার হতে লাগল। বাংলার মুমূর্ষু চাষীর মর্মভেদী হাহাকার গান হয়ে বের হল :

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

চিরবিদ্রোহী বাংলার চাষী এই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের ও সোনার বাংলাকে বাঁচাবার জন্য বিদ্রোহের পথ বেছে নিল। সমগ্র বাংলায় আবার এক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ বিদ্রোহী চাষী একদিন সমস্বরে আওয়াজ তুলল—বাংলার জমিতে নীলের চাষ আর চলবে না, কোন চাষী আর নীলের চাষ করবে না। গ্রামে গ্রামে চাষীরা জোট বাঁধল। তারা গ্রামে গ্রামে সভা করে প্রতিজ্ঞা করল, প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু তারা নীলকর-সাহেবদের কাছ থেকে নীলচাষের জন্য অগ্রিম টাকা দাদন নিয়ে নিজেদের বিক্রয় করবে না। তারা আর নীলের চাষ করবে না।

প্রথমে এগিয়ে এল নদীয়া জেলার চাষীরা। চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নদীয়ার চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুচরণ ছিলেন একজন সাধারণ কিন্তু তেজী চাষী আর দিগম্বর ছিলেন গ্রামের এক মহাজন। তাঁরা উভয়েই প্রথমে নীল-কুঠিতে চাকরি করতেন। কিন্তু নীলকর-সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাঁরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিদ্রোহী নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এই দুই নেতার জ্বালাময়ী প্রচারে নীল-চাষীরা ক্ষেপে উঠল। বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। গ্রামে গ্রামে সভা হল। সেই সকল সভায় চাষীরা প্রতিজ্ঞা নিল—যেভাবে হোক, নীলকর-সাহেবদের অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু নীলকর-সাহেবদের পক্ষে রয়েছে দেশের সরকার। নীলকর-সাহেবদের হুকুমেই বাংলাদেশের সরকার চালিত হয়। তাছাড়া তাদের হাতে আছে বহু বন্দুকধারী বরকন্দাজ। নীলকর-সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাদের অত্যাচার চরমে উঠবে। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে চাষীদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লাঠি ধরতে হবে, সম্ভব হলে বন্দুকও যোগাড় করা দরকার।

এইবার গ্রামে গ্রামে শুরু হল কৃষকদের লাঠিখেলা-শিক্ষা। তখন সমগ্র বাংলায় বরিশালের লাঠিয়ালদের জুড়ী ছিল না, বরিশালের লাঠিয়ালদের যমেও ভয় করত। নদীয়ার চাষীরা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল নিয়ে এল। গ্রামে গ্রামে লাঠিখেলার আখড়া বসল, সেই সকল আখড়ায় হাজার হাজার লাঠিয়াল তৈরী হতে লাগল।

নদীয়ার চাষীদের বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ পেতে নীলকর-সাহেবদের বিলম্ব হল না। নীলকর-সাহেবরা স্থির করল, চাষীদের আয়োজন পূর্ণ হবার আগেই চাষীদের উপর আক্রমণ করতে হবে, চাষীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে

দিয়ে তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করতে হবে। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বরের গ্রাম চৌগাছা হল নীল-চাষীদের বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি। নীলকর-সাহেবরা তাদের প্রথম আক্রমণের জন্য এই গ্রামটিকেই বেঁছে নিল। প্রায় এক হাজার বরকন্দাজ নিয়ে তারা চৌগাছা গ্রামের উপর আক্রমণ করল। গ্রামের চাষীরা তখনও তৈরী হয়নি। তারা বীরের মত যুদ্ধ করে পরাজিত হল। নীলকরদের বরকন্দাজেরা গ্রামে ঢুকে চাষীদের ঘরে আগুন লাগাল এবং স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করল। এই আক্রমণে দশজন চাষী প্রাণ হারাল।

এই সংবাদ দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, নদীয়া জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পরে অন্যান্য জেলায় পৌছাল। এই অত্যাচারের সংবাদে কেবল নদীয়ার চাষীরাই নয়, সারা বাংলার চাষীরা জ্বলে উঠল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে নদীয়ার চাষীদের সঙ্গে যশোহর, খুলনা, পাবনা, রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার চাষীরাও নীলকর-সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সমগ্র বাংলাদেশ যেন এক বারুদের স্তূপে পরিণত হল। চাষীদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ লাঠিয়াল নীলকর-সাহেবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

নীলকর-সাহেবদের বরকন্দাজেরা যাতে গ্রামে ঢুকে চাষীদের ঘরে আগুন লাগাতে বা চাষীদের হত্যা ও তাদের বাড়ী লুট করতে না পারে, সেইজন্য নীল-চাষীরা এক অপূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলল। প্রত্যেক গ্রামের সর্বাপেক্ষা উঁচু গাছের উপর বড় বড় ঘণ্টা বাঁধা হল। নীলকর-সাহেবদের বরকন্দাজেরা গ্রাম আক্রমণ করতে এলেই, সেই ঘণ্টা বাজিয়ে আশপাশের গ্রামবাসীদের সতর্ক করে সাহায্যের জন্য আহ্বান করবার ব্যবস্থা হল। তাছাড়া, আরও ব্যবস্থা হল যে, নীলকরদের কোন বরকন্দাজ কোন গ্রামের উপর আক্রমণ করতে এলেই, শঙ্খধ্বনি করে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হবে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের লাঠিয়ালরা দৌড়ে এসে আক্রান্ত গ্রামবাসীদের সাহায্য করবে। কেবল নদীয়া জেলাতেই নয়, সারা বাংলাদেশের প্রতি গ্রামে এই অদ্ভুত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে উঠল।

এর পরেও নীলকরদের বরকন্দাজেরা বিভিন্ন জেলায় বহু গ্রামের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণ শুরু হবার পূর্বেই বরকন্দাজদের দূর থেকে দেখে ঘণ্টাধ্বনি করা হত, সারা গ্রামে শত শত ঘণ্টা বেজে উঠত। এইভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের জানিয়ে দেওয়া হত যে, শত্রুরা এসে পড়েছে। সেই শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শুনেই পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত লাঠিয়াল দৌড়ে আসত। চাষী-লাঠিয়ালদের লাঠির ঘায়ে বরকন্দাজরা পালাবার পথ পেত না। বিদেশী নীলকর শয়তানরা বুঝে নিল যে, এবার বাংলার চাষী জেগে উঠেছে, তাদের অত্যাচার ও শোষণের দিন ফুরিয়েছে। তারা আরও বুঝল যে, বাংলায় নীলের চাষ আর চলবে না। চাষীদের বিদ্রোহের ফলে নীলের চাষ বন্ধ হয়ে গেল।

নীল-চাষীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ চারদিকে ফেটে পড়তে দেখে বাংলার শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণীর ভিতর থেকে একদল লোক বেরিয়ে এসে নীল-চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে ও তাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তাদের সহযোগিতা

ও চেষ্টা চাষীদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। অবশ্য এদের মধ্যে অনেকেই চেয়েছিলেন যে, নীল-চাষীরা যেন বাংলা ও ভারতের চাষীদের চিরাচরিত পথ, অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ গ্রহণ না করে। তখন ছিল ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ, সবেমাত্র ভারতজোড়া সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভে গিয়েছে। ইংরেজ-রাজ শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে হত্যা, লুট ও ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। তা দেখে বাংলার এই শিক্ষিত মধ্য-সম্প্রদায় ভীত ও সন্ত্রস্ত। তারা এ ভেবে আরও ভীত হয়ে উঠেছিল যে, হয়ত নীল-চাষীদের এই বিদ্রোহ বাংলার বুকেও ইংরেজ-রাজের পৈশাচিক অত্যাচার ও ধ্বংস ডেকে আনবে। তাদের এই ভয়ের প্রধান কারণ এই যে, তারা তখন ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের বদলে সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং তাঁরা নীল-চাষীদের এই আন্দোলনকে শুধু আবেদন-নিবেদনের নিয়ম-তান্ত্রিকতার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু যারা সেদিন নীল-চাষীদের বিদ্রোহের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের কয়েকজন নীল-চাষীদের এই বিদ্রোহ সফল করে বাংলা থেকে নীলকর-সাহেবদের বিতাড়িত করবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র বসু ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষের নাম সর্বাগ্রগণ্য। হরিশ্চন্দ্র নীল-চাষীদের আন্দোলন ও মামলার খরচ চালাবার জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ব্যয় করে, শেষে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় যক্ষারোগে মৃত্যু বরণ করেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সমর্থনের ফলে নীল-চাষীদের আন্দোলন যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এই সব শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, বাংলার চাষীরা তাদের বিদ্রোহী ঐতিহ্য ভুলে যায়নি। সারা বাংলাব্যাপী দীর্ঘকাল ধরে নীলকর-সাহেবদের সঙ্গে খণ্ড-যুদ্ধ চলতে লাগল। নীল-চাষীদের লাঠি ও বল্লমের ঘায়ে নীলকর-সাহেবরা কুঠি ছেড়ে পালিয়ে গেল। বিদ্রোহী চাষীরা অত্যাচারের কেন্দ্র নীলকুঠিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ও লাঠির ঘায়ে ধূলিসাৎ করে দিল।

বাংলাব্যাপী এই বিরাট জাগরণ দেখে ভারতের ইংরেজ-শাসকদের হৃদকম্প উপস্থিত হল। তখন ভারতের বড়লাট ছিল লর্ড ক্যানিং। সে সিপাহী বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর স্মৃতি তখনও বিস্মৃত হয়নি। তারা অতিকষ্টে সিপাহী বিদ্রোহের কবল থেকে ভারতের ইংরেজ-শাসনকে বাঁচাতে পেরেছে। কাজেই বাংলাদেশের নীল-চাষীদের বিদ্রোহের সংবাদ শুনে সে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে সে বলেছিল : 'বর্তমান নীল-চাষীদের বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় এক সপ্তাহকাল আমার এতই উৎকণ্ঠা হয়েছিল যে, দিল্লীর ব্যাপার (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ)-এর সময়েও আমার ততখানি উৎকণ্ঠা হয়নি। আমি সকল সময়ে ভেবেছি যে, কোন নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা ক্রোধে একটি গুলিও ছোঁড়ে, তা হলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণ-বাংলার সবগুলি কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।'

ইংরেজ-রাজ সবেমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের সাংঘাতিক আঘাত থেকে সামলে উঠেছে। কাজেই বিদ্রোহের নাম শুনলেই তারা আঁতকে ওঠে, তাদের হৃদকম্প

শুরু হয়। তাই এখনই আবার একটা বিদ্রোহ শুরু হলে সেই বিদ্রোহের আঘাত থেকে তাদের রাজত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কাজেই ইংরেজ-শাসকেরা চণ্ডনীতির বদলে নীল-চাষীদের শান্ত করবার পথ গ্রহণ করল। অবিলম্বে বিদ্রোহের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে একটা তদন্ত কমিশন বসান হল।

এই কমিশনের তদন্তের মধ্য দিয়ে নীলকর-সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বহু অবিশ্বাস্য কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কমিশন বসিয়েও বিশেষ কোন ফল হল না। বিভিন্ন জেলায় নীলকর-সাহেবদের অত্যাচার সমানেই চলতে লাগল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলল চাষীদের লড়াই। ইংরেজরা তখন শেষ উপায় হিসাবে বিদ্রোহ দমনের জন্য সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করতে আরম্ভ করে। যশোহর ও নদীয়া জেলাতেই নীল বিদ্রোহ সবচেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। বিদ্রোহী চাষী-লাঠিয়ালদের আক্রমণে এই দুই জেলার প্রায় সকল নীলকুঠি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা এই দুই জেলায় দুই দল পদাতিক সৈন্য ও দুইটি রণতরী নিয়ে আসে। কিন্তু তাতেও চাষীদের দিয়ে নীলের চাষ করান সম্ভব হয়নি।

নীল বিদ্রোহ খুলনা জেলাতেও ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। জেলার সবচেয়ে বড় দুই জমিদার ও নীলকর রেনী সাহেব ও মরেল সাহেবের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে খুলনার চাষীরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। লাঠিয়াল-সর্দার কাদের মোল্লার নেতৃত্বে এক বিরাট চাষী-লাঠিয়াল দল নীলকর জমিদার সাহেবদের বিরুদ্ধে শেষ বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। খুলনা জেলার শ্রীরামপুর, বিরাট, পানিহাটি, তিলক, বাহিরদিয়া প্রভৃতি গ্রামে নীলকর-সাহেবদের বরকন্দাজদের সঙ্গে চাষী-লাঠিয়ালদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধেছিল। প্রত্যেকটি সংঘর্ষে লাঠিয়ালরা জয়লাভ করে। মোল্লাহাটির বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। এই বিদ্রোহের কাহিনী নিয়েই স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত **নীলদর্পণ** নাটক রচনা করেছিলেন।

নীলকর-সাহেবরা বিদ্রোহীদের দমন করতে না পেরে, এবার অন্য উপায় অবলম্বন করল। তারা এক একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ এক একজন বিদ্রোহী নায়কের বাড়ী ঘেরাও করে, নায়ক ও তাঁর পরিবারের সকলকে হত্যা করতে লাগল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একদিন রাত্রিকালে নীলকর-জমিদার মরেল সাহেবের ম্যানেজার হেলী সাহেব বহু বরকন্দাজ নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নায়ক রহিমউল্লার বাড়ী ঘেরাও করে রহিম ও তাঁর পরিবারের সকলকে হত্যা করল।

সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের আক্রমণে সকল নীলকুঠি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মরেল সাহেবের জমিদারীও অচল হয়ে পড়ল। এই অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন রহিমউল্লা। রহিমউল্লার নামে তখন নীলকর ও জমিদার-সাহেবদের হৃদকম্প শুরু হত।

নীলকর-জমিদার মরেল সাহেবের ম্যানেজার হেলী আড়াই শত পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে একদিন মধ্য-রাত্রে রহিমউল্লার বাড়ী ঘেরাও করল। রহিমের বাড়ীর চার-পাশে কাটা হয়েছিল চওড়া গভীর গড়খাই। হেলীর পাইক-বরকন্দাজরা গড়খাই পার হবার পূর্বেই ঘরের মধ্য থেকে রহিম গুলি চালালেন। গুলি লেগে কয়েকজন

বরকন্দাজ প্রাণ দিল। তারপর সারা রাত্রি ধরে চলল উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণ। রহিমউল্লা ও তাঁর বাড়ীর লোকজন এক দিকে, আর অপর পক্ষে আড়াই শত শিক্ষিত বরকন্দাজ। রহিম ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ঘরের চারদিকে ও সদর পথে ভিজা কাঁথা টাঙ্গিয়ে শত্রুপক্ষের গুলিরোধের ব্যবস্থা করলেন। সারা রাত্রি যুদ্ধের পর ভোরের দিকে রহিমউল্লার গুলি ফুরিয়ে গেল। ঘরের মেয়েরা তাদের গা থেকে রুপার কাঁকন খুলে দিল। সেই রুপার কাঁকন দিয়ে তৈরী হল বন্দুকের গুলি। তা দিয়ে আবার যুদ্ধ চলল। কিছুক্ষণ পরে তাও ফুরিয়ে গেল। এবার রহিমউল্লা ঢাল আর রামদাও নিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বরকন্দাজরা রহিমউল্লার দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারা ভয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু হেলীর রিভলবারের গুলি লেগে রহিম নিহত হলেন। এই যুদ্ধে হেলী সাহেবের একত্রিশ জন বরকন্দাজ নিহত ও তেতাল্লিশ জন আহত হয়।*

এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় বিদ্রোহ চলতে লাগল। বিদ্রোহের ফলে সারা বাংলায় নীলের চাষ বন্ধ হয়ে গেল এবং নীলকর-সাহেবরা এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটাবার আয়োজন করতে লাগল। বিদ্রোহী চাষীরা তাদের শক্তিতেই বাংলায় নীলের চাষ সম্পূর্ণ অচল করে দিল। অন্যদিকে নীল-কমিশনের কাজও চলছিল। কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে চাষীরা দৃঢ়তার সঙ্গে একবাক্যে ঘোষণা করল, তারা কিছুতেই আর নীলের চাষ করবে না।

এমন সময় একদিন পদ্মার শাখা গড়ুই নদী দিয়ে স্টিমারে চলেছে বাংলার ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব। গোপনতা সত্ত্বেও লাট সাহেবের এই ভ্রমণের কথা চাষীরা জেনে গেল। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়। বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার প্রজা গড়ুই নদীর দুই তীরে সারি দিয়ে দাঁড়াল। তারা আজ বোঝাপড়া করবে বাংলাদেশে ইংরেজ-রাজের প্রধান কর্তা ছোটলাট সাহেবের সঙ্গে। লাট-সাহেবের স্টিমার এগিয়ে চলেছে বিশাল গড়ুই নদীর মাঝখান দিয়ে। নদীর দুই পাড় থেকে হাজার হাজার চাষী দাবি তুলল, নদীর তীরে লাটসাহেবের স্টিমার ভিড়াতে হবে। সমবেত হাজার হাজার চাষীর ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। লাটসাহেবের হৃদকম্প উপস্থিত হল। স্টিমার তীরে ভিড়ল না, দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। শত শত ক্রুদ্ধ চাষী গড়ুই-এর খরস্রোত উপেক্ষা করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাটসাহেবের স্টিমার তীরে ভিড়াতে হবে, চাষীদের দাবি তাকে শুনতেই হবে। ক্রুদ্ধ চাষীরা যেন লাটসাহেবের স্টিমারখানা ডাঙ্গায় টেনে তোলবার জন্যই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চাষীরা লাটসাহেবকে অভয় দিল তার জীবনের কোন ভয় নেই। লাটসাহেব নিরুপায় হয়ে স্টিমার ভিড়াল। সে চাষী নেতাদের নিকট থেকে নীলচাষ বন্ধের দাবি শুনল, লাটসাহেবকে বাধ্য হয়ে সেখানেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হল, নীলচাষ বন্ধের ব্যবস্থা করা হবে।

ইংরেজ-শাসকগণ চাষীদের দাবি মানল বটে, কিন্তু সহজভাবে নয়, একটু ঘুরিয়ে।

* সতীশ মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস।

নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর, আইন করা হল, কোন নীলকরই আর জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলের চাষ করাতে পারবে না, নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হল।

এর কিছুদিন পরেই রাসায়নিক উপায়ে নীল তৈরি করবার প্রণালী উদ্ভাবিত হবার ফলে নীলের চাষ আর বিশেষ লাভজনক হল না। নীলের চাষে খরচ হত বেশী, ভাল লাভ ছিল না, তাই ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নীলের চাষ প্রায় সকল জায়গা থেকেই উঠে গেল। কিন্তু দুই-একজন নীলকর-সাহেব তখনও নীলের চাষ চালাচ্ছিল।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যশোহর জেলার বিজলীয়া কুঠিটি টিকেছিল। এই কুঠির অধীনে আটচল্লিশটি গ্রামের চাষীরা নীলের চাষ করত। এই নীলকুঠির ম্যানেজার ছিল ডোম্বল সাহেব। তার অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন এই আটচল্লিশখানা গ্রামের চাষীরা বিদ্রোহ করল। সাহেব ও তার লোকজন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল, অবশেষে এই কুঠিও উঠে গেল।

এইভাবে বাংলার বীর চাষীরা তাদের নিজ শক্তি ও সংগঠনের জোরে নীলচাষ নামক ইংরেজ-রাজের এক ভয়ঙ্কর দস্যুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই দস্যুতার অবসান ঘটিয়েছিল। সম্ভবত নীল-বিদ্রোহই ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রথম সফল বিদ্রোহ। আজও বাংলার চাষী, বাংলার গরীব জনগণ এই নীল-বিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে আসছে, তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই স্মৃতি এতদিন জলন্ত প্রেরণা যুগিয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-১৯২১)

সমগ্র ভারতের উপর ইংরেজ-রাজশক্তি শক্ত হয়ে বসেছে। ইংরেজ-রাজ ভারতের উপর শোষণের এক বিরাট জাল বিছিয়েছে। সেই জাল দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছে ভারতের বিপুল ধন-সম্পদ। সেই জালের খুঁটিগুলোও এক একটা শোষণের কেন্দ্র। রাজা, মহারাজ, জমিদার, কুসীদজীবী মহাজন—এরাই হল ইংরেজের ভারত-শোষণের খুঁটি। এই সব খুঁটি ভিত্তি করেই ভারতের বুকে চেপে বসেছে বিদেশী ইংরেজ-রাজ।

সমগ্র উনিশ শতাব্দী কাল ধরে ইংরেজরা তাদের এই শোষণের জাল ভারতের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এই জাল ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র পুরাতন আর্থিক-ব্যবস্থা ও জীবন-যাত্রা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। তার ফলেই দেখা দিয়েছে, গণ-বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউ এবং সেই ঢেউ-এর আঘাতে ভারতের ইংরেজ-শাসন বার বার কেঁপে উঠেছে।

মালাবারের মুসলমান মোপলা সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক বিদ্রোহ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতের গণ-বিদ্রোহেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাদ্রাজের সমুদ্রতটস্থ অধিবাসী এই মোপলা সম্প্রদায়ের উপর ইংরেজ-রাজের আক্রমণ শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তখন থেকেই মোপলা সম্প্রদায় ইংরেজ-রাজের আর্থিক শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ইংরেজ-রাজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল থেকে মোপলাদের আত্মরক্ষার কঠিন সংগ্রাম। সেই ধারাবাহিক সংগ্রাম তখন থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলেছিল। মোপলা সম্প্রদায়ের এই সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে গৌরব-মণ্ডিত করেছে, এই সংগ্রামে অফুরন্ত প্রেরণা দান করেছে।

বর্তমান মোপলাদের পূর্ব-পুরুষরা একদিন যুগ-যুগান্তের দুঃখ-দারিদ্র্যের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুসন্ধান করতে করতে আরব দেশ থেকে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্র-উপকূলস্থ মালাবার অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। অতঃপর তারা সেই অঞ্চলেই স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ প্রভৃতি সূত্রে মিশে যায়। তারা হয়ে গেল পুরোপুরি ভারতবাসী। ভারতবর্ষকেই তারা নিজেদের দেশ বলে গ্রহণ করে। তাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় হল চাষবাস। তারা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে চাষের কাজ শুরু করে। প্রথম থেকেই জমিদাররা নেয় ফসলের অর্ধভাগ, কিন্তু জমিচাষের সকল খরচই বহন করতে হয় মোপলা-চাষীকে। জমি থেকে যখন খুসী উৎখাত করবার অধিকারও জমিদারদের হাতে থাকে। এতে মোপলা-চাষীর দুঃখ-দুর্দশা দূর হবার কথা নয়, হলও না; বরং,

তাদের দুঃখ-দুর্দশা শতগুণ বেড়ে গেল। মোপলা চাষীদের টাকা ঋণ দেবার ব্যবস্থা হল। জমিদার তো আছেই, এবার তাদের সঙ্গে এসে জুটল মহাজনের দল। জমিদার আর মহাজন—ইংরেজের দুই অবিচ্ছেদ্য সহচর। তারা ইংরেজ-রাজের শোষণের জাল শক্ত খুঁটিতে বেঁধে দিল। সুদূর আরব থেকে এসে হতভাগ্য মোপলা চাষীরা তিন-তিনটা পর্বত প্রমাণ শোষণের বোঝার চাপে পিষে যেতে লাগল। মোপলা চাষীরা সংখ্যায় মাত্র দশ লক্ষ, আর তাদের শোষক হল তিন-তিনটা মহাশক্তিশালী রাক্ষস।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মোপলাদের মত এত দরিদ্র আর নেই। তারা মুসলিমধর্মী নয়, অভাবনীয় দারিদ্রই মোপলা সম্প্রদায়কে দক্ষিণ ভারতের একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করেছে। মোপলাদের দারিদ্রের কোন তুলনা নেই। চিরদারিদ্রই তাদের করে তুলেছে দুর্দান্ত, অসম সাহসী ও ভয়ংকর। ইংরেজ-শাসক, জমিদার ও মহাজন—এই ত্রিশক্তির মিলিত শোষণই তাদের করে তুলেছে মৃত্যু-ভয়হীন, দুর্ধর্ষ।

কিন্তু এই ভয়ংকর শোষণ দীর্ঘকাল নির্বিবাদে চলতে পারে না। শোষণ ও উৎপীড়নের চাপে পিষ্ট হয়ে মোপলারাও তাদের শোষক ও উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ইংরেজ-রাজের পুলিস, মিলিটারী। মোপলাদের জাগরণে বাধা দিতে পুলিস-মিলিটারীতে ভরে গেল তাদের বাসভূমি মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক। ইংরেজের পুলিস-মিলিটারীর সঙ্গে যোগ দিল জমিদার-মহাজনদের পাইক-বরকন্দাজ। দলে দলে মোপলাদের গ্রেপ্তার করা হল, তাদের জীর্ণ কুটির ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হল।

এ হল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যুগান্তকারী সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেলেও তার রণ-ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি। সেই রণ-ধ্বনি নূতন নূতন গণ-বিদ্রোহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। তখন জমির উপর প্রজা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 'সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ' নামে পাবনা ও বগুড়া জেলার কৃষকের সংগ্রাম উত্তরবঙ্গের ইংরেজ-শাসন অচল করে দিয়ে বাংলার শাসকদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছে। নূতন অঞ্চলের নূতন কৃষক জনগণ বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে বিদেশী শাসকদের উপর প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত দিচ্ছে, আর ইংরেজ-রাজ তার সকল শক্তি দিয়ে উন্মত্তের মত সেই সকল বিদ্রোহ দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। দেশব্যাপী এই গণ-বিক্ষোভের মধ্যে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে মোপলা-চাষীরা রুখে দাঁড়াল। ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক জুড়ে দশ লক্ষ মোপলা-চাষী সামান্য কয়েকটি তরবারী, লাঠি আর বল্লমের জোরে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। পুলিস-মিলিটারীর বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে মোপলা বিদ্রোহীরা নিকটবর্তী পাহাড়ে পালিয়ে গেল। সেই পাহাড়ে ঘাঁটি করে তারা গেরিলা যুদ্ধ চালাতে লাগল। পাহাড়ের গোপন পথ দিয়ে মোপলা বিদ্রোহীরা হঠাৎ বের হয়ে পুলিস-মিলিটারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের হত্যা করে আবার উধাও হয়ে যায়। এইভাবে যুদ্ধ চলল এক বছর। এই এক বছরে শত শত মোপলা বিদ্রোহী প্রাণ দিল, পুলিস-মিলিটারীরাও প্রচণ্ড মার খেল।

কিন্তু অবশেষে অগণিত পুলিস-সৈন্য-কামান-বন্দুকের কাছে প্রায় নিরস্ত্র মোপলারা পরাজিত হল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোপলাদের উপর দিয়ে ইংরেজ-জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের বন্যা বইতে লাগল। মোপলাদের ভয় দেখাবার জন্য শাসকগণ সেই অঞ্চলে স্থায়িভাবে একটি সৈন্যদল বসাল, আর সেই সৈন্যদলের যাবতীয় ব্যয়ভার মোপলাদেরই বহন করতে হত। এইভাবে শেষ হল প্রথম মোপলা বিদ্রোহ। বিদ্রোহী মোপলারা ভবিষ্যতে আর একটা সুযোগের অপেক্ষায় সকল অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। তখন সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে এক বিস্ফোরণ আসন্ন। ইংরেজ, জমিদার ও মহাজনদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা দক্ষিণ ভারতের চাষী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদিকে মোপলা-চাষীদের উপর সৈন্যদের অত্যাচারও চরম সীমায় উঠেছে। মোপলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা মরিয়া হয়ে স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও সৈন্যদের উপর আক্রমণ শুরু করল। এবার মোপলারা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংগঠিত, পূর্বাপেক্ষা তাদের শক্তি অনেক বেশী। দ্বিতীয় মোপলা বিদ্রোহ চলল প্রায় দেড় বছর। এবার এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য হাজার হাজার সৈন্য এল, বহু কামান আর কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজও আনা হল। ইংরেজ-বাহিনী আর তাদের যুদ্ধ-জাহাজের নিষ্ঠুর আক্রমণে দ্বিতীয় মোপলা বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পরেই শুরু হল অত্যাচারের পালা। প্রায় দেড় হাজার মোপলা বিদ্রোহী সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ দিল। কয়েকজন নেতাকে পাঠান হল দ্বীপান্তরে। মোপলা অঞ্চলে স্থায়িভাবে সশস্ত্র পুলিস দল বসান হল এবং পিটুনী-কর আদায়ের নাম করে দরিদ্র মোপলাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হল। বিদ্রোহী মোপলা চাষী আর একটি সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। 'দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ' নামে বিখ্যাত কৃষক-অভ্যুত্থান অর্ধেক জয় অর্ধেক পরাজয়ের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজের কৃষকগণ এই বিদ্রোহের মাধ্যমে জমিদার-মহাজনদের অবাধ শোষণে বাধা দিয়ে আংশিক সফলতা লাভ করেছে। এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার ভারতে সর্বপ্রথম 'মহাজনী আইন' পাস করতে বাধ্য হয়েছে। এই বিদ্রোহের সংবাদ শুনে মোপলারা আবার আশায় বুক বাঁধল, তাদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য জেগে উঠল। কিন্তু জমিদার-মহাজনগণ এবং ঐ অঞ্চলের সশস্ত্র পুলিস-দল তাদের উপর শ্যেনদৃষ্টি পেতে বসে আছে। মোপলাদের সামান্য একটু চাঞ্চল্য দেখামাত্র তারা আঘাত করল। বহু মোপলা-চাষী গ্রেপ্তার হল। সশস্ত্র পুলিসদল ও বরকন্দাজের দল দিবা-রাত্র টহল ও উস্কানি দিয়ে মোপলাদের ক্রোধের আগুনে ইন্ধন যোগাল। এই ভাবে শুরু হয়ে গেল তৃতীয় মোপলা বিদ্রোহ। কিন্তু মাত্র কয়েকটা সংঘর্ষের পরেই এই বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বিদ্রোহের আয়োজন ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু এবারেও মোপলাদের মূল্য দিতে হল প্রচুর। প্রথমত, সশস্ত্র পুলিস ব্যতীত আরও সৈন্যদল এনে স্থায়িভাবে বসান হল। তাদের খরচ মোপলাদেরই বহন করতে হল। দ্বিতীয়ত,

তিনমাস পর্যন্ত দুইখানা যুদ্ধ-জাহাজ মালাবারের উপকূলে টহল দিয়ে মাঝে মাঝে মোপলাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে লাগল। এসব সহ্য করে মোপলারা আবার নূতন এক সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকল।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে চলল। তখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় মোপলা বিদ্রোহের মাত্র দুই বছর পরের কথা। মোপলাদের অঞ্চল থেকে যুদ্ধ-জাহাজ চলে গেলেও যায়নি পুলিস, যায়নি মিলিটারী। তাদের অত্যাচার চলেছে অবাধে। তার সঙ্গে সঙ্গে চরমে উঠল জমিদার-মহাজনের শোষণ ও অত্যাচার। জমিদারগণ ঋণের সুদ মোপলা-চাষীদের কাছ থেকে আদায় করতে লাগল, মহাজনের ঋণের সুদও খুব বেড়ে গেল। জমিদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণের দায়ে শত শত মোপলা-চাষী জমি হারাল। তাদের লাঙ্গল ও চাষের বলদ কেড়ে নেওয়া হল। জমিদার খাজনার দায়ে তাদের পাইক-বরকন্দাজদের দিয়ে চাষীদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলল, ঘটি-বাটি কেড়ে নিল। এই বীভৎস অত্যাচার মোপলাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। চিরবিদ্রোহী মোপলা-চাষী আবার গর্জে উঠল। চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহ আরম্ভ হল।

সর্বস্ব পণ করে বিদ্রোহীরা শত্রুর উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করল। পূর্বের মত এবারও তারা পালিয়ে গেল নিকটবর্তী এক পাহাড়ে—পাহাড়েই তাদের বিদ্রোহের ঘাঁটি। এই ঘাঁটি থেকে চলল তাদের গেরিলা যুদ্ধ। বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অতর্কিত আক্রমণে পুলিস-মিলিটারীর ঘাঁটি জ্বালিয়ে ও ভেঙ্গে-চুরে দিতে লাগল। বিদ্রোহীদের আক্রমণে জমিদার-মহাজনের শস্য-ভাণ্ডার, ঘর-বাড়ী ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বহু জমিদার, মহাজন প্রাণ দিল। এইবার বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করল। দক্ষিণ ভারতের ইংরেজ-শাসন কেঁপে উঠল। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বিরাট আয়োজন করল। হাজার হাজার সৈন্যে মালাবার ছেয়ে গেল। দশ লক্ষ সহায়-সম্বলহীন ও প্রায় নিরস্ত্র মোপলা-চাষীর আঘাতে ভারতের ইংরেজ-শাসকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

এক বৎসর ধরে চলল এই বিদ্রোহ। তারপর ইংরেজ-রাজের পশু-শক্তির আঘাতে বিদ্রোহীরা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অবশেষে চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। কিন্তু এবারের বিদ্রোহে কিছুটা সুফল ফলল। এবারের মোপলা বিদ্রোহের চেহারা দেখে ইংরেজ-শাসকেরা সত্যই ভয় পেয়ে গেল। সরকার জমিদারদের বাড়তি খাজনা ও মহাজনদের বাড়তি সুদ আদায় বন্ধ করে দিল। খাজনা এবং সুদের হার কিছুটা নির্দিষ্ট করে দেবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু এই সব ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে চাষীরা পেল না কিছুই। জমিদার ও মহাজনেরা আরও বহু উপায়ে তাদের শোষণ অব্যাহত রাখল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী যুগান্তকারী ঘটনাবলীর আলোড়নে নূতন সংগ্রামে মেতে উঠল বিদ্রোহী ভারত। সেদিন ভারতের ইংরেজ শাসনের ধ্বংসের জন্য দেশব্যাপী এক নূতন বিদ্রোহের রণধ্বনিতে সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপছিল। জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সেদিন ইংরেজ-শাসনের

উপর শেষ আঘাত হানবার জন্য সারা ভারতের বিদ্রোহী মানুষ উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সেদিনকার আন্দোলন অহিংসই হোক আর সহিংসই হোক, সেই আন্দোলনে ছিল ভারতের ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা দেশব্যাপী বিদ্রোহের আহ্বান। সারা ভারতের কোটি কোটি কৃষক সেদিন এই আন্দোলনের মধ্যে খুঁজে পেল তার চিরাচরিত বিদ্রোহের ধারা। তাই ভারতের কৃষক সেদিন সর্বস্ব পণ করে বিদেশী ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সেই বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেদিন এই আন্দোলনের সঙ্গে আর এক বিদ্রোহের ঢেউ এসে মিলেছিল। সেই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'খিলাফৎ আন্দোলন' নামে পরিচিত। অন্তত ভারতের মুসলমান জনসাধারণ—মুসলমান কৃষক সেই আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান হিসাবে। আর অত্যাচার ও শোষণের ভারে অবনত কোটি কোটি মুসলমান কৃষকের নিকট তাদের স্বাধীনতার অর্থ ছিল বিদেশী শাসকের গোলামী, জমিদার-মহাজনের শোষণ ও অত্যাচারের অবসান।

এই বিরাট আহ্বানে ভারতের কৃষক তার সমগ্র শক্তি নিয়ে সাড়া দিল। সেদিন খিলাফৎ আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলমান কৃষক এগিয়ে এল তাদের নিজস্ব খিলাফৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কারণ এই খিলাফৎ রাজ্যে জমিদার-মহাজনের শোষণ ও অত্যাচার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মুসলমান মোপলা-চাষীরাও তাদের অঞ্চলে স্বাধীন ও শোষণ-মুক্ত খিলাফৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হল। এই সময়ে মোপলা অঞ্চলে আবার জমিদার-মহাজনের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। এই অঞ্চলের জমিদার-মহাজন সকলেই হিন্দু। তাই মোপলা-চাষীরা অবিলম্বে 'খিলাফৎ রাজ্য' প্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। এই চাঞ্চল্য দেখা দেবামাত্র সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারী এবং জমিদার-মহাজনের দল বিদ্রোহকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য প্রথম আক্রমণ আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম মোপলা বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিলেন মোপলাদের প্রিয়তম নেতা আলী মুজালিয়র।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম দিকেই পুলিস-মিলিটারী ও জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার চরমে উঠল। তারা এমন কি মোপলাদের মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের মধ্যেই মোপলাদের অপমান করত। ধর্মের উপর এই আঘাত মোপলা বিদ্রোহে নূতন ইন্ধন যোগাল। মালাবারের সকল জমিদার ও মহাজন হিন্দু বলে মোপলারা সকল হিন্দুকেই শত্রু বলে গণ্য করল। ধর্মের উপর এই আঘাতের ফলে হিন্দুদের প্রতি মোপলাদের বিরূপ মনোভাব তীব্র হয়ে উঠল। তারা ধরে নিল যে, হিন্দুমাত্রেই অত্যাচারী ও শোষক। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, ১৮ই আগস্ট ইংরেজ-সরকার মোপলা অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করল। ২০শে আগস্ট কালিকট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে তিরুরাঙ্গাদি গ্রামের কয়েকজন বিদ্রোহী-নেতাকে গ্রেপ্তার করতে এল। প্রায় দুইশত মোপলা-চাষী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বাধা দিল। সশস্ত্র পুলিসদল তাদের নিকট পরাজিত হয়ে

পালিয়ে গেল। সারা মোপলা অঞ্চলে পুলিস-মিলিটারী ও জমিদার-মহাজনদের উপর আক্রমণ শুরু হল।

মোপলা বিদ্রোহীরা রাস্তাঘাটের যোগাযোগ নষ্ট করে দিল, টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলল, রেল লাইন তুলে ফেলল এবং রেল স্টেশনগুলি ধ্বংস করে দিল। দশ লক্ষ বিদ্রোহী মোপলার আক্রমণে সমগ্র মোপলা-অঞ্চলে ইংরেজ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সমগ্র অঞ্চলে উড়তে লাগল বিদ্রোহী মোপলাদের স্বাধীনতার পতাকা। বিদ্রোহীদের আক্রমণে শয়তানের ঘাঁটিস্বরূপ থানাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গেল, বহু ইংরেজ জমিদার-মহাজন নিহত হল, পুলিস ও সৈন্যদল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

মোপলারা তাদের বাসভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করল। স্বাধীনতা ঘোষণার পর দশ লক্ষ মোপলা একমত হয়ে তাদের নেতা আলী মুজালিয়রকে তাদের স্বাধীন মোপলা-রাজ্যের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করল। এরনাদ ও ওয়ালুভানাদ তালুক নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল এই স্বাধীন মোপলা-রাজ্য।

এবার সমগ্র মোপলা-সম্প্রদায়ই এতদিনের অত্যাচার, শোষণ, দুঃখ-দুর্দশার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষেপে উঠেছে। যারা তাদের উপর এতদিন ধরে চালিয়েছে অমানুষিক অত্যাচার, তাদের আর তারা ক্ষমা করবে না। তারা ক্ষমা করবে না ইংরেজদের, ক্ষমা করবে না অত্যাচারীদের—শোষকদের, ক্ষমা করবে না এই দুনিয়াকে, যে দুনিয়ার কাছ থেকে তারা এতদিন পেয়েছে শুধু অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, পশুর মত ব্যবহার, মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও ধ্বংস। চিরকালের অত্যাচারিত এই সম্প্রদায় আজ সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে এতদিনের দুঃখের জ্বালা জুড়াবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তাই ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের উপর, বিশেষ করে ধনী-হিন্দুদের উপরও আক্রমণ চলল।

এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ-সরকার একটা প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী পাঠাল। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের দুটি যুদ্ধ হল। শত্রুর বিপুল শক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে বিদ্রোহীরা পাহাড়ে আশ্রয় নিল। পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে তারা গেরিলাযুদ্ধ চালাল। বিদ্রোহী গেরিলাদের আক্রমণে শত শত শত্রুসৈন্য প্রাণ দিল।

ইংরেজ-সরকার মোপলা অঞ্চলে আরও সৈন্য নিয়ে এল। সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের সকল সৈন্য একত্র করা হল। তিনখানি যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ চলল বিদ্রোহীদের উপর, উড়োজাহাজ থেকে বোমা পড়ল। বিদ্রোহীরা সব কিছু অগ্রাহ্য করে শত্রুর উপর প্রাণপণে আঘাত দিতে লাগল। এইভাবে যুদ্ধ চলল নভেম্বর মাস পর্যন্ত। ইংরেজ-শাসকগণ এই বিদ্রোহকে ধ্বংস করবার জন্য সমবেত করল আট হাজার সৈন্য, বহু সাজোয়া গাড়ী, ছোট ট্যাঙ্ক, কামান এবং আরও বহু মারণাস্ত্র। এই অত্যাচারে ক্ষিপ্ত ও প্রায়-নিরস্ত্র এক চাষী-সম্প্রদায়কে পিষে মারবার জন্য শাসকগণ উন্মাদ হয়ে উঠল।

ইংরেজ বাহিনী পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। ছোট পাহাড়ে এই বিরাট অস্ত্রশক্তির সম্মুখে বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারল না। তারা বহু খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হল এবং আর কোন আশা নেই দেখে শেষে দলে দলে

আত্মসমর্পণ করল। ইংরেজরা শত শত বিদ্রোহীকে গুলি করে হত্যা করল। বহু বিদ্রোহী নেতাকে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেওয়া হল। নিহত বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ জন। একদল বন্দীকে ট্রেনে করে সুদূর বেলারী জেলে নিয়ে যাবার পথে পঁচাত্তর জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল। এইভাবে শেষ হল পঞ্চম ও সর্বশেষ মোপলা বিদ্রোহ।

এই মোপলা বিদ্রোহকে ইংরেজরা চক্রান্ত করে হিন্দু-বিরোধী বলে অভিহিত করেছে, যেমন তারা 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' নাম দিয়েছিল 'দস্যুতা', ওয়াহাবী বিদ্রোহের নাম রেখেছিল 'হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন'। ইংরেজদের সেই অপ-প্রচারে আমাদেরও অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে এই গৌরবময় স্বাধীনতা-সংগ্রামকে হিন্দু-বিরোধী বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সেইদিন ভারতের হিন্দু-মুসলমানের কাছে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি ছিল অজ্ঞাত। তা ছিল, উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার-মহাজন ও তাদের মুরুব্বি ইংরেজ-শাসকদের কথা। ইংরেজ-জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করে ধ্বংস করবার জন্যই তারা ঐসব কথা সৃষ্টি করেছিল।

ভারতের বিদ্রোহী মানুষ দুই শতাব্দীকাল বিদেশী ইংরেজের দাসত্ব আর তাদের দেশীয় অনুচরদের বহুমুখী শোষণ ও অত্যাচারের অবসানের জন্য বিভিন্ন নামে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালনা করে গিয়েছে। বিদেশীরা প্রত্যেকটি সংগ্রামকে কোন না কোন আইন বিরোধী নামে অভিহিত করে বিদ্রোহী ভারতের সত্য পরিচয়, তার গৌরবময় ইতিহাস বিকৃত করে রেখেছে। বিদ্রোহী ভারতের বিদ্রোহী মানুষ বিদেশী ইংরেজের সৃষ্ট সেই মিথ্যা ইতিহাস ঘৃণা করে।

বিদ্রোহী ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি অতীত সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেলেও, সেই সকল বিদ্রোহ আমাদের মনের উপর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে দাগ রেখে গিয়েছে, তা কোন দিন মুছে যাবে না। সেই সকল সংগ্রাম থেকে ভারতের কোটি কোটি মানুষ লাভ করেছে দেশব্যাপী আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামের জ্বলন্ত প্রেরণা। সেই সকল বিদ্রোহ শতগুণ শক্তিশালী করে তুলেছে ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামকে। সেই সকল সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রচিত হয়েছে আমাদের বিদ্রোহী ঐতিহ্য, বিদ্রোহী ভারতের অমর ইতিহাস।

নবম অধ্যায়

মণিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৯০-৯১)

এক বিচিত্র স্থান ভারতের পূর্ব-সীমান্ত। পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত যেন এই অঞ্চলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে। কোথাও আকাশচুম্বী পর্বত-শৃঙ্গ, আবার কোথাও দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমি। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে এই স্থানটিকে বিভিন্নরূপে গড়ে তুলেছে। ভারতের এই পূর্ব-সীমান্তে চারদিকে পাহাড়-পর্বতে ঘেরা সমতল ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছোট একটি দেশীয় রাজ্য—নাম মণিপুর। জয়সিংহ ছিলেন মণিপুরের রাজা।

ব্রহ্মের রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ মণিপুর আক্রমণ করলেন। মণিপুরের রাজা জয়সিংহ উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইংরেজরা তখন শ্রীহট্ট দখল করে বসেছে। ব্রহ্ম-বাহিনীকে বাধা দেওয়া তাদেরও প্রয়োজন। তারা একদল সৈন্যসহ মণিপুর যাত্রা করল বটে, কিন্তু সময়মত পৌঁছাতে না পারায় জয়সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পরে, ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের কতকাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

জয়সিংহের পরে সিংহাসন আরোহণ করেন তাঁর পঞ্চম পুত্র গম্ভীর সিংহ। তিনিই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্ম-বাহিনীকে বিতাড়িত করে সমগ্র মণিপুর উদ্ধার করেন। তারপর রাজা হন গম্ভীর সিংহের পুত্র চন্দ্রকীর্তি। তিনি ছিলেন মণিপুরের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের অন্যতম। পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হলে, সিংহাসন লাভ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র। শূরচন্দ্রের সেনাপতি ছিলেন তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা টিকেন্দ্রজিৎ।

চন্দ্রকীর্তির শাসনকালেই ইংরেজগণ ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত মণিপুর রাজ্যেও একজন পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্য যেমন এই 'পলিটিক্যাল এজেন্ট'-দের নির্দেশে পরিচালিত হত, মণিপুরের শাসন-কার্যও তেমনি ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর নির্দেশে পরিচালিত হতে লাগল। রাজা শূরচন্দ্র ইংরেজদের কথাতেই ওঠেন বসেন। স্বাধীনতাপ্রিয় নূতন সেনাপতি টিকেন্দ্র-জিতের তা অসহ্য। মণিপুরকে ইংরেজ প্রভাব থেকে মুক্ত করবার বাসনা প্রথম থেকেই তাঁর মনে ছিল। এবারে সেনাপতির পদ লাভ করে তিনি সেই বাসনা পূর্ণ করবার আয়োজন করতে লাগলেন।

টিকেন্দ্রজিত সেনাপতি হবার পর থেকেই রাজপরিবারের মধ্যে এক আত্মঘাতী বিরোধের সূত্রপাত হল। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভৈরবজিৎ তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। এই ষড়যন্ত্রে কেবল রাজ-পরিবারের লোকই নয়, বাইরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও জড়িত ছিলেন।

রাজ-পরিবার ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দুই; দলে ভাগ হয়ে গেলেন। আর পলিটিক্যাল এজেন্ট-এর দপ্তর হয়ে উঠল এই ষড়যন্ত্রের মূলকেন্দ্র। টিকেন্দ্রকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করে মণিপুর থেকে চিরতরে নির্বাসিত করাই ছিল ইংরেজদের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তারা জানত, তিনি সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকতে তাদের মণিপুর সম্পূর্ণ গ্রাস করবার বাসনা পূর্ণ হবে না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একদিন শেষ রাত্রে টিকেন্দ্রজিৎ তাঁর দলবলসহ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, রাজা শূরচন্দ্রকে বন্দী করে তাঁর প্রভাবে রাখা। কিন্তু শূরচন্দ্র প্রাসাদের বাইরে বন্দুকের শব্দ শুনেই পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করে ইংরেজ পলিটিক্যাল এজেণ্ট-এর সুরক্ষিত প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। রাজা শূরচন্দ্র এত ভয় পেয়েছিলেন যে, তিনি ইংরেজ এজেণ্ট-এর ব্যবস্থা-মত একদল গুর্খা সৈন্যের প্রহরায় মণিপুর ত্যাগ করে কাছাড়ে চলে গেলেন।

এদিকে টিকেন্দ্রজিৎ রাজপ্রাসাদে রাজাকে না পেয়ে দুর্গ, বারুদখানা প্রভৃতি দখল করে ফেললেন। তারপর তাঁর পক্ষের অপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্রকে রাজ-প্রতিনিধি ঘোষণা করে নিজেই রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

অপর দিকে রাজা শূরচন্দ্র কাছাড় থেকে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে ইংরেজদের সাহায্যে টিকেন্দ্রজিৎকে বিতাড়িত করে মণিপুরের সিংহাসন পুনর্দখলের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। ইংরেজগণও বুঝেছিল, টিকেন্দ্রজিৎ জীবিত থাকতে মণিপুরের উপর তাদের প্রাধান্য চলবে না।

তখন লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতের বড়লাট। কৌশলে টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করবার জন্য সে আসামের চিফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেবকে নির্দেশ দিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে মণিপুরে উপস্থিত হল।

কুইণ্টন সাহেব মণিপুরে পৌছেই রাজধানী ইম্ফলের ব্রিটিশ রেসিডেন্সি-তে এক দরবার আহ্বান করল। দরবারে টিকেন্দ্রজিৎকেও আমন্ত্রণ করা হল। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হল, এই দরবারে মণিপুরের রাজ-পরিবারের বিবাদ মিটান হবে। কিন্তু দরবারের আসল উদ্দেশ্য ছিল, টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে ডেকে এনে তাঁকে কৌশলে বন্দী করা। ইংরেজরা টিকেন্দ্রজিৎকে বাঘের মত ভয় করত; এই বাঘ যত দিন স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে, তত দিন তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। আর প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে তাঁকে বন্দী করবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক। কারণ, মণিপুরের স্বাধীনতাপ্রিয় সমস্ত লোক টিকেন্দ্রজিতের অনুরক্ত, টিকেন্দ্রজিতের গায়ে হস্তক্ষেপ করলে মণিপুরে যে আগুন জলে উঠবে, তা নির্বাপিত করবার ক্ষমতা ইংরেজদের ছিল না। কাজেই কুইণ্টন এই কৌশল অবলম্বন করল। সমস্ত ইংরেজ সৈন্য দরবার-স্থল ঘিরে থাকল, টিকেন্দ্রজিৎ একবার এই জালে পা দিলে সে যেন আর বের হতে না পারে।

টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু ইংরেজদের এই হীন কৌশল পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি অসুস্থতার অজুহাতে দরবারে উপস্থিত থাকতে অক্ষমতা জানিয়ে কুইণ্টন

সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সুতরাং ফাঁদ পেতে টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করবার কৌশল ব্যর্থ হল।

এইবার ইংরেজরা রাজপ্রাসাদের উপর সরাসরি আক্রমণ করে টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করবার মতলব করল। এই আয়োজন চলল অতি গোপনে। অবশেষে একদিন রাত্রিশেষে ইংরেজ বাহিনী রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা প্রাণপণে ইংরেজ বাহিনীকে বাধা দিয়ে পরাজিত হল। ইংরেজ সেনাপতিরা মহা উল্লাসে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। কিন্তু একি? দাস-দাসীরা ব্যতীত প্রাসাদে রাজ-পরিবারের একজন লোকও নেই! পূর্বেই এই সংবাদ পেয়ে টিকেন্দ্রজিৎ সপরিবারে প্রাসাদ থেকে পলায়ন করেছেন। ইংরেজদের দ্বিতীয় কৌশলও ব্যর্থ হল।

টিকেন্দ্রজিৎ প্রাণের ভয়ে ভীরুর মত পালিয়ে যাননি, মণিপুরের স্বাধীনতার চরম শত্রু ইংরেজদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করে-ছিলেন। সেইজন্যই রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে মণিপুরের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। একদিন প্রত্যুষে অকস্মাৎ দুর্গ থেকে ইংরেজদের রেসিডেন্সির উপর প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ আরম্ভ হল। অবিশ্রান্ত গোলা-বর্ষণ চলল সমস্ত দিন ধরে। কামানের গোলার আঘাতে বহু ইংরেজ সৈন্য প্রাণ হারাল, রেসিডেন্সির দুর্গপ্রাসাদ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হতে লাগল, ইংরেজগণ মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ল। তারা প্রাণ বাঁচাবার আর কোন উপায় না দেখে সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিল, বিউগল্ বেজে উঠল। এদিকে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের আদেশে গোলা বর্ষণ বন্ধ হল।

বিজয়ী টিকেন্দ্রজিৎ কুইণ্টন প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ইংরেজদের সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য তাঁর দুর্গে ডেকে পাঠালেন। সন্ধ্যার পর কুইণ্টন, রেসিডেণ্ট গ্রিমউড প্রভৃতি পাঁচজন ইংরেজ নায়ক টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে সন্ধির শর্ত আলোচনার জন্য দুর্গে উপস্থিত হল।

এদিকে রাজধানী ইম্ফল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণ ইংরেজদের এই অহেতুক উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্গের মধ্যে ও চারপাশে এসে জড় হয়েছে। তারা মণিপুর ও টিকেন্দ্রজিতের উপর বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাগল হয়ে উঠল। তাদের সামনে দিয়েই পরাজিত ইংরেজ নায়কগণ সন্ধ্যার পর দুর্গের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ইংরেজ নায়কদের নিকট টিকেন্দ্রজিতের সন্ধির শর্ত হল, অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র দুর্গে জমা দিয়ে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে দুর্গের মধ্যে ও বাইরে সমবেত জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হল যে, ইংরেজরা অস্ত্রত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, সুতরাং সন্ধি হয়নি। এই সংবাদে তারা আরও ক্ষেপে উঠল।

আলোচনা ভেঙ্গে যাবার পর, টিকেন্দ্রজিৎ বিশ্রামের জন্য তাঁর কক্ষে গেলেন আর ইংরেজ নায়কগণ কক্ষ ত্যাগ করে দুর্গের সিংহদ্বারের দিকে অগ্রসর হল।

তাদের দেখে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ মণিপুরী সৈন্য ও জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে সিংহদ্বার রুদ্ধ করে পাঁচজন ইংরেজ নায়কের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড প্রহারে তাদের কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। বর্শার আঘাতে রেসিডেন্ট গ্রিমউড নিহত হল। এমন সময় মণিপুরের থঙ্গাল সেনাপতির আদেশে দুর্গের ঘাতক প্রহারে জর্জরিত চার-জন ইংরেজ নায়কের মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেলল। তারপর ক্রোধোন্মত্ত মণিপুরী-বাহিনী আবার ব্রিটিশ রেসিডেন্সি-র উপর কামানের গোলা বর্ষণ আরম্ভ করল।

নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণের ফলে ইংরেজ রেসিডেন্সি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। শেষ রাত্রে হতাবশিষ্ট ইংরেজগণ অন্ধকারে আত্মগোপন করে কাছাড়ের পথ ধরে শিলচরে উপস্থিত হল। তারা অবিলম্বে ভারতের সর্বত্র এবং আসাম ও শ্রীহট্টে মণিপুরের ঘটনা সালঙ্কারে প্রচার করল। এই সংবাদে ভারতের সমস্ত ইংরেজ মণিপুরীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল।

সমগ্র ভারত ও আসামের বিভিন্ন বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্য পঙ্গপালের মত ছুটল মণিপুরের দিকে। ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুরকে তারা প্রতিহিংসার আগুনে নিঃশেষ করতে ছুটে এল। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ বুঝলেন, মণিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্ত উপস্থিত। ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুর, স্বল্প এর জনসংখ্যা, তা নিয়েই বিশাল ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে শেষ শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন।

মণিপুরের চারদিক থেকে চারটি বিশাল ইংরেজ বাহিনী মণিপুরকে ঘিরে আক্রমণ আরম্ভ করল। পালেল নামক স্থানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দুই দলে। এই যুদ্ধে সংখ্যাল্প মণিপুরীরা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অপর এক ইংরেজ বাহিনী থোবোলের দুর্গ অবরোধ করল। ইংরেজ বাহিনী প্রচণ্ড গোলা বর্ষণের পর দুর্গ দখল করে মণিপুরী সৈন্যদের বন্দী করল। তারপর চারদিক দিয়ে মণিপুরকে বেষ্টন করে চারটি ইংরেজ বাহিনী রাজধানী ইম্ফলে প্রবেশ করল। কিন্তু রাজধানী জন-মানব শূন্য, শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। রাজধানীর সমস্ত মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে শহর থেকে পালিয়েছে। ইংরেজ সৈন্যরা প্রতিহিংসার জ্বালায় অস্থির হয়ে শহরের সমস্ত ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে ফেলল।

পালেল ও থোবালের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মণিপুরী সৈন্যবাহিনীর আর যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা ছিল না, সমস্ত সৈন্য হত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাজা কুলচন্দ্র, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য সেনাপতিগণ পলাতক অবস্থায় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী কামানের গোলায় রাজধানী ইম্ফল ধূলিসাৎ করে সমগ্র মণিপুর রাজ্যের উপর দিয়ে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। মণিপুর রাজ্যের সকল লোকের বাড়ী থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হল। মহারাজ, টিকেন্দ্রজিৎ, থঙ্গাল সেনাপতি ও অন্যান্য সেনাপতিদের জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেবার জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

মণিপুর খুবই ছোট রাজ্য, মণিপুরের নায়কদের গ্রেপ্তার করবার জন্য অগণিত ইংরেজ সৈন্য সমস্ত রাজ্য তোলপাড় করতে লাগল। তার ফলে, একে একে থঙ্গাল

সেনাপতি ও অন্যান্য সেনাপতিরা ধরা পড়লেন। কেবল বাকি রইলেন টিকেন্দ্রজিৎ।

টিকেন্দ্রজিৎ তখন বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় ইম্ফলের নিকটেই এক গ্রামে পালিয়ে ছিলেন। ইংরেজ বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করবার আগে থেকেই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর উত্থানশক্তিও লোপ পেল। পলাতক অবস্থায় টিকেন্দ্রজিৎ মানসিক অবসাদে ভেঙ্গে পড়েছিলেন, মনের স্থিরতা হারিয়ে পলাতক জীবন তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, তাঁর আশ্রয়দাতাকে ইংরেজদের সংবাদ দেবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালেন। অবশেষে আশ্রয়দাতা বাধ্য হয়ে ইংরেজদের সংবাদ দিলেন। একদল ইংরেজ সৈন্য এসে পীড়িত টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করে রাজ-প্রাসাদের একাংশে বন্দী করে রাখল।

এবার আরম্ভ হল বিচারের প্রহসন। দেশের স্বাধীনতার জন্য টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করেছেন—তাই তাঁর অপরাধ। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বিচারের রায় বের হল। টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করতে হবে—এই হল বিচারের রায়। আর রাজা কুলচন্দ্রের হল মণিপুর থেকে চির-নির্বাসন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসির দিন। ইংরেজ সেনাপতি স্থির করল মণিপুরীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হবে। মণিপুরীরা যাতে আর কোন দিন স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়, তার জন্যই এই অমানুষিক সিদ্ধান্ত।

১৩ই আগস্টের অপরাহ্ন কাল। ইম্ফলের পোলো খেলার বিরাট ময়দান। ময়দানের মধ্যস্থলে দুইটি ফাঁসির মঞ্চ। অগণিত গুর্খা সৈন্য চারদিক ঘিরে আছে। ইম্ফলের সমস্ত মানুষ তাদের বীর নায়ক, মণিপুরের স্বাধীনতার মহান যোদ্ধা টিকেন্দ্রজিৎকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাবার জন্য উপস্থিত।

সৈন্যরা চারদিক ঘিরে টিকেন্দ্রজিৎ ও বৃদ্ধ থাঙ্গাল সেনাপতিকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে এল, উপস্থিত জনতা পরম শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানাল তাদের দুই মহান নায়ককে। টিকেন্দ্র নীরবে প্রতি নমস্কার জানালেন। টিকেন্দ্রজিতের প্রশান্ত ও নির্ভীক মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত শহীদদের মতই চির অম্লান হাসি।

টিকেন্দ্রজিৎ ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন। বৃদ্ধ থাঙ্গাল সেনাপতিকে সৈন্যরা ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিয়ে একটি টুলের উপর বসিয়ে দিল। টিকেন্দ্রজিৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে হাসিমুখে গলা বাড়িয়ে দিলেন ফাঁসির রজ্জুর দিকে। মুহূর্ত মধ্যে মণিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই বীর যোদ্ধার প্রাণহীন দেহ শূন্যে ঝুলতে লাগল বিস্তীর্ণ ময়দানের বুকের উপর প্রোথিত দুইটি ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে। সমবেত জনতার আর্ত হাহাকারে ইম্ফলের আকাশ-বাতাস ভরে গেল। মণিপুরের স্বাধীনতা সূর্য অর্ধ শতাব্দীর জন্য অস্তমিত হল।

দশম অধ্যায়

ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ (১৮২০-১৯০০)

ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী জাতিসমূহের অবদান অন্য কারও অপেক্ষা কম নয়। ভারতের ইংরেজ-শাসনের আরম্ভকাল থেকে আত্মরক্ষা ও নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষা করবার জন্য এবং বিদেশী ইংরেজ-শাসক ও তাদের সহচর জমিদার ও মহাজনদের নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তারা বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করেছে এবং অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢেলে ভারতের ভূমি রঞ্জিত করে হাজারে হাজারে প্রাণ বলি দিয়েছে। ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের মতই সমান গৌরবময়। সাঁওতালদের মতই কোলগণও রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। কোলজাতি হো, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ঐতিহ্য সমান গৌরবময়।

প্রাগৈতিহাসিক কালে কোন এক সময় এই কোল জাতি (অস্ট্রালয়েড) বাইরে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। তখন বিহার অঞ্চল ছিল এক গভীর বনভূমি। কোলগণই সেই বনভূমি কেটে বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুর ও রাঁচি অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। কোলদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারগণের নাম হল মুণ্ডা। এই জন্য তাদের মুণ্ডা নামেও অভিহিত করা হয়। কোলদের আগমণের পর ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে পর পর প্রবেশ করেছে দ্রাবিড়, আর্য, তুর্কি, মোগল প্রভৃতি গোষ্ঠীসমূহ। এদের সকলেই প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ও শস্য-শ্যামল বিহার অঞ্চল দখল করে কোল ও অন্যান্য আদিবাসীদের উপর অল্প-বিস্তর আধিপত্য বিস্তার করেছে, কিন্তু কেউই তাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করেনি, অথবা এই অঞ্চলের বন কেটে প্রথম লোকবসতি স্থাপনকারী (খুন্ত কাট্টিদার) হিসাবে কোলগণ প্রাচীন কাল থেকে যে সব বিশেষ অধিকার ভোগ করছিল, তার উপরেও কেউ কোনদিন হস্তক্ষেপ করেনি। সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে এই কোলগণই সর্বপ্রথম ভারতে সমান অধিকারের ভিত্তিতে এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেই সমাজই ইংরেজযুগের পূর্ব পর্যন্ত একটানা চলে এসেছে। কালক্রমে কোলদের মধ্যেও রাজা (ছোটনাগপুরের রাজা) ও জমিদার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তারাও কখনও কোলদের সমাজ-ব্যবস্থা ও বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেনি।

ইংরেজ-শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কোলদের রাজা ও জমিদারগণ সকলেই ছিল কোল জাতির লোক। তাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে যে জমি কোলগণ সকলে মিলে বন কেটে পরিষ্কার করেছে, তার মালিক রাজাও নয় বা জমিদারও নয়। সকল

মালিক 'কাট্টিদার' কোল। জমিদারদের কাজ ছিল খাজনা বাবদ সামান্য পরিমাণ শস্য গ্রাম-সমাজের কাছ থেকে আদায় করে এবং তা থেকে কিছু শস্য নিজেদের জন্য রেখে বাকি শস্য রাজার ভাণ্ডারে জমা দেওয়া। কাষ্ঠ, বেত, প্রভৃতি বনজ দ্রব্য ব্যবহার করবার অবাধ অধিকার ছিল কোলদের। আর প্রচলিত নিয়ম কানুন ভঙ্গ করলে জমিদার প্রভৃতি সকলকেই কোল-সমাজপতি মুণ্ডাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতে হত।

ইংরেজ-শাসকদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আরম্ভ হল ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। তারা যেখানেই গিয়েছে সেইখানেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে মহাজনগোষ্ঠী এবং নূতন এক শ্রেণীর জমিদার ও মহাজনদের দল একত্রে মিলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছে। তারপর শাসকগণ চাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে এবং তাদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা নূতন জমিদারশ্রেণী ও মহাজনদের হাতে তুলে দিয়েছে। তার ফলে সর্বত্র চাষীরা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ-শাসনের আরম্ভকাল থেকেই বিহারের ছোটনাগপুর ও রাঁচি জেলার অধিবাসী কোল চাষীদের জীবনেও এইরূপ এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে।

অন্যান্য স্থানের মত বিহারেও ইংরেজ-শাসকগণ খাজনার জন্য ফসলের পরিবর্তে টাকা দেবার নিয়ম প্রবর্তন করল। কিন্তু কোলচাষীদের কাছ থেকে ফসলের পরিবর্তে টাকায় খাজনা আদায় করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই অবস্থায় জমিদারগণ, হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি মহাজনদের ডেকে এনে তাদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার দিল এবং এর পরিবর্তে মহাজনদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করল। এইভাবে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি মহাজনগণই হল নূতন জমিদার—কোলদের ভাষায় 'ডিকু'। এই নূতন জমিদারগণ ক্রমশ আদিবাসী চাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করে এবং বিনা মজুরিতে বেগার খাটিয়ে তাদের ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে বাধ্য করল।

অরণ্যচারী কোল আদিবাসীরা প্রকৃতির অবিকৃত সন্তান। তারা বর্তমান সভ্য জগতের নানারূপ প্রতারণা-শোষণ ও উৎপীড়নে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারা ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নূতন আদালতে অভিযোগ করল। কিন্তু ইংরেজদের আদালত জমিদার-মহাজনদের হাতধরা, সুতরাং সেখানে তাদের অভিযোগের কোন প্রতিকার হল না। তার পর কোলগণ চরম শোষণ-উৎপীড়নের জ্বালায় অস্থির হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হল। ইংরেজ-শাসনের যুগে কোল জাতির ইতিহাস 'ডিকু' অর্থাৎ বহিরাগত জমিদার-মহাজন গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস।

১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শাসন কার্যের বিবরণেও শাসকগণ কোলজাতির ধারাবাহিক বিদ্রোহের মূল কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছে:

"ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা জমির উপর এতকাল ধরে যে সকল অধিকার ভোগ করছিল, তা থেকে বঞ্চিত হবার ফলেই তাদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে প্রচণ্ড

বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। তারা স্মরণাতীত কাল থেকে জমির উপর কতকগুলি বিশেষ অধিকার ভোগ করছিল এবং তাদের জমিদারগণও তা স্বীকার করত। কিন্তু বহু বৎসর হল, এই জমিদারদের জমিদারী বহিরাগতদের, বিশেষত মহাজনদের কবলে পতিত হয়েছে। মহাজনগণ জমিদারী গ্রাস করেই আদিবাসিগণকে তাদের বিশেষ অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেছে এবং যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধি করেছে। তার ফলেই এই নূতন জমিদারগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ চলে।"

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

ছোটনাগপুর বিভাগের আদিবাসী কোলগণ হো, মুণ্ডা, ওঁড়াও প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ছোটনাগপুরের দুই হাজার বর্গ মাইলব্যাপী কোল্হান অঞ্চলই কোলদের প্রধান ঘাঁটি। এই কোল্হান অঞ্চলে তারা দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল। ইংরেজ-যুগের পূর্বে অন্য কোন শাসকই এই অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে কোলদের পদানত করবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালের প্রথম থেকেই শাসকগণের প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজা ও জমিদারগণ কোলজাতিকে তাদের শোষণ ও শাসনের শিকারে পরিণত করবার চেষ্টা করে আসছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পোরহাট রাজ্য ইংরেজ-শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। পোরহাটের রাজার উপর বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক কর ধার্য করা হলে, রাজা এই সুযোগে হো-কোলদের অঞ্চলটিও তাঁর রাজ্যের অংশ বলে দাবি করে। ইংরেজ শাসকগণও রাজার এই দাবি মেনে নেয়। রাজার কর্মচারীরা হো-কোলদের কাছ থেকে বলপূর্বক খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে, এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তা শোনামাত্র হো-সম্প্রদারের প্রত্যেকটি নরনারী ক্রোধে জ্বলে ওঠে। সমগ্র হো-অঞ্চলে আদিবাসী চাষীরা রাজার কর্মচারীদের হত্যা করতে আরম্ভ করে, বহু কর্মচারী পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। রাজা উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজ-শাসকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। করদ রাজ্যের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে প্রজা-বিদ্রোহের সময় করদ রাজা ও তাঁর রাজত্ব রক্ষার দায়িত্ব ইংরেজ-শাসকদের। এই চুক্তি অনুসারে রোগদেজ্ নামক এক ইংরেজ সেনাপতি হোগণের বিদ্রোহ দমন করতে আসে। কিন্তু বিদ্রোহীদের শক্তি ও দৃঢ়তা দেখে সেনাপতি বিদ্রোহীদের বুঝিয়ে আপসের চেষ্টা করে। তার আহ্বানে হো-সর্দারগণ এসে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল, তারা রাজার অধীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইংরেজ-সেনাপতি তার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে হো-অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। চাঁইবাসার নিকটবর্তী এক বিশাল সমতল ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তীর ধনুক ও বল্লমে সজ্জিত বিদ্রোহীদের সঙ্গে বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলের ঘোরতর যুদ্ধ চলল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আদিবাসী হো-চাষীরা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে শত্রু সংহার করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল। অবশেষে আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে

অধিকক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব বুঝে, তারা পিছু হটে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু যুদ্ধ চলল বহু দিন পর্যন্ত। বিদ্রোহীরা তাদের বনের আশ্রয় থেকে অকস্মাৎ বের হয়ে ইংরেজ বাহিনীর উপর আঘাত করে আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত। এইভাবে সারা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাপী যুদ্ধ চলবার পর ইংরেজ সেনাপতি বুঝল আরো কয়েকটি বড় সৈন্যদল এনে নূতনভাবে আক্রমণ আরম্ভ না করলে এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সেনাপতি তার সৈন্যদল নিয়ে ফিরে গেল, অর্থাৎ বিদ্রোহী হো-গণের প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িক পরাজয় বরণ করে পলায়ন করল।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই উক্ত সেনাপতি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী ও কয়েকটি কামান নিয়ে পুনরায় হো-অঞ্চলে ফিরে এল। বিদ্রোহীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারাও আঘাতের পর আঘাত হেনে এই বিরাট ইংরেজ বাহিনীটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এবার ইংরেজ-পক্ষ এক নূতন কৌশল অবলম্বন করল। বিদ্রোহীদের বন থেকে বের হয়ে এবং পিছন থেকে আঘাত দিয়ে আবার অকস্মাৎ বনের মধ্যে অদৃশ্য হতে দেখে তারা কামানের সাহায্যে বনের উপর আক্রমণ করল। কামানের গোলায় বনের বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার পর অশ্বারোহী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে হাজার হাজার বিদ্রোহী প্রাণ দিল, পরে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

আপাতত হো বিদ্রোহের অবসান হল বটে, কিন্তু তারা কাউকে কর দিতে অস্বীকার করল। তারা পোরহাটের রাজাকে তাদের পরম শত্রু বলে তাঁকে কর দিতে কিছুতেই সম্মত হল না। কারণ, তারা মনে করল যে, এই রাজার জন্যই ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। হো-সর্দারগণ ঘোষণা করল, তারা বরং ইংরেজদের কর দেবে, তবু পোরহাটের রাজাকে কোন কর দেবে না। কিন্তু ইংরেজ-শাসকগণ হো-চাষীদের দাবি গ্রাহ্য না করে তাদের ঐ রাজার হাতেই সঁপে দিল এবং রাজাকে 'লাঙ্গল-কর' (প্রত্যেক লাঙ্গলের উপর ধার্য কর) দেবার নির্দেশ দিল। রাজাও ইংরেজ প্রভুদের নির্দেশে অবিলম্বে চাষীদের প্রত্যেকটি লাঙ্গলের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করল। অসহায় চাষীরা এই অপমানের জ্বালায় অন্তরে অন্তরে জ্বলতে লাগল।

যতদিন ইংরেজ সৈন্য এই অঞ্চলে ঘাঁটি করেছিল, ততদিন এই আদিবাসীরা চুপ করেছিল। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী চলে যাওয়ামাত্র আবার হো-অঞ্চলে আগুন জ্বলে উঠল। তারা 'লাঙ্গল-কর' বন্ধ করল এবং রাজার কর্মচারীদের দেখামাত্র হত্যা করতে লাগল। হোগণ আবার তাদের অঞ্চলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করল। প্রায় পনের বছর ধরে হো-চাষীদের সঙ্গে রাজার পাইক-বরকন্দাজদের যুদ্ধ চলল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কোলজাতির অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা ও ওঁড়াও সম্প্রদায় রাঁচি-অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ করলে, হোগণও তাদের জ্ঞাতি ভাইদের এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল; এর পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-শাসকগণ পোরহাটের রাজার হাত থেকে হো-

অধ্যুষিত কোল্‌হান অঞ্চলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে একটি সৈন্যদল বসিয়ে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগে কোল জাতির হো, মুণ্ডা এবং ওঁড়াও সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ মহাজনগণ চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের ইজারা নিয়ে কোলদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে ফেলছিল, খাজনার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেল, খাজনার দায়ে নূতন জমিদার চাষীর সর্বস্ব কেড়ে নিল। এই শোষণ ও উৎপীড়ন কোল চাষীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাঁচি জেলার মুণ্ডা ও ওঁড়াও সম্প্রদায়ের সমস্ত চাষী একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই বিদ্রোহের সংবাদ দ্রুত সমস্ত বিভাগে ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র কোল জাতি যেন পূর্ব থেকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। রাঁচির জেলায় বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়ামাত্র সিংভূম জেলার হোগণ হিন্দু ও মুসলমান মহাজনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। দেখতে না দেখতে এই বিদ্রোহ মানভূম, হাজারিবাগ এমন কি পালামৌ জেলাতেও বিস্তার লাভ করল। এই সব জেলার চাষীরা হল চেরো ও খারোয়ার (সাঁওতাল) সম্প্রদায়ভুক্ত। এরাও একত্রে নূতন জমিদারগোষ্ঠী (ডিকু) ও তাদের কর্মচারীদের নির্মূল করবার জন্য চারদিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ করল। সমগ্র ছোটনাগপুর বিভাগ জুড়ে আদিবাসী চাষীরা দীর্ঘকালের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের অবসান করতে উন্মাদ হয়ে উঠল।

আদিবাসীদের অস্ত্র হল তীর-ধনুক, টাঙ্গি আর বল্লম। তা নিয়েই তারা সমগ্র বিভাগে বহিরাগত সমস্ত হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের হত্যা করতে লাগল। তারা 'ডিকু' দস্যুদের ও তাদের গৃহ ও সমস্ত সম্পত্তি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলল। এমনকি মহাজন ডিকুদের শস্যপূর্ণ ক্ষেত-খামারও বাদ গেল না। তারা ক্ষেত-খামারে আগুন লাগিয়ে, ক্ষেতের পাকা ফসল মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে দীর্ঘকালের শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিল। এক সহস্রাধিক 'ডিকু' ও তাদের লুণ্ঠনের সহচর কর্মচারীরা আদিবাসী চাষীদের ক্রোধের আগুনে জীবন আহুতি দিল।

এই বিদ্রোহ দীর্ঘদিন ধরে দুর্বার গতিতে চলল। বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে পাটনা ও দানাপুর থেকে তিনটি পদাতিক বাহিনী ও একটি প্রকাণ্ড অশ্বারোহী সৈন্যদল বিদ্রোহ দমনের জন্য ছুটে এল। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সমগ্র বিভাগে ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল সৈন্যদলের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সর্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। একদিকে বন্দুক ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারী সৈন্যদল, অপর দিকে তীর, ধনুক ও বল্লমধারী আদিবাসী চাষীরা। প্রায় একমাস ধরে ছোটনাগপুরের সর্বত্র খণ্ডযুদ্ধ চলল। শত শত চাষী বন্দুকের গুলির আঘাতে প্রাণ দিল, চাষীর

রক্তে ছোটনাগপুর বিভাগের সমগ্র জমি লাল হয়ে গেল। শেষে বিদ্রোহের অবসান হল।

ইংরেজ-শাসকগণ আদিবাসী চাষীদের এই বিদ্রোহের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে এতই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা ছোটনাগপুর বিভাগকে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে একে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এক সীমান্ত প্রদেশ বলে ঘোষণা করে এবং এর পরিচালন-ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সীমান্ত প্রদেশকে বিহার প্রদেশের এক বিভাগে পরিণত করে একজন কমিশনারের অধীনে রাখা হয়। সৈন্যবাহিনীর বর্বর তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে আবার নূতন ডিকুর দল এসে আদিবাসী চাষীদের মাথার উপর চেপে বসে। তাদের উপর পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতর শোষণ-উৎপীড়নের ঝড় বইতে থাকে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী চাষীরা বিদ্রোহের আগুন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ভবিষ্যতের আশায় দিন গুণতে থাকে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে বিহারের সকল অধিবাসী জাতির, বিশেষত কোল জাতির অবদান কিছুমাত্র কম নয়। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে যখন স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগুলিও সাহাবাদের বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহ ও বিভিন্ন স্থানের বিদ্রোহী সৈন্যদলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নিজ নিজ অঞ্চলের ইংরেজ-সহচর জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলে আদিবাসীদের জমিদার-মহাজনবিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। জমিদার-মহাজনগণ ইংরেজ-শাসকদের নিকট বার বার সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেও কোন সাহায্য না পেয়ে প্রাণের ভয়ে এই অঞ্চল থেকে পলায়ন করে।

সিংভূমের হোগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে পোরহাটের রাজাকে বন্দী করে। মুক্তি পেলে রাজাও হো-প্রজাদের সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহে যোগদান করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিলে হোগণ তাঁকে মুক্তি দেয় এবং রাজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সরল বিশ্বাসে হো-বিদ্রোহীরা রাজার নেতৃত্ব মেনে নেয়। এই বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্র একদল শিখ সৈন্য সিংভূম অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু দুর্ধর্ষ হো-বিদ্রোহীদের দমন করা ছিল শিখদেরও সাধ্যাতীত। হোগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিখ সৈন্য দেখামাত্র বন থেকে বের হয়ে প্রাণপণে আঘাত করে আবার বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। এই ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলবার পর কয়েকটি ইংরেজ-সৈন্যদল শিখদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হো-বিদ্রোহীদের আশ্রয়স্থল বনভূমি ঘিরে ফেলে। বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময়, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভয়ঙ্কর বিপদ

আসন্ন দেখে পোরহাটের রাজা লুকিয়ে ইংরেজ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এর পরেও কয়েক মাস ধরে বিদ্রোহ চলে, অবশেষে বহু সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার পর এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

এই সময়ের সিংভূমের হো-বিদ্রোহ এবং পালামৌ জেলার আদিবাসী বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আদিবাসীরা কোলদেরই জ্ঞাতি সম্পর্কীয় খারোয়ার ও চোরো সম্প্রদায়। এরা সাহাবাদ জেলার বিদ্রোহী নায়ক কুমার সিংহের আহ্বানে দুইজন খারোয়ার সর্দারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এল. এস. এস. ওম্যালি তাঁর History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

"বহিরাগত রাজপুত জমিদারদের বিরুদ্ধে এই উভয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ দীর্ঘকাল থেকে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল এবং দীর্ঘকাল থেকে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চলছিল। এইবার তারা মনে করল যে, ইংরেজ-শাসনের অবসান হয়ে গেছে এবং এখন তারা আবার অতীতের সেই সুখ শান্তিময় ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যে ব্যবস্থায় তারা নিজেদের সর্দারদের অধীনে এই সমগ্র অঞ্চলের উপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব করত। বহিরাগত জমিদারগোষ্ঠীকে তখন তাদের খাজনা দিতে হত না"। (পৃঃ ৪১৪)

বহু খণ্ডযুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের পরিচালক খারোয়ার নেতৃদ্বয় ইংরেজ-সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তার পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-ভাগে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার সমগ্র রাঁচি জেলা জুড়ে আদিবাসী কোল-চাষীদের বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাঁচি জেলায় কোল জাতির মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বাস। ১৮৩১ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় এই অঞ্চলের বহিরাগত হিন্দু, মুসলমান ও রাজপুত জমিদারগণ সাময়িকভাবে পলায়ন করেছিল। বিদ্রোহ শেষ হলে আবার তারা ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে শোষণ ও উৎপীড়ন করতে আরম্ভ করে। চাষীদের উপর বিদ্রোহের সময় সৈন্যবাহিনীর ও বিদ্রোহের পর জমিদার শ্রেণীর এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন চলে যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় ছিল না। কিন্তু কিছুদিন পর আবার তারা শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়।

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কিছু দিন পর্যন্ত একটা অবসাদের ভাব দেখা দিলেও, আবার ধীরে ধীরে আদিবাসী চাষীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠতে থাকে। এই চাঞ্চল্য ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। এর কিছুদিন পূর্ব থেকে চাষীদের খাজনার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খাজনা এত বৃদ্ধি পায় যে, চাষীরা তাদের সমস্ত ফসল বিক্রয় করেও খাজনার টাকা সংগ্রহ করতে পারত না। এর উপর বিভিন্ন প্রকারের কর ও বে-আইনী আদায় তো চলতই। চিরকাল আদিবাসীরা বন থেকে বাঁশ, বেত, কাঠ

প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। এবার সেই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হল। তা ছাড়া বন কেটে চাষের জমি তৈরি করতে জমিদারগণ চাষীদের বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নিত। চাষীরা দলবদ্ধভাবে এর প্রতিকার দাবি করেও কোন ফল পেল না। আদালত থেকেও কোন প্রতিকার হল না। সুতরাং আদিবাসী চাষীদের সামনে একটিই পথ খোলা রইল এবং তা হল বিদ্রোহের পথ।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সমগ্র রাঁচি জেলায় আবার কোল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহীরা নিজ নিজ অঞ্চলের জমিদারী কাছারীগুলো অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করল, বহু কর্মচারী নিহত হল। অল্পকালের মধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদারী শোষণ-ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে গেল। পূর্বের মত এবারেও জমিদার-গোষ্ঠীর আহ্বানে ইংরেজ সরকারের কয়েকটি বৃহৎ সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ছুটে এল। এই সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে রইল জমিদারগোষ্ঠী।

এবার ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, কেবল কামান-বন্দুক দ্বারা আদিবাসীদের হাজারে হাজারে হত্যা করে কোন স্থায়ী ফল হবে না, এভাবে তাদের সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হলেও, আরও ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকবে। সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিগণ বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচনার মারফত আপসের ইচ্ছা এবং আদিবাসীদের অভিযোগের প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করল। আদিবাসী সর্দারগণ ও সেনাপতিদের মধ্যে বৈঠক হল। সেই বৈঠকে স্থির হল, খাজনা বৃদ্ধি করা হবে না, পূর্বের খাজনাই বহাল থাকবে এবং বনজাত দ্রব্যাদি আদিবাসীরা ব্যবহার করতে পারবে। সরলমতি সর্দারগণ এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে ফিরে গেল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অবসান হল।

বিরশা ভগবানের নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০)

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে মুণ্ডা সর্দারগণ ফিরে গেলেও, অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। জমিদারগোষ্ঠী, ডিকুর দল কোন প্রতিশ্রুতি মেনে চলবার পাত্র নয়। কাজেই মুণ্ডা অঞ্চলে ধীরে ধীরে আবার বিদ্রোহের ঝড় ওঠবার লক্ষণ দেখা দিল। ক্রমশ মুণ্ডা অঞ্চলটি হয়ে উঠল অগ্ন্যুৎ-পাতের পূর্বক্ষণের একটি আগ্নেয়গিরির মত—বাইরে নির্জীব শান্তভাব, আর ভিতরে ভিতরে চলেছে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিপ্রবাহ।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মুণ্ডা অঞ্চলে এক নূতন নায়কের আবির্ভাব হল। বয়স মাত্র একুশ বছর, সদা সহাস্য মুখ, বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল। রাঁচি জেলার তামার থানার অন্তর্গত চালকাদ গ্রামের এক মুণ্ডা সর্দারের পুত্র, নাম **বিরশা মুণ্ডা**। বিরশা বাল্যে চাইবাসার জার্মান মিশন স্কুলে শিক্ষা লাভ করে, পরে এক ক্যাথলিক গীর্জার স্কুলে গেল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। স্কুলে বসে বিরশার মনে হল, কোলদের কুসংস্কার দূর করে জাতিকে উন্নত করে তুলতে না পারলে দীর্ঘ কালের শোষণ-উৎপীড়নের অবসান হবে না। এই স্কুলে বসেই বিরশা কোল জাতির

ধর্ম ও প্রচলিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে নবলব্ধ খ্রীষ্টান ধর্মের মিশ্রণ করে এক নূতন ধর্মমত গড়ে তোলেন। মুণ্ডা সমাজের উপর থেকে রোমান পুরোহিত ও খ্রীষ্টান পাদ্রী এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের অর্থাৎ ধর্মের নামে শোষণকারীদের দুষ্ট প্রভাব নষ্ট করাই ছিল বিরশার এই নূতন ধর্মমতের মূল উদ্দেশ্য। বিরশা যতটুকু শিক্ষা পেয়েছেন, তাতেই বুঝেছেন যে, এই উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণই মুণ্ডা সমাজের শত্রু। তাদের প্রচারে ও অনুশাসনে মুণ্ডারা বিভ্রান্ত। সুতরাং এদের প্রভাব দূর করতে না পারলে মুণ্ডাদের জাগরণের কোন আশা নেই। মুণ্ডা সমাজে বহু দেবতার পূজা ব্রাহ্মণরাই প্রচলন করেছে। তারও অবসান ঘটাতে হবে। তার পর তিনি কতিপয় সমবয়স্ক মুণ্ডা যুবককে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে নিজের এই নূতন ধর্মপ্রচার করতে বের হলেন।

বিরশা প্রচার করলেন, তিনি এই নূতন ধর্ম মুণ্ডাদের প্রধান দেবতা 'শিং বোঙ্গা-'র কাছ থেকে লাভ করেছেন। 'শিং বোঙ্গা' স্বয়ং তাঁর মারফত বলে পাঠিয়েছেন যে, এখন থেকে বহু দেবতার (বোঙ্গার) পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি দেবতাকেই মুণ্ডাদের মেনে পূজা করতে হবে। মুণ্ডাদের জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করতে হবে, সং-ভাবে জীবন যাপন করতে হবে, সর্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ করে, সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র চরিত্র গঠন করতে হবে, আর হিন্দুদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মত গলায় 'জানে' অর্থাৎ পবিত্র সূত্র ধারণ করতে হবে। এসবই হল প্রধান দেবতা শিং বোঙ্গার নির্দেশ। তাঁর পূজা মুণ্ডারা নিজেরাই করবে, এর জন্য পুরোহিত ডাকার আবশ্যক নেই।

বিরশার মুখ থেকে শিং বোঙ্গার এই নির্দেশ অর্থাৎ নবজাগরণের মন্ত্র লাভ করে মুণ্ডা জনসাধারণের মধ্যে এক নূতন প্রাণ-চাঞ্চল্য জেগে উঠল। তাদের মধ্যে এক ব্যাপক ও গভীর সামাজিক আলোড়ন দেখা দিল। সূত্রধারী ব্রাহ্মণের দল এতকাল তাদের মধ্যে বহু দেবতা ও সূত্রের মহিমা প্রচার করে তাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে, আর ধর্মের ভয় দেখিয়ে জমিদার-মহাজনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধা দিয়েছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত বিরশা এইবার মুণ্ডাদের মধ্য থেকে পুরোহিতশ্রেণীর দুষ্ট প্রভাব দূর করবার আয়োজন করলেন।

শত শত মুণ্ডা যুবক বিরশার নব ধর্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে এক নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা দলে দলে গৃহত্যাগ করে বিরশার গ্রামে এসে সমবেত হতে লাগল। তারা তাদের তরুণ নায়ককে ভগবানের আসনে বসিয়ে জাতির ত্রাণকর্তারূপে পূজা করতে আরম্ভ করল। বিরশা হলেন বিরশা ভগবান, মুণ্ডা ভাষায় 'ধাতৃ আবা' অর্থাৎ বিশ্বের পিতা।

বিরশা তাঁর শিষ্যদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে গ্রামে গ্রামে তাঁর নূতন বাণী প্রচার করতে পাঠালেন। প্রচারকদল ঘুরে ঘুরে অবিলম্বে জমিদারদের খাজনা, বেগার খাটা প্রভৃতি বন্ধ করবার নির্দেশ দিল। বিরশার নির্দেশ অনুযায়ী তারা মুণ্ডাদের নিকট বিদ্রোহের তারিখটিও জানিয়ে দিল। এই দিনকে বলা হল 'প্রলয়ের দিন'। এই প্রলয়ের দিনে সকল মুণ্ডাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করে নবসাজে সজ্জিত হয়ে এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বিরশার গ্রাম চালকাদে সমবেত হতে হবে।

অবশেষে প্রলয়ের দিন উপস্থিত হল। তার আগের দিন থেকে হাজার হাজার মুণ্ডা চালকাদ গ্রামে সমবেত হতে লাগত—মুণ্ডা নারী এবং শিশুরাও এল। চালকাদ গ্রাম জন-সমুদ্রে পরিণত হল। সমস্ত মুণ্ডা নারী ও পুরুষ সংগ্রামের উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যে পরিকল্পনা করে বিরশা তাদের আহ্বান করেছিলেন তা ব্যর্থ হওয়ায় বিরশা তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

মুণ্ডাদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য জেগে উঠতে দেখে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও জমিদার-মহাজনগণ ভয়ে মুণ্ডা অঞ্চল থেকে পলায়ন করল। তারা আসন্ন বিদ্রোহের সংবাদ থানায় থানায় জানিয়ে দিল। বিদ্রোহের আগে কয়েক শত পুলিস এসে চালকাদ গ্রামের নিকট ঘাঁটি করে থাকল। একই দিনে মুণ্ডা অঞ্চলের সবগুলি 'ডিকু' শয়তান অর্থাৎ জমিদার-মহাজনদের হত্যা করাই ছিল বিরশার পরিকল্পনা। কিন্তু তারা পূর্বেই পলায়ন করায় বিরশার অনুচরগণ অতর্কিতভাবে পুলিস বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। পুলিস প্রস্তুত হবার আগেই বিদ্রোহীরা তাদের কয়েক জনকে আহত করে, তাদের জিনিসপত্র তচ্‌নচ্‌ করে এবং বিছানাগুলি নিকটবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করে পলায়ন করে।

এরপর সশস্ত্র পুলিসের দল গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে মুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করে। এক খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে কয়েকজন অনুচরসহ বিরশা আত্মগোপন করল। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্য ও কয়েকটি হাতি নিয়ে মুণ্ডা অঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং কয়েক শত পুলিস ও সৈন্য একত্রে মিলে বিরশা ও তার প্রধান অনুচরদের গ্রেপ্তারের জন্য মুণ্ডা অঞ্চল চষে ফেলতে থাকে। হাতির সাহায্যে মুণ্ডাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয়, গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করা হয়। অবশেষে বিরশার এক বিশ্বাসঘাতক অনুচরের নিকট সংবাদ পেয়ে পুলিস ও সৈন্যগণ বিরশাকে তাঁর গোপন আশ্রয় স্থান থেকে নিদ্রিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে গোপনে দূরবর্তী রাঁচি জেলে প্রেরণ করে।

বিরশার গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাত হাজার মুণ্ডা জেল ভেঙে তাঁকে মুক্ত করবার জন্য চালকাদ গ্রামে সমবেত হয়। বিরশার অনুচরগণ তাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে দেয়। আটজন অনুচর রাঁচি জেলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বিরশা ও তাঁর অনুচরগণকে মুণ্ডা অঞ্চলের মধ্যবর্তী খুন্তিয়া জেলে রেখে প্রকাশ্যে বিচার করে শাস্তি দিলে মুণ্ডারা ভয় পেয়ে বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করবে—এই ধারণা নিয়ে বিরশা ও তাঁর অনুচরগণকে খুন্তিয়া জেলে আনয়ন করা হয়। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র প্রায় দশ হাজার মুণ্ডা খুন্তিয়া জেল দুই দিন পর্যন্ত ঘিরে রাখে। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে অতি গোপনে আবার তাদের রাঁচি জেলে স্থানান্তরিত করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিরশাকে আড়াই বৎসর ও তার অনুচরদের বিভিন্ন সময়ের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

* * *

বিরশার কারাদণ্ডের পরেও মুণ্ডা জনসাধারণ শান্ত না হয়ে বরং আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করল ; বিরশার কারাদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আর একটা বিদ্রোহ আসন্ন হয়ে উঠল। এই অবস্থা দেখে ইংরেজ শাসকগণ ভয় পেয়ে গ্রামে গ্রামে পুলিস ও সৈন্য বসাল, তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে সকলকে ভয় দেখাতে লাগল। মুণ্ডারা আপাতত বিদ্রোহ করা অসম্ভব বুঝে উপরে শান্তভাব ধারণ করল।

পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর পিছনে পিছনে পুরোহিত ও জমিদার-মহাজনগণ আবার ফিরে এসে শোষণ ও উৎপীড়নের তাণ্ডব আরম্ভ করল। সরকারী বিবরণেও এই ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়ণের কথা স্বীকার করে বলা হয়েছে :

"লোহারডুগা জেলায় (মুণ্ডা অঞ্চলে) শোনা যায় যে, জমিদারদের খাজনা ও বেগার-শ্রমের নামে চাষীদের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। জমিদার আদিবাসী চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে সর্বদা তাদের শঙ্কিত অবস্থায় রাখছে। এই অবস্থায় চাষীরা তাদের দেয় খাজনাও দিতে অস্বীকার করে।"

(১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ভূমি রাজস্বের বাৎসরিক বিবরণ।)

পর বৎসরের বিবরণে দেখা যায় :

"লোহারডুগা জেলার জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক অতিশয় উদ্বেগজনক। জমিদারগণ আইনের সাহায্যে অথবা বে-আইনীভাবেই রায়তের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। রায়তেরা তাদের যথাসম্ভব বাধা দিচ্ছে। জঙ্গলের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ লেগেই আছে। এই সম্পর্কে অবিলম্বে কিছু করা না হলে জেলার এক বৃহৎ অংশের জঙ্গলে আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার অথবা জঙ্গলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে।" (১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ভূমি রাজস্ব বিবরণ।)

জমিদার মহাজনদের এই উৎপীড়ন ও শোষণ ব্যতীত দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আক্রমণেও আদিবাসীরা অনিবার্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। জমিদারদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে এরূপ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেরূপ দুর্ভিক্ষের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। অনাহারে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হল। এর পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সমগ্র অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর কলেরা মহামারী দেখা দিল। শত শত আদিবাসী বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাল। সমগ্র আদিবাসী চাষীদের মধ্যে হাহাকার উঠল।

এই অবস্থার মধ্যেই, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিরশা ও তাঁর অনুচরগণ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মুণ্ডা অঞ্চলে ফিরে এলেন। বাইরে এসে বিরশা মুণ্ডাদের এই দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর স্বজাতির এই চরম দুর্দশার জন্য যারা দায়ী, তাদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিরশা অস্থির হয়ে উঠলেন। অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে বিরশার অভয় বাণী ও সংগ্রামের কথা প্রচারিত হল। সেই বাণী শুনে মুমূর্ষু মুণ্ডা জাতির মনে জোর এল, আবার উৎসাহের জোয়ার বইল। হাজার হাজার মুণ্ডা যুবক আবার তাদের প্রিয়তম নায়ক বিরশা ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করতে চালকাদ গ্রামে উপস্থিত হল। বিরশা ঘোষণা করলেন, মুণ্ডারাই মুণ্ডা অঞ্চলের সমগ্র জমির একমাত্র মালিক, তারা ইংরেজ

সরকারকে ভূমিকর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'ডিকু' অর্থাৎ জমিদারকে কোন খাজনা দেবে না, 'ডিকু'-দের কোন অধিকার তারা স্বীকার করে না।

জেল থেকে ফিরে এসে বিরশা শুনলেন, অদূরবর্তী চুতিয়া নামক স্থানে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সহায়তায় জমিদার-মহাজনগণ এতদিন চাষীদের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিরশা অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শের পর স্থির করলেন, এই 'শয়তানের ঘাঁটি' হিন্দু মন্দিরটার উপরেই প্রথম আক্রমণ করতে হবে।

অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে বিরশা একদিন মন্দিরের উপর আক্রমণ করলেন এবং তা দখল করে সমস্ত দেবমূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন। স্থানীয় জমিদার, মহাজন ও পুরোহিতগণ ছোটনাগপুরের মহারাজের সাহায্যে বিরশার কবল থেকে মন্দির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হল। জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে এক গভীর রাত্রে যখন বিরশা তাঁর অনুচরদের নিয়ে মন্দিরে পরামর্শ করছিলেন তখন, মহারাজের পাইক বরকন্দাজরা আকস্মিকভাবে মন্দির আক্রমণ করল। এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে বিরশার দল পরাজিত হয়ে মন্দির থেকে পলায়ন করল।

এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রাঁচি থেকে একদল সৈন্য ও পুলিস এসে মুণ্ডা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি করে বসল; তারা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে বিরশা ও তাঁর অনুচরগণকে গ্রেপ্তার করার জন্য খুঁজতে লাগল। বিরশা দেখলেন, এখন কোনও আয়োজন না করে বিদ্রোহ করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মুণ্ডা চাষীদের মধ্যে নূতন সংগ্রামের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

* * *

একদিকে পুলিস ও সৈন্য বসিয়ে মুণ্ডাদের ভীতি প্রদর্শন এবং গ্রেপ্তারের জন্য বিরশার অনুসন্ধান চলল, অপরদিকে চিরবিদ্রোহী মুণ্ডাদের শান্ত করবার চেষ্টাও হতে লাগল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাস করে জমি ও বনভূমির উপর মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার নামমাত্র স্বীকার করা হল। অবশ্য জমিদারগণ সেই আইন কোন দিন মেনে চলেনি। ঐ বৎসরই লেঃ গভর্নর উডবার্ন সাহেব এসে ঘোষণা করল যে, মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার রক্ষা করা হবে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা হল না। আদিবাসীদের আর্থিক দুর্দশা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের আঘাত কাটিয়ে উঠতে না উঠতে, আর একটা দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণ মেঘ মুণ্ডা অঞ্চলের উপর ঘনিয়ে এল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শীতের ফসল হল না, কারও ঘরে এক মুষ্টি শস্য উঠল না। সমগ্র মুণ্ডা অঞ্চলে হাহাকার পড়ে গেল। অথচ জমিদারগণ তাদের প্রাপ্য এক পয়সাও ছাড়ল না। তারা খাজনার দায়ে চাষীর যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে লাগল, তাদের জমিজমা আত্মসাৎ করতে লাগল। মুণ্ডাদের এই দুর্দশা দেখে বিরশা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি এবার প্রকাশ্যে মুণ্ডা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অভয় দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চল থেকে সৈন্য ও পুলিস বাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং বিরশা নির্ভয়ে সর্বত্র

বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর অনুচরগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করতে লাগল, মুণ্ডারাই জমির একমাত্র মালিক, কেউ যেন জমিদার 'ডিকু'-দের খাজনা না দেয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষের তিন মাস মুণ্ডা অঞ্চলের সর্বত্র বড় বড় সভা হল। এই সব সভায় বিরশা স্বয়ং অথবা কোন প্রধান অনুচর জ্বালাময়ী ভাষায় মুণ্ডা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা এবং তাদের উপর জমিদার ও মহাজনগোষ্ঠীর উৎপীড়নের কথা বলে মুণ্ডাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে 'ডিকু'-দস্যুদের তাড়াতে না পারলে, মুণ্ডাদের বাঁচবার কোন আশা নেই—এ সব মুণ্ডাদের বুঝতে বিলম্ব হল না। তারা বিরশার আহ্বানে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। মুণ্ডা সর্দারগণের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্রোহের দিন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস পর্বের পূর্বদিন স্থির করা হল। ঐ দিন মুণ্ডাগণ তাদের নিজ নিজ তীর, ধনুক, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুণ্ডা অঞ্চলের সমস্ত রাজা, হাকিম, জমিদার, জাগীরদার, ঠিকাদার, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, খ্রীষ্টান-পাদ্রী প্রভৃতি সকল শোষক এবং উৎপীড়কদের আক্রমণ করা হবে, তাদের হত্যা করা হবে। বিরশা বললেন, "এই সব শয়তানকে হত্যা করলেই এই দেশ হবে আমাদের। জমির মালিক হব আমরা।"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস পর্বের কয়েকদিন আগে থেকেই বিরশার বিশ্বস্ত অনুচরগণের এক এক জনকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল। খ্রীষ্টমাসের পূর্বদিন তাদের নেতৃত্বে তানা, কুঁটি, তামা, বাসিয়া, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারদের কুঠি, মন্দির, গীর্জা, খামার, থানা, আদালত প্রভৃতির উপর আক্রমণ আরম্ভ হল, বহু জমিদারী কর্মচারী, পুরোহিত, পাদ্রী, ও চৌকিদার নিহত হল। সমগ্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহের ফলে খ্রীষ্টানদের বড়দিনের উৎসব ও আনন্দ পণ্ড হল, সমস্ত জমিদার-মহাজন, পুরোহিত-পাদ্রীরা পালিয়ে রাঁচি শহরে আশ্রয় গ্রহণ করল। এমন কি, সামরিক ঘাঁটি রাঁচি শহরের উপরেও বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে শহরবাসীরা দিন কাটাতে লাগল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী তিনশত মুণ্ডা যুবক তীর, ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খুন্তির থানার উপর আক্রমণ করে। থানার কনস্টেবলগণ বহুক্ষণ প্রাণপণে বাধা দিয়ে প্রায় সকলেই নিহত বা গুরুতররূপে আহত হয়। বিদ্রোহীরা থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র পুলিস কমিশনার ও ডেপুটি পুলিস কমিশনার দারেন্দার সামরিক ঘাঁটি থেকে ১৫০ জন সৈন্য ও ১০০ জন সশস্ত্র পুলিস সঙ্গে নিয়ে খুন্তি এসে উপস্থিত হল।

এই সংবাদ শোনামাত্র খুন্তির নিকটবর্তী ডুমারী পাহাড়, জানুমপিড়ি, ঘুটুহাটু, কুরাপুর্তি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে শত শত সশস্ত্র মুণ্ডা খুন্তির নিকটবর্তী অরণ্য অঞ্চলে সমবেত হল। তারা আত্মরক্ষার জন্য গাছ ও বাঁশ কেটে বেড়া দিল এবং বেড়ার পেছনে থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকল। স্বয়ং বিরশা হলেন বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে পুলিস কমিশনার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের নিকটবর্তী হল। সে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করবার আদেশ দেবামাত্র, বেড়ার ফাঁক দিয়ে শত শত

বিষাক্ত তীর সৈন্যবাহিনীর উপর বর্ষিত হল। বহু সৈন্য ও পুলিস ধরাশায়ী হল। তার পর আরম্ভ হল সৈন্য ও পুলিসবাহিনীর রাইফেল থেকে অশ্রান্ত ধারায় গুলি বর্ষণ। বহুক্ষণ পর্যন্ত তীর-বৃষ্টির সঙ্গে গুলিবৃষ্টি সমানভাবে চলল। ইতিমধ্যে গুলির আঘাতে বহু মুণ্ডা যুবক নিহত ও আহত হওয়ায় বিরশা বুঝলেন, রাইফেলের সঙ্গে তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করা বেশীক্ষণ সম্ভব নয়। সুতরাং তার নির্দেশে বিদ্রোহীরা বেড়ার পেছনের আশ্রয় ত্যাগ করে নিকটবর্তী অরণ্যে আশ্রয় নিল। পরে বেড়ার পেছনে সাতজন মুণ্ডা যুবকের মৃতদেহ ও সাংঘাতিকরূপে আহত তিনজন যুবকের দেহ পাওয়া গেল। সাতটি মৃতদেহের মধ্যে তিনটি ছিল বীরবেশে সজ্জিতা মুণ্ডা যুবতীর।

সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের সংখ্যা সর্বসমেত তিনশত। এই শক্তি নিয়ে তারা অরণ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হল না। সংবাদ পেয়ে বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আরও তিনশত সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস এসে পৌছবার পর তারা বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে অরণ্যে প্রবেশ করল। বিদ্রোহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাঁচি জেলা ও সিংভুম অঞ্চলে সশস্ত্র মুণ্ডাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রায় দুই মাস ধরে যুদ্ধ চালাতে থাকে। এদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে পঙ্গপালের মত পুলিস দল এসে মুণ্ডা অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ধ্বংস-কাণ্ড আরম্ভ করে। তার ফলে কত মুণ্ডা আদিবাসী যে প্রাণ দিল, কত কুটির ধূলিসাৎ ও ভস্মীভূত হল, তার হিসাব নেই।

এই অসমান যুদ্ধ বেশীদিন চলতে পারে না। বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে নিভে এল। বিদ্রোহের নায়ক বিরশা ও তাঁর শতাধিক অনুচর গ্রেপ্তার হলেন। এবার আরম্ভ হল বিচারের পালা। বিচার শেষ হবার পূর্বেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাঁচি জেলে কলেরা রোগে এই ঐতিহাসিক মুণ্ডা বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বিরশা ভগবান মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের কেউ কেউ বিরশার ধর্মসংস্কার, রাজনৈতিক মত ও আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁকে "ধর্মোন্মাদ", 'উগ্র ও বিকৃতমস্তিষ্ক' প্রভৃতি আখ্যাদান করেছেন, কিন্তু মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত এই মুণ্ডা যুবক স্বজাতির শতাব্দীকালের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাবার জন্য, মুণ্ডা জাতির উপর হিন্দু-খ্রীষ্টান পুরোহিত-সম্প্রদায় ও জমিদার-মহাজনগণের অবর্ণনীয় শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করবার জন্য এবং মুণ্ডা জাতিকে এর প্রাচীন মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যেভাবে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তা যে কোন জাতির, যে কোন মানুষেরই অনুকরণীয়। স্বজাতির মুক্তিসাধনে নিবেদিত প্রাণ এই তরুণ মুণ্ডা নায়ক তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে যে নূতন চেতনা সঞ্চার করেছেন, তাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে বাঁচবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে গিয়েছেন, তার জন্যই তাঁকে মুণ্ডা জাতি ভগবানের আসনে বসিয়েছে। আজও সেই উচ্চতম আসনে বিরশা সুপ্রতিষ্ঠিত।

দীর্ঘকাল পরে বিদ্রোহের অন্যান্য নায়কগণের বিচার শেষ হল। বিচারে দুইজনের ফাঁসি, বারোজনের দ্বীপান্তর এবং তিয়াত্তর জনের পাঁচ বৎসর থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

ইংরেজ সরকার এত দিন পর্যন্ত মুণ্ডা আদিবাসীদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করে নি, তারা আদিবাসী চাষীদের জমিদার-মহাজনের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এইবার এই বিদ্রোহের ফলে তাদের টনক নড়ল। এবার সরকার ব্যস্তসমস্ত হয়ে মুণ্ডা অঞ্চলের সমস্ত জমি জরীপ করল এবং জমি ও বনভূমির উপর তাদের অধিকার আংশিকভাবে স্বীকার করে নিল। তা ছাড়া জমিদারদের জমিতে আদিবাসীদের বল প্রয়োগে বেগার খাটানো সাময়িকভাবে বন্ধ হল।

একাদশ অধ্যায়

ময়মনসিংহের মহাজন-বিরোধী কৃষক অভ্যুত্থান (১৯৩০)[১]

অভ্যুত্থানের পটভূমি

অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা আয়তনে ও অধিবাসীদের সংখ্যায় ভারতের বৃহত্তম জেলা। জেলার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। এই জেলা প্রধানত জমিদার ও তালুকদার প্রধান। কৃষকদের প্রয়োজনে যারা টাকা ও ধান প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ঋণ হিসাবে দেয় সেই মহাজনদের সংখ্যাও প্রচুর। জেলার আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, জেলার অধিকাংশ কৃষক মুসলমান, আর তাদের শোষক জমিদার, তালুকদার ও মহাজনগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। অসংখ্য ছোট বড় জমিদার, তালুকদার ও মহাজন গ্রামাঞ্চলে নানা প্রকারে শোষণ-কার্য চালাত। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না কোন দিনই।

গ্রামাঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান কৃষক একত্রে মিলে জমিদার-তালুকদার মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ইংরেজ-শাসনের গোড়া থেকেই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করত, আর জমিদার-তালুকদার-মহাজনগণ ইংরেজ-শাসকদের সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করত। ইংরেজ-শাসকগণ কৃষকদের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকত, কারণ এই শোষক-উৎপীড়কগণই ছিল গ্রামাঞ্চলের ইংরেজ-শাসনের প্রধান খুঁটি বা অবলম্বন।

* * *

১৯৩০ সালের পূর্বেই বাংলাদেশে মধ্যশ্রেণীর যুবকদের একাংশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও কর্মাদর্শের বিস্তার ঘটেছিল। তারা শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে এই আদর্শের প্রচার ও শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। ইতিপূর্বে 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ' নামে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত একটি সংগঠন কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার শাখা-প্রশাখাও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছিল। তারই একটি শাখা গড়ে উঠেছিল ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। এই শাখার কর্মীরা মহকুমার কৃষকদের মধ্যে জমিদার-তালুকদার-মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধ্বনি তুলে কৃষকদের সংগঠিত করছিল।

'ইয়ং কমরেডস্ লীগ'-এর ব্যাপক প্রচার-আন্দোলনের ফল হিসাবে কিছুকালের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অতি ভয়ঙ্কর মহাজনী

১। এই কাহিনীর মূল তথ্যাবলী শ্রীধরণী গোস্বামী লিখিত এবং মাসিক পত্রিকা 'পরিচয়'-এর ১৩৭৬ সালের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত 'একটি কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী' নামক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। —সুপ্রকাশ রায়

প্রথার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়। আন্দোলন আরম্ভ হয় বড় বড় জোতদার, তালুকদার ও সকল মহাজনের বিরুদ্ধে। জোতদার আর তালুকদাররাও ছিল মহাজনদের গোষ্ঠীভুক্ত।

এই মহাজনদের শোষণ-ব্যবস্থা ছিল অতি ভয়ঙ্কর। দুর্দিনে অর্থের অভাবে যদি গরীব কৃষকেরা পরিবারের ভরণ-পোষণ অথবা চাষের কাজে অর্থ বা খাদ্য ঋণের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হত তবে তাদের আর মুক্তির উপায় থাকত না। যদি কেউ এক ঝুড়ি ধান মহাজনের কাছ থেকে ধার নিত তবে তাকে সেই ঋণ শোধ করতে হত দুই বা তিন ঝুড়ি ধান দিয়ে। যদি কেউ চাষের কাজে একশো টাকা ধার নিত তবে তাকে কয়েক মাস পরে সুদ দিতে হত একশো টাকা বা তারও বেশী। ধার শোধের জামিন স্বরূপ তাকে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হত তার সমস্ত জমি-জমা, এমন কি বাস্তুভিটা পর্যন্ত।

এই মহাজনী শোষণের ফল হত সমাজের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। কোন কৃষকই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে পারত না। মহাজনরা এই সব ঋণ পরিশোধে অক্ষম কৃষকদের জমি-জমা, এমন কি বাস্তুভিটাও ক্রোক করে দখল করত। এরই ফলে প্রতিবছর কৃষকদের হাত থেকে বহু জমি-জমা চলে যেত মহাজন, জোতদার ও তালুকদারদের হাতে।

এ কেবল কিশোরগঞ্জের গ্রামের ছবি নয়, ১৯৩০ সালের সমসাময়িক কালে এ ছিল সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলেরই ছবি। একদিকে গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার কৃষক জমি-জমা হারিয়ে নিঃস্ব মানুষে পরিণত হচ্ছিল, আর অপর দিকে মুষ্টিমেয় মহাজন, তালুকদার ও জোতদারের হাতে জমা হচ্ছিল প্রচুর অর্থ আর জমি-জমা। এর অনিবার্য ফল গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন, কৃষি ও অর্থনীতির ধ্বংস। কিশোরগঞ্জের মহাজন-বিরোধী বিদ্রোহ বাংলার গ্রামাঞ্চলের এই সর্বনাশকর অবস্থার দিকে সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মহাজন-বিরোধী আন্দোলন

ইতিমধ্যে কিশোরগঞ্জের 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ'-এর কর্মীরা গ্রামে আলোচনা সভা ও বড় জনসভা করে মহাজনী প্রথা বিরোধী প্রচার পুরোদমে চালাচ্ছিল। এই সব সভার আলোচনা ও প্রচারের ফলে বিশেষত গরীব কৃষকদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, নেতাদের আহ্বানে গ্রামে গ্রামে গরীব কৃষকরা মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়।

কিশোরগঞ্জ শহরের দশমাইল দূরে পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম থেকে এই মহাজন-বিরোধী আন্দোলনের আরম্ভ। এই গ্রামের গরীব কৃষকগণ এক মুসলমান মহাজনের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মুসলমান মহাজনের বাড়ী আক্রমণ করে। গ্রামের গরীব হিন্দু ও মুসলমান কৃষকগণ একত্রে মিলে মহাজনের বাড়ী ঘেরাও করে এবং জোর করে ঘরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙ্গে কৃষকদের জমির দলিলপত্র বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহাজন আর তার বাড়ির লোকজন বাধা

দিলে কৃষকগণ বাড়ির সমস্ত আসবাবও আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে চারদিকে মহাজনদের বাড়ির উপর কৃষকদের আক্রমণ চলতে থাকে এবং সব ক্ষেত্রেই কৃষকগণ মহাজনদের বাড়ী থেকে জমির দলিলপত্র খুঁজে বের করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

এই বিদ্রোহ অবিলম্বে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ে। এক রাত্রে এক বিপুল সংখ্যক গরীব কৃষক জনতা পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্বর্তী জাঙ্গালিয়া গ্রামের বিরাট ধনী ও বিশেষ প্রভাবশালী মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাড়ি ঘেরাও করে। কৃষকরা প্রথমে শান্তভাবে কৃষ্ণবাবুর কাছে তাদের ঋণপত্র ও জমি-বন্ধকের কাগজপত্র ফেরত দেবার দাবি জানায়। কিন্তু কৃষ্ণবাবু তার উত্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বন্দুক দিয়ে বেপরোয়াভাবে কৃষকদের উপর গুলিবর্ষণ করেন। এই গুলিবর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলেই আটজন কৃষকের মৃত্যু হয়। এর পর কৃষকগণ ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করে। এই সময় কৃষ্ণবাবুর একজন মুসলমান গৃহ-ভৃত্য বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে পলায়মান কৃষকদের জানিয়ে দেয় যে, কৃষ্ণবাবুর বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেছে, সুতরাং আর গুলিবর্ষণের ভয় নেই। এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা ফিরে আসে। কৃষক জনতা তখন আটজন কৃষক-হত্যার প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তারা লাঠি প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে কৃষ্ণবাবুর বাড়ি আক্রমণ করে এবং বিভিন্ন ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। তারা বাড়ির ভিতরে আসবাবপত্র প্রভৃতি যা কিছু পেল তাই ভেঙে চুরমার করে, লোহার সিন্দুক ভেঙে ঋণপত্র প্রভৃতি সমস্ত দলিল বের করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কৃষ্ণবাবু জনতার এই ধ্বংসকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করলে বাড়ীর ভিতরেই ক্রুদ্ধ জনতা কৃষ্ণবাবুকে পিটিয়ে হত্যা করে। কৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সকলে কৃষ্ণবাবুর জীবন রক্ষা করতে এসে আক্রান্ত হন। এর পর জনতা বাড়ি থেকে চলে যায়।

এরপর কৃষক জনতার বিদ্রোহ আরও কয়েকটি গ্রামে এবং বাজারে বিস্তার লাভ করে। প্রত্যেকটি গ্রামে যারা মহাজন কেবল তাদের বাড়িই আক্রান্ত হয়। জনতা প্রত্যেক মহাজনের বাড়ি ঢুকে কেবল ঋণপত্র ও জমির দলিল প্রভৃতি পুড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন বাজারে বসে যে সব মহাজন তাদের ব্যবসা চালাত তাদের উপরে কৃষক জনতার আক্রমণ চলে। মহাজনেরা ঋণপত্র প্রভৃতি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

এই বিদ্রোহের আঘাত সবচেয়ে বেশী পড়েছিল জাঙ্গালিয়া, হুসেনপুর, মঠখোলা ও গোবিন্দপুর গ্রামে। কিন্তু একমাত্র জাঙ্গালিয়া গ্রাম ছাড়া আর কোথাও প্রাণ-হানি হয়নি। জাঙ্গালিয়ার কৃষ্ণবাবু তাঁর বুদ্ধির দোষেই প্রাণ হারিয়েছেন। ইনি কৃষক জনতার উপর গুলিবর্ষণ না করলে এবং গুলিবর্ষণের ফলে আটজন কৃষক নিহত না হলে আর কৃষকদের দাবি অনুসারে ঋণপত্র প্রভৃতি দলিলগুলি কৃষকদের ফিরিয়ে দিলে কৃষ্ণবাবু যে খুন হতেন না তা অন্যান্য স্থানের ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়।

এই কৃষক বিদ্রোহের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে

কৃষকগণ কোন বড় জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করেনি, তাদের জমি-জমাও দখল করা হয়নি। তার কারণ, এই বিদ্রোহ ছিল মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানেই বিদ্রোহী-কৃষকগণ তাদের ঋণপত্র ও জমি বন্ধকের দলিল ফেরত পেয়েছে সেখানেই ঐ সব দলিল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তারা স্থান ত্যাগ করেছে। কৃষ্ণ রায়ের বাড়ির ঘটনা ব্যতীত অন্য কোথাও নরহত্যা, দৈহিক উৎপীড়ন বা নারীর উপর অত্যাচার হয়নি।

শাসকগোষ্ঠীর আক্রমণ

কয়েকদিন কৃষকদের এই মহাজন-বিরোধী বিদ্রোহ অব্যাহতভাবে চলার পর শাসকগোষ্ঠী তার বিপুল শক্তি নিয়ে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করল। ঢাকা থেকে একটি বিরাট সশস্ত্র গুর্খা পুলিস বাহিনী কিশোরগঞ্জে পাঠান হল। এই বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হল বিদ্রোহী বলে সন্দেহ হলেই দেখামাত্র গুলি করতে। কিশোর-গঞ্জের খ্রীষ্টান পাদ্রী ফ্রাঙ্কলিন একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করে গুর্খা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। পাদ্রী ফ্রাঙ্কলিন নিজের হাতে গুলি করে বিদ্রোহী সন্দেহে কৃষকদের হত্যা করেছে। বর্বর চরিত্রের এই গুর্খারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিদ্রোহী সন্দেহে কয়েকশো কৃষক হত্যা করেছে। গুর্খাদের নির্মম অত্যাচারে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে পাটক্ষেতে আশ্রয় নেয়। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে বহু কৃষক বাড়ি না ফিরে পাটক্ষেতেই ১০।১৫ দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে। এই অমানুষিক অত্যাচারের ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

দ্বাদশ অধ্যায়

পেশোয়ারের-শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র অভ্যুত্থান (১৯৩০)

দশদিনের জন্য শহর দখল

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাঠান জাতীয় মুসলমানদের বাসভূমি। এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান কেন্দ্র পেশোয়ার। এই পেশোয়ারই এই প্রদেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরও প্রধান ঘাঁটি।

শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের চাপে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তার অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে। পেশোয়ারের শ্রমিকশ্রেণী আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলির কৃষকেরাও সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। পেশোয়ারের স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য আন্দোলনের তারিখ ঘোষণা করে ১৯৩০ সালের ২০শে এপ্রিল। সংগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি সংগ্রাম পরিষদও গঠিত হয়।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েক হাজার পাঠান কৃষক মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব 'বকর ঈদ' পালন করবার জন্য এবং পেশোয়ারের বিখ্যাত বাসন্তী মেলা দেখবার জন্য পেশোয়ার শহরে এসে উপস্থিত হয়। সে সময় সীমান্তের পাহাড় অঞ্চলের বহু উপজাতীয় কৃষকও পেশোয়ারে প্রবেশ করেছিল। তারা বের হয়েছিল দিন-মজুরের কাজের সন্ধানে, এখন মেলা দেখে বাড়ি ফিরছিল। ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হল, কংগ্রেস ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম শুরু করেছে, সব জায়গায় জনসাধারণের সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছে।

২২শে এপ্রিল পেশোয়ারের পুলিস স্থানীয় কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী এবং সংগ্রাম পরিষদের সভ্যদের গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদ শহরে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ারের জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ২৩শে এপ্রিল সকাল বেলায় শহরের শ্রমিক, কারিগর ও ছাত্রগণ আর বাইরে থেকে শহরে আসা কৃষকগণ পেশোয়ারের প্রধান রাজপথে সমবেত হয়। ঠিক এই সময় বন্দীদের পুলিসের গাড়ীতে করে শহরের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাস্তায় সমবেত বিশাল জনতা গ্রেপ্তার করা নেতাদের গাড়ী আটক করে। ইতিমধ্যে জনতা জেলখানাও ঘিরে ফেলেছিল। শহরের নেতৃস্থানীয় গান্ধীপন্থী কংগ্রেস-কর্মীরা জনতাকে বোঝাবার জন্য জেলখানার ফটকে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা জনতাকে পুলিসের কাজে বাধা না দেবার জন্য বোঝালেন, পুলিসকে বাধা দেওয়া যে গান্ধীর নির্দেশের বিরোধী কাজ তা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। তাদের উপদেশ আর ব্যাখ্যা শুনে জনতার ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে পুলিস জনতার উপর কয়েকবার গুলিবর্ষণ করলে জনতার ক্রোধ চরমে ওঠে। তারা পুলিসের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাঠান উপজাতীয় কৃষকদের কাছে ছিল কয়েকটি বন্দুক। উপজাতীয় পাঠানরা নিজ বাসভূমিতে আংশিক স্বাধীনতা ভোগ করত বলে তারা আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক রাখতে পারত, আর সেই বন্দুক নিয়েই চলাফেলা করত। উপজাতীয় কৃষকরা পেশোয়ারে যখন 'বকর ঈদ' পালন করতে এবং বাসন্তী মেলা দেখতে এসেছিল তখন তারা তাদের বন্দুকগুলিও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। পুলিস যখন জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে তখন পাঠান কৃষকেরাও তাদের বন্দুক দিয়ে পুলিসের উপর পাল্টা গুলিবর্ষণ করল। এই গুলিবর্ষণে উভয় পক্ষেই বহুলোক হত ও আহত হয়।

এর পর পেশোয়ার শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিসের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ চলতে থাকে। এইভাবে পেশোয়ারে শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যায়। শহরের সকল স্থানে শ্রমিক, উপজাতীয় কৃষক আর ছাত্ররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পুলিস আর ইংরেজ সরকারের দলভুক্ত ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। স্থানীয় সরকারের অনুরোধে পেশোয়ার মিউনিসিপ্যালিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান এল বিদ্রোহী জনতাকে শান্ত করতে। কিন্তু জনতা এই ব্যক্তিটির দালালি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। পুলিসরক্ষী বেষ্টিত হয়ে সে বক্তৃতা শুরু করা মাত্র তার উপর জনতা ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপ করতে লাগল। ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল, সে আহত অবস্থায় পালিয়ে গেল।

শহরের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক বুঝে শাসকগোষ্ঠী সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করল বিদ্রোহ দমন করবার জন্য। সৈন্যবাহিনীর সাজোয়া গাড়ীর বহর শহরে প্রবেশ করল। সাজোয়া গাড়ী থেকে জনতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করা হলে ক্রুদ্ধ জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল সাজোয়া গাড়ীগুলির উপর। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে একখানা সাজোয়া গাড়ী বহর থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। বাকি সাজোয়া গাড়ীগুলি আরও কয়েকবার গুলিবর্ষণ করল এবং বহু শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রকে হত্যা করে অবশেষে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল।

এবার বিদ্রোহীরা বিশেষ সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষার আয়োজন করতে থাকে। যাতে সাজোয়া গাড়ীর বহর কিংবা সৈন্যবাহিনী আর শহরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য বিদ্রোহীরা গাছ কেটে সেই গাছ আর ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি দিয়ে পেশোয়ারের প্রত্যেক রাস্তায় 'ব্যারিকেড' তৈরি করে রাস্তা বন্ধ করে দিল। শহরের সকল ইংরেজ আর দেশীয় সরকারী কর্মচারী ও ধনী লোকেরা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে শহরের সুরক্ষিত 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' অঞ্চলের উঁচু দেয়ালের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল। এর পর বিদ্রোহী জনসাধারণ একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে শহরের সকল থানা ও পুলিস-ঘাঁটি এবং সরকারী দপ্তরখানা অধিকার করে ফেলল। এইভাবে পেশোয়ার শহর থেকে ইংরেজ-শাসনের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেল, আর শহরের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হল সুশৃঙ্খল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতার নূতন ধরনের এক শাসনব্যবস্থা।

দেশীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসকগণ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের কবল থেকে পেশোয়ার শহর উদ্ধার করবার জন্য একটি দেশীয় সৈন্যদল নিয়ে এল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যেরাও কৃষকের সন্তান। সারা ভারতবর্ষে শ্রমিক-কৃষকের জীবনপণ সংগ্রাম আর তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলতে দেখে গারোয়ালী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি দেশীয় সৈন্যদের মধ্যেও তখন চাঞ্চল্য জেগে উঠছিল। তারাও এই ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে যোগদান করার জন্য ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবী সৈন্যদলের মধ্যে বামপন্থী আকালীদের প্রভাব ছিল গভীর। বামপন্থী আকালীদের 'আজাদ আকালী' নামক মুখপত্রে পাঞ্জাবী সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আর ইংরেজ সেনাপতিদের হুকুম অমান্য করতে। পাঞ্জাবী সৈন্যদলের মধ্যে ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এই সময় আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরাও পাঞ্জাবী ও অন্যান্য দেশীয় সৈন্যদলের মধ্যে গোপনে ইংরেজ-বিরোধী প্রচার-কার্য চালাচ্ছিল। এইসব প্রচার-কার্যের প্রভাবে ক্রমশ দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব জেগে উঠছিল। তার প্রভাবে পাঞ্জাবে আর উত্তরপ্রদেশের গারোয়ালী সৈন্যদেরও ইংরেজ-বিরোধী ও বিদ্রোহী মনোভাব-সম্পন্ন করে তুলছিল।

শ্রমিক-কৃষক জনতার হাত থেকে পেশোয়ার উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগণ পেশোয়ারে একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে দুইটি গারোয়ালী সৈন্যদল নিয়ে এল। ইংরেজ সেনাপতি গারোয়ালী সৈন্যদের উপর নির্দেশ দিল পেশোয়ারের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করতে। গারোয়ালী সৈন্যদের একটি দলের হাবিলদার ছিলেন চন্দ্রসিং। তিনি তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের পাল্টা আদেশ দিলেন—"দেশীয় ভাইদের উপর গুলিবর্ষণ করো না, রাইফেলগুলি দেশীয় ভাইদের হাতে তুলে দাও।" চন্দ্রসিংয়ের আদেশ শুনে সৈন্যগণ ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর তারা তাদের দল ভেঙে দিয়ে হাতের রাইফেলগুলি জনসাধারণের হাতে তুলে দিল। উপস্থিত শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র জনতা উল্লাসে বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যদের আলিঙ্গন করল। ভারতের ইতিহাসে এক অপূর্ব সংগ্রামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল।

ভারতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যরা সেদিন গণ-সংগ্রামের এক নূতন সম্ভাবনা দেখিয়ে দিল। সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর এই মিলন গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করল।

এই ঘটনা দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর। বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যদের শাস্তিদান আর পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য এবার তারা নিয়ে এল একটি বিরাট ইংরেজ সৈন্যদল। এই ইংরেজ সৈন্যেরা শহরে পৌছেই গারোয়ালী সৈন্যদের বন্দী করে নিকটবর্তী এক সামরিক ঘাঁটিতে নিয়ে আটক করল। এখানে গারোয়ালী সৈন্যদের বিচারের জন্য এক সামরিক আদালত বসান হল।

এই আদালতের বিচারে চন্দ্রসিংয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর অন্যদের দশ থেকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হল।

পেশোয়ার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যারাই এই ঘটনা শুনেছে তারাই বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যদের 'জাতীয় বীর' বলে বরণ করে নিয়েছে। ভারতের 'শ্রমিক-কৃষক পার্টি' (সেকালের কমিউনিস্ট পার্টির নাম) গারোয়ালী সৈন্যদের অভিনন্দন জানাল। আর কংগ্রেস, বিশেষত কংগ্রেসের প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধী গারোয়ালী সৈন্যদের "অবাধ্যতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী" বলে তীব্র নিন্দা করলেন। গারোয়ালী সৈন্যদের এই বিদ্রোহ হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৩রা মে। সমগ্র পাঞ্জাবে এবং ভারতের প্রায় সব প্রধান শহরে প্রগতিশীল মানুষেরা সভা করে গারোয়ালী সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

গারোয়ালী সৈন্যগণ বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে স্বদেশবাসীদের হত্যা করতে অস্বীকার করে স্বদেশ-প্রেমের যে জলন্ত আদর্শ স্থাপন করেছে তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে অধিক মিলবে না। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর, ১৯৩৭ সালের শেষভাগে গণদাবির চাপে শাস্তি-প্রাপ্ত গারোয়ালী সৈন্যদের মুক্তিদান করা হয়েছিল।

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান

বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হলেও পেশোয়ারের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের স্বাধীন সরকার পূর্ণ দুই সপ্তাহ কাল অব্যাহত ছিল। ইতিমধ্যে শাসকগণ পেশোয়ারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে সমস্ত দেশীয় সৈন্য অপসারিত করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে ইংরেজ-সৈন্যদের পেশোয়ারে পাঠাল। এইভাবে ভারতে অবস্থিত মোট ইংরেজ-সৈন্যদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী সৈন্য পেশোয়ার শহরের কাছে সমাবেশ করা হল। কেবল তাই নয়, উড়োজাহাজে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ করে পেশোয়ারের বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের হত্যা করবার জন্য এক বিরাট বোমারু বিমান-বাহিনী নিয়ে আসা হল।

অন্যদিকে পেশোয়ারের বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার জন্য অমৃতসর থেকে একটি বিরাট শিখ-আকালী দল পেশোয়ারের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু ইংরেজ বাহিনী আগে থেকে এই সংবাদ পেয়ে ঝিলম নদীর তীরে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। দুইশত আকালীকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আটক করা হয়। পেশোয়ারে শ্রমিক-কৃষকদের একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুনে মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, আফ্রিদি ও মোমন্দ উপজাতীয় অধিবাসীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারাও পেশোয়ারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পেশোয়ারের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু তারা শহরে পৌছাবার পূর্বেই ইংরেজ বাহিনী শহর অধিকার করবার জন্য চারদিক থেকে শহরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। সুতরাং তারা আর শত্রু-বেষ্টিত শহরে প্রবেশ করতে পারল না।

পেশোয়ারের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের সশস্ত্র বাহিনী এক সপ্তাহ কাল প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে ইংরেজ বাহিনীকে বাধাদান করল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের অস্ত্র-সম্বল ছিল গারোয়ালী-সৈন্যদের দেওয়া কয়েকটি রাইফেল এবং কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর বন্দুক। আর সুশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ করেছিল উন্নত ধরনের রাইফেল, বহু মেসিন-গান আর কামান নিয়ে। এছাড়া বোমারু বিমানবাহিনী থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল দিবারাত্র। তবু বিদ্রোহীরা পেশোয়ারের সবগুলি প্রবেশ পথ বন্ধ করে রাইফেল আর বন্দুকের সাহায্যে মে মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ চালাল। বহু শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করল। অবশেষে ইংরেজ বাহিনী অস্ত্র ও সংখ্যা-শক্তির জোরে বিদ্রোহীদের বাধাদানের শক্তি চূর্ণ করে শহর অধিকার করল। তারপর বহুদিন ধরে চলল ইংরেজ-সৈন্যদের অবাধ লুণ্ঠন আর হত্যাকাণ্ড। বহু শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হল, অনেক মৃতদেহ প্রকাশ্যভাবে রাজপথে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখা হল। অবশেষে তখনকার মত শান্ত হয়ে এল চির-অশান্ত পেশোয়ার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শোলাপুরের শ্রমিক অভ্যুত্থান (১৯৩০)

সাতদিনের জন্য শহর দখল, শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

বিদ্রোহের পটভূমি

১৯৩০ সালের মে মাস। গান্ধীজির পরিচালনায় কংগ্রেসের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সকল স্থানে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ সেই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সর্বত্র পুলিস আর সৈন্যবাহিনী গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনা করে আন্দোলন দমন করবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সর্বত্র এই বর্বর সুলভ অত্যাচার দেখে শোলাপুরের কাপড়ের কলের ৫০ হাজার শ্রমিক চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে পারল না। ইংরেজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ ৮ই মে তারিখে এক বিশাল প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা বের করল। ইংরেজ সরকারের উন্মত্ত পুলিস সেই শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শ্রমিকেরা ইষ্টকখণ্ড নিয়ে পুলিসের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলল শ্রমিক-পুলিসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ৮ জন পুলিস ইটের আঘাতে আহত হয়ে মারা গেল। এবার এল সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী। তারা এসেই শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করল। শ্রমিকেরা ইষ্টকখণ্ড দিয়ে গুলিবর্ষণের উত্তর দিল। কিন্তু রাইফেল বন্দুকের সঙ্গে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝে শ্রমিকেরা তখনকার মত পিছু হটে গেল। পুলিসের গুলিবর্ষণের ফলে পাঁচজন শ্রমিক নিহত এবং বহু বালক-বালিকাসহ শতাধিক শ্রমিক আহত হল। এই শ্রমিক হত্যার জন্য স্বয়ং বড়লাট পুলিস-বাহিনীকে অভিনন্দন জানালেন।

এই শ্রমিক-হত্যার বিরুদ্ধে শোলাপুরের ৫০ হাজার শ্রমিক গর্জে ওঠে। তারা শোলাপুরের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের শান্তিরক্ষার সমস্ত চেষ্টা আর আবেদন অগ্রাহ্য করে এক চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা সমগ্র শোলাপুর শহরের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। শহরের প্রতি মহল্লায় একটি করে সংগ্রাম-কমিটি এবং নির্বাচিত শ্রমিক নেতাদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম-কমিটি গঠিত হয়। শোলাপুরের সর্বজনমান্য শ্রমিক-নায়ক মালাপ্পা ধানসেট্টি, জগন্নাথ সিন্ধে, শ্রীকিয়েন সর্দা, আর আবদুল্লা রসুল ও কোরবান হোসেন এই কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে শ্রমিক-যুবকদের নিয়ে গঠন করা হয় একটি 'লাল ফৌজ'। এর পর আরম্ভ হয় সংগ্রাম।

বিদ্রোহী শ্রমিকগণ ইংরেজ সরকারের দস্তাবেজখানা, ৬টি থানা, বহু মদের দোকান এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বহু দোকান ও অফিস আগুন দিয়ে ভস্মীভূত

করে। শহরের সকল ইংরেজ পক্ষীয় ভারতীয়গণ, মিল-মালিকগণ এবং ইংরেজ কর্মচারীরা শহর থেকে পালিয়ে শোলাপুরের সুরক্ষিত রেল-স্টেশনে আশ্রয় গ্রহণ করে। সামরিক কর্তৃপক্ষ ও পুলিস একত্রে মিলে রেল-স্টেশনটিকে একটি দুর্গের মত সুরক্ষিত করে তোলে। কয়েকটি মেসিনগান নিয়ে একদল ডোগরা সৈন্য ও ইংরেজ মেসিনগান-চালক দিবারাত্র রেল-স্টেশনটির পাহারায় নিযুক্ত হয়।

বিদ্রোহী শ্রমিকগণ শোলাপুর শহর সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলে। শহরের সকল স্থানে—রাজপথে ও সরকারী অফিসসমূহের উপর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করে।

এবার শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি শহরে এক নূতন শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সকল পুরানো কর্মচারীকে বিতাড়িত করে তাদের পরিবর্তে শ্রমিকদের নিযুক্ত করে। শ্রমিকদের 'লাল ফৌজ' শহরের শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করে। 'লাল ফৌজ'-এর তদারকিতে শহরের সব কাজ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে। গাড়ীঘোড়ার চলাচল, জল-সরবরাহ, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই পূর্ণ শৃংখলার সঙ্গে অব্যাহত থাকে। শোলাপুরের এই পূর্ণ শৃংখলার উপর মন্তব্য করে 'পুনা স্টার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

"শ্রমিকগণ সমগ্র শাসন-যন্ত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে নিজস্ব আইন-কানুন রচনার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিল।"

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের বুকের উপর শোলাপুরের শ্রমিকদের এই স্বাধীন বিপ্লবী রাষ্ট্রটি টিকে ছিল মাত্র সাতদিন। তার পরই আরম্ভ হয় এর উপর ইংরেজ রাজশক্তির বিপুল সামরিক শক্তির আক্রমণ। পূর্বে পেশোয়ার অভ্যুত্থানে ভারতীয় গারোয়ালী সৈন্যগণ বিদ্রোহী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং বিদ্রোহ দমনের কাজে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়োগ করার সাহস ইংরেজ শাসকদের হয়নি। তাই তারা কেবল ইংরেজ-সৈন্যদেরই শোলাপুরের শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করল। শোলাপুরের শ্রমিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করবার কাজে নিযুক্ত হয় ইংলণ্ডের 'ইয়র্কসায়ার রাইফেল' বাহিনীর একটি 'রেজিমেণ্ট' এবং 'কিংস্ আলস্টার রাইফেল' বাহিনীর একটি 'ব্যাটালিয়ন' (মোট প্রায় ৩ হাজার সৈন্য)।

'ইয়র্কসায়ার রাইফেল' বাহিনীকে শোলাপুরের শ্রমিকদের দমনের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে—এই সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হলে ইয়র্কসায়ারের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ ইংরেজ সরকারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে শোলাপুরের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের বিদ্রোহকে অভিনন্দিত করে এবং পূর্ণ সমর্থন জানায়। ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি একটি প্রচারপত্র বের করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম সমর্থন করবার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ-সৈন্যের নিয়োগ বন্ধ করবার জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান করা হয়।

প্রায় তিন হাজার ইংরেজ-সৈন্য রাইফেল ও বহু মেসিনগানসহ ছুটে আসে শোলাপুরের শ্রমিকদের এই শিশুরাষ্ট্রটিকে ভারতের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

এদিকে শ্রমিকদের 'লাল ফৌজ' আর শোলাপুরের সমস্ত শ্রমিক ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়। ইংরেজ-সৈন্য যাতে শোলাপুর শহরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য শহরের সকল রাজপথে ড্রেনের বড় বড় পাইপ, বড় বড় গাছ, গরুর গাড়ী, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি দিয়ে বাধা (ব্যারিকেড) তৈরি করা হয়। একটি সরকারী প্রচারপত্রে স্বীকার করা হয়েছিল যে, শোলাপুরের শ্রমিকদের এই 'ব্যারিকেড' ও বাধাসৃষ্টির অন্যান্য ব্যবস্থা চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর শহরের রাজপথে যে বাধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এও স্বীকার করেছিল যে, ভারতবর্ষের গণ-বিদ্রোহের ইতিহাসে এমন 'ব্যারিকেড' এর পূর্বে আর কখনও তৈরী হয়নি।

শোলাপুরের শ্রমিকদের বিদ্রোহ আর তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদে ভারতের বড়লাট, জঙ্গীলাট প্রভৃতিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এমনকি ইংলণ্ডের শাসকগণও আতঙ্কে অস্থির হয়। শোলাপুরের ৫০ হাজার শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংহতি আর অভূতপূর্ব সংগ্রাম ও তাদের দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংবাদ চারদিকে প্রচারিত হলে ভারতবর্ষের সকল শিল্পাঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে, আর তার ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদসহ ভারতের ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থাও ধ্বংস হবে—এই আতঙ্কে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী আর ভারতের দেশীয় শোষকগোষ্ঠী অবিলম্বে শোলাপুরের শ্রমিক রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করবার জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। শোলাপুরের সংবাদ ভারতবর্ষের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশনার উপর জরুরী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এমনকি শোলাপুরের সংবাদ যাতে লোকমুখেও প্রচারিত হতে না পারে তার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও শোলাপুরের সংবাদ লোকের মুখে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হয়ে পড়ে। চারদিকে শোলাপুরের শ্রমিকদের সমর্থনে সভা-শোভাযাত্রা হতে থাকে। বোম্বাই শহরের শ্রমিকগণ ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা করে শোলাপুরের শ্রমিকদের সঙ্গে সহানুভূতি ও সমর্থন জানায় এবং শোলাপুরে সৈন্য পাঠাবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে। শোলাপুরের নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ শ্রমিকদের সমর্থনে সভা-শোভাযাত্রা করে কয়েকটি থানা পুড়িয়ে দেয়।

ভারতের বড়লাট ১২ই মে তারিখে শোলাপুরে সামরিক আইন জারি করে এবং আরও ইংরেজ-সৈন্য নিয়ে কয়েকজন ইংরেজ সেনাপতি শোলাপুর শহরে প্রবেশ করে। শহরের রাজপথে দিবারাত্র যুদ্ধ চলতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধ চলে ১২ই মে থেকে ১৬ই মে পর্যন্ত। ইংরেজ-সৈন্যদের রাইফেল আর মেসিনগানের সঙ্গে প্রায় নিরস্ত্র শ্রমিকগণ যুদ্ধ করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। রাজপথে শ্রমিকের রক্তের স্রোত বয়ে যায় আর শোলাপুরের শ্রমিক-রাষ্ট্র, 'শোলাপুর কমিউন' সেই রক্তস্রোতে ভেসে যায়।

অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল। নূতন শ্রমিক রাষ্ট্রের সকল নায়ক ইংরেজ-সৈন্যদের হাতে বন্দী হলেন। বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে শোলাপুরের রাজপথে শোলাপুর বিপ্লবের ৩০ জন শ্রেষ্ঠ শ্রমিক-নায়ককে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হল। এর পর সামরিক বিচারে প্রায় দুইশত শ্রমিক বিভিন্ন মেয়াদের দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করল।

চতুর্দশ অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতীয় অভ্যুত্থান (১৯৩০-৩১)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতীয় কৃষক-সংগ্রাম দীর্ঘকালের। মোগল সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির বিরুদ্ধেও তারা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। সে সময় তাদের সংগ্রাম বেশীদিন চলেনি। সম্রাট আকবর তার শাসন-কালে কয়েকবার মাত্র এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির পর তিনি এই অঞ্চলটি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।

কিন্তু এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসন বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর সঙ্গে পাঠান উপজাতীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম আরম্ভ করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই সেই সংগ্রাম চলেছিল। ইংরেজ সামরিক শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের আত্মরক্ষা করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়েছিল। এই জন্যই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান উপজাতীয় অঞ্চলটিকে বলা হয় "ব্রিটিশ স্থল-সৈন্যবাহিনী ও বোমারু বিমান-বাহিনীর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার আদর্শ ক্ষেত্র।"

*　　　*　　　*

পেশোয়ার অভ্যুত্থানের কিছুকাল পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উৎমনজাই গ্রামে আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ নামক একজন পাঠান সর্দারের নেতৃত্বে একটি পাঠান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে গড়ে তোলা হয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আদর্শে এবং এই বাহিনীর নাম রাখা হয় 'আল্লার সেবকদল।' প্রথমে তাদের পোশাকের রঙ ছিল সাদা, কিন্তু সাদা রঙ শীঘ্র ময়লা হয় বলে তারা লাল রঙের পোশাক পরতে আরম্ভ করে। তাদের পোশাকের রঙের জন্যই তাদের অভিহিত করা হয় 'রেডসার্ট সেচ্ছাসেবক দল' নামে।

'রেডসার্ট স্বেচ্ছাসেবকদলের' কর্মনীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়ঃ পাঠানদের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ও সক্রিয় সংগ্রাম এবং শ্রম-জীবী জনসাধারণের জীবিকার মানোন্নয়ন। এই কর্মনীতির ঘোষণার ফলে দলে দলে দরিদ্র পাঠান কৃষক ও কারিগরগণ 'রেডসার্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী'তে যোগদান করে। ১৯৩০ সালের শেষভাগে আব্দুল গফ্‌ফর খাঁর 'রেডসার্ট দল' ৮০ হাজার সভ্যের এক বিশাল কৃষক-বাহিনীতে পরিণত হয়। আব্দুল গফ্‌ফর খাঁর অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই 'রেডসার্ট দল' একটি বিশাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তিনি এই বাহিনীকে

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই জন্য তিনি সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত হন।

প্রথমে গফ্ফর খাঁ ছিলেন স্বাধীনতাকামী ব্যবসায়িশ্রেণী ও পাঠান ভূস্বামীদের প্রতিনিধি। তিনি পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তিনি কিছুদিনের জন্য নির্বাসন দণ্ডও ভোগ করেছিলেন।

গফ্ফর খাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও 'রেডসার্ট বাহিনী' কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে। এই বাহিনী কয়েকটি জেলায় ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। এই অভ্যুত্থান সীমান্তের বিভিন্ন আধা-স্বাধীন উপজাতিগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইংরেজ শাসনের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে উদ্যত হয়।

১৯৩০ সালে পেশোয়ার শহরে ১০ দিনের জন্য শ্রমিক-কৃষকদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ শুনে ১০ই মে তারিখে আফ্রিদি উপজাতির ১০ হাজার স্বেচ্ছাসৈন্য পেশোয়ার যাত্রা করে। এই বাহিনী 'রেডসার্ট বাহিনী'র পতাকা, নওজোয়ান ভারত সভার লাল পতাকা এবং কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা প্রভাবিত 'কীর্তি কিসান পার্টি'র লাল পতাকায় সুসজ্জিত ছিল। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখিকা জোয়ান বুসাম্প ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অবলম্বনে লিখেছিলেন :

"পেশোয়ারের অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর বিদ্রোহী পাঠানগণ তুরন গাজীর সর্দার হাজি সাহেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। হাজি সাহেব এক বিরাট কৃষক-বাহিনী নিয়ে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পেশোয়ারের ২০ মাইলের মধ্যে এসে উপস্থিত হন। এই সময় আফ্রিদি উপজাতীয়রা (সংখ্যায় প্রায় ১০ হাজার) এবং অন্যান্য উপজাতীয় কৃষকগণও অভ্যুত্থান শুরু করে একত্রে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু ইংরেজদের 'রয়াল এয়ার ফোর্স' নামক জঙ্গী বিমান-বাহিনী দ্বারা প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলে তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়।....এই সময় অহিংস 'রেডসার্ট বাহিনী'ও সরকারী দমন নীতির নিষ্ঠুরতা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে আক্রমণাত্মক ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ করে এবং কিছুকালের জন্য কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নিত রক্তপতাকা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। এই সময় থেকে ইংরেজদের 'রয়াল এয়ার ফোর্স'-এর বোমারু বিমান-বহর দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে উপজাতীয় অঞ্চলের উপর বোমাবর্ষণ করে। বোমাবর্ষণের ফলে 'রেডসার্টদের' গ্রামগুলি বিধ্বস্ত হয়। তুরন গাজীর হাজী সাহেবের প্রভাবাধীন পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই সব অঞ্চলে বহু হাজার টন বোমা বর্ষিত হয়েছিল। এছাড়া 'রেডসার্ট' সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হয় এবং এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে জেলে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু 'রেডসার্ট' বাহিনীর পাঠানগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সকল উপজাতীয় কৃষকদের মধ্যে তারা বৈপ্লবিক

ধ্বনি ও প্রচারকার্য চালায়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত উপজাতীয় কৃষকদের এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল।" (জোয়ান বুসাম্প : ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২০১)

আফ্রিদি উপজাতীয় কৃষকগণ একবার জুলাই মাসে, আর একবার আগস্ট মাসে পেশোয়ার আক্রমণের চেষ্টা করে। ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ আফ্রিদিদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তাদের পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে আফ্রিদি বাহিনীর উপর উন্মত্তের মত আক্রমণ আরম্ভ করে। ইংরেজ সৈন্য-বাহিনী কামান, মেসিনগান আর বোমারু বিমানের জোরে আফ্রিদিদের পেশোয়ার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ইংরেজ বাহিনী আফ্রিদিদের পশুচারণ ক্ষেত্র কাজুরি উপত্যকা অধিকার করে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলে আফ্রিদিদের গ্রামগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। তার ফলে আফ্রিদিরা পিছু হটে গিয়ে পার্বত্য উপজাতীয় অঞ্চলে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ চলে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। আফ্রিদিরা নিরবচ্ছিন্ন কামানের গোলা ও বোমাবর্ষণে এবং দীর্ঘকালের অবরোধের ফলে সর্বস্বান্ত বহু পাঠান কৃষকের মৃত্যুতে হীনবল হয়ে শেষ পর্যন্ত অক্টোবর মাসে ইংরেজ সামরিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

আফ্রিদি ও মোমন্দ উপজাতীয়গণ তাদের সংগ্রামের সময় 'রেডসার্ট বাহিনী'র কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল। 'রেডসার্ট বাহিনী' ইংরেজ-সৈন্যদের গোলা-বর্ষণ ও বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করে পাঠান অভিযাত্রীদের খাদ্য সরবরাহ করত। যে পথে ইংরেজ বাহিনী আফ্রিদি ও মোমন্দ উপজাতীয়দের ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, রেডসার্ট'রা সেই পথের উপর ইংরেজদের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। তারা রাস্তার উপর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের লাইন কেটে, রাস্তা ধ্বংস করে, আর সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করে ইংরেজ বাহিনীর অভিযানে বাধা দেয়। এর ফলে ইংরেজ বাহিনীকে বহু ক্ষেত্রে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

'রেডসার্ট'দের সাহায্যেই মোমন্দ উপজাতীয় কৃষক যোদ্ধারা ইংরেজ সৈন্য-বাহিনীর কবল থেকে মালাকান্দ অঞ্চলের সুরক্ষিত কেন্দ্রটি ও সারকাদার শহর উদ্ধার করে ঐ দুটি স্থান ৭ দিন পর্যন্ত অধিকার করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অবশেষে ইংরেজ বাহিনী উপজাতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের পর ঐ দুটি স্থান পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নাগা বিদ্রোহ (১৮৩০-৩২)

পূর্ব ইতিহাস

আসামকে বলা হয় 'বিভিন্ন জাতির যাদুঘর'। আসামের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কত জাতি-উপজাতি যে বাস করে, তার হিসাব করা কঠিন। খাসিয়া, সিণ্টেং, মোরাণ, বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত কাছারী, গারো, মিকির, নাগা প্রভৃতি নানা জাতির সমাবেশ হয়েছে আসামে। এদের মধ্যে নাগা জাতি সর্বপ্রধান। নাগা জাতি আবার আঙ্গামী, রেঙ্গমা, লোটা, আও, সেমা প্রভৃতি বহু বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত। এই সকল জাতি-উপজাতি আসামে থেকে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল বহু প্রাচীনকালে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে) অহোম জাতি আসামে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন আদিবাসী জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করে নাগা ও খাসিয়া অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র আসামের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। আসামের উপর প্রায় ছয় শত বৎসর অহোম রাজবংশের শাসন অব্যাহত থাকে। এই রাজ-বংশের অত্যাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসনে বিভিন্ন জাতির আদিবাসী চাষী শোষণ-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘকাল ধরে এক ব্যাপক বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। এই বিদ্রোহই আসামের ইতিহাসে 'মোয়ারিয়া বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহের আঘাতে অহোম শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ইংরেজগণ আসামের শ্রীহট্ট অধিকার করেছিল। তারা এই বিদ্রোহের গোড়ার দিকে নিরপেক্ষ মনোভাব দেখালেও পরে বিদ্রোহে যোগদান করে। ইংরেজগণ প্রথমে অহোম রাজকে তাদের রক্ষণাধীনে রেখে তার নামে শাসন-কার্য পরিচালনা করে। তারা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে দখল করে আসামের দক্ষিণ অঞ্চল, পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সমগ্র আসাম গ্রাস করে বসে।

প্রথম থেকেই শ্রীহট্ট ও আসামের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করে ইংরেজগণ আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল। সেই সময়ই ইংরেজ শাসকগণের সঙ্গে আসামের নাগা, খাসিয়া প্রভৃতি চির-স্বাধীন পার্বত্য আদিবাসীদের প্রথম পরিচয় ও সংযোগ ঘটে। ইংরেজদের ব্যবসার উদ্দেশ্য অর্থ লুণ্ঠন, সেই ব্যবসা পরিচালিত হয় কামান-বন্দুকের জোরে। সুতরাং আসামের নাগা, খাসিয়া প্রভৃতি আদিবাসীরা ইংরেজ বণিকদের ব্যবসার ও তাদের শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ইংরেজগণের আসামের শাসন-ক্ষমতা লাভের পর বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে তাদের ব্যবসা ও শাসন ছিল সর্বধ্বংসী। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের অতি প্রাচীন সমাজের ভিত্তি ছিল অতি সরল ও

আদিম দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থা। তাতে মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সার প্রয়োজন হত না। সমাজে শোষণের নামগন্ধও ছিল না। কালক্রমে সর্দারগণের শোষণ আরম্ভ হলেও, তা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু ইংরেজ বণিকরাজের শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থা আদিবাসীদের এই সরল ও শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। আধুনিক যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হল সর্বশক্তিমান মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা। ইংরেজ-বণিকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই শ্রীহট্টকে কেন্দ্র করে পার্বত্য অঞ্চলে যে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে, তার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে টাকা-পয়সার প্রচলনের চেষ্টা চলে। প্রথম থেকেই খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি আদিবাসীরা প্রাণপণ শক্তিতে সেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুদ্রার প্রচলনে বাধা দেয়। কিন্তু আসামের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করবার পর, ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা হল। জমির উপর যে কর ধার্য হল, প্রতি বাসগৃহের উপর যে কর বসল, সবই দিতে হত টাকায়। আদিবাসীদের সেই টাকা সংগ্রহ করতে হত ক্ষেতের শস্য বিক্রয় করে। করের টাকা সংগ্রহ করতে তাদের সব ফসল বিক্রয় করতে হত ব্যবসায়ীদের কাছে। আদিবাসীদের টাকা ঋণ দেবার জন্য ক্রমে ক্রমে মহাজনদের ভিড় জমে উঠল। ইংরেজ রাজের শাসনের অধীনে এসে এই আদিবাসী মানুষ শোষণের শিকারে পরিণত হল। তাদের প্রাচীন সমাজ, তাদের জীবিকা, সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। তার পরিবর্তে তারা শাসকদের কাছ থেকে পেল না কিছুই। তাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ অবশেষে বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। ইংরেজ শাসনাধীনে আসামের আদিবাসীদের, বিশেষত নাগা জাতির ইতিহাস হল, প্রায় দুই শতাব্দীর বিদ্রোহের ইতিহাস।

নাগা আদিবাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম বড় সংঘর্ষ ঘটে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় ইংরেজগণ মণিপুর-রাজের সাহায্য নিয়ে নাগা বিদ্রোহীদের সাময়িকভাবে দমন করতে সক্ষম হয়। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র নাগা পাহাড় অঞ্চল মণিপুর-রাজকে অর্পণ করা হয়। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার নাগা জাতি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইংরেজগণ এবারেও মণিপুর-রাজের সাহায্য নিয়ে বিদ্রোহী নাগাদের দমনের জন্য সচেষ্ট হয়। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাগা আদিবাসীরা অসীম বিক্রমে সংগ্রাম চালনা করে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-রাজ নাগা পাহাড় অঞ্চল মণিপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের শাসনাধীনে আনয়ন করে। অবশ্য এই অঞ্চলে ইংরেজ শাসন নামেই পর্যবসিত হয়। কারণ, নাগারাও কোনদিন ইংরেজ শাসনের নিকট মাথা নত করেনি, কিংবা ইংরেজ শাসকগণও কোনদিন সমগ্র নাগা অঞ্চল ও নাগা জাতির সকল সম্প্রদায়কে পদানত করতে সক্ষম হয়নি।

ইংরেজ শাসকগণ সমগ্র নাগা অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে না পেরে দখলভুক্ত অঞ্চলটি স্বাধীন অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্য শেষোক্ত অঞ্চলকে শাসন-বহির্ভূত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে। নাগা অঞ্চলের শাসনাধীন অঞ্চল ও শাসন-বহির্ভূত স্বাধীন অঞ্চলের মধ্যস্থলে একটি সীমারেখা কল্পনা করে নেওয়া

হয়েছিল। অবশ্য স্বাধীন অঞ্চলের নাগারা কোনদিনই সেই কাল্পনিক রেখা স্বীকার করে নেয়নি।

নাগা অঞ্চলের যে অংশ ইংরেজ শাসকদের কাছে মাথা নত করেছিল, তা নিয়েই গঠিত হয় নাগা পাহাড়ের শাসনাধীন অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে কাবুই ও কাচা সম্প্রদায়ের নাগারা। এই অঞ্চলের নাগাদের উপর ইংরেজ শাসকদের শোষণ-উৎপীড়নের কোন সীমা ছিল না। শাসকগণ এদের প্রতি বাসগৃহের উপর তিন টাকা করে গৃহকর ধার্য করে। তার উপর এই অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য সকল বয়োপ্রাপ্ত নাগাকেই বেগার খাটতে হত। বেগার খাটতে অস্বীকার করলে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের লাঞ্ছনার সীমা রাখত না। এই রাস্তাঘাট তৈয়ারী হত স্বাধীন নাগাদের পদানত করতে। সুতরাং পরাধীন নাগাদের বেগার খাটতে হত স্বাধীন নাগাদের সর্বনাশ করবার জন্য।

ইংরেজ-রাজের এই শোষণ-উৎপীড়ন ও এই বিদেশীদের জন্য স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কার্য পরাধীন অঞ্চলের নাগাদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত করে তুলছিল। এই বিক্ষোভ ক্রমশ বিস্ফোরণের অবস্থায় পরিণত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল ঝড় সারা ভারতবর্ষকে মথিত করে ফেলছিল। সেই ঝড় সমগ্র আসামকেও আলোড়িত করে তোলে। আর সেই ঝড়ের প্রচণ্ড আলোড়নে পরাধীন অঞ্চলের নাগাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ থেকে বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে। সেই বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় ভারতের পূর্ব প্রান্ত লাল হয়ে যায় এবং পূর্বপ্রান্তের ইংরেজ শাসন সেই আগুনে ধ্বংস হবার উপক্রম হয়।

১৯৩০-৩২ সালের অভ্যুত্থান

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের-স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বৃহত্তম সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এক দিকে আরম্ভ হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন, আর অন্য দিকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখা দেয় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম। কয়েক মাসের জন্য মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে যায়। চট্টগ্রামের মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবীরা শহরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এবং দুইদিন পর্যন্ত শহর অধিকার করে রাখে। পেশোয়ারে দশদিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন অচল হয়ে থাকে। শোলাপুরের শ্রমিকগণ সাত দিনের জন্য শহরের মধ্যে নিজেদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। যুক্ত প্রদেশের কৃষক-বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই অঞ্চলে কৃষকের কর বন্ধের আন্দোলন অবিলম্বে খাজনা বন্ধের সংগ্রামে পরিণত হয়। সমগ্র দেশে জনসাধারণের আঘাতে ইংরেজ শাসনের মূল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এই সুযোগে আসামের পরাধীন অঞ্চলের নাগারাও ইংরেজ শাসকগণের শোষণ-উৎপীড়ন ও পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত হয়।

এই নাগা বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, যাদুনাঙ ও তাঁর সম্পর্কিত ভগ্নী গাইদিলিউ।* যাদুনাঙ দীর্ঘকাল ধরে নাগা আদিবাসীদের বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ আন্দোলন পরিচালনা করে এবং স্বাধীন নাগাদের শোষণ-উৎপীড়নহীন জীবনের চিত্র তুলে ধরে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিলেন।

পরাধীন নাগা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কাবুই নাগা বংশে গাইদিলিউ-র জন্ম। ইনি বাল্যকালে এক মিশনারী স্কুলে অধ্যয়ন করে কিছু শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করবার সময়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। স্কুলে থাকতেই তিনি স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশার কথা, তাদের মুক্তির কথা ভাবতে আরম্ভ করেন। স্কুল থেকে বের হয়ে, তিনি যাদুনাঙের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেন নাগাদের উপর ইংরেজ শাসনের শোষণ-উৎপীড়ন ও পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত স্বাধীন নাগারাজ্য প্রতিষ্ঠার মহামন্ত্র। এবার দুই ভ্রাতা ভগ্নী মিলে নাগাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে লাগলেন। নাগা আদিবাসীদের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সেই বীজকে মহাবৃক্ষে পরিণত করল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস-পরিচালিত ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন আসামেও বিস্তার লাভ করে আসামের পাহাড় পর্বতকেও কাঁপিয়ে তুলল। এই সুযোগে যাদুনাঙ আর গাইদিলিউ নাগাদের কাছে বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন। নেতৃদ্বয়ের আহ্বানে নাগা পাহাড়েও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। তাঁদের নির্দেশে নাগারা সকলে শাসকদের গৃহকর দেওয়া এবং শাসকদের জন্য বেগার খাটা ও মজুরের কাজ করা বন্ধ করে দিল। পরাধীন নাগা অঞ্চলে সমস্ত নাগা আদিবাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। গৃহকর আদায় ও বেগার খাটবার লোক সংগ্রহ করতে গিয়ে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী নিহত হল।

পূর্বাঞ্চলের শাসকগণ প্রমাদ গণল। কারণ তারা জানত, পরাধীন অঞ্চলের নাগারা স্বাধীন অঞ্চলের চিরবিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে মিলিত হলে সমগ্র নাগা পাহাড়ে যে আগুন জ্বলে উঠবে, তা নির্বাপিত করা অসম্ভব। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর হল। তারা এই অঞ্চলের সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়ে বিদ্রোহী নাগাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্রোহের প্রধান নায়ক যাদুনাঙকে ধরবার জন্য পুলিস ও সৈন্যবাহিনী শাসনাধীন নাগাপাহাড় অঞ্চল তোলপাড় করতে লাগল। কত নাগা প্রাণ দিল, তাদের কত গৃহ ধূলিসাৎ হল! অবশেষে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যাদুনাঙ ধরা পড়লেন। কর্তৃপক্ষ কালবিলম্ব না করে বিচারের প্রহসন করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। যাদুনাঙ ইংরেজরাজের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে পরাধীন দেশের বিদ্রোহী নায়কের যোগ্য পুরস্কার লাভ করলেন।

* ইনি সাধারণভাবে পরিচিত গুইদালো নামে। কিন্তু আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র মহাশয়ের মতে তাঁর প্রকৃত নাম 'গাইদিলিউ'।

বিদ্রোহের প্রধান নায়ক যাদুনাঙকে হত্যা করে শাসকগণ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হল না। গণ-বিদ্রোহে নায়কের শূন্যস্থান অন্য নায়ক এসে পূরণ করে। যাদুনাঙের শূন্যস্থান পূরণ করলেন উনিশ বৎসর বয়স্কা তরুণী গাইদিলিউ। অব্যাহত গতিতে নাগা বিদ্রোহ চলতে লাগল। গাইদিলিউ এখন আর সাধারণ মেয়ে নন বা বিদ্রোহের সাধারণ কর্মী নন। স্বজাতির মুক্তি সাধনের জন্য গাইদিলিউ এতদিন গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা তুচ্ছ করে নাগা জনসাধারণের এই মহা-সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে জনগণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছেন, সৈন্য ও পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে হাতে বন্দুক নিয়েছেন। তাই বিদ্রোহী নাগারা এই তরুণী নাগাকন্যার প্রতি তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করে তাঁকে তাদের 'রানী'র আসনে বসিয়েছে। রানী গাইদিলিউ তাঁর স্বজাতির এই শ্রদ্ধার সম্মান জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে রক্ষা করেছেন।

যাদুনাঙের মৃত্যুর পর রানী গাইদিলিউ-র যোগ্য নেতৃত্বে নাগা বিদ্রোহ অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। বিদ্রোহী নাগা আদিবাসীরা তাদের রানীর আদেশে মৃত্যু বরণ করতেও প্রস্তুত। গাইদিলিউ-র নেতৃত্বে মণিপুরের চতুর্দিকের পার্বত্য অঞ্চলে, কাছাড় প্রদেশের উত্তরভাগে ও শাসনাধীন নাগা অঞ্চলের সর্বত্র বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করল। শাসকগণ এই সকল অঞ্চলে গৃহকর আদায় করতে অথবা বেগার বা মজুর হিসাবে কাজ করবার জন্য একটি লোকও সংগ্রহ করতে সক্ষম হল না। এই অঞ্চল থেকে সকল সরকারী কর্মচারী প্রাণের ভয়ে পলায়ন করল। বিদ্রোহীরা সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে গেরিলা ধরনে যুদ্ধ আরম্ভ করল। তারা পাহাড়-পর্বতের গোপন স্থানে লুকিয়ে থেকে সৈন্য ও পুলিসদলের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে, আবার উধাও হয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতের এই লুকোচুরির যুদ্ধে ইংরেজের সামরিক শক্তি নাজেহাল হতে লাগল। এইভাবে যুদ্ধ চলল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই অঞ্চলের শাসনকর্তারা বুঝল, যতদিন গাইদিলিউ স্বাধীনভাবে নাগাদের মধ্যে বিচরণ করবেন, যতদিন তাঁর উপর নাগাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটুট থাকবে, ততদিন এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং গাইদিলিউকে বন্দী ও নাগাদের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে তাঁর উপর থেকে নাগাদের বিশ্বাস নষ্ট করবার জন্য শাসকগণ নানা প্রকার চক্রান্ত আরম্ভ করল।

মণিপুরের নিকটবর্তী সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের শাসনকর্তা হল মণিপুর রাজ্যে নিযুক্ত রেসিডেন্ট ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব। বহু চেষ্টা করেও রানী গাইদিলিউকে বন্দী করতে না পেরে, সে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি গাইদিলিউকে ধরিয়ে দিতে পারবে, সে দুইশত টাকা ও একটি বন্দুক পুরস্কার পাবে। কিন্তু এই ঘোষণায় কোন কাজ হল না, নাগাদের মধ্যে কেউই তাদের প্রিয় নেত্রী রানী গাইদিলিউর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল না। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি লোভনীয় পুরস্কার ঘোষিত হল। গাইদিলিউকে যে ধরিয়ে দিতে অথবা তাঁর গতি-বিধির সংবাদ দিতে পারবে, তাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অধিকন্তু যে গ্রামের লোকেরা তাঁকে ধরবার জন্য সৈন্য ও পুলিসকে সাহায্য করবে, সেই

গ্রামের লোকদের দশ বৎসর পর্যন্ত কোন গৃহকর দিতে হবে না। ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব এতেও সন্তুষ্ট হল না, রানী গাইদিলিউকে নাগাদের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে, তাঁর উপর থেকে তাদের সমস্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে এক অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন করল। সে মণিপুর রাজদরবারের মারফত ঘোষণা করল, গাইদিলিউ যাদুকরী—ডাইনী।

নাগা এবং অন্যান্য আদিবাসীদের নিকট 'ডাইনী' কথাটি অতি ভয়ংকর। তাদের ধারণা এই যে, ডাইনীরা মন্ত্রদ্বারা মানুষকে পশুতে পরিণত করতে পারে এবং তাকে দিয়ে তাদের যা ইচ্ছা তা করাতে পারে। সুতরাং নাগারা ডাইনীকে ভীষণ ভয় করে। তারা যদি কোন স্ত্রীলোককে ডাইনী বলে মনে করে, তবে তাকে নানারূপ নির্যাতন করে হত্যা করে, অথবা আগুনে পুড়িয়ে মারে। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ভেবে-ছিল যে, 'গাইদিলিউ ডাইনী'—এই কথা প্রচারিত হওয়ামাত্র বিদ্রোহী নাগারাও গাইদিলিউকে হত্যা করবে অথবা ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবে। আর তার ফলে নাগা বিদ্রোহেরও অবসান হবে। বিদ্রোহী নাগারা ইংরেজ শয়তানদের এই মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করল না, ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চক্রান্ত ব্যর্থ হল।

ইংরেজদের এরূপ বর্বরসুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি এই নূতন নয়। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে তারাই ফরাসী দেশের বীর কৃষক কন্যা 'জোয়ান অফ আর্ক'-কে 'ডাইনী' বলে প্রচার করেছিল এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে প্রতিহিংসার জ্বালা মিটিয়েছিল। তখন ফরাসী দেশ ছিল ইংরেজদের অধীন। ইংরেজদের অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হয়ে ফরাসী কৃষকেরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করলে গাইদিলিউর মতই জোয়ানও সেই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন। জোয়ানের নেতৃত্বে ফরাসী দেশের কৃষক বিদ্রোহীরা বারংবার ইংরেজদের সামরিক শক্তিকে পরাজিত করেছিল। অবশেষে ইংরেজগণ কৃষকদের কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বাসঘাতক ফরাসী ভূস্বামীদের সহায়তায় এই বীর কৃষককন্যা জোয়ানকে 'ডাইনী' বলে ঘোষণা করল। ফরাসী কৃষকেরা সেই সময় ইংরেজ শয়তানদের সেই ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে, জোয়ানকে 'ডাইনী' বলে মনে করল এবং তাঁকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করল। ইংরেজ দস্যুরা এক বিচারের অভিনয় করে বিচারের রায় অনুসারে এই বীর কন্যাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করে হত্যা করেছিল। ফরাসীরা দীর্ঘকাল পরে জাতীয় চেতনা ফিরে পেয়ে জোয়ানকে 'সেণ্ট জোয়ান অফ আর্ক'—এই উচ্চ সম্মানজনক উপাধি দান করেছে এবং এইভাবে জোয়ানকে ফরাসী দেশের জাতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব সম্ভবত তাঁর পূর্ব-পুরুষদের এই কুকীর্তির কথা স্মরণ করে নাগা বিদ্রোহ দমনের জন্য একই প্রকারের ঘৃণ্য চক্রান্তের আশ্রয় নিয়েছিল এবং জোয়ানের মতই রানী গাইদিলিউকেও মণিপুর দরবারের মারফত 'ডাইনী' বলে ঘোষণা করল। কিন্তু বিদ্রোহী নাগারা ইংরেজ শয়তানদের উত্তমরূপেই চিনতে পেরেছিল। তাই তারা ইংরেজদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি, তাদের বীর কন্যাকে জোয়ানের মত ইংরেজ শত্রুর হাতে তুলে দেয়নি।

ইংরেজ শাসকগণ তাদের এরূপ সুচিন্তিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে দেখে এবার নগ্ন বর্বরতার আশ্রয় নিল। হাজার হাজার সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস নাগা পাহাড় অঞ্চলে সমবেত হয়ে ধ্বংসের তাণ্ডব আরম্ভ করল। বিদ্রোহী নাগাদের গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত সৈন্য ও পুলিস প্রবেশ করে অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে হত্যা এবং নাগা কুটির ভস্মীভূত করতে লাগল, কয়েকটি বড় বড় গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

রানী গাইদিলিউর নেতৃত্বে নাগা বিদ্রোহীরাও বিভিন্ন সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিসের ঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। সমগ্র নাগা পাহাড় অঞ্চলে দুই পক্ষের সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন লাউজ্‌লি নামে এক ইংরেজ সেনাপতির অধীনে একটি প্রকাণ্ড সৈন্যদল আসামে উপস্থিত হয়ে নূতনভাবে অত্যাচার আরম্ভ করল। সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস দলের অবর্ণনীয় অত্যাচারে বহু নাগা বাড়ী, ঘর ও গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করল, তাদের শস্য ধ্বংস হল, ঘর-বাড়ী ভস্মীভূত হল। সৈন্য ও পুলিসের দল গ্রামের পর গ্রাম ঘেরাও করে গাইদিলিউর সন্ধান করতে লাগল। এর সঙ্গে সঙ্গে তারা গাইদিলিউর সন্ধান দেবার জন্য অর্থ পুরস্কার ও দীর্ঘকালের কর মুকুবের প্রলোভন দেখিয়ে নাগাদের মধ্য থেকে বিশ্বাসঘাতক খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। সৈন্য ও পুলিসের অসহনীয় উৎপীড়নে পাগল হয়ে কয়েকজন নাগা ইংরেজ শয়তানদের ফাঁদে পা দিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সেনাপতি সংবাদ পেল, গাইদিলিউ নাগা পাহাড় অঞ্চলের খানোমা গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্য ও বহু পুলিস গভীর রাত্রিতে গাইদিলিউকে বন্দী করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কয়েকদিন গোপনে দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে তারা রাত্রিকালে খানোমা গ্রামের নিকটবর্তী হল এবং গভীর অন্ধকারে নিঃশব্দে গ্রামখানি ঘিরে প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। রাত্রি প্রভাতে এই বিপুল সামরিক বাহিনীর এক অংশ গ্রামের চতুর্দিক ঘিরে রইল এবং অপর অংশ সঙ্গীন উচিয়ে প্রত্যেকটি বাড়ীতে গাইদিলিউর সন্ধান করতে লাগল। নাগা পাহাড়ের সুদূর অভ্যন্তরে একটি নগণ্য গ্রামের উপর সৈন্যবাহিনীর এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে এবং বিপুল সামরিক আয়োজন দেখে নাগারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বাধাদানের কিছুমাত্র সুযোগ পেল না। তাদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এ হল তাদেরই কোন স্বজাতি বিশ্বাস-ঘাতকের কাজ।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর নাগা বিদ্রোহের অধিনায়িকা রানী গাইদিলিউ ও তাঁর কয়েকজন অনুচর ইংরেজ-সৈন্যদের হস্তে বন্দী হলেন। এই বিশাল সামরিক শক্তির অতর্কিত আক্রমণে অসহায় গ্রামবাসীরা নীরবে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের বীর কন্যাকে বিদায় দিল।

গাইদিলিউকে মণিপুরে নিয়ে আসা হল। মণিপুর রাজ্যের রেসিডেন্ট ও সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক তাঁর বিচার করল, নরহত্যা ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। আসামের ঐতিহাসিক নাগা

বিদ্রোহের অধিনায়িকা রানী গাইদিলিউ মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ইংরেজ-রাজের কারাগারে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ হলেন। নাগারা তাদের অধিনায়িকার গ্রেপ্তারে হতাশায় ভেঙে পড়ল। ধীরে ধীরে বিদ্রোহের অবসান হল।

* * * *

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের বহু প্রদেশের মত আসামেও কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গাইদিলিউ মুক্তিলাভ করেননি। সম্ভবত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীর নারী-যোদ্ধার কথা তখন ভারতের মানুষ বিস্মৃত হয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় অঞ্চলের নাগারা কোনদিন তাদের প্রিয় রানীকে বিস্মৃত হয়নি। কংগ্রেস সরকার গঠিত হবার পর নাগারা তাদের রানীর মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। তার পর আসামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যোগদানের ফলে এই আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আসাম-ভ্রমণে এলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নাগা বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ অবগত হন এবং গাইদিলিউর মুক্তির আন্দোলন সমর্থন করে Release Giedileu শীর্ষক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তাতে তিনি নাগা রানী গাইদিলিউর গভীর দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা ও এর তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন:

"তিনি (গাইদিলিউ) স্বজাতির মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং সেই পতাকার নীচে সমবেত হতে তাঁর স্বজাতিকে আহ্বান করেছিলেন।"

ইংরেজ শাসকগণ অবশেষে গাইদিলিউকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই নাগা বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর বৈপ্লবিক প্রভাব এবং নেতৃদ্বয় যাদুনাঙ ও রানী গাইদিলিউর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই বৈপ্লবিক প্রভাব, অজেয় দেশপ্রেম ও নিঃশেষে আত্মত্যাগ চরম সার্থকতা লাভ করেছে ভারতের স্বাধীনতা লাভে।

ষোড়শ অধ্যায়

মালদহ-দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৯৩২)

সাঁওতাল পরগনায় সাঁওতালদের ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর বহুকাল আর তাদের মাদল-ধ্বনি শোনা যায়নি। তাদের সেই বিদ্রোহের মাদল স্তব্ধ হয়ে ছিল বহুকাল। ইতিমধ্যে শোষণ-অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সাঁওতালরা জীবিকা-সংগ্রহ আর শান্তিতে জীবন যাপনের আশা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিম আর উত্তরবঙ্গের বহু জেলায়। উত্তরবঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের এক বিরাট দল। তারা এসে বসতি স্থাপন করল উত্তরবঙ্গের মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায়।

উত্তরবঙ্গের সাঁওতালরা হল কুখ্যাত জোতদারদের জমির বর্গাদার। উত্তরবঙ্গের জমিদারগোষ্ঠী অনায়াসে শোষণের শিকার করে নিল নিরীহ নির্বিবাদী সাঁওতালদের। উত্তরবঙ্গের জোতদার এক বিশেষ ধরনের জোতদার। জোতদার দুই রকমের। এক শ্রেণীর জোতদার আছে, তারা অনেক জায়গা-জমি নিয়ে ট্রাক্টর প্রভৃতি উন্নত যন্ত্রপাতি আর মজুর নিয়ে চাষ-আবাদ করে, মজুরদের নির্দিষ্ট হারে মজুরি দেয়। তারা ধনতান্ত্রিক জোতদার।

উত্তরবঙ্গের জোতদার এ ধরনের নয়। তারা সেকেলে ধরনের জোতদার। তাদের কাজই হল সাঁওতাল আর অন্যান্য উপজাতীয় চাষীদের কাছে জমি, টাকা বা বর্গা দেওয়া। যে সময়ের কথা তখন বর্গাদার চাষী নিজেরাই সমস্ত খরচ জুগিয়ে যে ফসল ফলাত, তার অর্ধেক অংশ নিজ খরচে তুলে দিয়ে আসত জোতদারের গোলায়। তাই বর্গাদার চাষীর নাম ছিল 'আধিয়ার'। বর্গাদার চাষী তার ভাগে যে ফসল পেত, তাতে তার চাষের খরচও উঠত না, সারা বছর দু'বেলা খাওয়া তো ছিল দূরের কথা। তার উপর ছিল বর্গাদার উচ্ছেদ। পুরানো বর্গাদারকে উচ্ছেদ করে নতুন চাষীর কাছে জমি বর্গা দিলে জোতদারদের লাভ হত অনেক। তাছাড়া, অনেক বছর ধরে একই চাষী জমি চাষ করলে জমির উপর সে অধিকার দাবি করতে পারত। কিন্তু বছর বছর নতুন চাষীকে জমি বর্গা দিলে সে ভয় আর থাকত না। এই ভাবে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল চাষী জোতদারদের ডবল শোষণের শিকার হল—প্রথমত হল চাষের শিকার, দ্বিতীয়ত হল উচ্ছেদের শিকার। এসব চলল বছরের পর বছর।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই এক ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট পৃথিবীর ধনতন্ত্রের ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। ভারতের চাষীদের উপরেও এসে পড়ল এই মহাসংকটের প্রচণ্ড ধাক্কা। ফসলের দাম অর্ধেকের চেয়েও কমে গেল। চারদিকে চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। এই সংকটের সময় অন্যান্য স্থানের মত উত্তর-

বঙ্গের জোতদারগোষ্ঠীও চাষীদের উপর নতুন করে আক্রমণ আরম্ভ করল। তারা এই সংকটের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিল বর্গাদার চাষীদের মাথার উপর। জোতদাররা বর্গা চাষীদের কাছে ফসলের দুভাগের পরিবর্তে তিনভাগ দাবি করল। এ দাবি বর্গা চাষীরা না মানলে তাদের উচ্ছেদ করে নূতন লোকের কাছে জমি বিলি করা হতে লাগল। এই সময় কত বর্গাদার যে উচ্ছেদ হল তার সংখ্যা নেই। চারদিকে জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গা চাষীদের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

মালদহ আর দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সাঁওতাল চাষীরাও জোতদার-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করল। আবার বেজে উঠল সাঁওতাল চাষীদের বিদ্রোহের মাদল। সেই পাগল করা মাদলের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল দিনাজপুর আর মালদহ জেলার এক বিরাট অঞ্চল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষদিকে আরম্ভ হল সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ। বিদ্রোহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন দিনাজপুরের বাঁশরি গ্রামের দুই বীর সাঁওতাল নায়ক—জিতু বোটকা আর সামু। তাঁরা দুই জনে দিনাজপুর আর মালদহ জেলার সকল সাঁওতাল চাষীর পরম শ্রদ্ধার পাত্র। জিতু আর সামু দুজনে মিলে প্রায় দুই হাজার সাঁওতাল চাষী সমবেত করলেন তাঁদের বিদ্রোহের পতাকা-তলে। তার পর শুরু হল জোতদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম। বহু জোতদারের বাড়ি আর ধানের গোলা বিদ্রোহী সাঁওতালদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল। জোতদারগোষ্ঠী প্রাণের ভয়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে থানায় গিয়ে পুলিসের আশ্রয় নিল। তারা দুই জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আকুল আবেদন জানাতে লাগল। উত্তরবঙ্গে ইংরেজ শাসনের অন্যতম প্রধান খুঁটি হল এই দুই জোতদারগোষ্ঠী। সুতরাং এই খুঁটিদের রক্ষা করার জন্য দুই জেলার দুই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দিনাজপুর আর মালদহ জেলার দুই ম্যাজিস্ট্রেট অনেক পরামর্শ করে বিদ্রোহী সাঁওতালদের দমনের জন্য বিপুল আয়োজন করল। দলে দলে সশস্ত্র পুলিস ছুটে এল বিদ্রোহ-কম্পিত গ্রামাঞ্চলের দিকে। এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য তারা পাগল হয়ে উঠল। পুলিসের হাতে রাইফেল আর মেসিনগান, অন্যদিকে সাঁওতালদের অস্ত্র তীর-ধনুক, বল্লম আর তলোয়ার। বিদ্রোহী সাঁওতাল আর পুলিসদলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ চলল, উভয় পক্ষে বহু হতাহত হল।

কিন্তু সাঁওতালদের পক্ষে তীর-ধনুক আর বল্লম-তলোয়ার নিয়ে বেশীদিন রাইফেল মেসিনগানের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এই অসমান যুদ্ধ মাঠে ঘাটে সম্ভব নয়, তার জন্য চাই কোন আড়াল বা দেয়ালের মত কিছু। দেওয়ালের আড়াল থেকে চোরাগোপ্তাভাবে সাঁওতালরা তাদের ধনুক দিয়ে দূর পাল্লার তীর ছুঁড়বে, বন্দুক আর মেসিনগানের গুলি থেকে আত্মরক্ষা করে শত্রুদের মারবে। তার জন্য চাই দুর্গের মত একটা আশ্রয়। কিন্তু দুর্গ কোথায় পাওয়া যাবে? অবশেষে বিদ্রোহের সেনাপতি জিতু এবং তাঁর সহকারী সামু দেওয়ালের আড়াল থেকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার এক অভিনব পরিকল্পনা করলেন।

মালদহের পাণ্ডুয়া অঞ্চলের আদিনা মসজিদ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে বহু-দিন থেকে। এ মসজিদ দেখেছে এ অঞ্চলের শত্রুদের সঙ্গে কৃষকদের অনেক যুদ্ধ। আরও দেখেছে ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' এবং ইংরেজদের সঙ্গে কৃষকদের যুদ্ধ, সে যুগের কৃষকদের 'দিনাজপুর বিদ্রোহ'ও ঘটেছিল এই অঞ্চলেই। তারও নীরব সাক্ষী এই আদিনা মসজিদ। সেই 'দিনাজপুর বিদ্রোহ'-এর প্রধান নায়ক ছিলেন নুরুলউদ্দিন। এবারও এই মসজিদ এই সাঁওতাল বিদ্রোহেরও সাক্ষী হয়ে থাক। জিতু আর সামু এই ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদকেই বিদ্রোহের দুর্গরূপে ব্যবহার করতে সিদ্ধান্ত করলেন।

জিতু আর সামু তাঁদের প্রায় দু'হাজার সাঁওতাল যুবক দিয়ে গড়া বাহিনী নিয়ে গোপনে আদিনা মসজিদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এবার মসজিদের মধ্যে শেষ যুদ্ধের আয়োজন চলতে লাগল। দুই নেতা তাঁদের বাহিনীকে ভাগ ভাগ করে মসজিদের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করলেন। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হলেন জিতু। জিতু নিজেকে 'সেনাপতি গান্ধী' বলে ঘোষণা করলেন।

তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বে চলছিল কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন। ভারতের শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণও তাদের নিজস্ব কোন পার্টিকে আন্দোলনের নেতৃত্বে না দেখে গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের সংগ্রামেই যোগদান করেছিল। গান্ধীর নাম তখন সারা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল চাষীরা গান্ধীর নামই কেবল শুনেছিল। এই সাঁওতাল চাষীরা জানত না গান্ধী কে, গান্ধীর উদ্দেশ্য আর নীতি কি তাও তারা জানত না। তারা কেবল জানত যে, গান্ধী নামে কোন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। সুতরাং গান্ধীর নাম এই বিদ্রোহী সাঁওতালদের সংগ্রামের প্রতীক, সংগ্রামের প্রেরণার উৎস। তাই বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতি জিতু নিজের নাম ঘোষণা করলেন 'সেনাপতি গান্ধী'।

এদিকে বিদ্রোহী সাঁওতালদের আদিনা মসজিদে প্রবেশের সংবাদ পেয়ে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী তেড়ে এল মসজিদের দিকে। পুলিস বাহিনীর নেতৃত্ব নিলেন মালদহ আর দিনাজপুরের দুই ম্যাজিস্ট্রেট। তার সঙ্গে এল দুই জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর প্রতিহিংসা-পাগল জোতদারের দল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর। সশস্ত্র পুলিস বাহিনী আদিনা মসজিদকে ঘিরে ফেলল। ম্যাজিস্ট্রেটরা সাঁওতালদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল। বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ বার বার শোনান হল সাঁওতালদের। তবু এল না কোন উত্তর। তারপর আরম্ভ হল পুলিসের উন্মত্ত গুলি-বর্ষণ। এবার মসজিদের ভেতর থেকে উত্তর এল তীরের মুখে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে পুলিসদের বিদ্ধ করল, বহু পুলিস ধরাশায়ী হল। সমানে চলল গুলি আর তীর বর্ষণ। বহুক্ষণ পরে সে বর্ষণও বন্ধ হয়ে গেল। উন্মত্ত পুলিস মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে বহু সাঁওতালকে হত্যা করল। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় বিদ্রোহের নায়ক জিতু

আর সামু বন্দী হলেন। সাঁওতাল সেনাপতি বীর জিতু আর তাঁর সহকারী সামুকে পুলিস গুলি করে হত্যা করল।

* * * *

গণ-সংগ্রামের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী আদিনা মসজিদ আর একটি গণ-সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে রইল। মসজিদের ভিতরে বাইরে আজও উন্মত্ত পুলিসের গুলিবর্ষণের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে—যেমন উজ্জ্বল হয়ে আছে উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের মধ্যে সেই বিদ্রোহের অমর স্মৃতি। ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদ তার নীরব সাক্ষী আর তার গায়ে গুলিবর্ষণের অসংখ্য ক্ষত আজকের শ্রমিক-কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এই সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী আর তার গভীর তাৎপর্য। বিদ্রোহের নায়ক জিতু আর সহকারী সামু স্মৃতিতে অমর হয়ে আছেন উত্তরবঙ্গের চির-বিদ্রোহী সাঁওতালদের মনের মণিকোঠায়। সেই স্মৃতি চিরকাল সংগ্রামের প্রেরণা যোগাবে, কেবল উত্তরবঙ্গের কৃষকদেরই নয়, সমগ্র বাংলা তথা ভারতের সংগ্রামী কৃষককে।

সপ্তদশ অধ্যায়

উড়িষ্যার ঢেনকানলের প্রজা বিদ্রোহ (১৯৩৮)

দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা

ইংরেজ শাসন-কালে সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের প্রজা সাধারণের অবস্থা ছিল বর্বরোচিত, ভয়ঙ্কর। এই বর্বরোচিত অবস্থার জন্যই এই সব দেশীয় রাজ্যকে বলা হত ভারতবর্ষের 'অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ'। তখন ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজ শাসনের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। কোথাও সাধারণ মানুষ বিদেশী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই ইংরেজ রাজের পুলিস ও সামরিক শক্তি সেই চেষ্টাকে রক্ত-বন্যায় ডুবিয়ে দিত। সারা ভারতবর্ষের পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজ ও অসংখ্য জমিদারের দল ছিল ইংরেজ শাসনের স্তম্ভস্বরূপ, বিদেশী শাসকদের শোষণ-উৎপীড়নের ছোট অংশীদার। এদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল সারা ভারতবর্ষব্যাপী বর্বর-সুলভ শাসন-শোষণের মহাচক্র।

দেশীয় রাজ্যসমূহের বাইরের ইংরেজ শাসন তবু ইচ্ছামত এক একটা 'আইন' তৈরি করে তার অজুহাতে শোষণ-উৎপীড়ন চালাত। কিন্তু 'অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ' দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজদের মুখের হুকুমই ছিল 'আইন-কানুন'। কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের এই সব বর্বর 'আইন-কানুন'-এর বিরুদ্ধে টু-শব্দ করবার উপায় ছিল না। যারা শোষণ-উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করত, তাদের ভাগ্যে জুটত বর্বর-সুলভ দৈহিক উৎপীড়ন আর কারাবাস। সেই সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। এইভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যেই বহু নেতৃস্থানীয় কৃষক-নেতাকে দীর্ঘ কারাবাসে আবদ্ধ থাকতে হত, আর তাদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর চলত সৈন্য ও পুলিসের পাশবিক অত্যাচার।

ভারতবর্ষের অন্যসব দেশীয় রাজ্যের মতই উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিতেও ছিল সমান বর্বরোচিত অবস্থা। এক একটি রাজ্য ছিল এক একটি 'অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ'। অন্যসব রাজ্যের মত উড়িষ্যার রাজ্যগুলিতেও চলত 'বেটি' অর্থাৎ বেগার খাটানো, বিভিন্ন রকমের রাজ-ভেট আদায়, অনির্দিষ্ট ও উচ্চহারে খাজনা আদায়। এই প্রকারের নানা ধরনের শোষণ-উৎপীড়নে পিষ্ট হয়ে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যের চিরদরিদ্র কৃষক হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের ভাগ্যের হাতে সঁপে দিত, অনিবার্য মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটাত। উড়িষ্যার বিখ্যাত বিপ্লবী কবি ও কৃষক-সংগ্রামের নায়ক শচী রাউথ রায় উড়িষ্যার কৃষক জনগণের এই হতাশাচ্ছন্ন অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছেন :

দেশীয় রাজ্যসমূহের "বিপুলসংখ্যক কৃষক ও দিন-মজুরগণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চেতনাহীন হয়ে যেন এক বিশাল দৈত্যের মত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

তারা তাদের কল্পনাতীত দুঃখ-দুর্দশার জন্য নিজেদের জন্মকেই দায়ী করে, নিজের উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তাদের হতাশাচ্ছন্ন মানসিকতা থেকে দেখা দিয়েছে এক ধরনের অদৃষ্টবাদ। একদিকে সুখ-দুঃখের প্রতি মিথ্যা উদাসীনতা তাদের মনকে করে দিয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সুবিধাভোগী উৎপীড়ন এবং নিরঙ্কুশ শোষণ-পীড়নের দানবীয় প্রথা তাদের দেহটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেছে।"[১]

দেশীয় রাজ্যের জাগরণ

এই হতাশাজনক অবস্থার প্রতিবিধান হিসাবে উড়িষ্যার জননায়কদের উদ্যোগে ১৯২৮-২৯ সাল থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কিছু কিছু আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তার ফল হয়নি কিছুই। উপরন্তু দাম্ভিক রাজা-মহারাজদের স্বেচ্ছাচার ও প্রজাপীড়নের মাত্রা যেন ক্রমশই বেড়ে চলছিল।

তারপর একদিন ঘটল বিস্ফোরণ। ১৯৩৭ সালের শেষ এবং ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিক। যেন মন্ত্রবলে ভারতবর্ষের সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দীর্ঘকালের ঘুম ভেঙে গেল। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাশক্তিও জেগে উঠল, শতাব্দী-কালের নিষ্ক্রিয়তা, হতাশাচ্ছন্নতা দূর হয়ে গেল। সকল দেশীয় রাজ্যে গড়ে উঠল প্রজাসাধারণের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'গণফ্রন্ট', আর সামন্তরাজ ও জমিদার-গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানের জনগণের সংগ্রামের সংহতি ও সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'প্রজামণ্ডল' বা দেশীয় রাজ্যের জনগণের চালক-সংগঠন।

দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাসাধারণের এই অভূতপূর্ব আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করে ফেলবার জন্য ঐসব রাজ্যের সরকারগুলি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল, চারদিকে চলল সংগ্রামী প্রজাদের উপর দেশীয় রাজ্যের পুলিস আর পাইক-বরকন্দাজদের প্রচণ্ড আক্রমণ। সব রাজ্যে প্রজাদের সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হল, সর্বত্র জারি করা হল দমনমূলক ১৪৪ ধারা, প্রজাদের সব সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হল।

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন

উড়িষ্যায় দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু তখন এই সংগঠন ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয়। ১৯৩৫ সালে যখন প্রজাদের মধ্যে বিক্ষোভ ক্রমশ বেড়ে উঠছিল তখন প্রজামণ্ডলও আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে কটকে প্রজামণ্ডলের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে কতকগুলি সর্বনিম্ন দাবি নিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং স্থির হয় যে উড়িষ্যার ২৬টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রজামণ্ডল গঠন করা হবে। বিভিন্ন রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত-কমিটিও গঠন করা হয়।

১। শচি রাউথ রায়: 'বোটম্যান বয়', পৃ ৯

এই সম্মেলনের পর থেকেই উক্ত দাবিসমূহ আদায় করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয় প্রজাদের আন্দোলন—সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের মধ্য থেকেই লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উঠতে থাকে। উক্ত দাবিসমূহ, বিশেষত শেষোক্ত দাবি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী প্রজাদের উপর বিভিন্ন রাজ্যে চলতে লাগল লাঠি, গুলি, নারীধর্ষণ—সবরকমের অত্যাচার-উৎপীড়ন।

ঢেনকানলের প্রজা বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে, ১৯৩৮ সালের জুন মাসে নীলগিরি রাজ্যের রাজা প্রজাদের আশু দাবি মেনে নিলে ঐ রাজ্যের প্রজা-আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। এর ফলে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির প্রায় ৪০ লক্ষ প্রজার প্রাণে এক নবজীবনের স্পন্দন দেখা দেয়। অবিলম্বে উড়িষ্যার ছোট বড় প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত প্রজাপুঞ্জ নিজ নিজ রাজ্যের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। নীলগিরি রাজ্যের পরেই প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় ঢেনকানল রাজ্যে। এই রাজ্যের আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সেই আন্দোলন দমনের জন্য রাজশক্তির প্রচণ্ডতার মাত্রার দিক দিয়ে ঢেনকানল রাজ্য উড়িষ্যার সমস্ত রাজ্যকে ছাড়িয়ে যায়।

"দীর্ঘকাল ধরে ঢেনকানল রাজ্যে হাজার রকমের দুর্নীতি আর অত্যাচার অবিচারের স্রোত অবাধ গতিতে চলে আসছিল। 'বেটি' বা বেগার প্রথা, অতিরিক্ত উচ্চহারের খাজনা ও কর আদায় এবং অন্যান্য বহু রকম উপায়ে প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায়ের প্রথা ব্যাপকভাবে এই রাজ্যে প্রচলিত ছিল। এছাড়া চিরদারিদ্রে জর্জরিত প্রজাপুঞ্জের সহস্র প্রকার অভাব, অনাহার, অর্ধাহার, রোগ-শোক ও অশিক্ষাজনিত দুঃখ-দুর্দশার তো কোন অন্তই ছিল না। রাজা শঙ্কর প্রতাপ সিং দেও মহেন্দ্র বাহাদুর প্রজাদের এই দুরবস্থার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ তো করতেনই না, উপরন্তু প্রজাদের কাছ থেকে কিভাবে অর্থ আদায় করা যায় সর্বদাই তার সুযোগ খুঁজতেন। এক সময়, এই রাজ্যে প্রজাদের বাড়িতে যে কয়টা উনুন এবং গোশালা থাকত তার প্রত্যেকটার জন্য রাজাকে কর দিতে হত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষেও রাজাকে কর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেগার খাটা ছিল বাধ্যতামূলক। কেউ বেগার খাটতে অস্বীকার করলে, অথবা অভাবের জন্য কর দিতে না পারলে প্রজাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। বাড়ির পুরুষদের উপর মধ্যযুগীয় প্রথায় অতি নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক পীড়ন করা হত, জিনিসপত্র লুট করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হত, এমনকি অন্তঃপুরের মেয়েদের উপরেও চলত জঘন্য অত্যাচার। সামান্য অপরাধে প্রজাদের প্রাণদণ্ড অথবা গুরুতর শাস্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত এ রাজ্যে বিরল ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও সামান্য অপরাধে রাজার সামনে শ্মশ্রুর প্রতিটি কেশ হস্তদ্বারা উৎপাটিত করার কথা শোনা গেছে। এই অমানুষিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনের দৃঢ় সংকল্প নিয়েই ঢেনকানলের প্রজাসাধারণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করল।"[১]

১। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন, পৃঃ ১৮০-৮১।

উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য ঢেনকানল চিরবিদ্রোহী। শত অত্যাচার-উৎপীড়ন আর নানা রকমের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ঢেনকানলের বিদ্রোহী প্রজারা সভা ও শোভা-যাত্রা করতে লাগল। তারা গঠন করল তাদের প্রজামণ্ডল, একখানি দাবিপত্র তৈরি করে তা পেশ করল ঢেনকানল রাজ্যের মহারাজের কাছে। এই দাবিপত্রে দাবি করা হল বিভিন্ন আর্থনীতিক দাবির সঙ্গে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু মহারাজের হুকুমে তাদের সমস্ত দাবি নাকচ করে কয়েক দিনের মধ্যেই প্রজামণ্ডলের সকল নেতাকে জেলে আবদ্ধ করা হল। তারপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বন্যা বয়ে যেতে লাগল সমগ্র ঢেনকানল রাজ্যের উপর দিয়ে। দেশীয় রাজ্যের পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হল ইংরেজ-রাজের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। বহু স্থানে জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ সভা ও শোভাযাত্রার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হল। তার ফলে নিহত ও আহত হল কয়েক শো মানুষ। সৈন্যেরা দল বেঁধে গ্রামে গিয়ে অসহায় মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাতে লাগল। 'ভারত বন্ধু' সি. এফ. এণ্ড্রুজ ঢেনকানলের প্রজাদের উপর এই অত্যাচার-উৎপীড়নের সংবাদ পেয়ে ঢেনকানল রাজ্যে উপস্থিত হন। এই প্রজা-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ও এর ইতিহাস লেখক শচি রাউথ রায় সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার কয়েকটি স্ত্রীলোককে এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট উপস্থিত করেন। এণ্ড্রুজ সাহেব তাদের কাহিনী শুনে কেঁদে ফেলেন। এই অত্যাচারিত স্ত্রীলোকদের দুঃখে তিনি এতই অভিভূত হন যে, এই স্ত্রীলোকদের প্রতি একটিও সান্ত্বনার কথা তিনি বলতে পারেননি।

শত অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও ঢেনকানল রাজ্যের জনগণ অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে, মরিয়া হয়ে রাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে লাগল। আন্দোলনের চাপে মহারাজ সুবাহু সিংহ নামক এক নেতাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। নেতা যাচ্ছেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে—এই সংবাদ শুনে রাজ্যের নানা জায়গা থেকে হাজার হাজার প্রজা রাজধানীতে এসে জমা হল। নেতা যখন রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলেন তখন তাঁর পিছনে চলল প্রায় চল্লিশ হাজার লোক। তারা চারদিক থেকে রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে মহারাজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। প্রজারা যাতে অবিলম্বে রাজধানী ছেড়ে চলে যায় তার জন্য মহারাজ তখনকার মত কতকগুলি ভাসাভাসা প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রজারা বুঝতে পারল মহারাজের প্রতিশ্রুতির অসারতা। সকল প্রজা সভা করে স্থির করল মৃত্যুপণ সংগ্রামের দ্বারা মহারাজের হাত থেকে তাদের সব দাবি আদায় করবে।

এই সময়, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সাল, কটক জেলার অন্তর্গত জিনাপুর নামক গ্রামে 'নিখিল ভারত কিষাণ দিবস' উপলক্ষে এক বিরাট কৃষক সভা হয়। ঢেনকানল রাজ্য থেকে প্রায় ১৫ হাজার কৃষক এই সভায় যোগদান করে। তাদের সকলেরই হাতে ছিল জাতীয় পতাকা বা লালঝাণ্ডা। ২রা সেপ্টেম্বর প্রজামণ্ডল ঢেনকানল রাজ্যের প্রজাদের দাবিসমূহের একটি তালিকা রচনা করেন এবং স্থির হয়

যে সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য অক্টোবরে এক সম্মেলন হবে। প্রজারা সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সভাসমিতি করে প্রজামণ্ডলের দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে লাগল।

অবস্থা দেখে রাজা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাজ্য থেকে অনেক সৈন্য আমদানি করা হল। ঢেনকানল প্রজামণ্ডলের সভাপতি হরমোহন পট্টনায়ক, সহকারী সভাপতি মহেশ্বর সুবাহু সিংহ, লক্ষ্মীধর সাহু এবং আরও ১২ জন নেতা গ্রেপ্তার হলেন। হাজার হাজার মানুষ জেলের ফটক পর্যন্ত তাদের অনুগমন করল। রাজ্যের পুলিস রাজার হুকুমে জেল-ফটকের কাছে সমবেত জনতার উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি ও বেয়নেট চার্জ করল। তার ফলে গুরুতররূপে আহত হল বহু লোক। এই সংবাদ দাবানলের মত রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। গ্রেপ্তার ও লাঠি চার্জের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য দলে দলে লোক ছুটল শহরের দিকে। শহরের প্রবেশ-পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। তবু শহরে ঢুকতে গিয়ে বহু লোক আহত হল। পুলিস তিন স্থানে গুলি চালালে বহু লোক নিহত ও আহত হল।

এই ঘটনার পর রাজ্যের প্রজামণ্ডলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল এবং কলিকাতা থেকে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসা হল। এ সবের ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই ঢেনকানল পরিণত হল একটি সৈন্য-শিবিরে। এত সব আয়োজন উপেক্ষা করে ১২ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলা দলে দলে জনতা রাজধানীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। পুলিস ও সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর লাঠি চালাল, তাদের উপর হাতী, ঘোড়া, মোটরগাড়ী প্রভৃতি চালিয়ে দেওয়া হল। রেল লাইনের ধারে সমবেত হাজার হাজার নিরস্ত্র নর-নারীর উপর পুলিস ও সৈন্যরা আক্রমণ চালাল। ঐ দিন বিকাল বেলা রাজ্যের পুলিস তিনবার গুলি চালায়। সেই সময় প্রায় ২০ হাজার মানুষ নেতাদের ডাকে সমবেত হয়েছিল, তাদেরই উপর এই গুলি চালনা। এর ফলে বহু লোক প্রাণ হারাল।

১০ই অক্টোবর গভীর রাত্রিতে পুলিস প্রজা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ভুবন গ্রামে প্রবেশ করে আটজন গ্রামবাসীকে ঘুম থেকে তুলে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক শত গ্রামবাসী এসে জড় হয়। বর্বর পুলিসের দল সমবেত গ্রামবাসীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। তার ফলে কয়েকজন হতাহত হয়।

এরপর কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে পুলিস নদীর ওপারে আর এক গ্রামে যাওয়ার জন্য নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে। নদীর পাড়ে পুলিসের সঙ্গে গ্রামবাসীদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। 'দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন'-এর ইতিহাস লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সংঘর্ষের কথা নিম্নোক্তরূপে বিবৃত করেছেন :

"পুলিসের নদী পার হবার চেষ্টা সে রাত্রে গ্রামবাসীরা যেভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিল, তা আজ উড়িষ্যার ঘরে ঘরে গল্পের মত প্রচলিত হয়ে রয়েছে। নদীর তীরে পুলিস ঘাটে বাঁধা জেলে-ডিঙির মাঝিদের হুকুম করল নদী পার করে দেবার

জন্য। ঘাটে তখন বারখানা নৌকা ছিল। মাঝিরা সবাই পার করতে অস্বীকার করল এবং এক এক করে নৌকাগুলি জলে ডুবিয়ে দিতে লাগল। পুলিস গুলি করে তাদের সকলকেই হত্যা করল। বাকি ছিল একখানি মাত্র নৌকা, তার মাঝি ১২ বছরের বালক বাজি রাউথ। পুলিস বন্দুক তুলে আবার তাকে হুকুম করল নদী পার করে দেবার জন্য। কিন্তু মাঝি বালক জবাব দিল, 'বাবু, আমাকে গুলি করে মেরে ফেল ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের আমি পার করতে পারব না, কারণ প্রজা-মণ্ডলের হুকুম নেই।' এই বলে যেমন সে তার নৌকাখানি জলে ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হল অমনি পুলিসের বন্দুক গর্জে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই সেই বীর মাঝি বালকের রক্তাক্ত দেহ রাত্রির অন্ধকারে নদীবক্ষে লুটিয়ে পড়ল। পুলিসের ওপারে যাওয়া আর হল না। এই ঘটনাটিকে নিয়ে উড়িষ্যার তরুণ কবি শচীকান্ত রাউথ এক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করলেন। কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'দি বোট বয়' সেই কবিতারই ইংরেজী অনুবাদ।"

নীলকণ্ঠপুর নামক আর একটি গ্রামেও সেই রাত্রিতে রাজ্যের পুলিস গুলি চালায়। সেখানেও কয়েকজন হতাহত হয়। জেনাপুর রেল লাইনের ধারে এইদিন আরও পাঁচজন কৃষকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারা পুলিসকে বাধা দিয়েছিল নীলকণ্ঠপুর গ্রামে ঢুকতে আর গুলি চালাতে। এই সব মৃতদেহ এক বিরাট শোভাযাত্রা করে কটক শহরে নিয়ে আসা হয়। তার ফলে উড়িষ্যার রাজধানী কটকে তো বটেই, সমগ্র উড়িষ্যায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং আগের চেয়ে বহুগুণ বেশী মানুষ প্রজা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ঢেনকানল রাজ্য সরকার ১১ই অক্টোবর নিম্নোক্ত বিবৃতি দেয়:

"গত দু'মাস যাবত ঢেনকানল রাজ্যের অন্তর্গত ভুবন থানার এলাকায় অবস্থা ভীষণ অশান্ত হয়ে উঠেছে। নেতারা গ্রেপ্তার ও শাস্তির পরোয়া না করে রাজদ্রোহ-মূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং প্রজাদের হিংসামূলক পন্থা অবলম্বন করতে উত্তেজিত করছেন। ১৯ আগস্ট ভুবন থানার বড় দারোগা প্রজাদের এক সভায় গেলে ক্ষিপ্ত জনতা তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে সভা থেকে তাড়িয়ে দেয়। জনতা থানায় ঢুকে পুলিস ইনস্পেক্টর ও থানার সব কর্মচারীকে প্রচণ্ড প্রহার করে। রাজ-কর্মচারীরা নিজ নিজ গ্রামের বাড়ী ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। একদিন প্রায় এক হাজার উত্তেজিত মানুষ থানায় উপস্থিত হয় এবং থানার কর্মচারীদের থানা ছেড়ে না গেলে তাদের খুন করবে বলে শাসিয়ে আসে। জনতার সঙ্গে ছিল প্রায় দু'শ লাঠি, সাতটি বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ১০ই অক্টোবর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে সশস্ত্র পুলিস আটজনকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে উত্তেজিত জনতা লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থানা আক্রমণ করে এবং ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করে। পুলিস বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে এবং তার ফলে অনেকে হতাহত হয়।"

১৩ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতা থেকে দু'শ সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্য ঢেনকানলে নিয়ে আসা হয়। এই সৈন্যেরা বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ করে। জনতা শোভাযাত্রা করে ১০টি মৃতদেহ কটকে নিয়ে আসে। ১৭ই অক্টোবর ঢেনকানল পুলিস বলরাম প্রসাদ,

মুরদাদপল্লী ও গুড়দি গ্রামের বহু নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই সময় ঢেনকানল রাজদরবার থেকে রাজানুগত্যের পরিচয় স্বরূপ এক রকম টিকিট দেওয়া হচ্ছিল। প্রত্যেক প্রজাকে এই টিকিট নিতে এবং খাতায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হত। এই টিকিট নিয়ে আসার জন্য সকল প্রজাকে শহরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা শহরে যেতে অস্বীকার করত তাদের উপর পুলিস গুলি চালাত। এর ফলে অনেক প্রজা নিহত হয়।

একে একে উড়িষ্যার প্রায় সব কটি দেশীয় রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার উড়িষ্যায় 'সামন্ত নৃপতি রক্ষা আইন' প্রবর্তন করে। ২১শে অক্টোবর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনায় একদল সৈন্য তুমুসিংহ গ্রামে প্রবেশ করে। এই গ্রামটি ছিল প্রজা-আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাঁটি। গ্রামের সবাই রাজানুগত্যের টিকিটে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল। তাদের রাজ্যানুগত্যের টিকিটে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করাই ছিল সৈন্যদলের অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রামবাসীদের টিকিট নিতে সম্মত করাতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে সৈন্যদল অসহায় ও নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর বেপরোয়াভাবে লাঠি ও গুলি চালায়। এর ফলে বহু গ্রামবাসী নিহত ও আহত হয়। আন্দোলনের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই সময় কটক জেনারেল হাসপাতালে উড়িষ্যার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে এত অধিক সংখ্যক আহত মানুষ এসে ভর্তি হতে থাকে যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে স্থান সঙ্কুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মাটিতে রোগীদের জন্য শয্যার বন্দোবস্ত করতে হয়।

২১শে অক্টোবর সকালবেলা খুর্দি মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ১৬ জন কনস্টেবল ও একজন হাবিলদারসহ খুর্দি থানার অন্তর্গত তুমুসিংহ ও সিরিমুল গ্রামে হানা দেয়। প্রজামণ্ডলের কয়েকজন বিশিষ্ট নায়ককে গ্রেপ্তার করাই ছিল এই পুলিসদলের উদ্দেশ্য। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পুলিস সিরিমুলা থেকে পাঁচজন নায়ককে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎ-গতিতে চারদিকে প্রচারিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে দুই গ্রামের মানুষ লাঠি প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে সমবেত হয়। ক্রমে ক্রমে তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারে পৌঁছায়। তারা ধৃত নেতাদের অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবি জানায়। তাদের সংখ্যা এবং অগ্নিমূর্তি দেখে পুলিসদল ভয় পেয়ে যায় এবং প্রজামণ্ডলের নায়কদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে বাঁচে।

১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম দলটিকে গ্রেপ্তার করা হলে সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র প্রায় ১৫ হাজার সশস্ত্র কৃষক সমবেত হয় এবং বলপূর্বক বন্দীদের মুক্ত করতে উদ্যত হয়। তারা কারাগারের ফটক ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। এই সময় তাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয় এবং তার ফলে বহু লোক হতাহত হয়।

এইভাবে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলার পর রাজ-কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত

প্রজাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন' গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"রক্তের বিনিময়ে প্রজারা তাদের দাবি রাজদরবারকে মেনে নিতে বাধ্য করে। প্রজাপুঞ্জের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমন করার সকল রকমের সশস্ত্র প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, রাজদরবার তখন প্রজাদের সকল অভিযোগ দূর করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হলেন। ২৯শে অক্টোবর ঢেনকানল রাজ্যের পাবলিসিটি অফিসার জানালেন, গত ২৭শে অক্টোবর অপরাহ্নে রাজপ্রাসাদে সমবেত গ্রামবাসীদের সম্মুখে দরবার থেকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে ৩১শে অক্টোবর রাজার জন্মদিনে জন-সাধারণের অভিযোগসমূহ দূর করে এক ঘোষণা প্রচার করা হবে। ২৭শে অক্টোবর তারিখে ২০৩ খানি গ্রামের প্রতিনিধিগণ 'প্যারেড গ্রাউণ্ড'-এ সমবেত হয় তাদের অভিযোগসমূহের খসড়া তৈরি করার জন্য।…সেই সভায় 'পলিটিকাল এজেণ্ট' এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ উপস্থিত থাকেন। সভায় প্রতিনিধিগণ দরবারের নিকট তাঁদের আবেদন পাঠ করেন। উত্তরে দরবার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাদের অভিযোগসমূহ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে এবং অবিলম্বে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দরবার প্রস্তুত আছেন।"

এইভাবে ঢেনকানল প্রজাদের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম জয়লাভ করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহ (১৯৪২)

ত্রিপুরা রাজ্যের পরিচয়

ব্রিটিশ শাসনকালে বঙ্গদেশে যে দুইটি দেশীয় রাজ্য ছিল, ত্রিপুরা তাদের একটি। ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন চার হাজার উনত্রিশ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা সে সময় ছিল (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে) পাঁচ লক্ষ তের হাজার। রাজ্যটির সীমানা: পশ্চিমে ত্রিপুরা বা কুমিল্লা জেলা, পূর্বে লুসাই পাহাড়, উত্তরে শ্রীহট্ট, উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কাছাড় জেলার এক অংশ এবং দক্ষিণে চট্টগ্রাম জেলার এক অংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা।

রাজ্যের অধিকাংশ পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের বাস। পার্বত্য অঞ্চলে চন্দন, শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি বনজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান আর পাট সমতল ভূমিতে জন্মে। রাজ্যে অনেকগুলি চা-বাগিচা আছে। পার্বত্য আদিবাসীরা ঝুমচাষের দ্বারা ধান ও কার্পাস উৎপাদন করে। আদিবাসীদের প্রধান অংশ বাঙালী হিন্দু, এছাড়া পার্বত্য আদিবাসীদের মধ্যে আছে ত্রিটিপুরী, মণিপুরী, জমাতিয়া ও রিয়াং। এই আদিবাসীরাই প্রধান।

ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতই ত্রিপুরা রাজ্যেও বহুকাল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন চলেছে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতই রাজ্যের রাজাই ছিল সর্বেসর্বা। তিনি ব্যক্তিগত মর্জি অনুযায়ী একাধিক মন্ত্রী নিযুক্ত করে শাসন পরিচালনা করতেন। সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে মহারাজের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাদের সুখ-দুঃখের আশা আকাঙ্ক্ষার ধার তিনি ধারতেন না। ব্রিটিশ ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ঝানু আমলারা রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে থেকে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ চালাত। এরাই ছিল রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার সর্বেসর্বা। অথচ এরা রাজ্যের সমস্যাবলীর কিছুই জানত না। প্রধানমন্ত্রীর বেতন ছিল আড়াই হাজার টাকা। অথচ তিনি কোন কাজই করতেন না। অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মোটা মোটা বেতন বাবদ মাসের পর মাস দরিদ্র প্রজা-সাধারণের অর্থ শোষণ করত। এই আমলাদের অসংখ্য প্রকার দুর্নীতি আর চক্রান্তের ফলে রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে থাকত। মহারাজের স্বেচ্ছাচারিতা ছিল অসীম। এছাড়া, রাজপরিবারের ছোট বড় সকলেই যেন এক একটি ক্ষুদে রাজা। তাদের দাপটে আর অত্যাচারে প্রজারা সব সময় থাকত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে। রাজপরিবার আর পরিবারের লোকজনদের বিলাস-ব্যসনে রাজস্বের একটা বড় অংশ ব্যয় হত। অথচ প্রজাদের না ছিল শিক্ষার ব্যবস্থা, না ছিল চিকিৎসার ব্যবস্থা, রাজ্যের পথঘাট ছিল না বললেই চলে। ত্রিপুরা রাজ্য বনজ-

সম্পদ আর খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করে রাজ্যের উন্নতি সাধনের কোন চেষ্টাই তখন হয়নি।

গণ-জাগরণ—পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ত্রিপুরায় গণ-জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীরা তাঁদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ত্রিপুরার যুবশক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। এই সময় রাজনৈতিক জাগরণ কেবল মধ্যশ্রেণীর যুবকদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তখন ত্রিপুরায় কয়েকটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ত্রিপুরায় গণ-জাগরণের সূচনা হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের অভিযোগে যুবক রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যেমন সমতলভূমি অঞ্চলে, তেমনই পার্বত্য অঞ্চলে হিন্দু, মুসলমান এবং বিভিন্ন উপজাতির মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। এই বিক্ষোভের প্রকাশ হিসাবেই হয়েছিল ধর্মনগর অঞ্চলে 'পর্ত বর্ত করবন্ধ আন্দোলন'।

কয়েক মাস ধরে চলেছিল এই করবন্ধ আন্দোলন। যুব-সংগঠনগুলির পরিচালনায় বিভিন্ন জাতীয় প্রজারা কয়েক মাস ধরে কর দেওয়া বন্ধ রাখে। কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও, এই আন্দোলন দমন করতে পারেনি। অবশেষে এই করবন্ধ আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফল হল সুদূর প্রসারী। এই আন্দোলনের পর থেকেই রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রাজ্যের 'স্টেট কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্টেট কংগ্রেসের কর্মীদের চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন চা-বাগিচার শ্রমিকদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরাও স্টেট কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্ব প্রথম নিজেদের দাবি আদায়ের সংগ্রাম আরম্ভ করে। সমতল ভূমিতে আর সুদূর পার্বত্য অঞ্চলেও কংগ্রেসের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সব সংগঠনের চেষ্টায় ও প্রচারে প্রজাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ত্রিপুরার 'প্রজামণ্ডল' ছিল কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন। পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় মানুষদের মধ্যে এই সংগঠনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী, আর এই সংগঠনের চেষ্টাতেই উপজাতীয় মানুষদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সবচেয়ে বেশী বিকাশলাভ করে। পরবর্তীকালে এই সব মানুষ যে বড় বড় আন্দোলন করেছিল, তা 'প্রজামণ্ডল'-এর প্রচেষ্টা ও পরিচালনারই ফল।

ত্রিপুরারাজ্যের পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত জুড়ে ত্রিপুরা (কুমিল্লা), শ্রীহট্ট ও নোয়াখালি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাক্‌লা রোশনাবাদ নামে মহারাজের যে খাস জমিদারি ছিল, সেই জমিদারির প্রজারাও তাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আর মহারাজের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছিল। বঙ্গদেশের সেই সময়কার মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা ত্রিপুরার রাজ্যসরকারের স্বৈরাচারী নীতি সমর্থন করেছিল। তারই ফলস্বরূপ চাকলা রোশনাবাদের কৃষক-প্রজাগণকে বরাবরই ত্রিপুরা

রাজ্যসরকার আর বাংলাদেশের সরকার এই উভয়ের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল এবং উভয়ের বিরুদ্ধে সমানভাবে আন্দোলন করতে হয়েছিল।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যেও কংগ্রেসের 'আগস্ট বিপ্লব'-এর প্রচণ্ড ঢেউ এসে পড়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের রণাঙ্গনের প্রধান ঘাঁটি। তাই ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ আর ত্রিপুরা রাজ্যসরকার উভয়ে মিলে দমন নীতি চালিয়ে এই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলে।

রিয়াং বিদ্রোহের পটভূমি

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পশ্চিমের য়ুরোপ থেকে পূর্ব-জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্যাসিবাদী জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাভিশ্বাস উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই সংকটে অন্য সব সামন্ত রাজাদের মত ত্রিপুরার মহারাজও এগিয়ে গেলেন ব্রিটিশ প্রভুদের সাহায্যে। ব্রিটিশ প্রভুদের আদেশে ত্রিপুরারাজের সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রামে গিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলে সেখানে গিয়ে জাপানকে প্রতিরোধ করবার আয়োজনে ব্যস্ত হল।

কিন্তু ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী অতি ক্ষুদ্র, প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই ব্রিটিশ প্রভুদের হুকুম, আরও সৈন্য চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যত কষ্ট-সহিষ্ণু পাহাড়িয়া উপজাতি আছে, তাদের সব যুবকদের সৈন্যদলে ভর্তি করে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিয়ে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী তৈরি করতে হবে।

সামন্তরাজ ত্রিপুরেশ্বর তো ব্রিটিশ প্রভুদের হুকুমের দাস। সুতরাং ব্রিটিশ প্রভুদের হুকুম অনুযায়ী পাহাড়-অঞ্চলবাসী উপজাতীয় যুবকদের আহ্বান করা হল সৈন্যদলে যোগদান করার জন্য। ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির বাস। মহারাজের হুকুমে তাদের অনেকে এসে সৈন্যদলে যোগ দিল। কিন্তু এল না কেবল দুইটি সম্প্রদায়—একটি জামাতিয়া, অপরটি রিয়াং সম্প্রদায়। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, তারা রাজার বাহিনীতে যোগদান করবে না।

জামাতিয়া আর রিয়াং সম্প্রদায়ের সংগ্রামের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের।[১] উনিশ শতকে এই দুই সম্প্রদায় ত্রিপুরা রাজ্যের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে ছিল। কীর্তি আর পরীক্ষিত সর্দারের নেতৃত্বে তাদের সংগ্রাম ইতিহাস তৈরি করেছে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের আদর্শ হয়ে রয়েছে। ত্রিপুররাজ তাদের চিরশত্রু। তাই তারা একমত হয়ে সর্দারদের মারফত জানিয়ে দিল—রাজার সৈন্যবাহিনীতে তারা যোগদান করবে না।

রিয়াংদের সর্দারদের মধ্যে খগেন্দ্র চৌধুরী নামে একজন সর্দার ছিল রাজার দালাল। সে ছিল ভীষণ অত্যাচারী, রিয়াং জনসাধারণের অন্যতম প্রধান শত্রু খগেন্দ্র চৌধুরী এই সংকটকালে তার এক দুষ্ট মতলব হাসিল করার জন্য প্রস্তুত হল। রিয়াং সর্দারদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান সর্দার, তাকে বলা হয় 'রায়'। রিয়াংদের মধ্যে

১। সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দ্রষ্টব্য।

রায়ের প্রভাব অসাধারণ, রাজ দরবারেও অবাধ প্রবেশাধিকার। এই 'রায়' পদটির উপর খগেন্দ্রের লোভ অনেক দিনের। কিন্তু এই পদটি লাভ করতে হলে রাজার সম্মতি চাই। তাই মহারাজকে খুশি করার জন্য তার কাছে গিয়ে সে জানাল, মহারাজের হুকুম হলে সে রিয়াংদের সৈন্যদলে এনে দিতে পারবে। খুসি হয়ে মহারাজ খগেন্দ্রকে অনুমতি দিলেন।

বিদ্রোহের নায়করূপে রতনমণির আবির্ভাব : খগেন্দ্র এবং আরও কয়েকজন সর্দার তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ আর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রিয়াংদের সৈন্যদলে ভর্তি করবার জন্য ঘুরে ঘুরে প্রচার আরম্ভ করল। তারা স্বাস্থ্যবান রিয়াং যুবকদের জোর করে সৈন্যদলে ভর্তি করতে লাগল। কিন্তু এর ফলে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল। খগেন্দ্র তাদের কাছে ছিল খুবই অপ্রিয়। খগেন্দ্রের শোষণ-উৎপীড়নের ফলে পূর্ব থেকেই তারা ক্ষিপ্ত হয়েছিল। এবার তার এই সৈন্যদলে লোক-সংগ্রহের প্রচেষ্টা তাদের ক্রোধের আগুনে ইন্ধন যোগাল।

কিন্তু অসহায় ও অসংগঠিত রিয়াংগণ খগেন্দ্রকে বাধা দেবার উপায় খুঁজে পেল না। শয়তানতুল্য খগেন্দ্রের পিছনে রয়েছে ত্রিপুরার রাজবল। তাকে বাধা দেওয়া সহজ নয়। তাকে বাধা দিতে গেলেই রাজার সৈন্যদল ছুটে আসবে বন্দুক আর মেসিনগান নিয়ে। কিন্তু রিয়াংদের নেই কোন সংগঠন, সহায়-সম্বল, নেই কোন অস্ত্রশস্ত্র। এই বিপদে এমন কেউ নেই যে তাদের সাহায্য করতে পারে।

এই সময় রিয়াং অঞ্চলে দেখা দিলেন রতনমণি ঠাকুর। রতনমণি নেয়াপাতিয়া সম্প্রদায়ের লোক, পার্বত্য-চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী। কি উদ্দেশ্যে তিনি পাহাড়ের পথে সাধুর বেশ ধরে রিয়াংদের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন তা জানা যায়নি। এই ছোট-খাট রোগা মানুষটি যেন একটি জলন্ত অগ্নিশিখা। রতনমণির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রিয়াংদের মধ্যে এক আশার আলো জ্বলে উঠল, সেই আলোকে তাদের মনের হতাশার অন্ধকার কেটে গেল। রতনমণি এই অশিক্ষিত, সরল, ভীতি-বিহ্বল রিয়াংদের মধ্যে নতুন আশা-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুললেন। তিনি বললেন, "মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, ত্রিপুররাজের শোষণ-উৎপীড়নের হাতিয়ার এই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান নয়, সৈন্যদলে জোর করে ভর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো।" রতনমণি আরও বললেন, "যদি বাঁচতে চাও, ত্রিপুররাজের শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চাও, তবে তাঁর শাসনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে, পাহাড় অঞ্চলে গড়ে তুলতে হবে, রিয়াংদের এক স্বাধীন রাজ্য।"

রতনমণির এই প্রচারে উৎসাহের জোয়ার বইতে শুরু করল রিয়াংদের মধ্যে। বাইশ হাজার রিয়াং এক হয়ে স্বাধীন রিয়াং রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করল। রিয়াংদের সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য রতনমণি রিয়াংদের তাঁর মন্ত্রশিষ্য করে নিলেন। এক অগ্নিমন্ত্রে বাইশ হাজার রিয়াংকে দীক্ষিত করলেন রতনমণি। তারা সবাই হল রতনমণির শিষ্য, আর রতনমণি হলেন তাদের সকলের গুরু 'রতনমুণি'—তাদের প্রাণের রাজা।

স্বাধীন রিয়াং রাজ্য প্রতিষ্ঠা: বাইশ হাজার রিয়াং ত্রিপুররাজের শাসন অগ্রাহ্য করে রতনমণিকে তাদের 'রাজা' বলে ঘোষণা করল। বাইশ হাজার রিয়াং হল তাঁর 'প্রজা', স্বাধীন রিয়াং রাজ্যের স্বাধীন রাজা 'রতনমণির' স্বাধীন প্রজা। এই স্বাধীন রিয়াং রাজ্যের রাজধানী হল উদয়পুরের তুমহারা নামক স্থানে। তুমহারার একটি উঁচু টিলার উপর তৈরী হল রাজা রতনমণির আবাস স্থল। জনৈক লেখক* এই অভূতপূর্ব রাজধানীর একটি বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন:

"এই টিলার চারদিক ঘিরে গভীর বন। সেই বন নীচের দিকে অনেক দূর প্রসারিত। তারপর বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। এই টিলার চারদিকে চারটি প্রবেশপথ। প্রবেশপথের ধারে উঁচু করে চারটি টং ঘর প্রস্তুত হল। টং ঘরে দিবারাত্র রিয়াংদের প্রহরা।"

এবার রাজা রতনমণি রীতিমত একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা করলেন। রিয়াংদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান লোক বেছে নিয়ে পাঁচজনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হল। "এ ছাড়া সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্য, পুলিস, ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর প্রভৃতি নিযুক্ত হল, অর্থাৎ একটি স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কর্মচারীর ও দপ্তরের সৃষ্টি হল।"

রাজ্য তৈরি করতে হলে রাস্তাঘাট চাই। পাহাড়-অঞ্চলে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। লোকজন, সৈন্য-সামন্ত, পুলিস প্রভৃতি যাতায়াত করবে কি করে? রাজার বাহিনীর সঙ্গে রিয়াং-সৈন্যরা যুদ্ধ করবে কি করে? কাজেই রিয়াং ইঞ্জিনীয়ারগণ বন কেটে অনেকগুলি চওড়া চওড়া আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা তৈরি করল। অবশ্য এসব রাস্তা তৈরী হল খুব গোপনে। এ সব রাস্তার কথা ত্রিপুররাজের কর্মচারীরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না। পূর্বোক্ত লেখক এ সম্বন্ধে লিখেছেন:

"রতনমণি যে সংগঠন করেছিলেন, তার কথা চিন্তা করলে সত্যই অবাক হতে হয়। সে সময়ে পাহাড়ের মধ্যে চলাফেরা করার জন্য বিদ্রোহীরা জঙ্গল কেটে যে সমস্ত বড় বড় রাস্তা তৈরি করেছিল, আমি সে সমস্ত রাস্তা দিয়ে যখন গিয়েছি, তখন খুবই বিস্মিত হয়েছি। আর বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে, বিদ্রোহীদের এ সমস্ত রাস্তাঘাট তৈরী ইত্যাদি তো একদিনে হয়নি! এ সমস্ত খবর কি করে গোপন ছিল! তখনকার ফরেস্ট বিভাগ (বন বিভাগ), পুলিস বিভাগ ইত্যাদি কেউ কোন সংবাদই রাখত না।"

বিদ্রোহের কাহিনী: এবার শুরু হল ত্রিপুররাজের দালাল, এবং অত্যাচারী চৌধুরীদের বিরুদ্ধে রিয়াংদের অভিযান। এই চৌধুরীরাই ত্রিপুররাজের সব শোষণ ও উৎপীড়নমূলক আদেশ কাজে পরিণত করে। তারাই রাজার দক্ষিণ হস্ত। তাদের বাধা দিলেই বন্দুক-মেসিনগান নিয়ে হাজির হয় পুলিস আর সৈন্যবাহিনী। তাই রিয়াংদের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য রাজার দালাল খগেন্দ্র প্রভৃতি চৌধুরীরা। এবার বিদ্রোহীরা শুরু করল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান। অভিযান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই চৌধুরীরা যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। যারা পালাতে পারল না, তাদের

* লেখক ছিলেন ত্রিপুরারাজ্যের সৈন্যবাহিনীর একজন (অবসরপ্রাপ্ত) উচ্চপদস্থ অফিসার।

বিদ্রোহীরা ধরে নিয়ে গেল তাদের রাজা রতনমণির কাছে। রাজা রতনমণি তাদের এতকালের সব গুরুতর অপরাধের বিচার করবেন, শাস্তি দেবেন।

বিদ্রোহীরা ঐ সব দালাল চৌধুরীদের ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। তাদের যে সব সম্পত্তি ছিল, তা তো রিয়াংদেরই সম্পত্তি, সাধারণ রিয়াং চাষীদেরই সম্পত্তি। আর রিয়াং চাষীদের ফসল লুট করেই তো চৌধুরীরা তাদের ধন-সম্পদ গড়ে তুলেছে। সুতরাং চৌধুরীদের সমস্ত সম্পত্তিই বিদ্রোহীরা বাজেয়াপ্ত করে ফেলল।

রিয়াং বিদ্রোহীরা পাহাড় অঞ্চলের থানার প্রধান দীনেশ দারোগাকেও ধরে নিয়ে গেল রাজা রতনমণির কাছে। আর এদিকে প্রাণের ভয়ে ভীত খগেন্দ্র চৌধুরী মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দিল যে, ত্রিপুরাসুন্দরীর (কালীর) মন্দিরে বলি দেবার জন্য বিদ্রোহীরা দীনেশ দারোগাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু দীনেশ দারোগাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। পূর্বোক্ত লেখকের বিবরণ অনুসারে—

"প্রকৃত পক্ষে হত্যার কোন উদ্দেশ্যই রিয়াংদের ছিল না। তারা দীনেশবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, সর্দারগণ যখন আমাদের নামে মিথ্যা সব নালিশ করে, তখন আমাদের কোন কথাই তুমি শোন না। আমরা এখন সর্দারকে ধরে এনেছি, তোমাকে তাদের বিচার করে দিতে হবে।' দীনেশবাবুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পিছনে এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু খগেন্দ্র উল্টো রিপোর্ট দিল মহারাজের কাছে।"

মহারাজ খগেন্দ্রের কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়েই অবিলম্বে একটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন উদয়পুরের দিকে। কারণ, তখন পর্যন্ত উদয়পুরেই বিদ্রোহীদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। মহারাজের দালাল খগেন্দ্র চৌধুরীর বাসস্থান ছিল বিলোনিয়ায়। এবার বিদ্রোহীদের একটি দল অভিযান করল ত্রিপুরার সর্বপ্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র বিলোনিয়ার দিকে। বিলোনিয়া ছিল অত্যাচারী মহাজনগোষ্ঠীরও প্রধান আড্ডা। বিদ্রোহীরা বিলোনিয়ায় পৌঁছে মহাজনদের বাড়ীঘর লুট করে পুড়িয়ে ফেলল। মহাজনরা সকলে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ পেয়েই মহারাজ বিলোনিয়ার দিকে আর একদল সৈন্য পাঠালেন।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করেছে। জাপানীদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ চালাচ্ছে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী। ইংরেজ বাহিনীর 'হেড কোয়ার্টার' ছিল কুমিল্লা শহরে। ইতিমধ্যে খগেন্দ্র ইংরেজ বাহিনীর 'হেড কোয়ার্টার'-এ সংবাদ দিল, রিয়াং বিদ্রোহীরা ব্রহ্মদেশে জাপানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেই এই বিদ্রোহ শুরু করেছে। সুতরাং ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি মহারাজকে অবিলম্বে রিয়াংদের এই বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিল আর জানিয়ে দিল, মহারাজ যদি এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হন, তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পাঠানো হবে। এই হুকুম পেয়ে মহারাজ তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, যেভাবে হোক, অবিলম্বে বিদ্রোহ দমন করতে হবে। সুতরাং বিলোনিয়া আর উদয়পুরের দিকে আরও কয়েকটি বড় সৈন্যদল পাঠানো হল।

এদিকে বিলোনিয়ার উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

কেবল মহাজনগোষ্ঠীই নয়, বিলোনিয়ার সকল ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বর্ধিষ্ণু লোকরা সপরিবারে চারদিকে পালিয়ে যেতে লাগল, বিরাট ব্যবসা-কেন্দ্র বিলোনিয়া জন-মানবহীন শ্মশানের আকার ধারণ করল। বিদ্রোহীরা তাদের প্রধান শত্রু খগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী লুট করে আগুন ধরিয়ে দিল। খগেন্দ্রের একটি মাত্র ঘর ছাড়া আর সব ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সৈন্যরা এসে আগুন নিবিয়ে ফেলল।

বিলোনিয়ায় রাইফেল, স্টেনগান আর ব্রেনগান নিয়ে বহু সৈন্য এসে পৌঁচেছে—এই সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা বিলোনিয়া ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী বাইখুরা গ্রামে প্রবেশ করল। তারা সংখ্যায় ছিল সাত আট শত। তাদের সঙ্গে ছিল দুই একটি গাদা বন্দুক আর সড়কি-বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। প্রায় নিরস্ত্র এই বিদ্রোহীদের হত্যা করার জন্য সৈন্যরা উন্মাদ হয়ে উঠল।

বাইখুরা গ্রামে গিয়ে বিদ্রোহীরা যখন খাওয়া-দাওয়া করছিল, ঠিক এমন সময় রাজার পক্ষের প্রায় দুইশত পাহাড়িয়া আদিবাসী আর একদল সৈন্য গ্রামটি ঘিরে ফেলল। বিদ্রোহীরা তাদের দুইটি গাদা বন্দুক দিয়ে সামান্য বাধা দিয়ে পরাজিত হল। একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকসহ কয়েকজন বিদ্রোহী নিহত আর বহু আহত হল। বাকি সকলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল।

এরপর বিদ্রোহীরা আবার গিয়ে সমবেত হল বিলোনিয়ার অপর দিকে অমরপুর নামক এক গ্রামে। এবার তারা রাইফেল-মেসিনগানে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার এক নতুন কৌশল অবলম্বন করল। তারা টিলার মত উঁচু স্থানে ঘাঁটি করে সেখানে বহু বড় বড় পাথরের টুকরা সংগ্রহ করল। তারপর সেখানে তারা শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। শত্রু সৈন্যরা টিলার উপরে ওঠার চেষ্টা করলেই বিদ্রোহীরা ঐ পাথরের টুকরাগুলো তাদের উপর গড়িয়ে দেবে, শত্রু-সৈন্যরা সেই পাথরে চাপা পড়ে মরবে। কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্যরা এই কৌশল সহজেই ব্যর্থ করে দিল। তারা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে টিলাটি দখল করে ফেলল এবং সকল বিদ্রোহীকে নিরস্ত্র করে আটক করল। পূর্বোক্ত লেখকের বিবরণ :

"নয় দিনে প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে আগরতলায় পাঠানো হয়েছিল। প্রথম বিদ্রোহীদলকে গ্রেপ্তার করতে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়েছিল। কারণ, সমস্ত দিন তারা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে থাকত, তারপর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে তাদের স্ত্রী কন্যারা রান্না করে টংয়ে খাবার দিয়ে যেত। বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে টংয়ে চলে আসত এবং রাত্রিটা টংয়ে থেকে দিনে আবার জঙ্গলে চলে যেত। আমরাও যখন তাদের এ ব্যাপার বুঝতে পারলাম, তখন আমরা সবাই মিলে সন্ধ্যার পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তৈরি হয়ে থাকতাম। তারপর সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের পিছন পিছন গোপনে গিয়ে প্রতিটি টংয়ের নিচে এক এক জন করে রাইফেল নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকতাম। তারপর বিদ্রোহীরা যখন আসত তখন তারা ধরা পড়ত আমাদের হাতে।"

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ : এইভাবে বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু বিদ্রোহীরাও শীঘ্রই বুঝতে পারল সৈন্যদের এই অপ-

কৌশল। তাই তারা সতর্ক হয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। তাদের পলায়নের সংবাদ পেয়ে তাদের ধরবার জন্য ত্রিপুরার রাজদরবার পূর্বাপেক্ষাও এক শয়তানী কৌশল বের করল। রাজদরবার থেকে সৈন্যবাহিনীর উপর নির্দেশ হল—"রিয়াং যুবতীদের সকলকে আটক কর। তাহলে বিদ্রোহীরা নিজ থেকেই ধরা দেবে।"

ত্রিপুরার শাসকগোষ্ঠী রিয়াংদের চরিত্র ভাল জানত। তারা জানত রিয়াং স্ত্রীরা শত্রুর হাতে ধরা পড়লে, রিয়াং পুরুষেরা কখনই পালিয়ে থাকবে না। তারা আত্মসমর্পণ করে অসহায় স্ত্রীলোকদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে। শাসকদের এই শয়তানী পরিকল্পনা সফল হল। সৈন্যরা রিয়াংদের গ্রাম আর বস্তি উজাড় করে স্ত্রীলোকদের ধরে নিয়ে এসে সৈন্যদের 'ক্যাম্প'-এ আটক করে রাখল। আর তারপর থেকেই আরম্ভ হল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ। সাতদিনের মধ্যে প্রায় ছয় হাজার বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করল। এর সঙ্গে সঙ্গেই চলল সৈন্যবাহিনীর অমানুষিক ধ্বংসকাণ্ড। পূর্বোক্ত লেখকও ছিলেন এই ধ্বংসকাণ্ডের নায়কদের অন্যতম। তিনি তাঁর নিজের কীর্তি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

"সৈন্যবাহিনী যে এলাকায় 'ক্যাম্প' করেছে, অন্য এলাকায় যাওয়ার সময় সেই এলাকায় এক কথায় শ্মশান তৈরি করে গিয়েছিল। ক্ষেত-কৃষি বস্তির কোন চিহ্নই আর সেখানে পাওয়া যেত না। ধৃত বিদ্রোহীদের উপর যেভাবে অত্যাচার করা হত, আজ ভাবি, তা সম্ভব হয়েছে বোধ হয় শুধু মাত্র সামরিক পোশাকটার জন্য। তা না হলে মানুষ মানুষের উপর এভাবে অত্যাচার করতে পারে না কোন অবস্থাতেই।"

ক্রমে ক্রমে বাইশ হাজার বিদ্রোহী রিয়াংই মহারাজের কাছে আত্মসমর্পণ করল। আত্মসমর্পণ করার পর তাদের প্রত্যেককে মাথা মুড়িয়ে মহারাজের গুরুবাড়ী থেকে দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। তাদের সকলকে প্রতিজ্ঞা করতে হত—আর কোনদিন তারা বিদ্রোহ করবে না।

রতনমণির হত্যা : বিদ্রোহীরা যে সময় দলে দলে আত্মসমর্পণ করছিল, সেই সময় আর কোন আশা নেই বুঝে রতনমণি রিয়াং অঞ্চল থেকে পালিয়ে গেলেন। পরে রাজার সৈন্যবাহিনী সংবাদ পেল, রতনমণি পাহাড় বেয়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে চলে গেছেন। চট্টগ্রামে তখন সামরিক বাহিনী আর গোয়েন্দা পুলিসের একচ্ছত্র আধিপত্য। রতনমণির চট্টগ্রামে পলায়নের সংবাদ পেয়ে গোয়েন্দা পুলিসের দল হন্যে হয়ে রিয়াং বিদ্রোহের নায়ক রতনমণিকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তাঁকে তারা গ্রেপ্তার করল এক গভীর বনের মধ্য থেকে। তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হল ত্রিপুরায়। সেখানে মহারাজের রক্ষীবাহিনীর কোয়ার্টারে তাঁকে রাখা হয় দু'দিন। এই দু'দিনে তাঁর উপর চলেছিল অমানুষিক অত্যাচার। পরদিন সকাল বেলায় তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল। তাঁর মৃত্যুর বিবরণীতে ত্রিপুরার চীফ মেডিক্যাল অফিসার লিখেছেন : পরীক্ষায় দেখা যায়, রতনমণি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাঁর দুটি ফুসফুসই অকেজো হয়ে গিয়েছিল ; তাই তিনি 'হার্টফেল' করেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্ট যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, আগা-গোড়া সাজানো, রতনমণিকে যে হত্যা করা হয়েছে, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন সামরিক বাহিনীরই একজন উচ্চপদস্থ অফিসার—আমাদের পূর্বোক্ত লেখক। তিনি চীফ মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করে লিখেছেন :

"কিন্তু এটাই সত্য যে অত্যাচারের ফলে লাংস (ফুসফুস) ফেটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"

রিয়াং বিদ্রোহের শিক্ষা : আমাদের পূর্বোক্ত লেখক মহাশয় তাঁর বিবরণে সর্বশেষে রিয়াং বিদ্রোহের এই শোচনীয় পরিণতি-সম্বন্ধে দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করে লিখেছেন :

"জনসাধারণ যখন রতনমণির নির্দেশে সংগঠিত হল, যখন তারা দেখতে পেল তাদের মিলিত শক্তির রূপ, তখন তারা তাদের শক্তিকে ভুল পথে পরিচালিত করল। রতনমণির শক্তি হল না, সে পথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনে, যার ফলে জনতার এই শক্তি উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে গেল। নতুবা আজ সে শক্তি ত্রিপুরাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত।"

কিন্তু এই লেখক বলেননি 'জনতার শক্তি' কোন ত্রিপুরাকে, কাদের ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেত। সে শক্তি এগিয়ে নিয়ে যেত জোতদার-মহাজন-চোরাকারবারী-অধ্যুষিত সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরাকে, না জনতার শোষণমুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাকে? জনতার সে শক্তিকে রতনমণির মত একজন অখ্যাত-অজ্ঞাত ব্যক্তি হঠাৎ এসে অল্প সময়ের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারল, আর যে কংগ্রেস নব্বই বৎসরাধিক কালব্যাপী তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালনা করে বৈদেশিক শক্তির কাছ থেকে গোটা ভারতের শাসন-ভার লাভ করল, ভারতের 'ভাগ্য-বিধাতা' হয়ে বসল, তারা এই ত্রিশ বছরেও তা পারেনি। রতনমণি জানতেন অতি পশ্চাৎপদ জনতাকে জাগিয়ে তোলার জাদুমন্ত্র।

সেই অমোঘ জাদুমন্ত্র জানা ছিল ঐ ত্রিপুরা জেলারই সমশের গাজী নামে অখ্যাত-অজ্ঞাত এক চাষী ক্রীতদাসের—যিনি সেই সুদূর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জনতার এক শোষণ-মুক্ত, স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জনতার অফুরন্ত কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই জাদুমন্ত্র জানা ছিল ময়মনসিংহের টিপু গারো নামক এক মূর্খ পাহাড়িয়া কৃষকের—যাঁর নেতৃত্বে সহায়-সম্বলহীন গারো বিদ্রোহীরা দুর্ধর্ষ সুসঙ্গ জমিদারের শোষণ-উৎপীড়নের কেন্দ্র শেরপুর শহর অবধি অধিকার করে এক শোষণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই জাদুমন্ত্র জানা ছিল চব্বিশ পরগনার তিতুমীরের—যাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষক চব্বিশ পরগনা, নদীয়া আর যশোহরের বিরাট অঞ্চলে এক শোষণ-মুক্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই জাদুমন্ত্র জানা ছিল, ফরিদপুরের ফরাজী নায়ক দুদুমিঞার—যাঁর নেতৃত্বে ফরিদপুর আর ঢাকার বিদ্রোহী কৃষক এক বিশাল অঞ্চলে জনতার এক শোষণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। সেই জাদুমন্ত্র জানা ছিল, সাঁওতাল পরগনার "মূর্খ', অসভ্য আর কালো ভূতের মত" সাঁওতালদের নায়ক

সিদু আর কানু মাঝির—যাঁদের নেতৃত্বে সাঁওতাল পরগনায় এক শোষণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রায় বিশ হাজার সাঁওতাল ইংরেজ ও জমিদারগোষ্ঠীর মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

এই সব স্বল্পকালস্থায়ী স্বাধীন রাজ্যে কি পেয়েছিল কৃষক জনসাধারণ? তারা পেয়েছিল জমির মালিকানা আর সকল প্রকার শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি—যা কৃষক জনসাধারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনদিন পায়নি, আর পেয়েছিল তাদের শক্তির আস্বাদ। সে সব স্বাধীন রাজ্যে তারা জমি হাতে পেয়েছিল, মহাজন নামক রক্ত-শোষকদের প্রাণঘাতী শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল, সকল প্রকার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। আর তারা মনেপ্রাণে বুঝেছিল, একতাবদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারলে হাজার হাজার বছরের শোষণ-উৎপীড়নের স্বর্গ-রাজ্যকে বিধ্বস্ত করা যায়, মানুষের সকল অধিকার আয়ত্ত করা যায়, সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচা যায়। তাই, অল্পকালের জন্য হলেও ত্রিপুরার স্বাধীন রিয়াং অঞ্চলে জেগে উঠেছিল জনতার সেই অভূতপূর্ব কর্মশক্তি—সেই কথাই বলেছেন আমাদের পূর্বোক্ত লেখক।

রতনমণি রিয়াং চাষীদের নিয়ে এক শোষণমুক্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন। রিয়াং চাষীরা রতনমণির সেই প্রয়াসের মধ্যে পেয়েছিল ত্রিপুররাজের সকল প্রকার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বন্ধন থেকে, মহাজনগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্তিলাভের ভরসা, তাই তাদের মধ্যে আলাদিনের প্রদীপের সেই দৈত্যের মতই জেগে উঠেছিল এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, অভূতপূর্ব কর্মশক্তি। রতনমণি জানতেন সেই জাদুমন্ত্র, তাই তিনি জনতার ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের কৃষক জনতার সেই শোষণ-মুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শকে বিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে আবার উচ্চে তুলে ধরে বর্তমান ভারতের মানুষকে সচেতন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি। তাই হল রতনমণির সবচেয়ে বড় অবদান। তাই তাঁর ব্যর্থতায় কোন গ্লানি নেই। তাঁর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত আদর্শের কাছে তাঁর ব্যর্থতা অতি তুচ্ছ।

উনবিংশ অধ্যায়

ময়মনসিংহের হাজং বিদ্রোহ (১৯৪৫-৪৬)

শহীদ রাসমণির কাহিনী*

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমান্তে গারো পাহাড় অঞ্চল ঘন সবুজ বনানী সমাচ্ছন্ন, স্বচ্ছ পাহাড়ী ঝরণা ও নদী-ঘেরা মনোরম দেশ। এই গারো পাহাড়ের সুবিস্তীর্ণ শ্যামল অঞ্চল জুড়ে হাজং, গারো, ডালু, কোচ প্রভৃতি উপজাতিদের বাস। এই সুন্দর অঞ্চলটি ময়মনসিংহের সুসঙ্গ জমিদারীর অন্তর্গত।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে সুসঙ্গের জমিদারগণ এই অঞ্চলের বন্য হস্তী সংগ্রহের কাজের জন্য হাজংদের দূর দূর পার্বত্য অঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছিল। সেই সময় থেকে হাজংগণের অধিকাংশ হয় ভূমিহীন বর্গা ঠিকা চাষী। অতীতে বন্য হস্তী সংগ্রহ করতে গিয়ে কত হাজং যে হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব নেই। এইভাবেই প্রাণ দিয়ে হস্তী সংগ্রহ করে যারা জমিদারদের প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করে দিত, তারা জমিদারদের কাছ থেকে পেয়েছে, জমি নয়, মধ্যযুগীয় ভূমি-দাসত্ব। হাজংদের অধিকাংশ সুসঙ্গ রাজার জমিদারী থেকে প্রতি বৎসর কয়েকটি শর্তে জমি-চাষের চুক্তি করত। এই চুক্তি অনুসারে জমির ফসল যাই হোক না কেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জমিদারকে দিতেই হত—তা ছাড়া ছিল বেগার খাটা। হাজং-চাষীকে বৎসরের নির্দিষ্ট সময় জমিদারের জমিতে বিনা মজুরিতে খেটে দিতে হত, রাজাকে ভেট দিতে হত, সেলামী দিতে হত, আরও কত কি! আর তার সবগুলিই ছিল চুক্তির শর্তে। যদি অনাবৃষ্টিতে ফসল না ফলত, যদি অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হত, তথাপি হাজং-চাষীকে যে প্রকারে হোক, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জমিদারকে দিতেই হত। তা না দিতে পারলে, সে জমি চাষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। ফলে, তার ও তার পরিবারের অনাহারে মৃত্যু ছিল অনিবার্য। হাজং অঞ্চলে এই শোষণ-ব্যবস্থার নাম হল টঙ্ক প্রথা।

গ্রামের শোষক শ্রেণীর মধ্যে জমিদারের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে, তার নীচে আছে বহুসংখ্যক ছোট, বড় তালুকদার আর জোতদার। তারাও হাজং ভাগচাষীকে চুক্তির জালে আবদ্ধ করে জমিদারের মতই সমানভাবে শোষণ করত। জমিদার, তালুকদার এবং জোতদার ব্যতীত আরও একদল আছে, তারা হল সমগ্র ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের সাধারণ শত্রু মহাজন শ্রেণী। ভারতের অন্যান্য স্থানের কৃষক সম্প্রদায়ের মতই এই হাজং-চাষীরাও ছিল মহাজনরূপী দানবদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার অনিবার্য

---

* হাজং বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণসহ এই কাহিনীটি এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক শ্রীপ্রমথনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ লেখকের 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যাবে।

শিকার। অতি সরল প্রকৃতির হাজং-চাষীরা তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বিনা দলিল-পত্রে পাঁচ, সাত বা দশ টাকা ঋণ নিয়ে তাদের জমি ও বাস্তুভিটা বন্ধক রাখত। বলা বাহুল্য, সেই জমি ও বাস্তুভিটা তারা কোনদিন উদ্ধার করতে পারত না। হাজং-অঞ্চলের হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ী গ্রামে এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, একটি ছাতার বিনিময়ে মহাজন এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা জমি দখল করে নিয়েছে, একটি কোদাল অথবা কয়েক সের লবণের বিনিময়ে চাষীর তিন-চার বিঘা জমি গ্রাস করেছে। মাত্র দশ টাকার সুদ পাঁচ বৎসরে আড়াই শত টাকায় পরিণত হবার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

এমন একদিন ছিল, যখন এই আদিবাসীরা তাদের জমিদারকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করত, তাকে তাদের ভগবৎ-প্রেরিত ভাগ্যবিধাতারূপে মান্য করত। সেইদিন গ্রামের মণ্ডল বা সর্দারের কুলবধূরা জল দিয়ে জমিদারের দুই পা ধুয়ে দিয়ে নিজেদের মাথার চুল দিয়ে তা মুছিয়ে দিত।

ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় বসে, তাদের সৃষ্ট এই সব শোষকশ্রেণী এরূপ 'চমৎকার' শোষণ-ব্যবস্থা গড়ে, বাদশাহী বিলাস-ব্যসনে, বাদশাহী মেজাজে বিভোর হয়েছিল। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষক-সংগ্রামের যে নতুন ঝড় উঠছিল, তার প্রচণ্ড আঘাতে অন্যান্য স্থানের মত ময়মনসিংহের জমিদার-কবলিত এই সীমান্ত অঞ্চলের জমিদার গোষ্ঠীর সুখের নীড়ও ভেঙে পড়তে লাগল। এই সময় সমগ্র ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ধনিক-জমিদার-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণবিপ্লবের প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। ভারতের কৃষক এতদিন যে নেতৃত্বের অভাবে জমিদার-মহাজন ও বিদেশী ইংরেজের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে, অজস্র ধারায় বুকের রক্ত ঢেলে, অকাতরে প্রাণ বলি দিয়েও সাফল্যলাভে ব্যর্থ হয়েছে, সেই নূতন নেতৃত্বের জাদুস্পর্শে হাজং-চাষীর বহু শতাব্দীর ঘুম ভাঙতে আরম্ভ করল। হাজং-চাষীর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের পূর্ব সীমান্তের জমিদারী শোষণের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ভিত্তি কেঁপে উঠল।

এই নূতন নেতাদের কয়েকজনের অক্লান্ত চেষ্টায় জমিদারী শোষণের টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। হাজং-চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় গারো, ডালু, বানাই, কোচ এবং মুসলমান চাষীরাও এই আন্দোলনে যোগদান করল। দেখতে দেখতে উত্তর ময়মনসিংহের পাঁচটি থানার দীর্ঘ নব্বই মাইলের মধ্যে প্রায় তিনশত গ্রাম জুড়ে এই টঙ্ক আন্দোলন আরম্ভ হল। এই আন্দোলনের মূল দাবি হল :

"টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদ চাই", "টঙ্ক জমিতে কৃষকের স্বত্ব চাই", "পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পরগনার খাজনার মান অনুসারে নূতন করে খাজনা ধার্য হোক"।

এই আন্দোলন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল এবং বিভিন্ন সময়ে আরও কয়েকটি আন্দোলন এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মূল আন্দোলনকে বহুগুণ শক্তিশালী করে তুলল। এই আন্দোলনের প্রবল জোয়ার এই

সব অঞ্চলে জমিদারী-শোষণের অন্যান্য ব্যবস্থাগুলিকে ভেঙে চুরমার করে ফেলল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নূতন বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হাজং-চাষী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজেদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হল। জমিদার ও তালুকদারগণ যে হাট বসিয়েছিল তাতে তোলা, ট্যাক্স প্রভৃতি নানাবিধ শোষণ-মূলক ব্যবস্থা বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল। চাষীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করে বহু হাটে এই সব প্রথা বন্ধ করল, যেখানে পারল না সেখানে তারা নূতন হাট বসিয়ে জমিদার, তালুকদারদের জব্দ করল। হাজং-চাষীদের বনের কাষ্ঠ আহরণের অধিকার ছিল না, আন্দোলনের ফলে সেই অধিকার আদায় হল। ঝিলের মাছ ধরা ছিল জমিদারদেরই একচেটিয়া অধিকার, চাষীরা মাছ ধরবার অধিকারও আদায় করল। জমিদার-তালুকদারকে ভেট দেওয়া, তাদের জন্য বেগার-খাটা বন্ধ হল। এই আন্দোলনের মধ্যে জমিদার-তালুকদারদের পাইক-লাঠিয়ালদের সঙ্গে চাষীদের সংঘর্ষ ঘটেছে বহুবার। কিন্তু একতাবদ্ধ হাজং-চাষীর লক্ষ লাঠি পাইক-লাঠিয়ালদের লাঠি ও অস্ত্র খণ্ড-বিখণ্ড করে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার ফলে হাজং-অঞ্চল থেকে পুলিস ও জমিদারের শোষণ-শাসন কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এই সব আন্দোলনের স্রোত একত্র মিলনের ফলে এই সীমান্ত অঞ্চলে যে সব বিশাল আন্দোলনের প্রবল জোয়ার দেখা দেয়, তাই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশ-ব্যাপী 'তেভাগা আন্দোলনে'র সঙ্গে মিশে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে ফেলে, আর তার ফলে বাংলাদেশের ইংরেজ-শাসন এবং তাদের সৃষ্ট ও অত্যাচারী ইংরাজদের পক্ষপুটাশ্রিত জমিদারী, জোতদারী, তালুকদারী এবং মহাজনীর মূলোৎপাটন করতে উদ্যত হয়। ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলের হাজং-চাষীরা সেই দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছে। এই সংগ্রামে হাজং মাতা রাসমণির বৈপ্লবিক নেতৃত্ব, সমাজ-সেবা ও আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবার যোগ্য। ভারতের সকল যুগের মুক্তি-সংগ্রামের নারী-যোদ্ধাদের মধ্যে শহীদ রাসমণির স্থান সর্বাগ্রে।

হাজং মুক্তি সংগ্রামে রাসমণি

সুসঙ্গ পরগনায় ভেদিপুরা অঞ্চলের বগাবারী গ্রামের এক দরিদ্র টঙ্ক চাষীর ঘরে রাসমণির জন্ম। বারো বছর বয়সে রাসমণিকে পাঁচ মণ ধান আর নগদ দশ টাকার বিনিময়ে আর এক নিঃস্ব টঙ্ক চাষী-যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। বিবাহের অল্পদিন পরেই রাসমণি বিধবা হয়। এই জন্য গ্রামস্থ সকলে রাসমণিকে 'ডাইনি' বলে ডাকত। হাজং-সমাজে বিধবা-বিবাহ, স্বামী ত্যাগ করে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করা, এমন কি রীতিমত বিবাহ না করেও অন্য কোন ব্যক্তির স্ত্রীরূপে বাস করবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু রাসমণি সেইপথে না গিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিধবার মত জীবনযাপন করেন।

বিধবা ও সহায়-সম্বলহীনা রাসমণি পরের জমিতে রোয়া ধান লাগিয়ে আর ধান

কেটে মজুরি বাবদ যে সামান্য ধান পেতেন, তাই আবার ঢেকিতে ভেনে চাউল তৈরি করে তিন মাস হাটে-বাজারে বিক্রয় করতেন। প্রতি বছর চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিনমাস রাসমণি বনের কাঠ কুড়িয়ে বিক্রয় করতেন এবং শীতের জন্য সঞ্চয় করতেন। অবসর সময়ে তিনি নিজের হাতে তৈরী তাঁতে গরীব হাজং মেয়েদের জন্য কাপড় ও ওড়না বুনতেন।

'ডাইনি' রাসমণির ছিল আর একটি মহৎ কাজ। তিনি ছিলেন সুসঙ্গ অঞ্চলের মায়েদের আঁতুড় ঘরের শ্রেষ্ঠ 'দাই' বা ধাত্রী। কেহ প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে—এই কথা শোনামাত্র রাসমণি সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে যেতেন, প্রাণপণ চেষ্টায় সুপ্রসব করিয়ে মায়েদের যন্ত্রণার লাঘব করতেন।

নবজাতকের তিনি ছিলেন একজন দরদী ও দক্ষ 'ওঝা'। তাঁর সমাজের সকল দুঃস্থা মাতা ও রুগ্ন শিশুদের নানাবিধ রোগ নিরাময় করবার জন্য রাসমণি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে বিভিন্ন দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। এই সব কাজ করে রাসমণি তাঁর সমাজে সকলের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন। প্রতিপদে তাঁর সাহায্য না পেলে হাজং-চাষীদের চলত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রাসমণির জীবনে এনে দিল এক নূতন পথের সন্ধান। মহাযুদ্ধের মহাতাণ্ডবে তখন বাংলাদেশের সমাজ, সংসার সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে দেশের সর্বত্র চলছিল 'ফ্যাসীবাদ-বিরোধী গণ-সংগ্রাম'। বিভিন্ন গণ-সংগঠনের মধ্যে সমবেত হচ্ছিল শ্রমজীবী জনগণ। 'মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি'-র পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিল সকল শ্রেণীর মেয়েরা। রাসমণি এই 'মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি'-র মধ্যে থেকে তাঁর নূতন কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তেরশো পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে যখন সমস্ত বাংলার চাষী, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি সকল দরিদ্র মানুষ অন্নাভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন, তখন রাসমণি লঙ্গরখানা খুলে তিনখানি গ্রামের সকলের অন্নদাত্রী-রূপে আবির্ভূতা হলেন। সারা পরগনা ঘুরে রাসমণির চাউল-সংগ্রহকারী দল (স্কোয়াড) সংগ্রহ করত ধান, চাউল, অর্থ ও বস্ত্র। রাসমণির নেতৃত্বে হাজং-চাষীদের দল চোরাব্যবসায়ী মজুতদারদের গোপন খাদ্যের গুদাম খুঁজে বের করত এবং সেই খাদ্য লঙ্গরখানার জন্য বাজেয়াপ্ত করত।

হাজং-অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করবার জন্য যে 'বেশী খাদ্য ফলাও', 'খালকাটা', 'বাঁধ-বাঁধা' আন্দোলন আরম্ভ হয়, তারও পুরোভাগে ছিলেন রাসমণি। 'মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতির'-র নির্দেশে রাসমণি নিজের গ্রামে ধর্মগোলা (ফসল ওঠার সময় সকলে উদ্‌বৃত্ত ধান দান করে এবং প্রয়োজনের সময় তা থেকে ধান ঋণ করা অথবা দান করা হয়) এবং মেয়েদের জন্য কুটীরশিল্পের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হলেই যে সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ে তোলা যায় না তা রাসমণির মত বুদ্ধিমতীর বুঝতে বিলম্ব হয়নি। হাজং-চাষীরা যে এতকাল জমিদার, তালুকদার এবং মহাজনদের কৃপাভাজন হয়ে পড়েছিল, তাদের ভাগ্য নিয়ে যে এতকাল তারা ছিনিমিনি খেলেছে—তার প্রধান কারণ হাজং-চাষীদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। রাসমণি একটি নৈশ ও বয়স্ক বিদ্যালয় খোলবার আবেদন জানালেন।

হাজং-পল্লীতে খোলা হল এই রকমের একটি বিদ্যালয় ; তিনি হলেন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম ছাত্রী। এই নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলল রাজনৈতিক আলোচনার জন্য পাঠচক্র। বালক-বালিকা, বয়স্ক-বয়স্কা এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও কেবল বর্ণপরিচয়ের জন্য, সামান্যমাত্র লেখা-পড়া শেখবার জন্য সেই নৈশ বিদ্যালয়ে ভিড় করতে লাগল। পাঠচক্রে চলল হাজং-কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা। রাসমণি রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়মিত সেই পাঠচক্রেও যোগদান করতে লাগলেন। সারাদিন চলত পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে প্রচার এবং রাত্রে চলত লেখা-পড়া ও রাজনৈতিক আলোচনা। রাসমণি প্রত্যেকটি সভা, সমিতি, বৈঠক ও পাঠচক্রের আলোচনায় যোগদান করতেন। তা থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন রাজনৈতিক জ্ঞান, স্থানীয় আন্দোলন থেকে লাভ করতেন মূল্যবান্ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই লাঞ্ছিত ও অনগ্রসর এক হাজং-ঘরের মেয়ে রাসমণি গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন। রাসমণি ময়মনসিংহের সীমান্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলের নারী-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

* * * *

১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার কৃষক-সংগ্রামের এক স্মরণীয় কাল। যুদ্ধোত্তর যুগে সমগ্র ভারতে যে নতুন গণ-সংগ্রামের জোয়ার বইতে আরম্ভ করে, বঙ্গদেশের ‘তেভাগা আন্দোলন’, বিশেষত ময়মনসিংহের এই সীমান্তের হাজংদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম সেই ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রামের নূতন শক্তি দান করে। হাজং ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সভা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, হাট-প্রচার ও গ্রাম্য বৈঠক চলতে থাকে সীমান্তের দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ মাইল জুড়ে। এই সব সভা ও মিছিলের পুরোভাগে নারী-বাহিনী নিয়ে চলতেন বীর মাতা রাসমণি। এই বীর নারী যেন এতদিনে তাঁর অন্তরের আবাল্যপোষিত হাজং-মুক্তির স্বপ্ন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। তাই প্রৌঢ় বয়সেও তরুণীর কর্মশক্তি নিয়ে তাঁর প্রিয় হাজং-সন্তানদের শেষ মুক্তি-সংগ্রামে বিপ্লবী নেত্রীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রচার-বাহিনী নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে রাসমণি হাজং-কন্যাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে থাকেন মৃত্যুপণ সংগ্রামের জন্য। তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় দুঃখ-দারিদ্র-ক্লিষ্ট শোষণ ও উৎপীড়নে জর্জরিত হাজং-কন্যারা বৈপ্লবিক উৎসাহে মেতে উঠত।

হাজং-বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে উত্তর-ময়মনসিংহের সুসঙ্গ জমিদারীর তিনটি মহকুমায় জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের শোষণ-ব্যবস্থা ও ইংরেজ-শাসনের পুলিস-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার পরিবর্তে দেখা দিল শোষণমুক্ত এক ক্ষুদ্রাকার নূতন গণ-রাষ্ট্র। ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে এই অঞ্চলের জমিদার, তালুকদার, জোতদার ও মহাজনগোষ্ঠী ইংরেজ প্রভুদের নিকট তাদের শোষণ এবং ইংরেজ রাজত্ব রক্ষার জন্য আবেদন করল। বাংলাদেশে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি হল জমিদারী প্রথা। সুতরাং সেই প্রথা যখন বিপন্ন হয়, তখন ইংরেজ-শাসনেরই ধ্বংস আসন্ন হয়ে ওঠে।

বঙ্গদেশের এই সীমান্ত অঞ্চলে ইংরেজ-শাসন ও তার সৃষ্ট জমিদারী-প্রথা রক্ষার জন্য ইংরেজদের সামরিক শক্তির প্রস্তুতি চলল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাষ্টিন সাহেবের পরিচালনায় 'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী' পূর্ণ শক্তি নিয়ে হাজং-অঞ্চলের উপর আক্রমণ করল। সৈন্য-বাহিনী গুলিবর্ষণ, লুঠতরাজ, গৃহ ও গ্রামদাহ, শস্যহানি, নরহত্যা অবাধে ও নির্বিচারে চলতে লাগল। কয়েক হাজার উন্মত্ত হিংস্র দানব যেন অকস্মাৎ শৃঙ্খল ছিন্ন করে চারদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। হাজং-বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান পরিচালক শ্রীপ্রমথ গুপ্তের ভাষায়:

"ব্যাস্টিনের আজ্ঞাধীন বর্বর সৈন্য-বাহিনী উন্মত্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রামে প্রবেশ করে চাষীদের মজুদ ধান-চাল, গরু-মহিষ, ঘটি-বাটি, টাকা-পয়সা যা কিছু পেল, সবই লুট করতে লাগল। তারা নষ্ট করল মা-বোনদের ইজ্জৎ, প্রকাশ্যে দিবালোকে আগুনে পুড়িয়ে দিল সংগ্রামী চাষীদের প্রাণপণ চেষ্টায় গড়ে তোলা গ্রাম, পূজা-ঘর, সমিতির ঘর, স্কুল আর পাঠশালা। দানব-বাহিনীর ধ্বংসের তাণ্ডব থেকে কিছুই রক্ষা পেল না।"

প্রায় একশত গ্রামব্যাপী এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকাণ্ড ও নরহত্যার মধ্যে হাজং-চাষীরা ভয়ে পলায়ন করল না। অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নের মধ্যেই যারা জীবন কাটায় তারা ধ্বংস ও মৃত্যুকে ভয় করে না। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী পশু-শক্তির সম্মুখে হাজং-চাষী অস্ত্র হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। চাষীরা দা, তীর-ধনুক প্রভৃতি যে যা পেল, তা নিয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তাদের পুরোভাগে দাঁড়ালেন হাজং-মাতা রাসমণি। রাসমণি চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাজং-চাষীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর সশস্ত্র প্রচারদল নিয়ে দিবারাত্র গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে সকলকে অভয় দান করতেন, সৈন্যদের রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান, ও মেসিনগানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখাতেন এবং কোন গ্রামের উপর সৈন্যদের আক্রমণের সংবাদ শোনামাত্র সেই গ্রামে দৌড়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করতেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহর। পঁচিশ জন সৈন্য হাজং-অঞ্চলে বহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করেছে। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবা এবং গ্রামের সমস্ত পুরুষ নিকটবর্তী জঙ্গলে গোপন সামরিক শিক্ষা শিবিরে গিয়েছে শিক্ষা গ্রহণ করতে। সুযোগ বুঝে নারী-মাংস-লোলুপ বর্বর সৈন্যগুলি ঘরে ঘরে প্রবেশ করে চাষী মা-বোনদের উপর অত্যাচার করল। তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। লাঞ্ছিত কৃষক-বধূ সরস্বতীর আর্তনাদ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি তুলল।

এই সময় বহেরাতলীর পার্শ্ববর্তী গ্রামে রাসমণির সশস্ত্র প্রচার দল ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছিল। তাদের আহার প্রস্তুত হচ্ছিল। লাঞ্ছিত সরস্বতীর গগণ-ভেদী আর্তনাদে তারা সচকিত হয়ে উঠল। রাসমণি বুঝলেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম শয়তানের দল আক্রমণ করেছে। সেই অত্যাচারিতা নারীর আর্তনাদ রাসমণির প্রচার-বাহিনীকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। তারা ক্ষুধা ও ক্লান্তির কথা ভুলে গেল। চিরশান্ত

বর্ষীয়সী মাতা রাসমণির অন্তরে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন। তিনি নিঃশব্দে তুলে নিলেন তাঁর রক্তপতাকা আর তাঁর চিরসঙ্গী হাতিয়ার বড় দাখানি।

তিনি সাথীদের আহ্বান করলেন নির্ভয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে। প্রচারদলের পঁয়ত্রিশ জন নির্ভীক চাষী-যোদ্ধা নিয়ে বীর রাসমণি নিগৃহীতা হাজং-কন্যা সরস্বতীকে বর্বর সৈন্যদের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটে চললেন। রাসমণি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাইফেলধারী পঁচিশ জন সৈন্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। সুসঙ্গ পাহাড়ের অপরদিকে সোমেশ্বরী নদীর বালুকাময় তীরে সেইদিন সুশিক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত পঁচিশ জন সৈন্যের সঙ্গে কেবল তীর-ধনুক, দা, লাঠি ও বর্শায় সজ্জিত মাত্র পঁয়ত্রিশ জন বীর হাজং-চাষী বীরমাতা রাসমণি ও সুরেন্দ্র হাজংয়ের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ করল, তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাসমণি তাঁর বাহিনী নিয়ে পাহাড়ের অপর দিকে উপস্থিত হলেন এবং সোমেশ্বরী নদীর তীরে সৈন্যদলকে দেখে তাদের দিকে অগ্রসর হলেন। সৈন্যগণ তাদের সতর্ক না করেই প্রাণের ভয়ে মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে লাগল। গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে রাসমণির বাহিনী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাজং-চাষীদের দা, বর্শা ও তীর-ধনুকের আঘাতে কয়েকজন সৈন্য ধরাশায়ী হল এবং সৈন্যদের গুলি লেগে কয়েকজন চাষী আহত হল। চাষীদের সামনে থেকে প্রাণপণে দা চালাচ্ছেন রাসমণি, আর তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে বর্শা চালাচ্ছেন তাঁরই যোগ্য-সাথী, হাজংদের অন্যতম বীর সন্তান সুরেন্দ্র হাজং। যে সিপাহীটি হাজং-কন্যা সরস্বতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল, রাসমণি তাকে খুঁজে পেয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি সংহত করে দায়ের এক কোপ বসিয়ে দিলেন। এক আঘাতেই সিপাহীর মুণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। আর একজন সিপাহী এগিয়ে আসছিল তাকে রক্ষা করতে। সেও রাসমণির দায়ের প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী হল। বীর মাতা রাসমণির সংহার-মূর্তি দেখে সৈন্যেরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর দিকে উন্মত্তের মত গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

দশটি বুলেটে রাসমণির দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। যুদ্ধ করতে করতে রাসমণির প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। তাঁর পাশে যুদ্ধরত সুরেন্দ্র তার বর্শা দিয়ে সম্মুখবর্তী নারী-হত্যাকারী সিপাহীটির বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। সিপাহী মরণ আর্তনাদ করে ধরাশায়ী হল। মুহূর্তের মধ্যে একটি বুলেট সুরেন্দ্রের বক্ষভেদ করে চলে গেল। সুরেন্দ্রের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এইভাবে প্রায় দু ঘণ্টা যুদ্ধ চলল। হাজং-চাষী ও সিপাহীদের রক্তে সোমেশ্বরী নদীর শুভ্র বালুকাময় তীরভূমি রক্তরঞ্জিত হল। সৈন্যদের মধ্যে দুইজন নিহত ও পনেরো জন আহত হল, আর বিদ্রোহীদের মধ্যে বীর মাতা রাসমণি ও হাজংদের বীর সন্তান সুরেন্দ্র শত্রু সংহার করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শহীদ হলেন। বিদ্রোহীরা সকলেই আহত হল—দুইটি রাইফেল ও একটি স্টেনগান তাদের হস্তগত হল।

এই যুদ্ধ চলবার কালেই সংবাদ পেয়ে কয়েকখানি গ্রামের যুবকরা তাদের অস্ত্র-

শস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এল। তাদের আসতে দেখে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণের ভয়ে পলায়ন করল। বহেরাতলীর যুদ্ধে বিদ্রোহীদের জয় হল।

শহীদ রাসমণির আদর্শ, জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ বাংলা তথা ভারতের কৃষক-সংগ্রামে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছে। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজং-চাষীদের সংগ্রামের পরবর্তী স্তরেও টঙ্ক প্রথার উচ্ছেদের জন্য শহীদ হয়েছেন হাজং-চাষীদের বীর কন্যা রেবতী ও শঙ্খমণিসহ আরও একশত পঞ্চাশ জন হাজং বীর সন্তান।

এই শ্রেষ্ঠ হাজং বীরদের আদর্শ এবং আত্ম-বলিদানের ফলেই পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাজং বিদ্রোহ আরও ব্যাপক আকারে, আরও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিদ্রোহের ফলে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে টঙ্ক প্রথার অবসান হয়েছে।

বিংশ অধ্যায়

নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬)

বিদ্রোহীদের পরিচয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন যুদ্ধ-জাহাজে এবং সমুদ্র-তীরবর্তী ঘাঁটিগুলিতে ভারতীয় সৈন্যদের সংখ্যা ছিল মোট ত্রিশ হাজার। এই সকল যুদ্ধ-জাহাজ আর ঘাঁটিগুলি অবস্থিত ছিল বোম্বাই, করাচী, কোচিন, কলিকাতা, ভিজাগাপত্তম্ এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বন্দরে। তারা এসেছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। নৌ-সৈন্যদের মধ্যে ছিল বাঙালী, পাঞ্জাবী, দক্ষিণ-ভারতীয়, আরও বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ। তাদের মধ্যে ছিল হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলে—সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু সকলেরই প্রথম পরিচয়—তারা ভারতবাসী, সকলের অন্তরেই ছিল দেশভক্তির জলন্ত শিখা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, কঠোর প্রতিজ্ঞা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুঃসাহসী সৈনিক তারা—সকলেই নবীন যুবক। প্রায় সকলেই মধ্যশ্রেণীর নিম্নঅংশ আর কৃষক পরিবার থেকে আগত। ইতিপূর্বেই তারা জাপানী আর জার্মান ফাসিস্তদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করে খ্যাতি অর্জন করেছিল, এই ফাসিস্ত-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষকে উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাদের যুদ্ধ করবার জন্য দেওয়া হয়েছিল কয়েকখানি ক্ষুদ্র আর অব্যবহার্য যুদ্ধ জাহাজ, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেকেলে ধরনের। তা নিয়েই তারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে, ভারতবাসীরা যুদ্ধ করতে জানে। যুদ্ধে, বীরত্ব প্রদর্শনে আর সাহসে তারা পশ্চিম জগতের যে কোন জাতি অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নয়।

*　　　*　　　*

ভারতের এই সাহসী, বীর নৌ-সৈনিকগণ প্রথমে তাদের ব্রিটিশ সেনাপতিদের অসহনীয় দুর্ব্যবহার আর উৎপীড়নের জ্বালায় অস্থির হয়েই ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকেই বিদ্রোহের প্রথম অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠতে আরম্ভ করে এবং তা আরম্ভ হয় বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত 'তলোয়ার' নামক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জাহাজ থেকে। অবিলম্বে এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করে এবং দাবানলের মত সকল ভারতীয় নৌ-সৈনিকদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তোলে।

এই অভ্যুত্থান ক্রমশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অংশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক সংগ্রামে একখানিও যুদ্ধ-জাহাজ এবং একটিও ভারতীয় সৈন্য নিষ্ক্রিয় থাকেনি। ভারতের উপকূল-ভূমিতে

অবস্থিত প্রত্যেকখানি যুদ্ধ-জাহাজ, প্রত্যেকটি ভারতীয় নৌ-সৈন্য এই সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বিদ্রোহীদের যুদ্ধ চলেছিল মাত্র পাঁচ দিন। এই পাঁচ দিনের যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশ নৌ-সেনাপতি মণ্ডলী, ভারতের সমগ্র ব্রিটিশ সামরিক শক্তি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালক শ্রমিক-সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী অর্থাৎ ব্রিটিশ 'লেবার পার্টি'—সকলে একত্রে মিলে বিদ্রোহীদের হুমকি দিল: "তোমাদের ধ্বংস করা হবে, পৃথিবীর বুক থেকে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে।"

কিন্তু সমস্ত হুমকি সত্ত্বেও ৭৪খানি যুদ্ধ-জাহাজ আর শিক্ষা-জাহাজের ত্রিশ হাজার সৈন্য লৌহদৃঢ় ঐক্য নিয়ে পর্বতের মত অটল হয়ে রইল। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। তারা যে-কোন অস্ত্র পেল তদ্বারাই আত্মরক্ষা করল, পাল্টা-আক্রমণ করল। এইভাবে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করেছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ সেনাপতিদের নিকট নয়, তারা আত্মসমর্পণ করেছিল ভারতের জনসাধারণের নিকট, আর তা করেছিল ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শে।

'তলোয়ার' যুদ্ধ-জাহাজের ঘটনা

'তলোয়ার' যুদ্ধ-জাহাজ থেকেই এই ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী নৌ-বিদ্রোহের সূত্রপাত। এই যুদ্ধ-জাহাজখানি ছিল বোম্বাইয়ের সমুদ্র-উপকূলে। এতে নৌ-সৈন্যদিগকে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হত। এখানে ছিল সর্বসমেত এগারোশো ভারতীয় সৈন্য। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজ নৌ-সেনাপতি কিং কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যকে 'কুত্তির বাচ্চা' ও 'কুলির বাচ্চা' বলে গালি দেয়। এর ফলে ক্রুদ্ধ সৈন্যদের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে। তারা পাঁচ বৎসর যাবত এই প্রকারের ব্যবহার নীরবে সহ্য করেছে। এতদিন তাদের ভাগ্যে জুটেছে কেবল অপমানজনক ব্যবহার, ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ আর অখাদ্য-কুখাদ্য অন্ন।

কিন্তু যুদ্ধের শেষভাগে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এতদিনের রুদ্ধ ক্রোধ চারদিকে ফেটে পড়ছিল। ১৯৪২ সালের 'আগস্ট আন্দোলনের' সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন ও পাশবিক দমননীতি, ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ আর তার ফলে প্রায় অর্ধকোটি নর-নারীর মৃত্যু, ভারতবাসীদের ভয়াবহ আর্থনীতিক দুর্দশা এবং জনসাধারণের জীবনের প্রতি চরম অবহেলা—এই সকল একত্রে ভারতবাসীদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়েছিল। সেই আগুনের ছোঁয়াচে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

ইতিপূর্বে ভারতের 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বিচারের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী বড় বড় শহরগুলিতে সভা ও শোভাযাত্রা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে মৃত্যুভয় ত্যাগ করে সংগ্রাম করেছিল। তার প্রভাব এই ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের উপর অনিবার্যভাবেই পড়েছিল। তখন প্রত্যেকটি শিল্পে যে অভূতপূর্ব

ধর্মঘট সংগ্রাম চলেছিল, কৃষক জনসাধারণ যে জঙ্গী সংগ্রাম চালিয়েছিল, তদ্বারাও ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সব সংগ্রামের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই নৌ-সৈন্যগণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল। তাই নৌ-সেনাপতি কিংয়ের অপমানজনক ব্যবহারে ৩০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ক্রোধে জলে উঠল।

বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

ব্রিটিশ সেনাপতি কিংয়ের অপমানজনক ব্যবহারের ফলেই ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠতে আরম্ভ করে। অপমানিত সৈন্যগণ প্রথমে এইরূপ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করল, পাল্টা-অভিযোগ করল, সকলে স্বাক্ষর দিয়ে দরখাস্ত পেশ করল। কিন্তু পূর্বের মত এবারও কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করল না। তার পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী সৈন্যদের প্রাতরাশের জন্য যে খাদ্য দেওয়া হয় তা ছিল সম্পূর্ণ অখাদ্য। পূর্ব থেকেই সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ জেগেছিল, এবার এই অখাদ্য দ্রব্য দেবার ফলে তারা ক্রোধে জলে উঠল। অবিলম্বে 'তলোয়ার' জাহাজের এগারোশো সৈন্য ধর্মঘট ঘোষণা করল। তারা কাজে যোগদান করতে অস্বীকার করল এবং সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করল, তারা ব্রিটিশ সেনাপতিদের নির্দেশে একটি অঙ্গুলিও তুলবে না।

ঐদিন বেলা একটার সময় 'ফ্লাগ-অফিসার' অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্রে 'তলোয়ার' জাহাজে এসে উপস্থিত হয়। সে এসেই ব্রিটিশ অফিসারদের সাহায্যে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের অন্যতম নায়ক ক্যাপ্টেন বি. সি. দত্তকে গ্রেপ্তার করল। এই গ্রেপ্তারের ফলে ভারতীয় সৈন্যগণ ক্রোধে জলে উঠল। তারা সমস্বরে ক্যাপ্টেন দত্তের মুক্তি দাবি করলে কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে তাঁকে মুক্তি দিল।

সেনাপতি কিং নৌ-সৈন্যদের কঠোর শাস্তির ভয় দেখাল, কিন্তু কোন ফল হল না, কেবল সৈন্যদের ক্রোধ ও দৃঢ়তাই শতগুণ বৃদ্ধি পেল। ঐদিন অপরাহ্নে 'তলোয়ার' জাহাজের এগারোশত সৈন্য মিলিত হয়ে সভা করল এবং সেই সভায় তাদের দাবির একটি তালিকা প্রস্তুত করল। তাদের দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) উৎকৃষ্ট খাদ্য, (২) যথেষ্ট পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য, (৩) ব্রিটিশ সৈন্যদের সমান বেতন, (৪) সেনাপতি কিংয়ের উপযুক্ত শাস্তি বিধান, (৫) অবিলম্বে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া, ইত্যাদি। এই সঙ্গে তাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল—'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান এবং অবিলম্বে ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ভারতে ফিরিয়ে আনা।

'তলোয়ার' জাহাজের এই সংগ্রামের সংবাদ দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণও এই সংবাদ শুনল। তার ফলে ১৮ই এবং ১৯শে নিয়মমত ধর্মঘট ঘোষিত না হলেও সর্বত্র কাজ বন্ধ রইল। সকল স্থানের সকল সৈন্যের মুখে একটিমাত্র কথা : "'তলোয়ার' জাহাজের নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘটে আমাদেরও যোগদান করতে হবে।" সর্বত্র সারাদিন নৌ-সৈন্যদের মধ্যে কেবল এই আলোচনাই হল, সর্বত্র ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলল।

বোম্বাইয়ের সকল যুদ্ধ-জাহাজের ধর্মঘট

পরদিন, ধর্মঘটের সকল আয়োজন সমাপ্ত। এবার আরম্ভ হল বোম্বাইয়ের সকল জাহাজ আর নৌ-ঘাঁটিতে ধর্মঘট। এই ধর্মঘটে যোগদান করল বোম্বাই পোতাশ্রয়ের 'আকবর', 'চিতা', 'কোলাবা', 'কুক্রি', 'ম্যাক্লিমার', 'হামলা' প্রভৃতি ২০টি বড় যুদ্ধ-জাহাজ এবং ১০০টি ছোট যুদ্ধ-জাহাজ, আর ফোর্ট-ব্যারাক, ক্যাসেল-ব্যারাক প্রভৃতি ১২টি নৌ-ঘাঁটি। সর্বসমেত বোম্বাইয়ের ২০ হাজার সৈন্য এই ধর্মঘটে যোগদান করল।

যুদ্ধ-জাহাজগুলির ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীদের নিরস্ত্র করে জাহাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ধর্মঘটীরা শান্তভাবে জাহাজগুলির পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাহারা বসান হয়। সৈন্যগণ সমস্ত কামান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য-ভাণ্ডার অধিকার করে। সকল স্থানে ব্রিটিশ পতাকা 'য়ুনিয়ান জ্যাক্' নামানো হয় এবং তার পরিবর্তে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা, মুসলিম লীগের সবুজ পতাকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সংযোগ-কেন্দ্র 'তলোয়ার' যুদ্ধ-জাহাজ এবং মাহোল-এর নৌ-বেতার-কেন্দ্র থেকে চারদিকে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নৌ-সংস্থা ও যুদ্ধ-জাহাজগুলিতে বেতারযোগে সংবাদ পাঠানো হল:

"আমরা ধর্মঘট করেছি, আমরা আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ করেছি। তোমরাও অবিলম্বে যোগদান কর।"

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র করাচী, কোচিন, কলম্বো, ভিজাগাপত্তম্, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি সকল নৌ-কেন্দ্রের ভারতীয় সৈন্যগণও ধর্মঘটে যোগদান করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে বোম্বাইয়ের সকল ভারতীয় নৌ-সৈন্য আজাদ ময়দানে সমবেত হয়। এই সমাবেশে ধর্মঘটের নায়কগণ ধর্মঘটের দাবি ঘোষণা করেন। তারপর সকল সৈন্য শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। তারা ধ্বনি তোলে—'জয়হিন্দ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'হিন্দু-মুসলিম এক হও', 'সকল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই'।

তাদের শোভাযাত্রা ও সঙ্গের লড়িগুলি কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকায় সুশোভিত হয়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। হাজার হাজার শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রমজীবিগণ শোভাযাত্রায় যোগদান করে। এ-এক অপূর্ব দৃশ্য, ভারতীয় নৌ-সৈন্যবাহিনী আর শ্রমজীবী জনসাধারণের বৈপ্লবিক মিলনের দৃশ্য! সৈন্য-বাহিনী দ্বারা জনসাধারণের সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তোলার দৃশ্য! ভারতের ইতিহাসে এদৃশ্য অভিনব।

এই বৈপ্লবিক দৃশ্য দেখে ইংরেজ-শাসকগণ উন্মাদ হয়ে ওঠে। এক বিরাট পুলিস বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যবাহিনীর উপর। কিন্তু এর ফল হল বিপরীত। সৈন্য ও শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু পুলিস এবং পুলিস বাহিনীর ইংরেজ পরিচালক স্বয়ং গুরুতররূপে আহত হয়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হুমকি ও আশ্বাস

এবার ব্রিটিশ শাসনকর্তারা বুঝলেন, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বোম্বাই-য়ের নৌ-বাহিনীর প্রধান কর্তা রিয়ার অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্রে সেইদিন অপরাহ্ণে নৌ-বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র 'তলোয়ার' জাহাজে এসে উপস্থিত হয়। সে এসেই নৌ-সৈন্যদের অভিযোগগুলি জানতে চাইল। নৌ-সৈন্যগণ দাবি করলেন, যারা তার সঙ্গে আলোচনা করতে যাবে তাদের কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না। সৈন্যরা জানিয়ে দিল, এই আশ্বাস না পেলে সৈন্যদের পক্ষ থেকে কেউই তার সঙ্গে দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতে যাবে না।

চারদিক থেকে সৈন্যদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে র‍্যাট্রে অত্যন্ত ভীত হল। সে আশ্বাস দিল, কাউকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। এর পর তার হাতে দাবি-দাওয়ার একটি তালিকা দেওয়া হল। সে ঐ দিনই অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় উত্তর দেবে বলে চলে গেল। কিন্তু কোন উত্তর এল না। উপরন্তু তার আদেশে 'হামলা' যুদ্ধ-জাহাজের তিন শত সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হল।

ঐ দিন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালেই সৈন্যগণ মিলিত হয়ে নিজ নিজ জাহাজ ও ঘাঁটিতে স্ট্রাইক-কমিটি গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় স্ট্রাইক-কমিটি গঠনের জন্য প্রত্যেক জাহাজ ও ঘাঁটি থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।

"সর্বসম্মতিক্রমে অন্যতম প্রধান 'সিগ্‌নালম্যান', উত্তর-পাঞ্জাবের একজন পীতাভ মুসলমান, এম. এস. খান সভাপতি, এবং রুগ্ন ও দীর্ঘকায় শিখ 'টেলিগ্রাফ' অফিসার মদন সিং সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেই রাজকীয় নৌ-বাহিনীতে (রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি) যোগদান করেছিলেন। যে সাম্প্রদায়িকতার বিষে সেদিনের ভারতীয় জন-জীবন জর্জরিত হয়েছিল সেই সাম্প্রদায়িকতা থেকে এঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত।"[১]

পরদিন, ২০শে ফেব্রুয়ারী কর্তৃপক্ষ সকল জাহাজ ও ঘাঁটির অদূরে সশস্ত্র পাহারা বসাল। কিন্তু তারা ভয়ে কামান-মেসিনগান-সজ্জিত জাহাজগুলির কাছে ঘেঁসতে সাহসী হল না। অন্যদিকে ধর্মঘটী সৈন্যদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তারা ধর্মঘটী সৈন্যদের দাবি অনুযায়ী যথেষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করতে লাগল। কিন্তু তখন উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করে ভারতীয় সৈন্যদের শান্ত করবার দিন অতীত হয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্যের সংগ্রাম এখন বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে।

সৈন্যগণ জাহাজে জাহাজে সভা করে স্থির করল, তাদের সমস্ত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এবং বিভিন্ন স্থান থেকে সশস্ত্র পাহারা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলতে থাকবে। বোম্বাই শহরের দক্ষিণ অংশে এক শোভাযাত্রা বের করে তারা জনসাধারণকে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে কর্তৃপক্ষ আদেশ ঘোষণা করল, ঐ দিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার মধ্যেই সমস্ত নৌ-সৈন্যকে নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, সৈন্যগণ কর্তৃপক্ষের এই আদেশ তাচ্ছিল্য-ভরে অগ্রাহ্য করল।

১। ক্যাপ্টেন বি. সি. দত্তের 'ডাইরী', পৃ. ৬।

করাচী ও অন্যান্য স্থানে ধর্মঘট

ইতিমধ্যে করাচী বন্দরে অবস্থিত বিভিন্ন যুদ্ধ-জাহাজ এবং নৌ-ঘাঁটিতেও বোম্বাইয়ের ধর্মঘটের সংবাদ পৌছেছিল। করাচীতে অবস্থিত 'চমক' যুদ্ধ-জাহাজের 'রাডার' শিক্ষার্থীরা এই ধর্মঘটে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২০শে ফেব্রুয়ারী করাচী বন্দরে অবস্থিত 'হিন্দুস্থান' ও 'ত্রিবাঙ্কুর' যুদ্ধ-জাহাজের সৈন্যগণও ধর্মঘটে যোগদান করে। উপকূলবর্তী নৌ-ঘাঁটি 'বাহাদুর' আর 'হিমালয়'-এর সৈন্যগণও ধর্মঘটে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এ ছাড়া কলিকাতার বেহালা বন্দরে অবস্থিত যুদ্ধ-জাহাজ 'হুগলী' ও 'রাজপুতানা'র সৈন্যগণও ধর্মঘটে যোগ দেয়। কিন্তু ধর্মঘটের মূলকেন্দ্র হল বোম্বাই। অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্রে কর্তৃক সৈন্যদের অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার মধ্যে ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আদেশ ঘোষণার পর সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। সকলে চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

২১শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় নৌ-ধর্মঘট কমিটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদনটি প্রচার করে:

"আমরা কয়েক বৎসর যাবত ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে কর্মরত আছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, অবিচার-অত্যাচার, স্বল্প বেতন, অখাদ্য 'রেশন' এবং সর্বোপরি অপমান ও সাদা-কালো জাতিবৈষম্য সহ্য করেছি।

"আমরা বহুবার আমাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য, বিশেষত সাদা-কালোর জাতিবৈষম্য দূর করবার এবং জাতিসাম্য প্রবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অসংখ্য-বার আবেদন করেছি। ...কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি।

"সুতরাং আমাদের বৈমানিক ভাইদের (রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স) অনুসরণে আমরাও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং গত পাঁচ দিন যাবত আমরা শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিতভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছি।

"কর্তৃপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে, বিশেষত আমাদের ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর ভাইদের বিশ্বাস করতে না পেরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করেছে। তারা 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর উপর আক্রমণ করে এবং আমাদের অস্ত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

"কোন ভারতবাসীই আমাদের অপমানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করতে এবং উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বুটের তলায় মাথা নত করতে বলতে পারে না।... আমরা কখনও ভীতি প্রদর্শনে মাথা নত করব না।

"আপনারা, আমাদের জনসাধারণ যদি আমাদের পাশে না দাঁড়ান, তবে নৌ-সেনাপতি তার ভীতি প্রদর্শন কার্যে পরিণত করবে। আপনারা নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আপনাদের সৈনিক ভাইরা ব্রিটিশ বুলেটে ধ্বংস হয়।

"আমরা বিশেষভাবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করছি: আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে বোম্বাইয়ের রক্তস্নান বন্ধ করুন, নৌ-কর্তৃপক্ষের গুলিবর্ষণ বন্ধ করুন, আমাদের সঙ্গে আপস করতে তাদের বাধ্য করুন। শান্তিপূর্ণ হরতাল ও ধর্মঘটের দ্বারা আমাদের সংগ্রাম সমর্থন

করতে আমাদের জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলুন। আমরা আমাদের দেশের ভাইবোনদের নিকট আবেদন করি, আপনারা আমাদের আবেদনে সাড়া দিন। আমরা আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।"[১]

সশস্ত্র সংঘর্ষ

১৯৪৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের—কেবল তাদেরই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। প্রথম দিন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামরিক শক্তির সঙ্গে বোম্বাই ও করাচীর ভারতীয় নৌ সৈন্যদের প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। আর দ্বিতীয় দিন, ২২শে ফেব্রুয়ারী সাম্রাজ্যবাদীদেরই যুদ্ধ-জাহাজের ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ করে।

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রথম যুদ্ধ হয় বোম্বাই বন্দরে। পূর্বদিন কর্তৃপক্ষ তীর-সংলগ্ন সকল যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌ-ঘাঁটির চারদিক মারাঠী সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টন করে। রাত্রিকালে নৌ-সৈন্যগণ মারাঠী সৈন্যদের নিকট আবেদন জানায়:

"তোমরাও ভারতবাসী, আমরাও ভারতবাসী। তবে তোমরা আমাদের গুলি করে হত্যা করতে এসেছ কেন? আমাদের সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।"

এই আবেদনের উত্তরে মারাঠী সৈন্যগণ জানাল:

"আমরা তোমাদের হত্যা করব না। আমাদের বন্দুকের সব কার্তুজই ফাঁকা।"[২]

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর নিকটবর্তী স্থানে মোতায়েন করা মারাঠী সৈন্যদিগকে নৌ-সৈন্যদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়বার আদেশ দেওয়া হয়। এর পর দেওয়া হয় 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর উপর আক্রমণের আদেশ। অন্যদিকে নৌ-সৈন্যরাও ত্রিশটি রাইফেল আর বারোটি রিভলভার নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তা দেখে মারাঠী সৈন্যগণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্থানত্যাগ করে।

প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয় দুই ঘণ্টা পর। এবার মারাঠী সৈন্যদের পরিবর্তে আসে একদল ইংরেজ সৈন্য। তারা এসেই নৌ-বিদ্রোহীদের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌ-বিদ্রোহীরাও 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর ম্যাগাজিন (অস্ত্রাগার) ভেঙে ফেলল এবং ম্যাগাজিন থেকে বহু হাতবোমা, ১৫০টি রাইফেল, তিনটি মেসিনগান, কয়েকটি রিভলভার আর প্রয়োজনীয় গুলিগোলা নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। যে স্থান থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সর্বাধিক, সেই দিক লক্ষ্য করে মেসিনগান তিনটি বসানো হল।

শীঘ্রই রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হল। একস্থানে বহু ইংরেজ সৈন্য সমবেত হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করে বিদ্রোহীদের মেসিনগানের গুলিবর্ষণ আরম্ভ হল এবং কয়েকটি

১। ক্যাপ্টেন বি. সি. দত্তের ডাইরি।
২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

হাতবোমাও ছোঁড়া হল। গুলি আর বোমায় বহু ইংরেজ হতাহত হল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরও একজন তরুণ সৈনিক নিহত এবং কয়েকজন আহত হল। 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এ যুদ্ধ চলে দীর্ঘ সাতঘণ্টা। তারা দেয়ালের আড়াল থেকে যুদ্ধ করে বলে তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প।

যুদ্ধ-জাহাজ থেকে কামানের যুদ্ধ

'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর যুদ্ধের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ গুলিও চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। নৌ-বহরের পতাকাবাহী জাহাজ 'নর্মদা'র বিদ্রোহীরা ঐ জাহাজের কামানগুলির মুখ ঘুরিয়ে রাখে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর দিকে। ব্রিটিশ বাহিনী 'ক্যাসেল-ব্যারাক'-এর উপর আবার আক্রমণের জন্য সুবিধামত স্থান অধিকার করছে দেখে অপর দুইখানি যুদ্ধ-জাহাজ 'আসাম' ও 'পাঞ্জাব'-এর বিদ্রোহীরা কামানশ্রেণী থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। এই গোলাবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে ব্রিটিশ সৈন্যগণ পলায়ন করে।

এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। ভারতীয় সৈন্যগণ অচঞ্চলভাবে লৌহদৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য নিজ নিজ স্থান অধিকার করে থাকে। নিকটবর্তী অন্যান্য যুদ্ধ-জাহাজ এবং নৌ-ঘাঁটিগুলিও যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 'ফোর্ট ব্যারাক', যুদ্ধ-জাহাজ 'তলোয়ার', 'আকবর'—প্রভৃতি সকল ঘাঁটি ও জাহাজ থেকে 'ক্যাসেল ব্যারাক'-এর সহযোদ্ধাদের প্রতি অভিনন্দন আর উৎসাহ-বাণী আসতে থাকে। সকল ভারতীয় সৈনিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধের অপেক্ষা করতে থাকে।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি গড্‌ফ্রে অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় বেতার-যোগে ভারতীয় সৈন্যদের ভয় দেখিয়ে অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। সে ঘোষণা করল: ভারতীয় সৈন্যগণ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ না করলে তার অধীনস্থ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যদের নির্মমভাবে ধ্বংস করা হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করলেন, বিদ্রোহী ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের ধ্বংস করবার জন্য একটি সুবৃহৎ ব্রিটিশ নৌ-বহর ভারতের দিকে যাত্রা করেছে।

ইতিমধ্যে সেনাপতি গড্‌ফ্রে বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয় অঞ্চলে এক বিপুল ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ করে। ঝাঁকে ঝাঁকে ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলি বিদ্রোহী বোম্বাই-য়ের পোতাশ্রয়ের উপর আকাশ-যুদ্ধের ভঙ্গিতে উড়তে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে পোতাশ্রয়ের বাইরেও একটি প্রকাণ্ড ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের এক বিশাল বহর ভারতীয় সৈন্যদের দিকে কামানের মুখ ঘুরিয়ে গোলাবর্ষণের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

সৈন্যদের পাশে গণশক্তির সমাবেশ

কিন্তু পোতাশ্রয়ের বাইরে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সামরিক শক্তির আক্রমণ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের রক্ষা করবার জন্য এক বিপুল সংগ্রাম-শক্তির সমাবেশ হয়।

এই শক্তি বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা চালিত জনসাধারণ। বোম্বাইয়ের শ্রমিক-শ্রেণীই তার প্রকৃত শক্তি। সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক আয়োজন যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এবং জনসাধারণও ততই তাদের প্রিয় সন্তান, সংগ্রামরত ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতে থাকে। ইতিপূর্বেই, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘটের সংবাদ বোম্বাই শহরে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ অ্যাপোলো বন্দর, পোতাশ্রয় ও ব্যারাক অঞ্চলে নৌ-সৈন্যদের অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে যায়। যুদ্ধ-জাহাজগুলি থেকে ভারতীয় সৈন্যগণ লঞ্চে করে তীরে অবতরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ জয়ধ্বনি করে তাদের অভিনন্দন জানায়। নানাবিধ খাদ্য, ফল ও সিগারেট সৈন্যদের দিকে অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। জনসাধারণ যেন তাদের সন্তানদের প্রতি তাদের স্নেহ-প্রীতি এইভাবে বর্ষণ করে জানিয়ে দেয় যে, তারা সৈন্যদের পাশেই আছে, তারা সৈন্যদের যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২১শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধায়োজন দেখে জনসাধারণের ক্রোধ ফেটে পড়ে। "ইংরেজ শয়তানেরা আমাদের ছেলেদের মেরে ফেলছে"—এই কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে তাদের ক্রোধ শতগুণ বাড়িয়ে তোলে। একটি সাধারণ হরতাল—ধর্মঘটের দ্বারা ব্রিটিশ শয়তানকে অচল করে দেবার আলোচনা চলতে থাকে। ঐদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই নগরীর অবস্থা চরম আকার ধারণ করে।

নৌ-সৈন্যদের কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি "বিভিন্ন পার্টির নেতৃবৃন্দ ও ভারতের জন-সাধারণের কাছে" এই নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন প্রচার করেন। এই আবেদনে তাঁরা তাঁদের ধর্মঘটের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যে হুমকি দিয়েছে তাও আবেদনে জানানো হয়। ধর্মঘট-কমিটি তাঁদের আবেদনটি প্রচার করেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। আবেদনে ভারতের জনসাধারণকে ধর্মঘটী সৈন্যদের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ হরতাল ও ধর্মঘট পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ঐদিনই (২১শে ফেব্রুয়ারী) কমিউনিস্ট পার্টি গড্‌ফ্রের হুমকির প্রত্যুত্তরে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের নিকট এক সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য আবেদন করে।

করাচীর সংগ্রাম

এদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী করাচীর নৌ-সৈন্যদের সংগ্রামও প্রবল আকার ধারণ করে। ঐদিন প্রাতঃকাল থেকে বোম্বাইয়ের ধর্মঘটী ভারতীয় সৈন্যদের সমর্থনে, করাচীর উপকূলবর্তী নৌ-ঘাঁটি 'হিমালয়' ও 'বাহাদুর' এবং যুদ্ধ-জাহাজ 'চমক'-এর নৌ-সৈন্যগণ সংগ্রাম আরম্ভ করে। 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ-জাহাজে ৬০০ ভারতীয় সৈন্য সমবেত হয়। ঐদিন করাচীর ব্রিটিশ সেনাপতি বালুচ্ রেজিমেন্টের দুই 'প্ল্যাটুন' সৈন্যকে (৬০ জন) 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ-জাহাজে আরোহণ করবার আদেশ দেয়। বালুচ্

সৈন্যগণ সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তারপর একদল ব্রিটিশ সৈন্য আনয়ন করা হয়। অবস্থা গুরুতর বুঝে ভারতীয় সৈন্যগণ 'হিন্দুস্থান' জাহাজের ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষকে জাহাজ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জাহাজ ত্যাগ করে ইঙ্গিত করামাত্র ব্রিটিশ বাহিনী উপকূল থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করে। ভারতীয় সৈন্যগণও মেসিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে উত্তর দেয়। ব্রিটিশ বাহিনীর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, যত সহজে কার্যোদ্ধারের আশা তারা করেছিল তত সহজে কার্যোদ্ধার হবে না। কিছুক্ষণ পর আবার তারা কামান থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে এবং বিদ্রোহীরাও মেসিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে তার উত্তর দেয়। এই যুদ্ধে দুইজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। তারপর বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যগণ মেসিনগানের পরিবর্তে জাহাজের কামানশ্রেণী থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। এই গোলাবর্ষণের ফলে ব্রিটিশ বাহিনী বিপদ বুঝে পশ্চাৎ অপসরণ করে।

করাচী বন্দরের অন্যান্য নৌ-ঘাঁটিতে যে সকল সৈন্য অবস্থান করছিল তারাও দৃঢ়ভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা অবিলম্বে ব্রিটিশ বাহিনীর অপসারণ দাবি করে।

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকাল থেকে করাচীর সংগ্রাম চরম আকার ধারণ করে। সকাল বেলা ভাঁটার ফলে সমুদ্রের জল নীচে নেমে গেলে সংগ্রামের মূলকেন্দ্র 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ-জাহাজ দূরে সরে গিয়ে এমন স্থানে নোঙর ফেলতে বাধ্য হয় যেখান থেকে জাহাজের কামান ব্যবহার করা বিশেষ অসুবিধাজনক। এই সুযোগে ব্রিটিশ বাহিনী আবার 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ-জাহাজের উপর কামানের গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও এই যুদ্ধ-জাহাজের সৈন্যগণ ২৫ মিনিটকাল জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই অসম যুদ্ধে ৬জন ভারতীয় সৈন্য নিহত এবং ২৫জন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়।

"২২শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতঃকাল। তখন করাচীর যুদ্ধ চরমে পৌছেছে। সামুদ্রিক ভাঁটার জন্য জাহাজ অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় আমরা বিদ্রোহীরা আমাদের চার ইঞ্চি ভারী কামান ব্যবহার করতে পারলাম না। তার ফলে ব্রিটিশ সৈন্যগণ চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলে। প্রায় আধঘণ্টা বীরের মত যুদ্ধ করে আমাদের ছয়জন কমরেড প্রাণ দিলেন। সকলের আগে গেলেন কমরেড আনোয়ার হোসেন (ইনি লাহোরের এক তরুণ ছাত্র)। কামানের একটি গোলা তাঁর দেহ দ্বিখণ্ড করে ফেলে। কমরেড আনোয়ার ছিলেন বিপ্লবের এক জলন্ত অগ্নিশিখা। আমরা মাথার টুপি খুলে শেষবারের মত তাঁকে বিদায় দিলাম।"[১]

আর যুদ্ধ চালনা অসম্ভব বুঝে 'হিন্দুস্থান' জাহাজের ভারতীয় সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করে। তাদের ৩৫০জনকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়। করাচীর সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র 'হিন্দুস্থান' যুদ্ধ-জাহাজ আত্মসমর্পণ করবার পর অন্যান্য নৌ-ঘাঁটির সৈন্যগণও আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে করাচীর ধর্মঘট ও সংগ্রামের অবসান ঘটে।

১। সুনীল ব্যানার্জির স্মৃতিকথা থেকে গৃহীত, ৮ পৃষ্ঠা।

করাচীর সৈন্যগণ বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলেও জনসাধারণ সংগ্রাম চালাতে থাকে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে করাচী শহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয় এবং অপরাহ্ণে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের এক বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। পুলিস ও সামরিক বাহিনী এই শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ করলে বহুলোক হতাহত হয়। ক্রুদ্ধ জনতার সঙ্গে বহুক্ষণ পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর ঘোরতর সংগ্রাম চলে।

মুক্তি-জাহাজের অভিযান

বোম্বাই ও করাচী বন্দরে যখন দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সঙ্গে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম চলছিল, তখনই ভারতের অন্যান্য বন্দরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণও তাদের সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রাম করছিল। ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বন্দরের ১৭০০ সৈন্য ধর্মঘট করে নৌ-ঘাঁটি ও যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে অচল করে দেয়। কোচিন বন্দরের ৭০০ সৈন্য এবং ভিজাগাপত্তমের ১৩০০ সৈন্য ধর্মঘট করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালনার সংকল্প ঘোষণা করে। ২২শে ফেব্রুয়ারী এক ব্রিটিশ বাহিনী ভিজাগাপত্তমের ভারতীয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করলে ভারতীয় সৈন্যগণ ঘোরতর যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়। সেই স্থানের ভারতীয় সৈন্যগণ প্রবলতর শত্রুর সঙ্গে আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব বুঝে আত্মসমর্পণ করে। তাদের ৩০০ জনকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়।

এমনকি সুদূর কাথিয়াবারের জামনগরের সমুদ্রতটে বালসুরার নৌ-ঘাঁটির ৩০০ সৈন্য ধর্মঘট করে এবং বোম্বাইয়ের সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা ধর্মঘট চালিয়ে যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'কাথিয়াবার' যুদ্ধ-জাহাজের সংগ্রাম। 'কাথিয়াবার' একখানি ছোট যুদ্ধ-জাহাজ। তাতে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২০ জন, আর ক্যাপ্টেন একজন ইংরেজ। যখন বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের সংগ্রাম আরম্ভ হয় তখন এই জাহাজখানি ছিল গুজরাটের দেশীয় রাজ্য মোরাভির একটি বন্দরে। 'কাথিয়াবার'-এর ভারতীয় সৈন্যগণ বোম্বাইয়ের সংগ্রামের সংবাদ জানতে পারে ২১শে ফেব্রুয়ারী। এই সংবাদ শোনামাত্র জাহাজের সৈন্যগণ ধর্মঘট ঘোষণা করে।

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে 'কাথিয়াবার' যুদ্ধ-জাহাজ বন্দর ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যগণ জাহাজের কর্তৃত্বভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, এবং বোম্বাইয়ের সংগ্রামরত সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বোম্বাই বন্দরের দিকে জাহাজ চালাতে থাকে। কিন্তু কিছুদূর আসার পরই তারা করাচীর 'হিন্দুস্থান' জাহাজের ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে রেডিওযোগে সাহায্যের আবেদন শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ জাহাজের গতি করাচীর দিকে পরিবর্তিত হল। জাহাজের ক্যাপ্টেন বাধা দিলে সৈন্যগণ তাকে ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারীকে বন্দী করে জাহাজের এক কামরায় আবদ্ধ করে রাখল। পথিমধ্যে তারা দিল্লীর সামরিক কেন্দ্র থেকে করাচীর আত্ম-

সমর্পণের রেডিও-সংবাদ শোনামাত্র আবার জাহাজের গতি পরিবর্তন করে বোম্বাইয়ের সংগ্রামী সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বোম্বাই বন্দরের দিকে যাত্রা করল।

'কাথিয়াবার' জাহাজ সমুদ্রের জল কাটিয়ে দ্রুতগতিতে চলেছে বোম্বাই বন্দরের দিকে। জাহাজের সৈন্যগণ তাদের বোম্বাইয়ের সংগ্রামী ভাইদের সঙ্গে শীঘ্রই মিলিত হবে, সেখানে চির-ঘৃণিত সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সঙ্গে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করতে পারবে। তারা আসন্ন মুক্তি-সংগ্রামের আনন্দে চঞ্চল হয়ে সমবেত কণ্ঠে উর্দু কবি যোশ মলিহাবাদী রচিত বিপ্লবের গান ধরল—

"কাম হায় মেরা তাগায়ুর,
নাম হায় মেরা শাবাব,
মেরা নারা : ইন্‌কিলাব—ও—ইন্‌কিলাব—ও
ইন্‌কিলাব।"

অনুবাদ :

"কর্ম আমার নতুনের সৃষ্টি,
নাম আমার যৌবন-শক্তি,
ধ্বনি আমার : বিপ্লব, আর বিপ্লব, আর বিপ্লব।"

২৩শে ফেব্রুয়ারী 'কাথিয়াবার' যুদ্ধ-জাহাজ বোম্বাই বন্দরে এসে পৌছে। কিন্তু তখন বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে, তারাও আত্মসমর্পণ করেছে। সুতরাং 'কাথিয়াবার'ও আত্মসমর্পণ না করে পারল না। এইভাবে 'কাথিয়াবার' যুদ্ধ-জাহাজখানির ঐতিহাসিক অভিযান শেষ হয়ে গেল। এটাই একমাত্র যুদ্ধ-জাহাজ যা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সৈনিকদের দ্বারা যুদ্ধাভিযান চালিয়েছে।

বোম্বাইয়ের বৃহত্তম হরতাল

একদিকে বোম্বাই ও ভারতের অন্যান্য স্থানে যখন ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের সংগ্রাম প্রবলভাবে চলছিল, তখনই অপর দিকে ভারতের সর্বত্র, বিশেষত বোম্বাই নগরীর শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ সংগ্রামরত ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যের জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর উপর চরম আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতব্যাপী নৌ-সৈন্যগণের সংগ্রাম চরম আকার ধারণ করে, তখনই বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী এবং জনসাধারণও তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২২শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ এক সর্বাত্মক হরতাল আরম্ভ করে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকগণ।

ইতিপূর্বে ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণের 'কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি'র আহ্বানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের সমগ্র জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশেষত সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সকল প্রকারে চেষ্টা করেও এই ঐতিহাসিক হরতাল বন্ধ করতে পারেননি। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের দৃঢ় সংকল্পে কংগ্রেস-নেতৃত্বের বাধাদানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর মিলন ভারতের

ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বৃহৎ বুর্জোয়া সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অগ্রদূত। ভারতের ইতিহাসের এই অভূত-পূর্ব ঘটনা সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই স্পষ্ট ইঙ্গিত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সেদিন বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ সংগ্রামের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী আর জনসাধারণ একই উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিল। বোম্বাই নগরীতে এত বড় হরতাল আর কোন কালে ঘটেনি। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের পুরো-ভাগে ছিল বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকশ্রেণী, আর তার পিছনেই ছিল ছাত্রশক্তি। তিন লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করে সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ করে দেয়। তাদের সঙ্গে ত্রিশ সহস্রাধিক ছাত্রও ধর্মঘট করে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শেষ সংগ্রামের আহ্বান নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়। তা ছাড়া বোম্বাইয়ের হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ, মধ্যশ্রেণী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষ অফিস-কাছারী-দোকান ত্যাগ করে শ্রমিক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বোম্বাই নগরী অসংখ্য সংগ্রামী মানুষের সমাবেশে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের আকার ধারণ করে। সকাল বেলা ১০টা থেকে বোম্বাইয়ের সমস্ত মানুষের খণ্ড খণ্ড শোভাযাত্রা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ আর কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা নিয়ে বিভিন্ন রাজপথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে ঘুরে বেড়ায়।

বোম্বাই নগরীর এই বৈপ্লবিক রূপ প্রত্যক্ষ করে শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ে। আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার পূর্বেই জনসাধারণের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য শাসকগোষ্ঠী উন্মাদ হয়ে ওঠে। তারা বুঝল এ তো এখন আর মাত্র ত্রিশ হাজার ভারতীয় নৌ-সৈন্যের প্রশ্ন নয়, এই সমাবেশ শীঘ্রই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মুক্তিকামী ভারতবাসীর মৃত্যুপণ সংগ্রামে পরিণত হবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সম্প্রদায়ের এই অভূতপূর্ব মিলন যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও সেই সঙ্গে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরও মূলোচ্ছেদ করবে তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হল না। তারা একথা জানত যে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধী হলেও তাদের পক্ষেও এই সংগ্রামী জনসাধারণকে আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে না।

সুতরাং শাসকগোষ্ঠী বোম্বাইয়ের জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম-শক্তিকে অবিলম্বে 'সংযত' করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। তার জন্য তারা ভারতীয় স্থল-সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করেনি। কারণ, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যের উপর তাদের আর আস্থা ছিল না। দক্ষিণ-ভারতের ভারপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ সেনাপতি লক্‌হার্ট-এর উপর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। একদিকে থাকে বোম্বাইয়ের সমগ্র জনসাধারণ, অপর দিকে ব্রিটিশ সেনাপতি লক্‌হার্ট পরিচালিত এবং ট্যাঙ্ক, মেসিনগান প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী।

লক্‌হার্টের নির্দেশে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী জনসাধারণের শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ

করে। তারা উন্মাদ হয়ে শোভাযাত্রাগুলির উপর ট্যাঙ্ক, কামান, মেসিনগান, রাইফেল প্রভৃতি থেকে বৃষ্টিধারার মত গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে। জনসাধারণও মৃত্যুভয় ত্যাগ করে ইষ্টকখণ্ড, লৌহদণ্ড, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাকে। বিভিন্ন রাজপথে 'ব্যারিকেড' রচিত হয় এবং তার আড়াল থেকে জনসাধারণের যুদ্ধ চলতে থাকে। এই 'ব্যারিকেড' রচনার ফলে সৈন্যবাহিনীর ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ীর চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। দিলাইল রোডের এক স্থানে জনতা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে। ডানকান রোডের বিভিন্ন স্থানে জনতা বহুক্ষণ গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ চালায়। এই অসম যুদ্ধে এই দিন ২৭০ জন নাগরিক প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং প্রায় ৫০০০ জন আহত হয়। শত্রুপক্ষেও বহু সৈন্য ইষ্টকের আঘাতে ধরাশায়ী হয়।

পরদিন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবারও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনসাধারণের ঘোরতর সংগ্রাম চলে। বহুস্থানে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনতার দীর্ঘস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ হয়। সারাদিন ধরে শহরের মধ্যে অভূতপূর্ব গেরিলাযুদ্ধ চলে। কিন্তু এদিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জরুরী নির্দেশে নৌ-সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ায় জনসাধারণ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ অবশেষে যুদ্ধ বন্ধ করে।

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পূর্বেই বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসন আর চলবে না। সুতরাং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েই তাদের হাতে শাসন-ভার ছেড়ে দেবে। তাই তাঁরা ভারত শাসনের ভার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাত থেকে শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। বোম্বাইয়ের রাজপথে যে তীব্র সংগ্রাম চলে তা দেখে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, তারা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন যে, এই আন্দোলন তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং তা বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করছে, নৌ-বিদ্রোহ ও জনসাধারণের সংগ্রামের আঘাতে তাদেরও অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং তাঁরা এই সংগ্রামের কেন্দ্রমূলটিকে উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা ভারতীয় নৌ-সৈন্যবাহিনীর উপর অবিলম্বে আত্মসমর্পণের নির্দেশ জারি করেন।

নৌ-সৈন্যদের ধর্মঘট-কমিটি ঘোষণা করেন যে, তাদের অস্ত্র ত্যাগের পূর্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, কোন ভারতীয় সৈন্যকেই শাস্তি দেওয়া হবে না এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই নিশ্চয়তা দিয়ে পুনরায় অবিলম্বে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। এর পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণ ২২শে ফেব্রুয়ারী অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ধর্মঘট-কমিটি নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রচার করে :

"সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের হস্তক্ষেপ ও পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ভারতীয়

জনসাধারণের নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। সর্দার প্যাটেল আমাদের নিশ্চয়তা দান করে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, আমাদের সাথীদের কেউ পদচ্যুত হবেন না।

"বোম্বাইয়ের নাগরিকদের নিকট, বিশেষত আমাদের সহযোদ্ধা বোম্বাইয়ের ডক-যানবাহন-মিল সমূহের শ্রমিক ভাই এবং ছাত্র-সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের সঙ্গে ঐক্য ও সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"যে সকল সাহসী নাগরিক ও শ্রমিক আমাদের কয়েকজন সাথীর মতই সংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে···জীবনদান করেছেন ও আহত হয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমাদের ধর্মঘট আমাদের জাতির জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সৈন্যদের রক্তধারা রাজপথে জনসাধারণের রক্তধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে একই উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়েছে। আমরা সৈনিকেরা কোন দিন তা বিস্মৃত হব না। আমরা জানি, আপনারা, আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীরাও তা কোন দিন বিস্মৃত হবেন না। দীর্ঘজীবী হোক আমাদের জনসাধারণ। 'জয় হিন্দ'!"

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর, ২৩শে ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নেই ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আবার যুদ্ধ-জাহাজগুলি অধিকার করে। বিভিন্ন স্থানের সৈন্য-ব্যারাক ও ডকগুলিতে এবং জাহাজে জাহাজে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বিদ্রোহী ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে কামান, মেসিনগান, রাইফেল, রিভলভার প্রভৃতি সকল অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। এইভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী নৌ-বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

গণ-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ এই বিশ্বাসঘাতকতাকেই এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের শেষ পরিণতি বলে গ্রহণ করেনি। নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ ক্রোধে জ্বলে ওঠে। দুই শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত ভারতবর্ষ এক নূতন বৈপ্লবিক মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী নৌ-সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় জ্বলে ওঠে। বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্র সম্প্রদায় ২৩শে ফেব্রুয়ারীও দুর্বার বিক্রমে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর গুলিতে বহু শ্রমিক ও ছাত্র নিহত ও আহত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুদূর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয় এবং অপরাহ্নে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করে নগর পরিভ্রমণ করে। এইভাবে জনসাধারণের রায় ঘোষিত হয়।

এমন কি ২৪ তারিখেও দক্ষিণ-ভারতের ত্রিচিনাপলী ও মাদ্রাজে সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। ত্রিচিনাপলীতে লক্ষাধিক এবং মাদ্রাজে প্রায় ১০

হাজার মানুষের বিশাল শোভাযাত্রা ভারতীয় সৈন্যদের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধ্বনি তুলে দক্ষিণ-ভারতকে কাঁপিয়ে তোলে। ত্রিভান্দ্রাম, ভিজাগাপত্তম, করাচী, লাহোর, কানপুর, এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল প্রধান শহরে, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের বহুস্থানেও হরতাল পালিত হয় এবং শোভা-যাত্রার ধ্বনিতে সমগ্র ভারতবর্ষ কেঁপে ওঠে।

ভারতীয় বিমান-সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন শাখাও ভারতীয় নৌ-সৈন্যদের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। নৌ-সৈন্যদের সমর্থনে বোম্বাই, পুণা, যশোহর, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভারতের সকল স্থানের বিমান-ঘাঁটিতে অবস্থিত বিমান-সৈন্যগণ ধর্মঘট পালন করে। জব্বলপুরে ভারতীয় স্থল-সৈন্যবাহিনীর সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুরলায় অবস্থিত স্থল-সৈন্যদের সংগ্রাম চিরস্মরণীয়। করাচীর মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট-এ অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণ "নৌ-বাহিনীর দাবি আমাদেরও দাবি" বলে ঘোষণা করে। ঠিক এই সময় ভারতীয় বাহিনীর 'দশম ডিভিশন'টি ইতালী ও গ্রীস থেকে সবেমাত্র ভারতে ফিরে আসে। এই 'দশম ডিভিশন'-এর সৈন্যগণও ধর্মঘটের জন্য বোম্বাইয়ের নৌ-সৈন্যদের নির্দেশ চেয়ে পাঠায়।

কিন্তু কংগ্রেস-নায়ক সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও মুসলিম লীগের নায়ক মহম্মদ আলি জিন্নার নির্দেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এই ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম উচ্চস্তরে আরোহণ করবার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের সংগ্রামের অবসান হলেও তা ভারতের শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুন জালিয়ে দিয়ে যায় তা সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে সেই সংগ্রামের আগুনেই ভারতের দুইশত বৎসরের প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

একবিংশ অধ্যায়

ত্রিবাঙ্কুরের পুন্নাপ্রা-ভায়লারের প্রজা বিদ্রোহ (১৯৪৬)

সংগ্রামের পটভূমিকা

ব্রিটিশ শাসনকালের দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর। আম্বালা পুঝা আর শেরতালাই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দুইটি তালুক। পুন্নাপ্রা আর ভায়লার এই দুইটি তালুকের অন্তর্ভুক্ত দুইটি স্থান। বর্তমানে গোটা ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যই নব গঠিত কেরালা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৬ সালের এই দুইটি স্থান, পুন্নাপ্রা আর ভায়লার, ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যের রাজা আর দেওয়ানের (দেশীয় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা কর্মকর্তা) এবং তাদের মুরুব্বি ইংরেজ-শাসকদের চোখের ঘুম আর মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল, আর সমস্ত ভারতবর্ষের সংগ্রামী কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের, সমস্ত সংগ্রামী মানুষের মনে অফুরন্ত সাহস জুগিয়েছিল, শত শত বৎসরের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রাণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। পুন্নাপ্রা-ভায়লারের সেই সংগ্রাম ছিল বর্বর শোষণ-উৎপীড়ন থেকে শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের মুক্তির সংগ্রাম, বৈদেশিক শাসন থেকে দেশের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার। অত্যাচারী হিসাবে এবং স্বেচ্ছাচারিতায় তার কোন তুলনা ছিল না দেশীয় রাজ্যগুলির দেওয়ানদের মধ্যে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) সবে মাত্র শেষ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে গণ-সংগ্রামের জোয়ার বইছে। এই অবস্থায় দেওয়ান রামস্বামী স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুর গড়ে তোলার এক নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনায় ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন হলেও কোন স্বাধীনতা থাকবে না রাজ্যের জনসাধারণের, তাদের নির্বিচারে মেনে চলতে হবে দেওয়ানের সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন আর খেয়ালি হুকুম। ত্রিবাঙ্কুরের কংগ্রেস নেতারা মুখে দেওয়ান রামস্বামীর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন এবং দায়িত্বশীল সরকার দাবি করলেন। কিন্তু তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনের বিরুদ্ধেও দাঁড়ালেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে পড়লেন। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ত্রিবাঙ্কুরের শ্রমিক তাদের দায়িত্বশীল সরকারের দাবি আর আর্থনীতিক দাবি নিয়ে এক রাজ্যজোড়া আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগল।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে, যুদ্ধের ফল হিসাবে দেশজুড়ে খাদ্যবস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের হাহাকার লেগে গেছে। চারদিকে চরম অব্যবস্থা, কলকারখানায়, খেতে-খামারে চরম অরাজকতা, সকল ক্ষেত্রে বেকারি বাড়ছে হু হু করে।

মুনাফাখোর কালোবাজারীদের চক্রান্তে বাজার থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন প্রভৃতি জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। তিনগুণ চারগুণ দামে সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাধারণ মানুষ দল বেঁধে খাদ্যের দাবি নিয়ে যখন আন্দোলন শুরু করল, দেওয়ান রামস্বামীর নির্দেশে পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ল জনসাধারণের সেই আন্দোলন ধ্বংস করতে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষি-শ্রমিক, তারা এবার জনসাধারণের সেই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত করতে এগিয়ে এল।

বহু বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আম্বালা পুঝা ও আরতালাই-এর শ্রমিকগণ নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কয়ার শ্রমিক য়ুনিয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শতকরা ৯৮ জন শ্রমিক এই য়ুনিয়ানের সদস্য হয়। নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই য়ুনিয়ান সমস্ত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক বিশেষ শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে উঠল। এই য়ুনিয়ানের শক্তি দেখে অন্যান্য স্থানের শ্রমিকগণও নিজেদের য়ুনিয়ান তৈরি করল। কিন্তু শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হতে দেখে মালিকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এই শ্রমিক-সংহতিকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করবার জন্য তারা য়ুনিয়ানগুলির উপর হিংস্র আক্রমণ শুরু করে দিল। তারা য়ুনিয়ানগুলির উপর বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করল, সেই সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শ্রমিকদের উপর তারা তাদের পোষা গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিতে লাগল। গুণ্ডারা মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করত, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত শ্রমিকদের কুঁড়েঘর।

জমিদারদের বর্বরসুলভ উৎপীড়ন

সেই সময় ত্রিবাঙ্কুরে চলেছে জমিদারগোষ্ঠীর মধ্যযুগীয় উৎপীড়ন। কৃষকগণ বিশেষত বর্গাদার ও ক্ষেত-মজুরগণ ছিল তাদের ক্রীতদাস। জমিদার ছিল তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বর্গাদার আর ক্ষেত-মজুরগণ জমিদারের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না, তার দিকে চোখ তুলে তাকাত না। কোন বর্গাদার বা ক্ষেত-মজুর সামান্যতম অন্যায় করলে অথবা অসতর্ক মুহূর্তে জমিদার বা তার প্রতিনিধির সঙ্গে তর্ক করলে তাদের আর রক্ষা থাকত না। জমিদারের গুণ্ডারা তার হাত-পা বেঁধে চাবুক মেরে তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিত। জমিদারের ভাবখানা ছিল এই, বর্গাদার বা ক্ষেত মজুর তো তার অন্নে প্রতিপালিত, সুতরাং তাকে যত ইচ্ছা প্রহার করার, এমনকি তাকে হত্যা করার অধিকারও তার আছে। জমিদাররা তার সব জমিই ভাড়া খাটাত, কিন্তু প্রজাদের খাজনার কোন রসিদ দিত না। খাজনার পরিমাণও নির্দিষ্ট করা থাকত না। জমিদারের ইচ্ছামত এক বর্গাদার তাড়িয়ে অন্য বর্গাদার নিয়োগ করা তো চলতই। কোন প্রজার উপর জমিদার কোন কারণে ক্রুদ্ধ হলে তার উপর বর্বরসুলভ দৈহিক নির্যাতন তো হতই, এমন কি সেই প্রজার স্ত্রী বা কন্যারাও পাশবিক অত্যাচার থেকে

অব্যাহতি পেত না। জমিদারদের হাতে কত প্রজার স্ত্রী-কন্যারা যে অত্যাচারিত হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। এইভাবে জমিদারদের বর্বরসুলভ অত্যাচারে কত যুবকের মৃত্যু হয়েছে, কত নারী ইজ্জত হারিয়েছে, কত পরিবার গৃহহারা, আশ্রয়হারা হয়েছে!

এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য, এর প্রতিশোধ নেবার জন্য, কৃষি-শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে শুরু করল। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শেরতালাইয়ের ভায়ার্ঠারা নামক স্থানে গঠিত হল কৃষি-শ্রমিকদের প্রথম ওয়ার্ড কমিটি। এর পরের বছরের জানুয়ারী মাসের মধ্যে সকল স্থানে ওয়ার্ড কমিটি স্থাপিত হল।

অন্যদিকে আম্বালা পুঝা আর শেরতালাই তালুকের বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের উপরেও চলছিল সমান অত্যাচার। শোষণ-উৎপীড়নে অস্থির হয়ে সংগঠিত হতে লাগল এই সকল স্থানের কারখানার শ্রমিকরাও। ক্ষেত-খামারের শ্রমিক আর কল-কারখানার শ্রমিক নিজ নিজ সংগঠনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এবার সংগ্রামের জন্য আয়োজন করতে লাগল।

শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রাম

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে এই অঞ্চলে শোনা যেতে লাগল এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল কৃষির আর কারখানার শ্রমিকরা। তারা এই দুর্ভিক্ষের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের সংগঠনের মারফত দাবি তুলল—চাল, কেরোসিন তেল, কাপড়, চিনি প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে হবে ন্যায্য মূল্যে। মালিকগোষ্ঠী মানতে অস্বীকার করল এই সব দাবি।

মালিকগোষ্ঠী শ্রমিকদের দাবি অগ্রাহ্য করলে আলেপ্পি, শেরতালাই আর মাহম্মীর সকল শ্রমিক একযোগে ধর্মঘট শুরু করল, সকল ক্ষেত-খামারের কাজ এবং কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র তিনদিন চলল ধর্মঘট। শ্রমিকদের একতা, দৃঢ়তা আর সংগ্রামী মনোভাব দেখে মালিকগোষ্ঠী ভয় পেয়ে গেল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কুখ্যাত দেওয়ান রামস্বামী আয়ার ঘোষণা করলেন, শ্রমিকগণ গৃহযুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। তিনি তাঁর বাছা বাছা অফিসারদের পাঠালেন ধর্মঘটের অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করতে। অফিসারগণ বুঝলেন, কোন হুমকি আর অত্যাচারে এ ধর্মঘট ভাঙা যাবে না, শ্রমিক-সংগ্রামের জঙ্গীরূপ দেখে তারাও শঙ্কিত হয়ে প্রকৃত অবস্থা জানালেন দেওয়ান রামস্বামীকে। রামস্বামী আপাতত শ্রমিকদের সঙ্গে আপস রক্ষার নির্দেশ দিলেন। অফিসারগণ শ্রমিক য়ুনিয়ানের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করলেন, ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে দোকান খোলা হবে।

কিন্তু শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের বেকারি আর দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার পক্ষে কেবল ন্যায্য মূল্যের দোকানই যথেষ্ট নয়, অতি সামান্য মজুরিতে সংসার চালানো সম্ভব নয়। কাজেই তাদের আয় বাড়াতে হবে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে

কয়ার (নারকেলের ছোবড়া) শ্রমিকগণ বোনাসের দাবি করে আসছিল। তারা এই দাবি নিয়ে বহুবার সরকার ও মালিকদের কাছে দাবি জানিয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। তাই এবার শ্রমিকগণ দাবি আদায়ের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল। আবার তাদের ধর্মঘট আসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু দেওয়ান রামস্বামী তখনও শ্রমিকদের এই আন্দোলন দমন করবার সকল আয়োজন করে উঠতে পারেন নি। তাই তিনি চেয়েছিলেন আপসের পথে শ্রমিকদের আপাতত ঠাণ্ডা রাখতে। সরকার, মালিক আর শ্রমিক—এই তিনপক্ষের একটি বৈঠক ডাকলেন তিনি। বৈঠকে স্থির হল, লাভ হোক চাই না হোক, শ্রমিকদের শতকরা চার টাকা করে বোনাস দেওয়া হবে।

বোনাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের একতা, শক্তি আর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল বহুগুণ। অন্যদিকে জমিদার-মালিকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করল বটে, কিন্তু তলে তলে সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের উপর নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করল। জমিদার-মালিকগোষ্ঠীর প্রধান মুরুব্বি দেওয়ান রামস্বামী নিঃশব্দে এক গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করলেন শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের সংগ্রামী শক্তিকে শেষ আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য।

দেওয়ান রামস্বামীর চক্রান্তের ফল হিসাবেই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কংগ্রেস নিজেকে শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ানের সঙ্গে আপস করল। এইভাবে শ্রমিক-কৃষক রাজ্য কংগ্রেসের সমর্থন হারাল, আর অন্যদিকে দেওয়ান ও জমিদার-মালিকগোষ্ঠীর শক্তি বেড়ে গেল। দেওয়ানের নেতৃত্বে জমিদার-মালিকগোষ্ঠী এবার নূতন আক্রমণ শুরু করল।

মালিকগোষ্ঠীর আক্রমণ

আম্বালা পুঝা আর শেরতালাই—এই দুইটি তালুকের শ্রমিক আর কৃষি-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দেওয়ান রামস্বামী আয়ারের নেতৃত্বে জমিদার প্রভৃতি মালিকগোষ্ঠী সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুণ্ডাবাহিনী আর পুলিস বাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হল কৃষি-শ্রমিক আর কারখানার শ্রমিকদের উপর। তাদের ঘরবাড়ী ও সমস্ত সম্পত্তি ভেঙেচুরে, তালুক দুটিকে তচনচ করে ফেলা হল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল। রাজ্যের সর্বত্র ধর্মঘট আর মিছিল বে-আইনী করা হল। দেওয়ান রামস্বামী যেন ত্রিবাঙ্কুরের সকল সংগ্রামী মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ত্রিবাঙ্কুর সরকার রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল, যেন পুলিসের অত্যাচারের কোন সংবাদ ছাপা না হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেরতালাই তালুকের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র পুলিসের ক্যাম্প বসান হল। সমস্ত তালুক জুড়ে সশস্ত্র বাহিনীর দিবারাত্র টহলদারি চলল।

এই সময় শ্রমিকদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। পুলিস আর গুণ্ডাবাহিনী শহর ও গ্রামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। কৃষি-শ্রমিক আর শহরের শ্রমিকদের মধ্যে যারা অসহনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত, পুলিস আর গুণ্ডারা তাদের

ধরে নিয়ে আসত তাদের আড্ডায়। তারপর তাদের উপর চলত অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন। গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত তাদের, যতক্ষণ না তারা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ত ততক্ষণ চলত লাঠি আর চাবুক দিয়ে প্রহার। শ্রমিকদের বাড়ীঘর ভেঙে ধূলিসাৎ করা হত। তাদের গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগী চুরি করে গুণ্ডারা ভোজ খেত। তার প্রতিবাদ করলে সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের থানায় ধরে নিয়ে এসে দিনরাত প্রহার করা হত। শ্রমিকদের য়ুনিয়ান অফিসের উপর আক্রমণ করে কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলা হত, টাকাপয়সা সব গুণ্ডারা চুরি করে নিয়ে যেত। এসব ছিল রোজকার ঘটনা। জমিদার ফসল কাটার সময় ছোটখাট ঘটনা উপলক্ষ্য করে হাঙ্গামা বাধিয়ে কৃষকের জমির ফসল গুণ্ডাদের দিয়ে কাটিয়ে নিয়ে যেত। সামান্য প্রতিবাদ করলে কৃষকদের ভাগ্যে জুটত অমানুষিক নির্যাতন আর কয়েদ।

এসব অত্যাচারে শ্রমিক-কৃষকের ক্রোধ আগুনের মত জলে উঠত, শত্রুদের বাধা দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু তখনও তারা শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি, তাই তাদের প্রতিবাদ হত নিষ্ফল। একদিন এক জায়গায় কয়েকজন শ্রমিক দাঁড়িয়ে পুলিস আর গুণ্ডাদের অত্যাচারের সম্বন্ধে কথা বলছিল। হঠাৎ সেখান দিয়ে গুণ্ডাবাহিনীর একজন দু'জন শ্রমিককে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়। সেই গুণ্ডাটা গিয়ে আশ্রয় নেয় এক জমিদারের বাড়ীতে। শ্রমিকরাও দৌড়ে গিয়ে জমিদারের কাছে দাবি করল—গুণ্ডাটাকে বের করে দিতে হবে, ওরা তাকে শাস্তি দেবে। জমিদার ভয় পেয়ে সৈন্যবাহিনীকে ডেকে পাঠাল। সৈন্যরা এসে গুলি করার ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের তাড়িয়ে দিল। শ্রমিকরাও বুঝল, অস্ত্র হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে না পারলে এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। আগেই মালিকদের আঘাত দেওয়া দরকার, তা না হলে শ্রমিকদের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না, তাদের মা, স্ত্রী আর বোনেদের ইজ্জত রক্ষা করা যাবে না। পুন্নাপ্রা-ভায়লারের শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালক কমিউনিস্ট পার্টি আর শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠনগুলো স্থির করল ধর্মঘট করে মালিকদের এখনই আঘাত দিতে হবে, সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের মনে সংগ্রামের দৃঢ়তা জাগিয়ে তুলতে হবে।

সাধারণ ধর্মঘট

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর। এই দিন 'নিখিল ত্রিবাঙ্কুর ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসে'-এর আহ্বানে সকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হল। ত্রিবাঙ্কুরের সকল পার্টি ও দল এই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে সমর্থন জানাল। এমন কি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কংগ্রেসও প্রথমে এই ধর্মঘট সমর্থন করেছিল। অবশ্য পরে শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাব আর দৃঢ়তা দেখে রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন তুলে নেয়। ধর্মঘট আশাতীতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হল, একজন শ্রমিকও কাজে যোগদান করেনি। শাসক আর জমিদারদের হুমকি সত্ত্বেও তারা দৃঢ় রইল তাদের সংগ্রামে।

এদিকে জমিদারগণ ভয় পেয়ে শাসকদের কাছে দাবি জানাল, সর্বত্র পুলিস

আর সৈন্যদের ঘাঁটি বসাতে হবে। জমিদারগণ তাদের বাড়ীতেই পুলিস ঘাঁটি বসাতে দিল, শ্রমিকরা আক্রমণ করলে পুলিস তাদের রক্ষা করবে এই আশায়। এইভাবে পুলিস আর সৈন্যদের ঘাঁটি স্থাপিত হল সর্বত্র। পুলিসগুলো দিনরাত ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল, শ্রমিকদের স্ত্রী আর কন্যাদের উপর অত্যাচার শুরু করল, তাদের সম্পত্তি লুটে নিল। শ্রমিকগণ পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য, স্ত্রী আর কন্যাদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য সবাই মিলে একসঙ্গে বাস করবার সিদ্ধান্ত নিল। ভট্টাল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে পুন্নাপ্রার সকল ধর্মঘটী শ্রমিক সেই শিবিরে বাস করতে লাগল।

ধর্মঘটী শ্রমিকগণ পুলিস আর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেও তারা বুঝতে পারল, সংঘর্ষ এড়ান সম্ভব হবে না। কারণ, এই শিবিরের উপরে পুলিস আর সৈন্যদের অসহ্য উৎপীড়ন চলতে লাগল। কাজেই ধর্মঘটী শ্রমিকরা যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করতে লাগল। পুলিস আর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজন, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণ এসে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগদান করল। এই অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের পরামর্শে আর সাহায্যে এবং নিজেরাই মাথা খাটিয়ে তারা নারকেল গাছের কাঠ দিয়ে বল্লম বানাতে শিখল, শিখল কেমন করে মুখোমুখি সংঘর্ষে বন্দুকের গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে হয়, কি করে বল্লম দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়। একদিকে চলল এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির আয়োজন, আর একদিকে চলল ধর্মঘটী শ্রমিকদের সভা ও মিছিল।

পুন্নাপ্রার যুদ্ধ

২৪শে অক্টোবর চারটি মিছিল বের হল ধর্মঘটী শ্রমিকদের। আলেপ্পি শহরের উত্তর দিক থেকে একটা বড় মিছিল আসছিল শহরের উত্তরদিকের পুলিস থানার নিকটবর্তী কয়ার শ্রমিক য়ুনিয়ানের অফিসের দিকে। মিছিলটি কাছে আসতেই থানার পুলিসরা প্রস্তুত হয়ে উঠল। শহরের পূর্বদিক থেকে আর একটি মিছিল যাচ্ছিল পশ্চিম থেকে। পশ্চিম থেকে সমুদ্রতীরে ছিল আর একটি পুলিস থানা। এই মিছিলটি থানার কাছে আসতেই পুলিস চঞ্চল হয়ে উঠল। আর একটি মিছিলও এগিয়ে আসছিল পশ্চিম দিকে। এটি ছিল অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের মিছিল। সৈন্যদের মিছিলটির সঙ্গে সংঘর্ষ হল। এই সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিস আহত হল, আর মিছিলের দুইজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক নিহত এবং আহত হল অনেকে।

এই সময় আর একটি মিছিল এগিয়ে আসছিল দক্ষিণ দিকে। রিজার্ভ পুলিসের একটি ঘাঁটি ছিল সেখানে। সেইটি ছিল শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে। মিছিলের শ্রমিকদের হাতে ছিল বল্লম, দাও, তীরধনু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল খুবই সাধারণ, সেকেলে, কিন্তু মন ছিল শত্রুর প্রতি ঘৃণায় আর প্রাণপণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় ভরপুর। তাই দিয়ে তারা পূরণ করল অস্ত্রের অভাব। মৃত্যুভয়ে আর ভীত নয় তারা—মৃত্যুঞ্জয়ী হল শ্রমিকশ্রেণী।

এদিকে পুলিসের থানার কাছে পৌঁছে গেল মিছিল। মিছিলের চেহারা দেখে সন্ত্রস্ত হল থানার দারোগা। সে মিছিলকে বে-আইনী ঘোষণা করল, মিছিলকে ছত্রভঙ্গ হতে নির্দেশ দিল। কিন্তু তখন দারোগার সেই নির্দেশ মান্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। সকলে সমস্বরে ঘোষণা করল—'দারোগার এই নির্দেশ মানবো না আমরা'। সংগ্রামের মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দারোগার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে, সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ল মিছিলটি, ওরা পিছু হটল না এক পাও।

মিছিলের শ্রমিকদের অগ্নিমূর্তি দেখে বুক কেঁপে উঠল দারোগার। মরিয়া হয়ে সে চিৎকার করে পুলিসদের দিল গুলি চালাবার হুকুম, তার জীবনের শেষ হুকুম। তার মুখ থেকে হুকুম বের হতে না হতেই, কাছে দাঁড়ানো একজন শ্রমিক তার হাতের দা দিয়ে এক আঘাতে দারোগার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। মিছিলের সকল শ্রমিক উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মিছিলের পরিচালকের নির্দেশে সকলে শুয়ে পড়ল মাটিতে, তারপর বুকে ভর দিয়ে এগোতে লাগল সামনের দিকে। পুলিসেরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিসদের উপর, তারা এক মুহূর্তে হাতের দায়ের আঘাতে পাঁচজন পুলিসকে ধরাশায়ী করল। বাকি সব পুলিস কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল কাছের এক জমিদারের বাড়ী। ইতিমধ্যে গুলির আঘাতে শ্রমিকদেরও অনেকে প্রাণ হারাল।

এই সংঘর্ষের জায়গাটা তখন সত্যিকারের এক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে। ছয়টা পুলিসের আর শ'খানেক শ্রমিকের মৃতদেহ এখানে ওখানে ছড়ানো। এই সংঘর্ষে অনেক শ্রমিক প্রাণ দিয়েছে। তাদের সংখ্যা একশো নয়—অনেক বেশী। তবু একজন শ্রমিকও ভয়ে পালিয়ে যায়নি, পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর কথা কোন শ্রমিকের মনেও স্থান পায়নি। বরং পুলিসগুলো পালিয়ে যাবার পর তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে শ্রমিকরা তাদের শিবিরে ফিরে গেল। তারা প্রস্তুত হতে লাগল পরবর্তী সংঘর্ষের জন্য।

এরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাইফেলধারী সশস্ত্র পুলিসে ছেয়ে ফেলল সমস্ত অঞ্চলটা। তারা মৃতদেহগুলো জড় করল এক জায়গায়, তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল সেগুলো। পুন্নাপ্রার সেই স্থানটি অমর শ্রমিক-শহীদদের দেহভস্মে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়ে রইল সর্বকালের সংগ্রামী-মানুষের কাছে।

ভায়লারের যুদ্ধ

ভায়লার জলে ঘেরা একটি দ্বীপ। দ্বীপটির চারদিকে বহু ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে। দ্বীপটির ভিতরে প্রায় সব জায়গা জুড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত আর উপকূল ঘিরে অসংখ্য দীর্ঘ নারকেল গাছ। সুন্দর, মনোরম জায়গাটি। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয় পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলের কয়ার শ্রমিক আর ক্ষেত-খামারের কৃষি-শ্রমিকগণ পুলিস আর গুণ্ডাদের অসহ্য

অত্যাচারে ঘরছাড়া হয়ে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দ্বীপে ফাঁকা জায়গা-গুলোতে বহু শিবির খাটিয়ে তারা বাস করছে। তারা যুবকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি করেছে। তারা দ্বীপের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে যাতে কোন গুণ্ডা আর তাদের দলবল দ্বীপে না ঢুকতে পারে।

পুন্নাপ্রার সংঘর্ষের সংবাদ এই অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। সেখানকার শ্রমিকদের জয়ের সংবাদ এখানে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপবাসীদের মধ্যেও উত্তেজনা জেগে উঠেছে, তারা শত্রুর সঙ্গে শেষ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এদিকে পুন্নাপ্রার সংঘর্ষের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আম্বালা পুঝা আর শেরতালাই তালুক দুটিও সামরিক বাহিনীর কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। তার ফলে সব কটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় দিবারাত্র মিলিটারি টহল দিচ্ছে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে সৈন্যরা বেছে বেছে যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে লাঠি পেটা বা গুলি করে মেরে ফেলছে। গ্রামের মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য দলে দলে ভায়লারে আশ্রয় নিচ্ছে। ভায়লারের মানুষ বুঝতে পারছে সংঘর্ষ আসন্ন।

একদিন একদল সৈন্য ভায়লার দ্বীপে ঢোকবার চেষ্টা করল। সতর্ক ভলান্টিয়ারগণ দূর থেকে তাদের দেখেই বাধা দেবার আয়োজন করল। দ্বীপবাসীরা বড় বড় গাছ কেটে তা দিয়ে রাস্তায় 'ব্যারিকেড' তৈরি করল, দ্বীপে ঢোকার পুলটিকে উড়িয়ে দিয়ে সৈন্যদের দ্বীপে ঢোকার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। সৈন্যরা পুলটি মেরামত করে আবার দ্বীপে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারেও দ্বীপবাসীরা পুলটিকে ভেঙে দিল। এমনি করে পর পর তিনবার তারা পুলটিকে ভেঙে দিয়ে সৈন্যদের বাধা দিল। চতুর্থবার যখন তারা পুলটিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে তখন সৈন্যরা শ্রমিকদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়ল। তাতে হতাহত হল অনেক, কিন্তু দ্বীপে ঢোকা সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব হল না। সৈন্যরা ওপারে ঘাঁটি পেতে সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

২৭শে অক্টোবর দুপুর বেলা দ্বীপবাসী শ্রমিকেরা মধ্যাহ্ন ভোজনে ব্যস্ত। সেই সময় সুযোগ বুঝে সৈন্যরা পাঁচটা স্টীম-বোটে করে নদীপথে দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। যাতে বোটের ইঞ্জিনের শব্দে দ্বীপের শ্রমিকেরা সতর্ক হয়ে না যেতে পারে, সেইজন্য দূর থেকেই স্টীম-বোটগুলোর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হল। তীরে নেমে গাছের আড়ালে থেকে সৈন্যরা দ্বীপের মধ্যভাগের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু ভলান্টিয়ারদের চোখে পড়ে গেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো শিবিরে আক্রমণের সংবাদ পৌঁছে গেল। শ্রমিকগণ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে যার যা অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে প্রস্তুত হল। কারোর হাতে কাঠের বর্শা, কারোর হাতে ধারাল দা আর রামদা, কারোর হাতে থলিভর্তি পাথরের টুকরো। তারা এই সব অস্ত্র নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আর অন্যদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে রাইফেলধারী সৈন্যগণ। তারা কাছে এসে পড়ল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। তাদের প্রথম সারি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, দ্বিতীয় সারি হাঁটু গেড়ে বসল, তৃতীয় সারি রইল দাঁড়িয়ে, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল দিয়ে। তাদের সেনাপতি সবার পিছনে দাঁড়িয়ে।

সেনাপতি হুকুম দিল—'ফায়ার'। গুলি চালনার হুকুম। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বুক চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটল রাইফেল থেকে আগুনে বুলেট। বিপরীত দিকে, শ্রমিকরা গুলির শব্দ অগ্রাহ্য করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে শত্রুর দিকে। তাদের কেউ গুলি লেগে মৃত, অনেকে আহত, অনেকের শরীর থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে, কিন্তু দ্রুত এগিয়ে চলেছে তারা শত্রুর দিকে—পাশের মৃত সহযোদ্ধার দিকে একবার তাকিয়ে, গায়ের মুখের রক্ত মুছে মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে এগিয়ে চলল তারা। তাদের বুকে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। শত্রুকে মেরে, শত্রুর রক্তে সঙ্গীর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য উন্মাদ! শ্রমিকের রক্তধারার সঙ্গে মিশল বহু সৈন্যের রক্তধারা, শ্রমিকের মৃতদেহের সঙ্গে মিশে গেল সৈন্যদের মৃতদেহ।

ভায়লারে পার্শ্ববর্তী নদীগুলোর জল রক্তে লাল হয়ে গেছে, মৃতদেহের স্তূপে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারই মধ্য দিয়ে ছুটে গেল শ্রমিক যোদ্ধারা। চৌদ্দ বছরের এক কিশোর তিনটি বুলেটের আঘাত নিয়ে ছুটে গিয়ে হাতের দা দিয়ে এক কোপ বসিয়ে দিল এক সৈন্যের গলায়। সৈন্যটা ধরাশায়ী হল। সৈন্যদের গুলি তখন ফুরিয়ে গেছে, তারা উদ্যত সঙিন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্রমিক যোদ্ধাদের উপর। শ্রমিকগণ সঙিনবিদ্ধ হল, কিন্তু মরবার আগে বর্শা আর দায়ের আঘাতে অনেক সৈন্যকে ধরাশায়ী করল। তাদের চাই চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ। কোন শ্রমিক অক্ষত বা জীবিত থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল একটানা। শ্রমিক-যোদ্ধা পালাতে জানে না, তাই যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে প্রাণের ভয়ে পালায় নি একজনও। বিপ্লবের সৈনিক তারা, সংগ্রামে পিঠ দেখানো শ্রমিক-সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা নেই। এই শ্রমিক বীর যোদ্ধাদের বুকের রক্তে আরও লাল হয়ে উঠল, আরও গৌরব-মণ্ডিত হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পতাকা, জয়ের পতাকা—লাল ঝাণ্ডা।

পুন্নাপ্রা-ভায়লারের রণক্ষেত্র চিরকালের মত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে রইল সংগ্রামী মানুষের কাছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

তেলেঙ্গানা বিপ্লব (১৯৪৬-৫১)

১. তেলেঙ্গানার পরিচয়

মোগল শাসনের শেষভাগে, ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মীর কামারুদ্দিন আসফ খাঁ নামে এক ব্যক্তি সমগ্র দক্ষিণ ভারতের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল তখন। এই সুযোগে, ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে আসফ খাঁ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে কুখ্যাত নিজামের গোষ্ঠী ভারতের সবচেয়ে বড় সামন্তরাজ রূপে হায়দরাবাদের কৃষকদের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছিল। তারপর এল ইংরেজরা। তারা এসে হায়দরাবাদের কৃষকদের আর সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মহাশত্রু এই নিজামটাকে তাদের শাসন ও শোষণের সাকরেদ করে নিয়ে তার রাজ্যের আয়তন আরও বাড়িয়ে দিল। নিজাম আর বিদেশী ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে তেলেগু বা অন্ধ্র কৃষকদের দুই ভাগে ভাগ করে বড় ভাগটা নিজামের রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। তেলেগু বা তেলেঙ্গা জাতীয় কৃষকদের বাস হায়দরাবাদের অর্ধেক জুড়ে। এই তেলেঙ্গা কৃষক, তেলেঙ্গা অধিবাসীদের নাম থেকেই হায়দরাবাদের পূর্ব অংশের নাম হয়েছে তেলেঙ্গানা দেশ। তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা তেলেগু ভাষাভাষী হিন্দু, আর হায়দরাবাদের নিজাম অর্থাৎ রাজা হল উর্দুভাষাভাষী মুসলমান। তেলেঙ্গানা আয়তনে ইংলণ্ডের চেয়েও বড়, লোকসংখ্যা প্রায় এককোটি, তারা প্রায় সবাই চাষী। তেলেঙ্গানার মধ্যে আটটি জেলা—ওয়ারাঙ্গাল, নালগোণ্ডা, মহবুবনগর, হায়দরাবাদ, মেদাক, নিজামাবাদ, করিমনগর আর আদিলাবাদ।

২. তেলেঙ্গানার শোষকগোষ্ঠী

তেলেঙ্গানার চাষীরা অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত। তাদের মাথার উপর যে কত রকমের আইনী আর বে-আইনী কর চাপান ছিল তার হিসাব করা কঠিন। কত রকমের শোষক তাদের রক্ত জোঁকের মত শুষে নিত, তাদের উপর সাপের মত ছোবল মারত আর শকুনের মত তাদের মাংস ঠুকরে খেত! এই শোষক-গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিটি ছিল স্বয়ং নিজাম, তারপর জায়গীরদার, জমিদার আর দেশমুখের দল। জায়গীরদাররা হল বড় জমিদার। তেলেঙ্গানার প্রায় অর্ধেক ছিল তাদের দখলে। বাকি অর্ধেকের বেশীর ভাগ জমি দখল করে ছিল দেশমুখরা। তারা এক সময় ছিল নিজামের খাজনা আদায়কারী। তারপর নিজাম সরকার খাজনা আদায়ের ভার দেশমুখদের হাত থেকে অন্য লোকের হাতে দেয়, আর তার বদলে দেশমুখরা প্রত্যেকে যথেষ্ট পরিমাণে উর্বর জমি লাভ করে নিজাম সরকারের

কাছ থেকে। দেশমুখদের কেউ কেউ হাজার হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির মালিক হয়েছিল। জনা রেড্ডি প্রতাপ রেড্ডি নামে একজন দেশমুখের অধিকারে ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমি, মাধিরা তালুকের কালুর পরিবারের অধিকারে ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার বিঘা, সূর্যপেটের দেশমুখের অধিকারে ছিল ৪৫ হাজার বিঘা।

এই ধরনের বড় দেশমুখ ছিল কেবল দু'চারজন নয়, অনেক। জাতপোলে নামে একজন বড় জমিদারের দখলে ছিল মহবুবনগর জেলার অর্ধেক, আর স্বয়ং নিজামের নিজ দখলে ছিল গোটা হায়দরাবাদ জেলার সমস্ত জমি। নিজামের নিজের জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা। ১৫ লক্ষ ভূমিদাস এই বিপুল পরিমাণ জমি চাষ করত। আর তা থেকে নিজামের বছরে আয় হত পাঁচ কোটি টাকা। তার উপরে স্টেট বাজেট থেকে নিজাম প্রতি বছরে যে ভাতা পেত তার পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া হায়দরাবাদের অধিকাংশ কল-কারখানার বেশীর ভাগ অংশেরও মালিক এই নিজাম বাহাদুর। নিজামের হীরামুক্তা আর সোনার অলঙ্কারের দাম অন্তত পক্ষে ৬০০ কোটি টাকা।

নিজামের এই অমানুষিক শোষণ-শাসনের সাকরেদদের মোট সংখ্যা ছিল ১১ শো। নিজাম তার এই ১১ শো সাকরেদের সঙ্গে মিলে মিশে শোষণ করত হায়দরাবাদের ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে। এই ১১ শো জায়গীরদার আর দেশমুখের যে জমি ছিল তার পরিমাণ ৯ কোটি বিঘা—রাজ্যের মোট জমির ৫ ভাগের ৩ ভাগ। এই ১১ শো সাকরেদদের মাত্র ১০টি পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ১০ কোটি টাকা। হায়দরাবাদের কৃষকদের মাথার উপর চাপান ছিল ৮০ কোটি টাকার ঋণ। আর সে ঋণ থেকে যে সুদ আদায় হত তার সবই যেত এই দশটি পরিবারের হাতে। এই হল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড় খুঁটি হায়দরাবাদের সামন্তগোষ্ঠীর শোষণের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব। এই শোষকগোষ্ঠীর কল্পনাতীত শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই তেলেঙ্গানার চাষী উড়িয়ে ছিল বিপ্লবের লাল পতাকা, এদের তাড়িয়েই তেলেঙ্গানার চাষীরা ১ কোটি ৮ লক্ষ বিঘা জমি শোষণমুক্ত করেছিল, সেই শোষণমুক্ত অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতের প্রথম জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, রীতিমত একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৩. কৃষক-শোষণের রূপ

কৃষকের মাথার উপর যে কত রকমের আইনী আর বে-আইনী কর চাপান ছিল তার সংখ্যা ঠিক করা কঠিন। একবার স্বয়ং নিজাম-সরকারই দেশমুখ আর জায়গীরদারদের চাপান ৮৩ রকমের বে-আইনী আদায় বন্ধ করার হুকুম জারি করেছিল। অবশ্য সে হুকুম কাগজে পত্তরেই থেকে গেছে, কোন দেশমুখ বা কোন জমিদারই তা মানেনি। তেলেঙ্গানার যারা প্রকৃত চাষী তাদের প্রায় অর্ধেকের কোন জমিজমা নেই। বাকি অর্ধেক চাষীর জমির পরিমাণ পাঁচ থেকে ত্রিশ বিঘা পর্যন্ত। এ জমিরও একটা অংশ 'ভেট' জমি। এই 'ভেট' জমির সমস্ত ফসল তুলে দিতে হত

জমিদার আর নীচুস্তরের মালিকদের ঘরে। ধনী-কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা পাঁচ থেকে সাত। তাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ৪০ থেকে ৭৫ বিঘা পর্যন্ত। আর ছোটবড় জমিদারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩ থেকে ৫ জন। এদের বিভিন্ন নাম—দেশমুখ, বাঞ্চরদার, সমস্থান প্রভৃতি। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ছিল এদের অধিকারে।

প্রকৃত পক্ষে জমিজমার উপর সাধারণ চাষীদের কোন অধিকারই ছিল না। দেশমুখ আর জমিদারগোষ্ঠী অসংখ্য করের দায়ে আর নানা ছলে চাষীদের সমস্ত ফসলই কেড়ে নিত। এমনকি মাথা গোঁজবার জন্য একখানা কুঁড়েঘর তুলতে হলেও জমিদারের অনুমতি নিতে হত, মোটা সেলামী দিতে হত। তেলেঙ্গানার চাষীরা এত দরিদ্র যে অধিকাংশই শুধু নেংটি পরে লজ্জা নিবারণ করে। ক্ষেত মজুরদের খাটতে হত দিনে ১৪ ঘণ্টা করে। আগে আমাদের বাংলাদেশের বর্গাচাষীরা ফসলের অর্ধেক পেত, কিন্তু তেলেঙ্গানার বর্গাচাষীদের তাও মিলত না। তার উপর নিজাম-জায়গীরদার-জমিদারদের জমিতে তাদের 'বেগার' খাটতেই হত।

তেলেঙ্গানায়, হায়দরাবাদের অন্যান্য অংশেও, কৃষক আর জনসাধারণের কোন রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না। নিজামের পুলিস-মিলিটারী আর 'রাজাকার' নামে গুণ্ডাদল চাষীদের উপর অবাধে অত্যাচার চালাত, লুটপাট করত নিজামের এক বর্বর "আইনের" নামে। এই অত্যাচার আর লুটপাট থেকে বাঁচবার একটি মাত্র উপায় ছিল, তা হল ঘুষ। প্রতিদিন ঘুষ দিয়ে বাঁচতে হত চাষীকে—সমস্ত মানুষকে।

৪. স্টেট কংগ্রেসের আন্দোলন

এই অমানুষিক অবস্থা চাষীদের সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিল। চারদিকের আন্দোলন দেখে তারাও সংগ্রামের পথে পা বাড়াল। তেলেঙ্গানার চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ দানা বাঁধতে লাগল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সেই বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ ফেটে পড়ল। কিন্তু তখনও তেলেঙ্গানার সেই বিদ্রোহ পরিচালনা করবার মত কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি, তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট পার্টি তখনও তৈরী হয়নি। কিছুকাল আগে হায়দরাবাদে তৈরী হয়েছিল 'স্টেট কংগ্রেস'। এই 'স্টেট কংগ্রেসের' নেতৃত্ব ছিল ধনী-কৃষক আর অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীদের হাতে। সেই 'স্টেট কংগ্রেস'ই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কৃষকদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ধনী-কৃষক আর ব্যবসায়ীরা চেয়েছিল নিজামের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করতে। তাই কৃষকদের বিক্ষোভকে তারা চেয়েছিল নিজামের উপর চাপ দেবার জন্য ব্যবহার করতে। অন্যদিকে গরীব-চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের কোন অধিকার ও দাবি স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। নিজামের বে-আইনী আদায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কোন সংগ্রাম করার সাহস বা ইচ্ছা ছিল না তাদের। নিজামের সঙ্গে আপস-রফা করে কিছু সুবিধা আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা নিজামশাহীর উচ্ছেদ আর চাষীদের হাতে জমি দেবার দাবি তোলেনি কোনদিন। তাদের প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল—"নিজামের অধীনেই দায়িত্বশীল

সরকার চাই।" এই দাবি নিয়ে তারা সত্যাগ্রহ শুরু করল। চাষীরা এই শয়তানের খেলা দেখে এই সত্যাগ্রহ থেকে দূরে দাঁড়াল। তারপর নিজামের পুলিস আর সৈন্যবাহিনীর তাণ্ডবে সে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল, তার পর 'স্টেট কংগ্রেস'কে বে-আইনী ঘোষণা করা হল।

৫. অন্ধ্র মহাসভার (সঙ্ঘম) জন্ম ও রূপান্তর

হায়দরাবাদের নিজাম উর্দু ভাষা-ভাষী মুসলমান, আর অধিকাংশ প্রজাই অন্য ভাষা-ভাষী হিন্দু। তবু উর্দু-ই হল হায়দরাবাদের সরকারী ভাষা। এমনকি শিশুদের শিক্ষাও চলত উর্দু ভাষায়। তাছাড়া সরকারের বেশী বেতনের সব পদগুলি ছিল মুসলমান জমিদারদের একচেটিয়া। নাগরিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না হায়দরাবাদ রাজ্যে। বিনা অনুমতিতে মিটিং করার অধিকার, এমনকি গানের আসর বা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন সভা ডাকারও অধিকার জনসাধারণের ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই এক সময় 'অন্ধ্র মহাসভা' (সঙ্ঘম) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারই ছিল এর দাবি। এরপর অন্ধ্র মহাসভা তেলেগু জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিও তুলতে থাকে। তখন তেলেগু ভাষা-ভাষী ধনী-কৃষক আর জমিদাররাই ছিল এর নেতা।

বে-আইনী ঘোষিত হবার পর 'স্টেট কংগ্রেস' প্রায় ভেঙে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। 'স্টেট কংগ্রেসে'র সংগ্রামশীল অংশ তখন অন্ধ্র মহাসভায় প্রবেশ করল এবং একে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হল। এরই সঙ্গে সঙ্গে 'স্টেট কংগ্রেসে'র কর্ম-পরিষদের সভ্য নারায়ণ রেড্ডি, ইয়েলো রেড্ডি এবং আরও কয়েক-জন বিপ্লবী কর্মী একত্রিত হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্ধ্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে ও প্রেরণায় হায়দরাবাদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করলেন। এবার এই নূতন গড়া কমিউনিস্ট পার্টিই হল অন্ধ্র মহাসভার (সঙ্ঘমের) প্রাণস্বরূপ। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই আন্দোলনের আয়োজন আরম্ভ হল তেলেঙ্গানায়। এই আন্দোলনের ভয়ে মহাসভার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব মহাসভা থেকে সরে পড়ল।

৬ ১৯৪৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রাম

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অন্ধ্র মহাসভা কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করল লক্ষ লক্ষ ইস্তাহারের মারফত। মহাসভার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচারকার্য চালাতে লাগল, সংগঠন গড়ে তুলল। সংগ্রামের ধ্বনি হল—জমিদার-রাজাকার-পুলিস-মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, জমি থেকে উচ্ছেদে বাধা দাও, বেগার খাটা আর বে-আইনী খাজনা দেওয়া বন্ধ কর। এই আপসহীন সংগ্রামের আহ্বান কৃষকদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তুলল। দলে দলে কৃষকেরা এসে সংগ্রামের পতাকা-তলে সমবেত হল। অল্পকালের মধ্যেই মহাসভার সভ্যসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়ে হল দেড়লক্ষ।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। নালগোণ্ডা জেলার 'জঙ্গম' তালুকের ৪০ খানি গ্রামের চাষীরা সমবেতভাবে এই অঞ্চলের কুখ্যাত দেশমুখ বিশ্নুরের বে-আইনী আদায় বন্ধ করে দিল। চাষীরা তাদের জমি দখল করে রইল, দেশমুখ তার গুণ্ডা-বাহিনী দিয়ে শতচেষ্টা করেও চাষীদের উচ্ছেদ করতে পারল না। তখনও সংগ্রামের বিশেষ কোন সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাই চাষীরা নিজ থেকেই দেশমুখ গুণ্ডাদলের আক্রমণ রুখতে লাগল, এমনকি পাল্টা আক্রমণও চালাল। দেশমুখ পারল না তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে।

চাষীরা এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সংগ্রাম আরও এগিয়ে নেবার দাবি করল। দেশমুখ পূর্বে যে সব জমি থেকে গুণ্ডা দিয়ে চাষীদের উচ্ছেদ করেছিল, সে সব জমি দখল করার দাবি উঠল। কৃষকেরা তাদের হাতে অস্ত্র দেবার দাবিও জানাল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে। কিন্তু তখনকার কেন্দ্রীয় পার্টি-নেতৃত্ব তাদের রাশ টেনে ধরল। তেলেঙ্গানার স্থানীয় পার্টি-নেতৃত্বও ভয় পেয়ে গেল। পার্টি-নেতারা আইনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি এই সময় নিজাম কৃষকদের কয়েকটি অধিকার মেনে নিয়ে কাগজে পত্তরে যে ঘোষণা করেছিল তার সুযোগ নিতেও তারা ভয় পেয়ে গেলেন। কাজেই আন্দোলন আর এগিয়ে যেতে পারল না, বরং এক কদম পিছিয়ে গেল। কিন্তু ফল হল মারাত্মক।

দেশমুখের গুণ্ডাদলের হাতে মহাসভা আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা প্রচণ্ড মার খেতে লাগলেন। তারা ছলে বলে তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাল। কংগ্রেসীরাও এসে গুণ্ডা আর পুলিসের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। একদিকে দেশমুখের গুণ্ডা আর পুলিস এবং অপর দিকে কংগ্রেসী গুণ্ডা—এই দুই দিকের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মরক্ষার জন্য গণ-ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে লাগল। সারা তেলেঙ্গানায়, বিশেষত নালগোণ্ডা জেলায় শত শত গ্রামের হাজার হাজার কৃষক যুবক এগিয়ে এসে এক নূতন ধরনের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলল। বহু ছোট ছোট দলে (স্কোয়াডে) তাদের ভাগ করে কমিউনিস্ট কর্মীরা গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে গ্রামগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়া থেকেই নিজামের পুলিস চাষীদের কাছ থেকে জোর করে বে-আইনী কর আদায় করতে আরম্ভ করে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে চাষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সময় জঙ্গম তালুকের মাচিরেড্ডীপল্লী গ্রামে গুণ্ডারা ১০টি স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। এর ফলে কৃষকদের বিক্ষোভ আগ্নেয় পর্বতের অগ্নি উদ্গারের মত ফেটে পড়ে চারদিকে। মহাসভা (সঙ্ঘম) আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এই বিক্ষোভকে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপদান করতে থাকেন। নিজাম সভাসমিতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অন্ধ্র আর তেলেঙ্গানার হাজার হাজার গ্রামে কৃষকদের সভা হল। এই সব সভায় নিজামশাহীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হতে থাকে। এইভাবে অন্ধ্র আর তেলেঙ্গানার

একজাতীয় জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী মিলন গড়ে ওঠে। পূর্বেই সমস্ত অন্ধ্র-জাতিকে মিলিত করে নিজামের শোষণ থেকে মুক্ত "বিশাল অন্ধ্র" গঠনের দাবি উঠেছিল। এবার নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধ "বিশাল অন্ধ্র" গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বিশ্নুর দেশমুখ তার পোষা গুণ্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দিল কৃষকদের উপর। কাদাভান্দি গ্রামে কৃষকেরা গুণ্ডাদের বাধা দিলে গুণ্ডারা কৃষকদের উপর গুলি চালাল। এই গুলি চালনার ফলে কামরাজ নামে একজন কমিউনিস্ট কর্মী নিহিত হলেন। এই সংবাদ চারদিকে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার কৃষক আর স্বেচ্ছাসেবক জড় হল ঘটনাস্থলে। তারা গুণ্ডাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের হাত থেকে বন্দুকগুলি কেড়ে নিল। গুণ্ডারা পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলে কৃষকেরা জমিদারের বাড়ী ঘিরে ফেলল, তারপর গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিল। কৃষকদের এই সংগ্রাম প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল নিজ থেকেই। তারপর কমিনিউস্টরা এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনা থেকে নূতন চেতনা দেখা দিল কৃষকদের মধ্যে। গুণ্ডাদের শাস্তি দিতে পেরে কৃষকদের মধ্যে সুপ্ত সংগ্রামী শক্তি জেগে উঠল। এরপর থেকে তারা হয়ে উঠল নূতন মানুষ, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সংগ্রামী বাহিনী। বিদ্রোহী কৃষক হাজারে হাজারে কমিউনিস্ট পার্টি আর সঙ্ঘমের পতাকা নিয়ে জমিদার, দেশমুখ আর তাদের গুণ্ডাদল ও কর্মচারীদের তাড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম দখল করতে লাগল, প্রতি গ্রামের উপর উড়ন্ত লাল পতাকার লালরঙে আকাশ লাল হয়ে গেল। কৃষক সৈন্যের দল গ্রামের পর গ্রামে সঙ্ঘম (অন্ধ্র মহাসভা) প্রতিষ্ঠা করল, প্রত্যেক গ্রামের সব কৃষকই তাতে যোগদান করল, প্রতিগ্রামে পঞ্চ-কমিটি (পঞ্চায়েত) গঠিত হল, প্রতিগ্রামে যুবকদের নিয়ে তৈরী হল ভলাণ্টিয়ার-বাহিনী। পুলিস-মিলিটারী আর গুণ্ডাদলের আক্রমণ থেকে গ্রামগুলি রক্ষার জন্য গ্রামের চারদিকে কৃষক সৈন্যদের পাহারা বসল। পঞ্চায়েত গ্রহণ করল গ্রামের শাসনকার্য চালাবার সমস্ত ভার। নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনে জর্জরিত তেলেঙ্গানার চেহারা অতি দ্রুত পাল্টে যেতে লাগল। সামন্ততান্ত্রিক তেলেঙ্গানার পরিবর্তে গড়ে উঠতে লাগল কৃষকের, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক তেলেঙ্গানা।

এই ঘটনার ফলে কৃষকের সংগ্রামের দৃঢ়তা শতগুণ বেড়ে গেল। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শত শত গ্রামে। আপসহীন সংগ্রামের সঙ্কল্প নিয়ে কৃষকেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘম (অন্ধ্র মহাসভা) গড়ে তুলল। সঙ্ঘম আর কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকায় গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে পঞ্চ-কমিটি (পঞ্চায়েত) তৈরী হল, জমিদারের বে-আইনী আদায় আর বেগার খাটান বন্ধ হয়ে গেল। কৃষকেরা গ্রাম থেকে দেশমুখ আর তাদের গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিল। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভলাণ্টিয়ার বাহিনী তৈরী হল, আর গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে গ্রামকে বাঁচাবার জন্য গ্রামের চারদিকে বসল ভলাণ্টিয়ারদের পাহারা। কমিউনিস্ট পার্টি

আর সজ্যম তখনও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর সংস্কার-বাদী নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। তাই স্থানীয় পার্টি কৃষকের এই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম পরিচালনা না করে বরং তার রাশ টেনে ধরল। কৃষকেরা পুলিস আর গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র দাবি করল, কিন্তু পূরণচাঁদ যোশীর নির্দেশে কমিউনিস্টরা তাদের বাধা দিলেন।

এই সময় জঙ্গম তালুকের ধর্মপুরম অঞ্চলে কৃষকেরা আর তাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী মিলে দেশমুখের কবল থেকে ১৫ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার করল। এই জমি দেশমুখ অনেক আগে কেড়ে নিয়েছিল কৃষকদের হাত থেকে। সেই অঞ্চলের কৃষকদের দমন করবার জন্য ছুটে এল সৈন্যদল। কিন্তু হাজার হাজার কৃষকের সমাবেশ আর সংগ্রামের দৃঢ়তা দেখে তারা দূর থেকেই সরে পড়ল।

নেতৃত্বের দুর্বলতা

স্থানীয় কমিউনিস্টরা তখনও কৃষকদের এই জমি দখল আর জঙ্গী সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদার আর দেশমুখদের, সৈন্য আর গুণ্ডাদের তাড়িয়ে তাদের শোষণের অবসান করায়, গ্রামে গ্রামে স্বাধীন পঞ্চায়েত তৈরি করার বৈপ্লবিক তাৎপর্যও তারা বুঝতে পারলেন না। কৃষকরা নিজেরাই ধ্বনি তুলল—কৃষকের হাতে জমি চাই। কমিউনিস্টরা এই ধ্বনির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও বুঝতে পারলেন না বা বুঝতে চাইলেন না। তাই তাঁরা চেষ্টা করলেন কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী সংগ্রামকে কেবল জমিদারের বে-আইনী আদায় আর বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখতে।

স্থানীয় কমিউনিস্টদের তখনকার এই নিষ্ক্রিয়তা আর সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাব নিজাম আর জমিদার-দেশমুখদের দৃষ্টি এড়াল না। তারা এই সুযোগে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। শত শত পুলিস তেড়ে এল কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করতে, বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে। কমিউনিস্টরা কৃষকদের হাতে অস্ত্র না দিলেও তারা বীরের মত যুদ্ধ করল, বীরের মত প্রাণ দিল। তাদের যুদ্ধের অস্ত্র হল ভাঙ্গা ইট, কাঁচা বেল, পাথরের টুকরো, লঙ্কার গুঁড়ো, বাদিশাল নামে এক ধরনের বড় গুলতি আর লাঠি ও তীর-ধনুক। পুলিস নাজেহাল হল কৃষকদের হাতে। এবার তেড়ে এল নিজামের সৈন্যবাহিনী। তাদের গুলি বর্ষণে বিভিন্ন গ্রামের মাঠ-ঘাট কৃষকদের রক্তে লাল হয়ে গেল। বহু কৃষকের সঙ্গে ২২ জন কমিউনিস্ট আর সজ্যম কর্মীও প্রাণ দিলেন সেই সব যুদ্ধে। বর্বর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'জন কৃষক রমণীও নিহত হল। নালগোণ্ডা জেলার ৫০০ গ্রামের উপর সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচার চলল বহুদিন ধরে।

বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা আবার অস্ত্রের দাবি জানাল কমিউনিস্টদের কাছে। এবার আর স্থানীয় কমিউনিস্টরা সে দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ, তাঁদেরই হত্যা করবার জন্য জমিদারের গুণ্ডারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই পূরণচাঁদ যোশীর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা পুলিস আর গুণ্ডাদের

হাত থেকে কেড়ে নেওয়া বন্দুকগুলি তুলে দিলেন ভলান্টিয়ারদের হাতে—কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার জন্য, আক্রমণের জন্য নয়।

আত্মরক্ষার তাগিদেই কমিউনিস্টরা কৃষকদের ভলান্টিয়ার-বাহিনীকেও ঢেলে সাজাতে আর সংগ্রাম-কৌশল বদলাতে বাধ্য হলেন। আত্মরক্ষার জন্য ভলান্টিয়ারদের ছোট ছোট 'স্কোয়াড' (৭।৮ জনের এক একটি দল) তৈরী হল। সৈন্য আর পুলিসদলের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষকদের দল বেঁধে সামনাসামনি বাধাদানের কৌশল ত্যাগ করা হল। স্থির হল, সৈন্য আর পুলিসের বড় দল এলে ভলান্টিয়ার আর কৃষকরা পালিয়ে যাবে, আর ছোট দল এলে তাদের ঘিরে ফেলে আক্রমণ করবে, তাদের অস্ত্র কেড়ে নেবে, আর গ্রামের কেউ শত্রুকে সাহায্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। এইভাবে প্রকৃত গেরিলা যুদ্ধ বা জনযুদ্ধের দিকে এক কদম এগিয়ে গেল তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষক।

তখনও কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা ছিলেন পূরণচাঁদ যোশী। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নানাভাবে সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। এই সময় কৃষকদের চাপে স্থানীয় কমিউনিস্টরা জমিদারের হাত থেকে জমি কেড়ে নেবার, বে-আইনীভাবে কেড়ে নেওয়া জমি পুনর্দখলের, গরীব-চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে জমি বিলি করার এবং খাজনা বন্ধ করার ধ্বনি তুলেছিলেন। যোশী কিন্তু কৃষকদের হুকুম দিলেন জমিদারকে খাজনা দেবার জন্য। যোশীর হুকুমে নিজাম-সরকারের কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করে তাতে বলা হল যে, জমিদারদের বে-আইনী আদায় আর বেগার প্রথা বন্ধ করাই কৃষকদের প্রধান দাবি। এ ছাড়া সেই দাবিপত্রে নিজামের অধীনে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠারও আবেদন জানানো হল। যোশী হুকুম দিলেন—সশস্ত্র সংগ্রাম, জমির দাবি আর নিজামের শাসনের অবসানের দাবি ত্যাগ করতে হবে, তার পরিবর্তে বুর্জোয়াদের 'স্টেট কংগ্রেসের' সঙ্গে মিলে নিজাম যাতে ভারত য়ুনিয়ানে যোগ দেয় তার জন্য আন্দোলন করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতার এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় আন্দোলন কয়েক কদম পিছিয়ে গেল।

সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপান্তর

এদিকে নিজামের সৈন্যবাহিনী—পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী একত্রে মিলে কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী পোড়ানো আর স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চালিয়ে যাচ্ছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে নেহরু-প্যাটেলের ভারত সরকারও তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার আয়োজন করল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদের এই কৃষক অভ্যুত্থান সফল হলে সারা ভারতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে, আর তার ফলে ভারতের সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রতিষ্ঠিত বড়বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর মিলিত শাসনও ধ্বসে পড়বে। তাই নেহরু-প্যাটেলের সরকার নিজামকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার এবং নিজামশাহীকে জোরদার করবার জন্য নিজামের সঙ্গে এক চুক্তি করল। এই চুক্তিতে

হায়দরাবাদের ভারত য়ুনিয়ানে যোগদানের প্রশ্নটি মুলতুবি রাখা হল, নিজামকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল এবং বাইরে থেকে তেলেঙ্গানার কৃষকরা যাতে সাহায্য না পায়, আর মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম যাতে বিস্তার লাভ না করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

এই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়। এই সভা থেকে যোশী নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয়, অবিলম্বে তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করবার এবং জমি দখল আর গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে জমি বিলি করবার জন্য হায়দরাবাদের কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় পার্টি কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেস থেকেও হায়দরাবাদের কমিউনিস্টরা এই নির্দেশ লাভ করেন।

ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানার কৃষক ও স্থানীয় কমিউনিস্টরা নিজামের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পূরণচাঁদ যোশীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন। নূতন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ লাভ করার পর তাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। নূতন সংগ্রামের ধ্বনি হল :

—ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদ রাজ্য আর নিজামশাহী ধ্বংস কর ; জনগণতান্ত্রিক 'বিশাল অন্ধ্র' প্রতিষ্ঠিত কর।

—সকল জমিদারের জমি-জমা দখল কর, আর সেই জমি গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি কর।

—কৃষকের সমস্ত ঋণ অগ্রাহ্য কর।

—গ্রামের সমস্ত দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেল, গ্রামের সরকারী কর্মচারীদের পদত্যাগ করতে বাধ্য কর, প্রতি গ্রামে জমিদার আর তার দালালদের বাদে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের ভোটে 'গ্রাম পঞ্চায়েত' নির্বাচিত কর।

—নিজামের সৈন্যবাহিনী, পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রতিগ্রামে ভলান্টিয়ার দল গড়ে তোল, নিয়মিত গেরিলাদল তৈরি কর।

এবার নূতন পদ্ধতিতে সংগ্রাম আরম্ভ হয় ভঙ্গির তালুকের পুলিগুল্লা জায়গীর থেকে। এই জায়গীরের কৃষকরাই প্রথম বিদ্রোহ করে জায়গীরদারের জমির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। তাদের দমন করতে ছুটে এল নিজামের সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডাদল। পুলিস আর রাজাকার বাহিনী প্রাণপণে গুলিবর্ষণ করল। কৃষকরা জঙ্গলের আড়াল থেকে তাদের 'বাদিশাল' নামক বড় গুলতি দিয়ে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে আর দূর পাল্লার তীর-ধনুক দিয়ে তার জবাব দিতে লাগল। কৃষকদের মধ্যে হতাহত হল অনেকে। কিন্তু গুলতির পাথর আর তীরের আঘাতে প্রায় অর্ধেক সৈন্য সাংঘাতিক রূপে আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে কৃষকেরা জয়লাভ করল তাদের বিপুল সংখ্যাশক্তি এবং নূতন যুদ্ধ-কৌশল আর গুলতি ও তীর-ধনুকের জোরে।

গ্রামের পর গ্রামে অতি দ্রুত এই নূতন সংগ্রামের কাহিনী প্রচারিত হল। স্থানীয় কথাকলি নাচ, নাটক আর যাত্রার মারফত কমিউনিস্ট কর্মীরা এই নূতন সংগ্রামের কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিল। গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হল সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়। ঘরে বাইরে যত রকমের হাতিয়ার ছিল তা নিয়ে দলবদ্ধ কৃষকেরা জায়গীর, জমিদার আর পুলিস-রাজাকারদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দিল। চারদিক থেকে এইভাবে আক্রান্ত হয়ে নিজামের বাহিনী তখনকার মত গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে পালিয়ে গেল।

সংগ্রামী কৃষক নূতন করে পেল তার শক্তির স্বাদ। কিন্তু তারা বুঝল, নিজাম আর জমিদারগোষ্ঠী কখনই তাদের এই জয়, তাদের দাবি স্বীকার করে নেবে না; তাদের জয়কে তাদেরই শক্তির জোরে রক্ষা করতে হবে, নিজের শক্তির জোরেই তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিজেদের মুক্তি সাধন করতে হবে। কমিউনিস্ট কর্মীরা তাদের শেখাল, মুক্ত গ্রাম ও অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর সেই শাসনে জায়গীদার জমিদারদের দ্বারা পূর্বে কেড়ে নেওয়া কৃষকদের জমি বাজেয়াপ্ত করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে সেই জমি চাষীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিলি করতে হবে, যারা সেই সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে আর ভবিষ্যতে প্রাণ দেবে তাদের পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বাড়াতে হবে। নিজামের বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা আর জমি রক্ষার জন্য গেরিলা-বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিজামের বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এমনি হাজারো কাজ অবিলম্বে করতে হবে। কৃষকদের এই শিক্ষা আর উপলব্ধি থেকেই তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে লাগল জনগণের শাসন—জনগণতন্ত্রের ভিত্তি। এভাবেই হল ভারতের মাটিতে প্রথম শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের গণরাজের সূচনা।

নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নিজামের বাহিনী ভাগ ভাগ হয়ে বিদ্রোহী গ্রামগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র হল আধুনিক রাইফেল আর স্টেনগান। তারা নির্বিচারে নিরস্ত্র কৃষকদের হত্যা করতে লাগল, গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। নিজামের বিপুল সৈন্যবাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে কৃষকরা বুঝল, এই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আগের মত আর সম্মুখ-যুদ্ধ সম্ভব নয়। এই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হলে চাই অস্ত্র। কিন্তু কোথা থেকে আসবে অস্ত্র? তারা দেশমুখ, জমিদার, রাজাকার প্রভৃতিদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তা দিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নিজামের সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত আঘাত দেওয়া যাবে না। তাই তারা স্থির করল, নিজামের বাহিনী আর সশস্ত্র গুণ্ডাদের হঠাৎ আক্রমণে তাদের পরাস্ত করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে, আর তাই দিয়ে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এমনি করে কমিউনিস্ট কর্মীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহী-কৃষকরা

নিজেদের সৈন্যবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল। যেসব অস্ত্র তাদের হাতে ছিল তাই নিয়ে কৃষক-সৈন্যরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের মেরে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে লাগল। এই তো হল জনযুদ্ধে জন-বাহিনীর যোদ্ধাদের অর্থাৎ গেরিলা-দের অস্ত্র সংগ্রহের চিরকালের নীতি!

এইভাবে ক্রমশ গড়ে উঠতে লাগল এক নূতন সংগ্রাম—ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। একদিকে, গ্রামের উপর শক্তিশালী নিজাম-বাহিনীর আক্রমণ হলে গ্রামের পুরুষেরা লুকিয়ে গ্রামের বাইরে চলে যেত। এই সুযোগে নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডারা চাষীর শস্য লুট করত, গরু-মোষ কেড়ে নিত, নারী আর শিশুদের উপর বীভৎস অত্যাচার করত, গ্রাম জালিয়ে দিত; আর একদিকে, নূতন নূতন গ্রামের উপর সগৌরবে মুক্তির নিশান উড়ত, সশস্ত্র গ্রাম-রক্ষীরা নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিত, নিহত বা আহত শত্রুসৈন্যদের অস্ত্র হস্তগত করত, দেশমুখ আর জমিদারদের জমি দখল করে গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করত। এছাড়া সশস্ত্র গেরিলা দল নিজামের ছোট ছোট সৈন্যদলের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করত, তাদের অস্ত্র দখল করত। নিজামের বড় বড় সৈন্যদল আক্রমণ করলে গ্রামের সমস্ত লোক পালিয়ে যেত। শত্রুসৈন্য চলে গেলে সবাই ফিরে এসে গ্রামের উপর আবার প্রতিষ্ঠা করত তাদের অধিকার।

এমনি করে মুক্ত গ্রামের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে হায়দরাবাদের মোট ২২ হাজার গ্রামের মধ্যে আড়াই হাজার গ্রামেই নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক-সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল, আর সেখানে উড়ল কৃষকের মুক্তির লাল পতাকা। তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল মুক্ত অঞ্চলে এক নূতন শাসনব্যবস্থা আর সেই মুক্ত অঞ্চলে গণফৌজ। সেই নূতন শাসনব্যবস্থাই ভারতের **প্রথম জনগণতন্ত্র**। গণফৌজের নাম হল তেলেঙ্গা ভাষায় **'দলম'**। প্রতিগ্রামেই নিজামের বাহিনীর সঙ্গে গণফৌজকে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই সব যুদ্ধের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ইতিহাস। কয়েকটি মাত্র কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া হল এখানে:

সিদ্ধিপেট তালুকের জেগিদপুরম গ্রামে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী ঢুকে লুটপাট, হত্যাকাণ্ড, ঘর জালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি সবকিছু করতে আরম্ভ করেছে। একদিন নয়, কয়েকদিন ধরে চলেছে এই ধ্বংস-কাণ্ড। একদিন গ্রামের সমস্ত পুরুষ মিলে হঠাৎ তাদের আড্ডা আক্রমণ ক'রে ১৫ জন রাজাকারকে মেরে ফেলল, আর তাদের অস্ত্রগুলি দখল করল। তারপর সেই অস্ত্র নিয়েই তারা বাকি রাজাকারদের শেষ করল। এইভাবে পাওয়া ৩০টি বন্দুকই হল এই গ্রামের গণফৌজের প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়েই গ্রামের গণফৌজ পরে নিজামের অনেক সৈন্য আর রাজাকার মেরেছিল, আরও বহু অস্ত্র তারা সংগ্রহ করেছিল।

পিলিয়াপল্লী গ্রামের উপর আক্রমণ করেছে ৮০ জন নিজামী সৈন্য। শত্রুর শক্তি দেখে গ্রামের গণফৌজের ছোটদলটি গ্রামের বাইরে পালিয়ে গেল। গ্রামে যারা রইল

তারা মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করল। নিজামী সৈন্যরা সারাদিন অবাধে লুটপাট করে চারখানি লরিতে সব লুটের মাল ভর্তি করল। ২০ জন সৈন্যের উপর লরিগুলি নিয়ে যাবার ভার দিয়ে বাকিসব সৈন্য চলে গেল। মাত্র ২০ জন সৈন্য লরি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ খবর গণফৌজের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে দিল গ্রামের লোকেরা। গণফৌজের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লরিগুলির উপর। ২০টা নিজামী সৈন্যই নিহত হল তাদের হাতে। গণফৌজ পেয়ে গেল তাদের হাতের ১৮টা রাইফেল আর দুটো স্টেনগান। লুটের মালভর্তি লরিগুলো নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে এল। এই সব অস্ত্র দিয়েই গ্রামের গণফৌজ পরে বহু লড়াই করেছিল, আরও বহু অস্ত্র তারা সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

নালগোণ্ডা জেলার আপ্পালিপেট গ্রামের পুরুষেরা একদিন সবাই গেছে কোন কাজে গ্রামের বাইরে। এই সংবাদ পেয়েই ৫০ জন সশস্ত্র পুলিস নিয়ে জমিদার হঠাৎ গ্রাম আক্রমণ করল। তারা এসেই অন্ধ্র মহাসভার চারজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। তারপর তারা কৃষকদের বাড়ী লুট আর মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করার চেষ্টা করতেই গ্রামের সব মেয়েরা উদুখলের ডাণ্ডা, বাদিশাল নামক বড় গুলতি আর লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে আক্রমণ করল জমিদার আর সশস্ত্র পুলিসদের উপর। চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে আর গুলতির বড় বড় গুলি মেরে তারা বহু পুলিসকে ঘায়েল করল, তারপর ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলল পুলিসগুলোকে। ৩০টা পুলিস ঘায়েল হল এইভাবে, আর বাকি ২০টা পুলিস গুলতিতে জখম হয়ে ছুটে পালাল। ইতিমধ্যে গ্রামের পুরুষরা এসে পুলিস-গুলোর বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল গ্রাম থেকে।

সমস্ত সংগ্রামই যে সফল হত তা নয়। বহু ক্ষেত্রে গণফৌজের বীর যোদ্ধাদের অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগ তেলেঙ্গানার কৃষক ভুলে যাবে না কোন দিন। একদিন এলিকাট্টে গ্রামে নিজামী সৈন্যদের একটা বড় দল এসে হঠাৎ ঢুকেই ছয়জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করল, তারপর তাদের হাত-পা বেঁধে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে এক-এক করে গুলি করে হত্যা করল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা চিৎকার করে বলল—'সঙ্ঘম কি জয়', 'কমিউনিস্ট পার্টি কি জয়'।

করিম নগর জেলার মন্দপুরম গ্রামে একদিন গণফৌজের একটি ছোট দল এসে পৌঁছল। গ্রামবাসীরা তাদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। এমন সময় ১২০ জন নিজামী সৈন্য এসে গ্রাম আক্রমণ করল। গণফৌজের ছোটদলটি এমনি করে ঘেরাও হয়ে প্রথমে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করল। তারা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। তাদের ছোট-দলটি শত্রুকে বাধা দিতে লাগল, আর বড়দলটি গ্রাম থেকে সরে পড়ল। ৯ জনের ছোটদলটি সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিতে লাগল শত্রুদের। তাদের নেতা প্রভাকর রাও সঙ্গীদের নিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে চারঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করলেন শত্রুদের সঙ্গে। যুদ্ধ করতে করতে প্রভাকর এবং আরও সাতজন যোদ্ধা শত্রুপক্ষের গুলিতে প্রাণ দিলেন। তাঁদের বন্দুকের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল একটি হাতবোমা। সেটিও

ছুঁড়ে দিলেন তাঁরা। বোমার ঘায়ে ছয়জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। তারপর সবাইকে নিয়ে প্রভাকর শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বন্দুকের বাঁট দিয়ে কয়েকটাকে শেষ করে অবশেষে শত্রুদের গুলিতে বীরের মত প্রাণ দিলেন তাঁরা সবাই।

ভোঙ্গির তালুকের রেন্নুকুন্তালু গ্রামের উপর রাইফেল ও স্টেনগান-ধারী ৩০০ জন পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডা হঠাৎ আক্রমণ করায় সব গ্রামবাসী পালাতে পারল না, আক্রমণকারীদের হাতে ১০ জন গ্রামবাসী নিহত হল। আক্রমণকারীরা অন্য সব লোককে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিছু দূরেই ছিল গণফৌজের ছোট একটি দল। নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যার সংবাদ শুনে তারা চুপ করে থাকতে পারল না। তারা ছিল সংখ্যায় মাত্র ২০ জন, তাদের নেতা ছিলেন চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডি। রামা রেড্ডির নেতৃত্বে এই ছোট গেরিলাদলটি রুখে দাঁড়াল আক্রমণকারীদের সামনে। তারা সাত ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করে আক্রমণকারীদের ৪০ জনকে ঘায়েল করল। কিন্তু সাত ঘণ্টার যুদ্ধের পর তাদের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে গেল। তারা শেষ পর্যন্ত তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল ২০ জনেই। কেবল এই একটি যুদ্ধেই নিজামের বাহিনীকে ১০ হাজার রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়েছিল। চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডি আর তাঁর ছোট গেরিলা দলটির এই অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী তেলেঙ্গানা সংগ্রামে অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎসে পরিণত হয়েছে, নূতন নূতন মানুষকে টেনে এনেছে। তেলেঙ্গানার বহু গাথায় কীর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডির অমর নাম।

গেরিলা-যুদ্ধের কাহিনী

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে একজন দরদী সাংবাদিক তেলেঙ্গানার মুক্ত-অঞ্চল ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সব দেখেছিলেন, তারপর সেখানকার অবস্থা এবং গেরিলা-যোদ্ধাদের সংগঠন আর কায়দা কানুন সম্বন্ধে 'ব্লিৎস' পত্রিকায় একটি বিবরণ লিখেছিলেন। বিবরণটি নিচে তুলে দেওয়া হল :

"খবরের কাগজে তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। রোজই হায়দরাবাদ রেডিও খবর দেয়, লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা দলে দলে মরছে। অধ্যাপক রঙ্গ এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রে বলেছেন, ভারতে তেলেঙ্গানায়ই চীনের মত গৃহ-যুদ্ধের সূচনা হচ্ছে। কমিউনিস্টরা দাবি করছে, নালগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গাল, কাশিম নগর, আত্রাফ্‌বাদলা আর আদিলাবাদ জেলায় ২৫০০ গ্রাম থেকে তারা নিজাম-তন্ত্রের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। নালগোণ্ডা আর ওয়ারাঙ্গাল তাদের প্রধান ঘাঁটি।

"ভারত সরকারের 'রাজাকার' সংগঠন ভেঙে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ দাবির উত্তরে নিজাম জানিয়েছেন যে, কমিউনিস্ট বিপদ বর্তমান থাকতে ও-বিষয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। বোম্বাইয়ের সাংবাদিক-সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন, কমিউনিস্টদের হাতে পড়বে বলে হায়দরাবাদের জনসাধারণের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া যাচ্ছে না। আসলে তেলেঙ্গানার ছবি যে ভারত-নিজাম আপস-আলোচনার পেছনে সব সময়

ভ্রূকুটি করছে তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু কে এই যোদ্ধারা যারা একই সঙ্গে সর্দার প্যাটেল, নেহেরু আর নিজামের গুরুতর দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে, তাঁদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে হয়েছে ?

আড়াই হাজার গ্রামে নিজামশাহীর অবসান : "তেলেঙ্গানার আড়াই হাজার গ্রামের বিরাট অঞ্চলে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কমিউনিস্টদের ধরার ব্যাপারে নিজামের অনুচরগণ, ভারত সরকারের পুলিস আর গোয়েন্দারা সমান উৎসাহী। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের ধরবার জন্য দুই পক্ষের একযোগে কাজ করার টাটকা বিবরণ সব সময়েই পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের অনেক দূর পায়ে হেঁটে আর গরুর গাড়ীতে করে গেরিলাদের দখল-করা অঞ্চলের মাঝখানে পৌঁছাতে হল। আমাদের রক্ষী হিসাবে সঙ্গে ছিল দেশী বন্দুকধারী একদল গেরিলা।

"এখানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলেছে, বীজ বোনার জন্য ক্ষেত-খামার তৈরী হয়েছে। চাষীরা ক্ষেতে গোরু-বাছুর প্রভৃতি চরিয়ে বেড়াচ্ছে। সব লোক যে যার কাজ করছে, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে। অবস্থার গুরুত্বটা কেবল বোঝা যায় সকলের সজাগ দৃষ্টিতে আর মুখের বজ্রকঠিন দীপ্তিতে। আড়াই হাজার গ্রামে এরা নিজামশাহীর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

"নিজাম-সরকারকে এককণা ফসল বা এক পয়সাও কর এখান থেকে দেওয়া হয় না। স্থানীয় পাটোয়াররা হয় পালিয়েছে, না হয় জনসাধারণের পক্ষে চলে এসেছে। কিন্তু নিজাম তার কর্তৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তলোয়ার আর আগুনের নারকীয় তাণ্ডব শুরু করেছে। তাই মুক্ত তেলেঙ্গানার একটুও বিশ্রাম নেই, সর্বত্রই তাদের রণক্ষেত্র, সকল সময়ই যুদ্ধ। এই নূতন পাওয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাই প্রতিটি গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ থাকতে হয়। এই বিরাট রণক্ষেত্রে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় গণফৌজ 'দলম'-এর সঙ্গে নিজামের পুলিস, সৈন্যদল আর 'রাজাকার' গুণ্ডাদের লড়াই চলেছে।

জনযুদ্ধের কায়দা : 'দলম' বলতে বোঝায় ছোট ছোট সশস্ত্র দল। ভারতের গণ-সংগ্রামে এ এক নূতন জিনিস। সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা লোপ এবং অত্যাচারী দস্যুদলের আক্রমণ রোধ করবার জন্য এক অব্যর্থ উপায় হল এই সশস্ত্র বাহিনী; আমি এই 'দলম'-এর শিক্ষা ও সংগঠনের যতটুকু দেখেছি তার অনেক কথাই এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ, তাতে শত্রুপক্ষের সুবিধা হয়ে যাবে। কাজেই যেটুকু বলা চলে তাই এখানে বলছি।

"একটি গ্রামের এক মাইল দূরের এক পাহাড়ে 'দলমের' এক আড্ডায় আমরা পৌঁছালাম। তখন ঘোর সন্ধ্যা। সেখানে দেশী বন্দুক হাতে খাকি পোশাক-পরা একশো জন যুবককে দেখতে পেলাম। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কয়েকটি রাইফেল আর একটি স্টেনগানও পরে দেখেছিলাম।

"এই দলের নেতা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ গ্র্যাজুয়েট। নিজে ধনী-কৃষক-পরিবারের ছেলে হলেও তিনিই প্রথম এই অঞ্চলের নূতন জমি বিলির

আইন অনুসারে নিজের শত শত বিঘা জমি বিলি করে দিয়েছেন কৃষি-মজুরদের মধ্যে। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান আর হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁকে নেতার পদে বসিয়েছে। এই গেরিলা দলটির সঙ্গে আমি ছিলাম তিন সপ্তাহ। এই সময় তাঁর কাছ থেকেই আমি 'দলমের' গঠন, এর যুদ্ধের কায়দা আর কর্মসূচী জানতে পেরেছিলাম।

"তেলেঙ্গানার সংগ্রাম-পদ্ধতি অবস্থাভেদে স্থির করা হয়। তিন বছর আগে জনসাধারণ গ্রামে গ্রামে লাল নিশান পুঁতে দলে দলে সঙ্ঘমের সভ্য হয়েছিল। তারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, দেশমুখ আর জায়গীরদারদের কাছে তারা বেগার খাটবে না, বে-আইনী কর দেবে না। আইন ছিল তখন চাষীদের পক্ষে। কিন্তু দেশমুখের সশস্ত্র গুণ্ডারা তাদের প্রকাশ্যে মারপিট করতে লাগল আর দিন-দুপুরে তাদের নেতা কুমারায়াকে খুন করল। সেই দিনই পাঁচ হাজার কৃষক একত্র হয়ে গুণ্ডাদের পিটিয়ে গাঁ-ছাড়া করল। এই প্রথম জনসাধারণ নিজের শক্তির মূল্য বুঝল। তারা আরও বুঝল যে, শত শত বছর ধরে চলে আসা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে এই শক্তির ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে।

"কিন্তু পুরানো চিনে জোঁক এত সহজে হার মানতে পারে না। দেশমুখের গুণ্ডারা গেল তো নিজামের সশস্ত্র পুলিস এল। কৃষকেরা তীর-ধনুক আর গুলতি হাতে আত্মরক্ষা করল। এর পর পুলিস এসে গ্রামে গ্রামে তাঁবু ফেলল। তবে দেশমুখরা ফিরে এসে আর আগের মত শোষণ চালাতে পারেনি। অত্যাচার, গ্রেপ্তার আর কয়েদের ফলে কৃষকেরাও চাষবাস করতে পারল না।

"এই অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হল। ১৯৪৭ সালে সমস্ত হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে কৃষকেরা প্রায় বিনা-অস্ত্রেই দল বেঁধে গ্রামের পুলিস ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করত, তাদের অস্ত্র কেড়ে নিত। এইভাবেই তারা প্রথম অস্ত্র সংগ্রহ করল। এইসব আক্রমণের ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে পুলিস-ঘাঁটিগুলি উঠে গেল। দেশমুখরা হায়দরাবাদ থেকে সৈন্যবাহিনী, পুলিসবাহিনী আর 'রাজাকার' গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে এল। এরপর শুরু হল এদের বীভৎস অত্যাচার-উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, বলাৎকার প্রভৃতি। এর ফলে স্পষ্টভাবে গ্রামাঞ্চল দুইটি যুদ্ধমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেল—একভাগ হল সৈন্য-পুলিস-রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী, আর একভাগ হল সশস্ত্র কৃষকগণ।

"জনসাধারণ তাদের মুক্ত, স্বাধীন অঞ্চলের সীমানা বাড়াতে লাগল। যেসব জমিদার আর জায়গীরদার সরকারের সাহায্যে নারীধর্ষণ, লুট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি চালিয়েছে, তাদের জমিজমা ও সম্পত্তি কৃষকেরা দখল করে নিল। জমি, স্বাধীন জীবন, মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য তারা গ্রামের সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করল, ২৪ ঘণ্টা গ্রাম পাহারা দিতে লাগল। এইভাবে হল 'দলম'-এর উৎপত্তি।

"আক্রমণকারীরা এবারে একসঙ্গে একশো, দু'শো, পাঁচশো এসে হানা দিতে লাগল। সুতরাং এদের প্রতিরোধের জন্য নূতন ভাবে 'দলম'কে ঢেলে সাজান হল। প্রতি গ্রামে একটি করে 'দলমের' পরিবর্তে অনেকগুলি গ্রামের দক্ষ আর সবচেয়ে

সাহসী যুবকদের নিয়ে এবং ভাল ভাল অস্ত্র দিয়ে এক একটি দল গড়া হল। এই দলগুলিকে গড়ে তোলা হল ঠিক সামরিক কায়দায়। এদের নিয়মিত সামরিক শিক্ষা—কুচকাওয়াজ প্রভৃতি শেখানো হল, আর প্রত্যেক দলের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল।

"আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম সেই দলটি নূতন গড়ে তোলা হয়েছে। এই দলের নেতা একজন ধনী-কৃষকের শিক্ষিত পুত্র হলেও ছোট ছোট দলের নেতারা প্রায় সবাই তরুণ কৃষক। নেতাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমানও ছিল। 'দলমের' অধিকাংশ সৈন্যই কৃষি-মজুর আর গরীব-কৃষকের ছেলে। এরাই হল 'দলম', সঙ্ঘম আর নূতন তৈরি করা জনগণের শাসনব্যবস্থার শক্তি, প্রথম থেকে এরাই রয়েছে সমস্ত লড়াইয়ের সামনের সারিতে।

দলম-সঙ্ঘম ও গণ-শাসনব্যবস্থা ঃ "কেন্দ্রীয় গেরিলা-বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করা হয় অনেক বাছাই করে। গ্রামের সব যুবকই এই বাহিনীতে যোগ দিতে চায়, কিন্তু নেওয়া হয় কেবল কষ্ট-সহিষ্ণু আর অত্যন্ত বিশ্বাসী লোককে। যাদের বাদ দেওয়া হয় তাদের বলা হয়, তারা যেন নিজ নিজ গ্রামের 'দলমে' কাজ করে তাকে শক্তিশালী করে তোলে। তাদের বাদ দেবার কারণ, দলমের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর। এই বাহিনীকে সব সময় থাকতে হয় লড়াইয়ের ময়দানে, সব সময় চলতে হয় এদের। নিজামের সশস্ত্র-বাহিনীর একমাত্র কাজ হল কেন্দ্রীয় 'দলমের' বিভিন্ন গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করা, তাদের ঘেরাও করে ধ্বংস করে ফেলা। কাজেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। 'দলমের' গুপ্তচরদের রাখা হয়েছে শত্রুর গতিবিধির সন্ধান রাখার কাজে। 'দলম' যেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যও বসে বিশ্রাম করে সেখানেও চারদিকে সতর্ক পাহারা বসে।

"এই তরুণ বাহিনীর প্রতিদিনের কর্মসূচী আছে। খুব ভোরে উঠে এরা প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে ড্রিল আর কুচকাওয়াজ করে। এসবের মধ্য দিয়ে আনাড়ি কৃষক-তরুণ বিপ্লবী গেরিলা সৈন্যরূপে গড়ে ওঠে। এরপর অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা। কিন্তু রণ-ক্ষেত্রই গেরিলা যোদ্ধার প্রকৃত শিক্ষাক্ষেত্র। রণ-ক্ষেত্রেই গেরিলা যোদ্ধারা যুদ্ধের সমস্ত কৌশল শিখে নেয়। অন্য সব শিক্ষাই দেওয়া হয় গোপন স্থানে। কুচ-কাওয়াজের পর গেরিলারা প্রাতঃরাশ করে অন্য এক জায়গায়। তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিশ্রাম। বিকালবেলা আর এক জায়গায় গেরিলারা রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাশে যোগদান করে। এখানে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা, নিজাম বাহিনীর রণ-কৌশল, তেলেঙ্গানার গেরিলা-যুদ্ধের অবস্থা, বিভিন্ন স্থানের নিজাম-বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলে। সেই সব আলোচনা থেকেই গেরিলারা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া যারা অশিক্ষিত, তাদের লেখাপড়াও শেখানো হয়। রাত্রে তারা দলপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম নেয়, ঘুমোয়। রাত্রের এই ঘুমোবার জায়গাটি দলপতি ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না।

"এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ চলে বেশ কঠোরভাবে। এ ব্যাপারে কোন

রকমের গাফিলতিই সহ্য করা হয় না। কারণ, তা হলে সমস্ত কিছু নষ্ট হবে, সবাই পুলিস আর নিজামের সৈন্যদের হঠাৎ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবে। দূরবীন নিয়ে যারা শত্রুর গতিবিধির উপর সকল সময় নজর রাখছে তাদের উপর গেরিলা-বাহিনীর জীবন-মরণ নির্ভর করে। তাদের সঙ্গে নেতারা সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেন।

"একদিন এই গেরিলা-বাহিনী এক রাস্তার ধারে স্নান করছিল। এমন সময় গুপ্তচরেরা দৌড়ে এসে খবর দিল, কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে ৩০ জন সশস্ত্র পুলিস গ্রামের ফসল লুঠ করতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা-দলটিকে আক্রমণের আদেশ দেওয়া হল। স্থির হল, একদল আক্রমণ করবে পিছন দিক থেকে, দুই দল দু'পাশ থেকে, আর একটি ছোট দল সামনে থেকে শত্রুবাহিনীকে রুখবে। যথাসময়ে সঙ্কেত করা হল, আক্রমণ আরম্ভ হল। সামনের দলটির গুলিবর্ষণে দু'জন পুলিস নিহত হল। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে মৃতদেহ নিয়ে পালিয়ে গেল। পিছন দিক থেকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নেতা শত্রুপক্ষের জিপে চড়ে ফিরে এলেন। গাড়ীতে ছিল কেবল কয়েকখানি লুটকরা বাসন। কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না বলে সবাই খুব দুঃখিত হল।

"দলম রোজই শত্রুর উপর আক্রমণ চালায়। আর এদের নিয়মিত কাজ হল স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্যে শত্রুর যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং জিপে করে যাওয়া-আসার রাস্তা ধ্বংস করে ফেলা। নিজাম সরকার আবার এই রাস্তাগুলি সামরিক পাহারায় তৈরি করে। একদিন এক গাড়ীভর্তি সৈন্যদল যাবার সময় ধ্বংস করা রাস্তায় ফাঁদ পেতে ১৪ জনকে সাবাড় করা হয়। তাদের কাছ থেকে ১৩টা রাইফেল আর অনেক কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল। এমনি করে দিনের পর দিন গেরিলা-বাহিনী তাদের নূতন গণতান্ত্রিক জীবন, জমি, গৃহ আর স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছে।

"ক্রমে ক্রমে এদের সংগঠন আর সংগ্রামের আয়োজন উন্নত হতে উন্নততর হয়েছে। এখন রেল লাইন উপড়ে ফেলার কৌশলও তারা আয়ত্ত করেছে। তারা এখন রেলপথ উপড়ে ফেলে গোটা হায়দরাবাদের রাজ্যে নিজামী শাসন অচল করে দেবার চেষ্টা করছে, আর ভারতের জনসাধারণকে সংগ্রামের নূতন কায়দা শেখাচ্ছে। মাত্র দুইদিনেই গেরিলারা ২০ জায়গায় রেলপথ উপড়ে দিয়ে নিজামের সব রেলপথের ছয়টি অংশকে অচল করে দিয়েছে। তার ফলে রেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। গেরিলারা বেজোয়াদা লাইনে একটা পুলের বেশির ভাগ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া তারা মাইলের পর মাইল টেলিগ্রাফ লাইনের তার কেটে দিয়েছে, বহু খুঁটি উপরে ফেলেছে।

"এই 'দলম' জনগণেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা জনসাধারণের খাদ্যে ভাগ বসায় না। এরা জমিদারের গোলা বাজেয়াপ্ত করে আর নিজেদের অর্থে দলের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস কিনে নেয়। তবু গ্রামের মধ্য দিয়ে এরা যখন যায় সে দৃশ্য মানুষের মনে গভীরভাবে নাড়া দেয়। গোটা গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, শিশু সবাই ভিড় করে আসে তাদের অভ্যর্থনা করতে। সবাই তাদের অনুরোধ করে

কিছুদিন তাদের সঙ্গে কাটাবার জন্য। কিন্তু বসে সময় কাটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গ্রামবাসীরা চলমান 'দলমের' পাশে পাশে গ্লাসে গ্লাসে শরবত ভর্তি করে খাওয়াতে থাকে আর নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। এইভাবে তারা 'দলমের' প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়। কারণ, তারা জানে, নিজামের দীর্ঘ-কালব্যাপী উৎপীড়ন আর তাদের নূতন জীবনের মধ্যে এরাই হল প্রাচীর-স্বরূপ।

দলমের জয়গান ঃ "প্রচারের কাজে একবার 'দলমের' একটি শাখা কয়েকটি গ্রামে ঘুরেছিল। গ্রামগুলিতে এর জন্য উৎসব লেগে গেল। সমস্ত লোক তাদের সেকেলে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে জড়ো হল, তারা সবাই নূতন জীবনের গান গাইতে শুরু করে দিল, আর তাদের সৈনিক ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে একটা সভা হল। সে সভায় 'দলমের' একজন জোরালো ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তা গ্রামবাসীদের কাছে লড়াইয়ের খবর দিলেন, আর জানালেন যে, বিশাল অন্ধ্ররাজ্য না গড়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তারপর 'দলমে' যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হল। গ্রামের যুবকরা এই 'দলমে', যোগ দেওয়া সম্মানজনক মনে করে, কারণ তারা জানে যে গ্রামের সেরা ছেলেরাই কেবল 'দলমে' যোগ দিতে পারে।

"নিজেদের সন্তানদের নিয়ে গড়া 'দলমের' প্রতি জনগণের ভালবাসা যে কতখানি তা না দেখলে অনুমান করা যায় না। শুধু প্রাণ হাতে করে নয়, অনেক সময় প্রাণ দিয়ে তারা 'দলম'কে আশ্রয় দিয়েছে। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা এক গ্রামে এসে খাওয়া-দাওয়া করছিল। কয়েকদিন পর সে গ্রামে নিজামের সৈন্যরা এসে দু'টি কৃষক-কর্মীকে গুলি করে মেরেছিল। তারা জানতে পেরেছিল যে ঐ দুটি কৃষক-কর্মী 'দলম'কে আশ্রয়-দানের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। 'দলম' আবার সে গ্রামে এসেছিল। সেবারেও গ্রামবাসীরা আবার তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল ঃ নিজামের দালালরা ধ্বংস হোক। হত্যার প্রতিশোধ চাই। 'সঙ্ঘম জিন্দাবাদ, বিশাল অন্ধ্র জিন্দাবাদ।'

"মৃত্যু এখানে কারোর মনেই ত্রাসের সঞ্চার করে না। কারণ, মরণকে তারা এত বেশী দেখেছে যে সকলেই তার জন্য প্রস্তুত। 'দলমে' নেওয়া হোক বা না হোক, গ্রামের প্রত্যেকটি যুবকই মনে-প্রাণে গেরিলা।

"নিজামের চার-পাঁচশো সৈন্য একসঙ্গে আসে, আর চার-পাঁচখানা গ্রাম ঘিরে ফেলে গেরিলাদের ধরবার চেষ্টা করে। 'দলমে'র গেরিলারা অবশ্য এই বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে সরে পড়ে। কারণ, নিজামের সৈন্যদের ধারণা, এসব অঞ্চলের সমস্ত যুবকই কমিউনিস্ট, সবাই গেরিলা-যোদ্ধা। নিজামের সৈন্যেরা গ্রামে ঢুকেই গ্রামের সমস্ত লোককে এক জায়গায় জড়ো করে, আর গেরিলা মনে করে কয়েক জনকে বেছে নিয়ে গুলি করে মারে। বাকি সবাইকে তারা খুব ধমকায়, মেরে ফেলবার ভয় দেখায়। কিন্তু গ্রামের কেউই আজ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, কাউকে ধরিয়ে দেয়নি। কারণ সব বিশ্বাসঘাতক আগেই পালিয়ে গেছে।

কৃষকদের প্রতিশোধ ঃ "শান্ত কৃষকদের মন থেকে ক্ষমার বাষ্প উবে গেছে।

তারা আজ রক্তের বদলে রক্ত চায়। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা খবর পেল যে, একদল পুলিস আর রাজাকার দিনের বেলায় কয়েকটি গ্রামের উপর ভীষণ অত্যাচার করার পর রাত্রির জন্য এক দেশমুখের সুরক্ষিত গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। শিকারের লোভে গেরিলারা মেতে উঠল, ভোর না হতেই তারা দেশমুখের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। এসব ক্ষেত্রে তারা আগুন লাগানোই সবচেয়ে ভাল উপায় বলে মনে করে। কারণ, গুলি ছুঁড়ে যুদ্ধ হলে তাদেরও ক্ষতি হতে পারে। আগুন লাগাবার পর শত্রুরা হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, তারা এসে পড়ল গেরিলাদের বন্দুকের সামনে। তারা অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। গেরিলারা তাদের বন্দুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাদের বন্দী করল। এখন সমস্যা দেখা দিল, এই বন্দীগুলোকে নিয়ে কি করা যায়। গ্রামের কৃষকদের কাছে সবচেয়ে সহজ পথ হল এদের গুলি করে মারা। কারণ, গেরিলারা এসে না পড়লে এরা কৃষকদের খুন করত, স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করত। তাই মৃত্যুই এদের উপযুক্ত শাস্তি। সুতরাং কুড়িজন পুলিস আর রাজাকারকে গুলি করে মারা হল। পরে অবশ্য গুলি করে মারার নিয়ম পাল্টাতে হয়। কারণ এতে অনেক গুলি খরচ হয়। এর পর থেকে নিজামের সৈন্য পুলিস আর রাজাকার বন্দীদের কেটে ফেলা হত। এতে অনেক গুলিগোলা বাঁচত। তেলেঙ্গানার শ্রেণী-সংগ্রাম এমনই হিংস্র, এমনই নির্মম যে, এখানে কোন পক্ষেই ক্ষমা নেই, ক্ষমা ভিক্ষাও নেই।

"তেলেঙ্গানার নিরীহ কৃষক এত নিষ্ঠুর হল কেমন করে? কোথা থেকে এত ধারাল আর কঠিন ইস্পাত তৈরি হল? এর উত্তর মিলবে পুলিস-মিলিটারী-রাজাকার প্রভৃতিরা নরনারী-শিশু নির্বিচারে সকলের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার এতদিন চালিয়ে এসেছে তার বিবরণ পড়লে। নিজামের গুণ্ডারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

"তেলেঙ্গানার সংগ্রাম দমন করা যাবে না—নিজের চোখে সবকিছু দেখে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এ সংগ্রাম কেবল কয়েকজন কমিউনিস্টের উস্কানির ফল নয়। অবশ্য এ অঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রচণ্ড, আর তরুণ কৃষকরা কমিউনিস্ট পার্টি আর দলমে যোগদান পরম সম্মানের কাজ বলে মনে করে। এ সংগ্রাম হল তেলেঙ্গানার সমগ্র জনসাধারণের সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার কৃষক লড়ছে এশিয়ার নিকৃষ্টতম সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। তেলেঙ্গানার কৃষক লড়ে' জমি পেয়েছে। এরা এদের নূতন পাওয়া জমি, স্বাধীনতা আর নিজেদের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য লড়বে, প্রাণ দেবে। ভারতে এরা নবযুগের সূচনা করেছে, নূতন সংগ্রামের উদ্বোধন করছে। তেলেঙ্গানার এ নূতন শক্তি অমর, কারণ এর শিকড় জনসাধারণের মধ্যে।"

।। মারাথওয়াড়ার কৃষক-সংগ্রাম ।।

তেলেঙ্গানার বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল হায়দরাবাদের সর্বত্র। হায়দরাবাদ রাজ্যে বহু জাতির বাস। তেলেঙ্গানার তেলেঙ্গা বা অন্ধ্র চাষীদের

সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে হায়দরাবাদের অন্যান্য জাতির কৃষকরাও সংগ্রাম আরম্ভ করল। হায়দরাবাদ রাজ্যের পশ্চিম অংশের মারাঠী ও কানাড়া ভাষাভাষী অঞ্চল মারাঠওয়াড়ার কৃষকরাও নিজামের শোষণ-শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে একে একে করিমনগর, বিদ, আওরঙ্গাবাদ, গুলবর্গ প্রভৃতি ২৫টি গ্রামের শত শত চাষী নিজ নিজ গ্রামের পুলিস-চৌকি পুড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করল। এর পর থেকে সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকারদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে লাগল। এসব সংঘর্ষে অনেক পুলিস আর রাজাকার নিহত হল। ৩০শে জুন নিজামের সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকারদের এক বিরাট বাহিনী ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করল। কৃষকেরা বড় গুলতি, তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে রুখে দাঁড়াল। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, ৫ জন কৃষক বীর শহীদ হয়েছেন, আর ১২ জন হয়েছেন আহত। অপর পক্ষে নিহত হয়েছে ৬ জন সৈন্য আর ১১ জন রাজাকার। তাদের বন্দুকগুলিও হস্তগত করল কৃষকেরা।

এর পর পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডারা হঠাৎ কোন গ্রাম আক্রমণ করে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেত, আর সম্ভব হলে লুটপাট করত। এইভাবে তারা ৪টি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে পালিয়ে যায়, আর পথে একা পেয়ে ১৮ জন কৃষক এবং এক বৃদ্ধকে গুলি করে মারে। কৃষকেরা এর পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করল, তেলেঙ্গানার মত গুপ্তচর-দল আর ছোট ছোট গেরিলা-দল তৈরি করল। গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হল। কৃষক গেরিলারা পথেঘাটে লুকিয়ে থেকে সৈন্য, পুলিস আর রাজাকারদের দলগুলির উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করে ফেলতে লাগল।

একদল সশস্ত্র রাজাকার একটি গ্রাম লুঠ করতে যাচ্ছিল। পথে গেরিলারা তাদের আক্রমণ করল, তারা প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। গেরিলাদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল ৭ জন রাজাকার। তাদের বন্দুকগুলি গেরিলাদের হস্তগত হল। একদিন গেরিলারা সংবাদ পেল, কোলি গ্রামের উপর প্রায় ১০০ জন পুলিস আক্রমণ করেছে, গ্রামরক্ষী দল তাদের রুখছে। গেরিলারা দৌড়ে গেল গ্রামরক্ষীদের সাহায্যে। তারা পেছন থেকে আক্রমণ করল পুলিসদের। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পুলিসগুলো পালিয়ে গেল এদিক ওদিক, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল তাদের ৪২টা মৃতদেহ আর আহত ১২ জন পুলিস। তাদের ৫৪টি বন্দুক গেরিলাদের হস্তগত হল।

এরপর এই অঞ্চলের পুলিস আর রাজাকারদের মনোবল ভেঙে গেল। তারা ভয়ে গ্রামের উপর আক্রমণ বন্ধ করে দিল। এ সংবাদ শুনে নিজামের প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলি স্থির করলেন তিনি স্বয়ং আসবেন পুলিস আর রাজাকারদের উৎসাহ দিতে। কিন্তু তাঁর যাত্রা শুরু করবার পূর্বেই গেরিলারা তাঁর পথের একটা রেলপুল উড়িয়ে দিল। লায়েক আলি ভয়ে তাঁর আসা বন্ধ করে দিলেন। একদিন পুলিস ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করল। গেরিলারা ছিল পাশেই এক গ্রামে লুকিয়ে। তারা

দৌড়ে এসে দাঁড়াল পুলিসের মুখোমুখি। সে যুদ্ধে ১৬ জন পুলিসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, আর গেরিলাদের নিহত হয়েছিল ৬ জন। এই যুদ্ধেই এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কৃষক-কর্মী জয়ন্ত রাও নিহত হন।

কৃষক সংগ্রামের পাশে শ্রমিকশ্রেণী

তেলেঙ্গানা সংগ্রামে প্রথম থেকেই হায়দরাবাদের শহরাঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছে, সংগ্রামী কৃষকদের উৎসাহিত করেছে, তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে—নেতৃত্ব দান করেছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই বিভিন্ন শহরের শ্রমিকগণ তেলেঙ্গানার সাহায্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকেরা সভা ও শোভাযাত্রা করে কৃষকদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়। সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে প্রচার ও তাদের উৎসাহ-দানের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকদের প্রচারক দল (স্কোয়াড) গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়। এসব ক্রিয়াকলাপ শ্রমিক-বিদ্রোহের পূর্বাভাস বলে মনে ক'রে নিজাম সরকার শ্রমিকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। পুলিস বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক-নেতাদের গ্রেপ্তার করে। শিল্পাঞ্চলে সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠল হায়দরাবাদের বীর শ্রমিকশ্রেণী।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নিজামের সৈন্য-বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ওয়ারাঙ্গাল, হায়দরাবাদ, নানদেদ, ঔরঙ্গাবাদ ও গুলবর্গের ১৫ হাজার সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট করে। তাদের ধর্মঘট চলেছিল দুই মাস ধরে। কোট্টাগুদামের খনি-শ্রমিকরা তাদের প্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আর কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে পাঁচবার ধর্মঘট করেছিল। পুলিস তাদের প্রিয় নেতা শেষগিরি রাওকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার ক'রে গুলি ক'রে হত্যা করলে খনি-শ্রমিকেরা ধর্মঘট ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বহু পুলিসকে হত্যা ক'রে শেষগিরি রাওয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামের প্রভাবেই হায়দরাবাদের হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে আর তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নিজাম সরকারের শত চেষ্টা অগ্রাহ্য করে মুসলমান শ্রমিকরা প্রত্যেকটি সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়ে যোগদান করেছিল। হায়দরাবাদ শহরের কমিউনিস্টরা প্রথমে ছিলেন পূরণচাঁদ যোশীর অনুচর। তারপর তাঁরা রণদিভের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদ শহরের রেল-শ্রমিক আর সুতাকল শ্রমিকদের নির্মম সমালোচনা এবং প্রচণ্ড চাপে শহর কমিটি তাদের মত বদলাতে বাধ্য হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তেলেঙ্গানার কৃষক বন্দীরা হায়দরাবাদের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রাণদণ্ডে

দণ্ডিত হলে সমস্ত হায়দরাবাদে শ্রমিক বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে। সকল কল-কারখানার প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মঘট ক'রে হায়দরাবাদের কলকারখানা, যানবাহন সবকিছু অচল করে দেয়। নিজাম সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করতে বাধ্য হয়। বহু শ্রমিক তেলেঙ্গানা বিপ্লবে স্বেচ্ছা-সেবকরূপে যোগদান করেছিল, অনেকে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। এইভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হায়দরাবাদের শ্রমিকশ্রেণী।

তেলেঙ্গানা বিপ্লবে শক্তি-সমাবেশ

ক্ষেত-মজুর ও দরিদ্র কৃষক ঃ ক্ষেত-মজুর আর দরিদ্র কৃষকরাই ছিল তেলেঙ্গানা বিপ্লবের মূল ও প্রধান শক্তি। তাদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, উদ্যোগ আর আত্মত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশী। সংগ্রাম আরম্ভের প্রথম থেকেই এরা সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম চালিয়ে-ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য আর গেরিলা-বাহিনীর সৈন্যদেরও বেশীর ভাগ এসেছিল ক্ষেত-মজুর আর গরীব কৃষকদের মধ্য থেকে। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রামে পৌঁছাবার আগেই ক্ষেত-মজুর আর গরীব কৃষকদের জোয়ান ছেলেরা নিজেদের উদ্যোগে গেরিলা দল তৈরি করেছে, গুলতি, তীর-ধনুক, লাঠি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে রাজাকারদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে শেষ করে দিয়েছে, তাদের বন্দুকগুলি কেড়ে নিয়েছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর মধ্যেও এরাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়।

মাঝারী কৃষক ঃ যারা নিজেদের জমি সাধারণত নিজেরাই চাষ করে তারাই মাঝারী কৃষক। এরা জমিদার ও মহাজনের শোষণে-উৎপীড়নে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। তেলেঙ্গানা বিপ্লবে এরাও এগিয়ে এসে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেছিল। এদের যুবকরা যথেষ্ট সংখ্যায় গেরিলা-বাহিনীতে আর গ্রামরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করে শতে শতে প্রাণ বলি দিয়েছিল এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, এই মাঝারী কৃষকেরা গেরিলাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সরবরাহ করে আর শত্রুসৈন্যর গতিবিধির সংবাদ দিয়ে বহু সংখ্যায় শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

ধনী কৃষক ঃ সংগ্রামের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ধনী কৃষকেরাও সংগ্রামে যোগদান করেছিল। তারপর সংগ্রাম যতই সশস্ত্র আর বিপ্লবের আকার ধারণ করে, জমিদার-জায়গীরদারদের দখল করা জমি গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুর-দের মধ্যে বিলি করা শুরু হয়, ততই ধনী কৃষকেরা সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যায় এবং নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। অবশ্য তারা গেরিলা বা সংগ্রামী চাষীদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা বা পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। কারণ, নিজাম আর জমিদাররা ছিল তাদেরও শত্রু।

ছাত্র-সম্প্রদায় ঃ তেলেঙ্গানা বিপ্লবে হায়দরাবাদের ছাত্রশক্তি এক অতুলনীয়

ভূমিকা পালন করেছে, ভারতের সমগ্র ছাত্র-সম্প্রদায়ের জন্য চির উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছে। সাহসে, বীরত্বে, বুদ্ধিতে, উদ্যোগে, কর্মে ছাত্রদের স্থান কারোর পিছনে নয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম যখন চরমে ওঠে, যখন নিজামের সমস্ত সৈন্য আর পুলিস-বাহিনী সংগ্রামী কৃষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেলেঙ্গানার উপর দিয়ে যখন রক্তবন্যা বয়ে যেতে থাকে, তখন হায়দরাবাদ রাজ্যের সমগ্র ছাত্রশক্তি সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সংগ্রাম-ধ্বনিতে সমগ্র হায়দরাবাদ কেঁপে উঠেছিল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদের সমস্ত ছাত্র 'কলেজ ছাড়' ধ্বনি নিয়ে কলেজ ছেড়ে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তারা দলে দলে অন্ধ্রমহাসভায় আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। নিজেরাই দল বেঁধে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, নূতন নূতন গ্রামে গিয়ে কৃষক জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে লাগল। তারা উদ্যোগ নিয়ে বহু গ্রামে গেরিলা দল ও গ্রামরক্ষীদল গড়ে তুলল, নিজামের সৈন্যবাহিনী আর রাজাকার গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তাদের সে সংগ্রাম ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য-বাহিনী তেলেঙ্গানায় প্রবেশ করার পর ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ নূতন নূতন দিকে প্রসারিত হয়; তারা আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর সাহসের নূতন নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আলওয়ালা নরসিংহ রেড্ডী নামে একজন ছাত্রনেতা বহু গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে নেহেরু-প্যাটেলের সৈন্যবাহিনী গ্রাম ঘিরে ফেলল। নরসিংহ তাদের হাতে ধরা পড়তে প্রস্তুত নন। তিনি তাঁর বন্দুক দিয়ে মাথায় গুলি করে মৃত্যুবরণ করলেন। ছাত্রনেতা সীতারামায়া ছিলেন একটি গেরিলা স্কোয়াডের নেতা। একদিন তাঁর স্কোয়াড সৈন্যদের বেড়াজালে পড়ে গেল। সীতারামায়া তাঁর দলকে পালাবার হুকুম দিলেন, আর নিজে তাঁর বন্দুক নিয়ে শত্রুদের আটকাবার ভার নিলেন। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে তিনি অনেকক্ষণ শত্রুদের আটকে রাখলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, আর নিজে শত্রুদের গুলিতে ভীষণ আহত হয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তিনি শুয়ে পড়লেন, আর হাতে নিলেন তাঁর শেষ সম্বল হাতবোমাটি। এদিকে সুযোগ বুঝে শত্রুরা এগিয়ে এল। সীতারামায়া তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতবোমাটি ছুঁড়ে দিলেন শত্রুসৈন্যদের দিকে। তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। তাঁর হাতবোমার বিস্ফোরণে ৫ জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। মোট ১১ জন শত্রুসৈন্য মেরে সীতারামায়া জীবন দিলেন। তাঁর স্কোয়াডের সবাই পালাতে পেরেছিল নিরাপদে। আর একজন ছাত্রনেতা ভেঙ্কট রেড্ডি। নালগোণ্ডা জেলার কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করছিলেন তিনি তাঁর স্কোয়াড নিয়ে। এমন সময় শত্রুসৈন্যরা এসে তাঁদের ঘিরে ফেলল। বন্দুক নিয়ে তিনি শত্রুসৈন্যদের বাধা দিতে লাগলেন, আর তাঁর স্কোয়াডকে পালাবার হুকুম দিলেন। তাঁর গুলিতে ৬ জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। তারপর তিনি ভীষণ আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। স্থির

হল, তাঁকে গুলি করে মারা হবে। শত্রুরা জানতে চাইল, মরার আগে তার শেষ ইচ্ছা কি। তিনি জানালেন, গেরিলা পোশাক পরে তিনি মরবেন—এই তাঁর শেষ ইচ্ছা। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। আজও হায়দরাবাদের জনসাধারণের প্রিয় সন্তান ভেঙ্কট রেড্ডীর কাহিনী স্মরণ করে তারা পুত্রশোকে অধীর হয়ে পড়ে। আর একটি ছাত্র রামা রেড্ডী। কলেজ ছেড়ে গেরিলা যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তিনি। সৈন্যবাহিনীর চলাচলে বাধা দেবার জন্য তিনি তাঁর স্কোয়াড নিয়ে দুইটি রেলপুল আর চারটি রাস্তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সৈন্যদের ঘেরাও থেকে তাঁর স্কোয়াডের পালাবার সুযোগ দেবার জন্য শত্রুসৈন্যদের একাকী আটকে রেখেছিলেন ১২ ঘণ্টা। তারপর শত্রুসৈন্যদের গুলিতেই প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। এ ধরনের অসংখ্য কাহিনী আছে তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ইতিহাসে।

তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দখল-করা অঞ্চলে কৃষক জনসাধারণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ৬ মাসের মধ্যেই অত্যাচারী জমিদার, দেশমুখ, জোতদার প্রভৃতিদের হাত থেকে ৩০ লক্ষ বিঘা জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে জমি গরীব-চাষী, ক্ষেত-মজুর প্রভৃতিদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিলি করার পর সে জমির স্বত্ব দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে।

মোট তিন রকমের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। প্রথমত, যে সমস্ত জমি দেশমুখ, জায়গীরদার, জোতদার প্রভৃতিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব জমি কৃষকদের কাছ থেকে দেশমুখ, জমিদার, মহাজনরা কেড়ে নিয়েছিল সে জমি বাজেয়াপ্ত করে যাদের জমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, 'প্রেম্বোক' বা পতিত জমি দখল করে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

গরীব চাষী আর জমিহীন ক্ষেত-মজুর গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এরাই ছিল সংগ্রামের সামনের সারিতে। তাদের মধ্যে কেবল জমিই বিলি করা হয়নি, তাদের মজুরির পরিমাণও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। এর ফলে উৎসাহিত হয়ে নূতন নূতন এলাকার কৃষকেরাও এসে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগদান করেছে, যারা ছিল পিছনে তারা দলে দলে সামনে, সংগ্রামের প্রথম সারিতে এগিয়ে এসেছে।

এই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজাম, জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতির শোষণ-শাসনের অবসান ঘটিয়ে তেলেঙ্গানায় যে মুক্ত স্বাধীন অঞ্চল গড়ে উঠেছিল তার পরিমাণ সামান্য নয়। সমগ্র হায়দরাবাদ রাজ্যের ২২ হাজার গ্রামের মধ্যে ২½ হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল জনগণের এই স্বাধীন রাজ্য—তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র। এর লোকসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ—সমগ্র হায়দরাবাদ রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই জনগণতান্ত্রিক সরকারের নিয়মিত গেরিলা যোদ্ধা-বাহিনীর

সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার, আর গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে উঠেছিল মোট ১০ হাজার কৃষক নিয়ে।

এই স্বাধীন জনগণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের নিজস্ব শাসন। প্রত্যেক গ্রামে নিজামের অনুচর আর নিজামশাহীর সঙ্গে সহ-যোগিতাকারীদের বাদ দিয়ে গ্রামের সমস্ত জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীন মত অনুসারে গ্রাম সরকার অর্থাৎ 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' গঠন করেছিল। এই পঞ্চায়েত-রাজ জনসাধারণের আদালত বসিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিত, গ্রামরক্ষী-দল গঠন করে গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করত, জমি দখল ও বিলি করত, চাষবাসের তত্ত্বাবধান করত। এরই সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত-সরকার ক্ষেত-মজুর ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর আর্থনীতিক অধিকার সুরক্ষিত করেছিল এবং জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতিদের সমস্ত অন্যায় অধিকারও লোপ করেছিল।

কৃষকদের কাছ থেকে দেশমুখ আর জায়গীরদাররা যে সব জমি কেড়ে নিয়েছিল তা গ্রামের পঞ্চায়েত দখল করে নেয়। সে জমির অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল মূল মালিককে, পরে যে-চাষী তা চাষ করত তাকে দেওয়া হয়েছিল সিকিভাগ, আর আগে যে চাষ করত তাকে দেওয়া হয়েছিল বাকি সিকিভাগ। পতিত ও অন্যান্য জমি ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। দেশমুখ আর বিশ্বাসঘাতক ধনী কৃষকদের নিজেদের জমিও চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। কৃষকদের উপবাসী রেখে বড় বড় জমিদাররা যে বিপুল পরিমাণ শস্য জমিয়ে রেখেছিল তাও বাজেয়াপ্ত করে গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের বাকি খাজনা, ঋণ প্রভৃতি জমিদার-মহাজনদের সমস্ত পাওনা মকুব করা হয়েছিল। এসব পাওনা আদায় করার চেষ্টাও বে-আইনী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল। পঞ্চায়েত-রাজ আরও ঘোষণা করেছিল, যে জমি চাষ করবে সে-ই হবে জমির মালিক। তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

এই ভাবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৩৬ লক্ষ বিঘা জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। তেলেঙ্গানার মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত ক্ষেত-মজুর জমি পেয়েছিল; তাছাড়া ক্ষেত-মজুরদের মজুরির হার বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়। ক্ষেত-মজুর আর গরীব চাষীদের ঘরের ব্যবস্থাও করেছিল তেলেঙ্গানার জনগণতান্ত্রিক সরকার। আগে ঘর তোলার জন্য জমি নিতে হত নিজাম আর দেশমুখদের মোটা টাকা সেলামি দিয়ে। তার জন্য ঘর ছিল না অনেকেরই। এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত ঘর তৈরি করার জন্য বিনামূল্যে জমি এবং জিনিসপত্রও সরবরাহ করল। তাই গরীব চাষী বাপ-ঠাকুর্দার জীবনে যা পায়নি, তা এবার পেয়ে গেল তাদের নিজেদের সরকারের কাছ থেকে। নূতন জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠল শতাব্দীকালের শাসন-জর্জরিত তেলেঙ্গানায়।

গ্রাম-সরকার বা গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা ছিল গ্রামে জনসাধারণের জীবনে এক মস্তবড় উৎসবের ব্যাপার। গ্রাম-সরকার প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নালগোণ্ডা জেলার ভক্তলপুরম গ্রামে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে। সকাল

বেলায় গ্রামের সমস্ত কৃষক মিলে স্বাধীনতার নূতন সংকল্প গ্রহণ করল। সেদিন সারা গ্রামকে লালপতাকা আর ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হল। একদল থাকল গ্রামের পাহারায়। তারপর গ্রামের ২১ বছর বয়সের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলে এক সভা করে, এবং গোপনে ভোট দিয়ে নিজেদের গ্রাম-সরকারের নির্বাচন করল।

গ্রাম-সরকার নির্বাচিত হয়েই প্রথম ঘোষণা করল—"আমরা নিজামের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।" এই ঘোষণা শুনে সমস্ত মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠল—"লালঝাণ্ডা কি জয়।" তারপর জনসাধারণ নির্বাচন করল গণ-আদালতের বিচারকদের। এরপর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গ্রামরক্ষী-বাহিনী গঠন করা হল। ঐ দিনই বিচারকগণ বন্দী প্যাটেল, দেশমুখ আর দালালদের দুষ্কার্যের বিচার করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবার আদেশ জারি করলেন। তারপর গ্রামের দেশমুখ, প্যাটেল প্রভৃতি শোষকদের বড় বড় বাড়ীগুলি দখল করে সেখানে সরকারের দপ্তর স্থাপন করা হল।

নেহেরু সরকারের আক্রমণ

তেলেঙ্গানা বিপ্লবকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হল নিজাম সরকার। একে ধ্বংস করা দূরের কথা, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছিল তেলেঙ্গানা ছাড়িয়ে মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলেও। অন্ধ্রেও শুরু হয়েছিল কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম, গড়ে উঠেছিল কয়েকটি মুক্ত অঞ্চল। তেলেঙ্গানা বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষে সারা ভারতের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটা কেঁপে উঠেছিল। নেহেরু-সরকারের অন্যতম অংশীদার সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা—রাজা-মহারাজ-জমিদারগোষ্ঠী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে আরম্ভ করেছিল। তাদের চাপে, তাদের শোষণ-ব্যবস্থা রক্ষা করতে, শেষপর্যন্ত নেহেরু-সরকার তেলেঙ্গানার উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর নেহেরু-প্যাটেল পরিচালিত ভারত সরকারের ২৬ হাজার সৈন্য হায়দরাবাদে প্রবেশ করল। এই বাহিনী পরিচালনার ভার দেওয়া হল ভারতীয় সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, সবচেয়ে নিষ্ঠুর বলে কুখ্যাত জেনারেল জে. এন. চৌধুরীকে। তার সহকারীরূপে এলেন নিষ্ঠুরতর চরিত্রের ক্যাপ্টেন নানজাপ্পা। তারা দুজনেই সারা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দিলেন—মাত্র দু'মাসের মধ্যেই তারা তেলেঙ্গানা বিপ্লব ধ্বংস করে ফেলবেন। কিন্তু তেলেঙ্গানার কৃষক তাদের সে গর্ব চূর্ণ করেছিল। এই দুই সেনাপতির সমস্ত নিষ্ঠুরতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে তেলেঙ্গানা বিপ্লব পূর্ণোদ্যমে চলেছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

নেহেরু-প্যাটেল পরিচালিত একচেটিয়া-বুর্জোয়া আর সামন্ত-প্রভুদের স্বার্থবাহী ভারত সরকারের সেনাবাহিনী তেলেঙ্গানায় প্রায় ৫ হাজার বিপ্লবী কৃষক আর কমিউনিস্টকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, প্রায় দেড়শত কৃষক রমণীকে ধর্ষণ করেছিল, ২৫ খানি গোটা গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিল, ১০ হাজার ঘর পুড়িয়ে আর ভেঙে ধূলিসাৎ করেছিল, আর বিতাড়িত জায়গীরদার, দেশমুখ, প্যাটেলদের ফিরিয়ে এনেছিল। তবু তেলেঙ্গানা হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়েছিল, তার সংগ্রাম নূতন নূতন অঞ্চলে বিস্তৃত করেছিল। চৌধুরী-নানজাপ্পার অমানুষিক উৎপীড়ন তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষকদের মধ্যে দুর্বার, অজেয় শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। নেহেরু-প্যাটেল-চৌধুরী-নানজাপ্পা-নিজামদের সাধ্য ছিল না সেই শক্তিকে চূর্ণ করবার।

নেহরু সরকারের আক্রমণ সত্ত্বেও, দুর্ধর্ষ সেনাপতি জে. এন. চৌধুরী ২৬ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তেলেঙ্গানায় প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস ও অসংখ্য মানুষকে হত্যা করলেও ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিপ্লবের সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলল। কিন্তু তারপর তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের নীতি বদলের ফলে সেই সংগ্রাম আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। পর বৎসর, ১৯৫২ সাল ছিল নির্বাচন বৎসর। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম বন্ধ করা হল। এইভাবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ, ঐতিহাসিক বিপ্লবের অবসান ঘটল।

* * * * *

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল তেলেঙ্গানার পরেই পার্শ্ববর্তী অন্ধ্র অঞ্চলের তেলেগু ভাষাভাষী কৃষকদের উপর। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম অন্ধ্রের কৃষকদের মধ্যেও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। সেদিন অন্ধ্রের কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামকে ভারতের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগেই তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের কমিউনিস্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের সংগ্রাম একযোগে চালাবার আয়োজন চলে। তার পর অন্ধ্রের পার্টি-নেতারা তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের এই সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই মতাদর্শগত আলোচনা 'অন্ধ্র পার্টির চিঠি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই আলোচনা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। এর পূর্বে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হলেও, এ সম্বন্ধে এত বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা কখনই হয়নি। তাছাড়া, এই আদর্শগত আলোচনার আরম্ভ হয়েছিল তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামের ময়দানে। আর এই মতাদর্শগত আলোচনার ভিত্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম-কালে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লব সম্বন্ধে মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারা ও চীন-বিপ্লবের আদর্শ। তাই এই আলোচনার গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

এই চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র-নেতারা ঘোষণা করেছিলেন: "মাও সে-তুঙের 'নয়া গণতন্ত্র'ই ভারতের ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ নির্দেশ করে।" মাওয়ের মতাদর্শ অনুসরণ করেই তাঁরা বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ভারতের সকল বুর্জোয়ারা নয়, কেবল বড়, একচেটিয়া-বুর্জোয়াগোষ্ঠী আর সামন্ততান্ত্রিক-জমিদারগোষ্ঠীই ভারতের জনসাধারণের, কৃষকের প্রধান শত্রু।

সুতরাং বিপ্লবের এই স্তরে কৃষক জনসাধারণের সকল অংশই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধই হবে এই সংগ্রামের প্রধান রূপ।

ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তর হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, আর রাশিয়ার বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই পার্থক্য দেখিয়ে অন্ধ্র চিঠির উপসংহারে ভারতবর্ষের বিপ্লব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয়:

"বিভিন্ন দিক থেকে ভারতের বিপ্লব আর রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কেবল সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট আর শহরের জনসাধারণের অভ্যুত্থানের মারফত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে গ্রামাঞ্চলের মুক্তি আসবে না, কৃষক-বিপ্লবের আকারে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে চলবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধ। তার মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে।"

এছাড়া অন্ধ্রপার্টির চিঠিতে ভারতের অন্ধ্র, মারাঠী, কানাড়ী প্রভৃতি জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিও আলোচনা করা হয়েছে, আর এর সঙ্গে মাও সে-তুঙের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের আদর্শ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অন্ধ্র পার্টির চিঠি

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল তেলেঙ্গানার পরেই পার্শ্ববর্তী মাদ্রাজ রাজ্যের অন্ধ্র অঞ্চলের তেলেগু-ভাষাভাষী কৃষকদের উপর। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম অন্ধ্রের কৃষকদের মধ্যেও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেদিন অন্ধ্রের কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামকে ভারতের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের কমিউনিস্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের সংগ্রাম একযোগে চালাবার আয়োজন চলে। তারপর অন্ধ্রের পার্টি-কমিটি তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের এই সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই আদর্শগত আলোচনাই 'অন্ধ্র পার্টির চিঠি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই আলোচনা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন ব্যাপার। এর পূর্বে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোচনা হলেও এ সম্বন্ধে এত বিস্তারিত আলোচনা আর কখনও হয়নি। তাছাড়া এই আদর্শগত আলোচনার আরম্ভ হয়েছিল তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইয়ের ময়দানে। আর এই আদর্শগত আলোচনার ভিত্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকালে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ বিপ্লব সম্বন্ধে মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা ও চীন-বিপ্লবের আদর্শ। তাই অন্ধ্রের এই পার্টির চিঠির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই চিঠি অন্ধ্রের পার্টির মধ্যে প্রচারিত হয়। এই

চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র-কমিটি ঘোষণা করেছিলেন, "মাও সে-তুঙের 'নয়া-গণতন্ত্র'ই ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দেশ করে।" মাওয়ের আদর্শ অনুসরণ করেই তাঁরা বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ভারতের সকল বুর্জোয়ারাই নয়, কেবল বড়, একচেটিয়া-বুর্জোয়াগোষ্ঠী আর সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠীই ভারতের জনসাধারণের, কৃষকদের প্রধান শত্রু। সুতরাং বিপ্লবের এই স্তরে কৃষক জনসাধারণের সকল অংশই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র ও এক-চেটিয়া-বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করবে, গেরিলা-যুদ্ধ চালাবে। দীর্ঘস্থায়ী, সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধই হবে এই সংগ্রামের প্রধান রূপ। এই পার্টি-চিঠিতে লেখা হয়েছিল :

এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে "মাঝারী কৃষক হবে বিপ্লবের সহযোগী। তারা সংগ্রামে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করবে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনী কৃষকদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই তাদের নিরপেক্ষ করে রাখা সম্ভব। কিন্তু তেলেঙ্গানা, রয়ালসীমা প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, সে সব অঞ্চলে ধনী-কৃষকরা অস্থিরচিত্ত হলেও তাদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনা সম্ভব।"

ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তর হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, আর রাশিয়ার বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই পার্থক্য দেখিয়ে অন্ধ্রের পার্টি-চিঠির উপ-সংহারে ভারতবর্ষের বিপ্লব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয় :

"বিভিন্ন দিক থেকে ভারতের বিপ্লব আর রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কেবল সাধারণ ধর্মঘট আর শহরের জনসাধারণের অভ্যুত্থানের মারফত (সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ থেকে) গ্রামাঞ্চলের মুক্তি আসবে না, কৃষক-বিপ্লবের আকারে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে চলবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধ। সেই প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে।"

এছাড়া অন্ধ্র পার্টি তাঁদের এই চিঠিতে ভারতের অন্ধ্র, মারাঠী, কানাড়ী প্রভৃতি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিও তুলেছিলেন, আর এর সঙ্গে মাও সে-তুঙের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক আদর্শ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের তাৎপর্য

তেলেঙ্গানা আজ পর্যন্ত ভারতের সমগ্র ইতিহাসে, বিশেষতঃ বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে, সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং চিরস্মরণীয়, অমর নাম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড় বড় মিল-মালিক আর সামন্ত-জমিদারগোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সবেমাত্র শাসন-ভার হাতে পেয়ে দিল্লীর গদিতে জেঁকে বসেছিল। ঠিক তখনই হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানার কৃষকগণ বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ভারতের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ নিজামশাহীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, আরম্ভ করেছিল ভারতের কৃষি-বিপ্লবের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। নিজাম আর নেহেরু-প্যাটেলের সমগ্র

সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা তার সংগ্রাম চালিয়েছিল হিমালয়ের মত অটল দৃঢ়তা নিয়ে। কৃষকের, শ্রমজীবী জনসাধারণের জাগ্রত সংগ্রাম-শক্তি যে অদম্য, অনিবার্য তা সেদিন প্রমাণ করেছিল তেলেঙ্গানা।

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন নূতন রূপে দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দেশীয় রাজ্যগুলির আন্দোলন ছিল কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন। সে সময় এ আন্দোলনের দাবি ছিল—(১) দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা; (২) বেগার প্রথার অবসান; (৩) বিভিন্ন প্রকারের সামন্ততান্ত্রিক কর আদায়ের অবসান। প্রায় সব রাজ্যে তখন কংগ্রেসের নামে জাতীয় বুর্জোয়ারাই তাদের স্বার্থে এই আন্দোলন চালিয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সংগ্রাম সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখনও এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম। এর মধ্যেও আবার হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ আর মহারাষ্ট্রের কৃষক সংগ্রাম সবচেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে গভীর আর সবচেয়ে জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল।

ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে এই কৃষক সংগ্রাম সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। কেবল হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানাতেই এই কৃষক সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের আকারে দেখা দিয়েছিল। তেলেঙ্গানার এই কৃষক বিপ্লবের ধ্বনি ছিল—(১) হায়দরাবাদের রাজা নিজামের শাসনের অবসান; (২) সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান; (৩) কৃষকের হাতে জমি; (৪) মাদ্রাজের তেলেগু বা অন্ধ্র ভাষা-ভাষী অঞ্চল আর তেলেঙ্গানাকে নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য গঠন—বিশাল অন্ধ্রের সৃষ্টি।

তেলেঙ্গানার কৃষকদের এই সশস্ত্র বিপ্লবকে দমন করার জন্য নিজাম তার বিরাট সৈন্যবাহিনী (প্রায় ২০ হাজার), আর 'রাজাকার' নামে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী নিযুক্ত করেছিল। বিদ্রোহী কৃষকেরাও আত্মরক্ষার জন্য 'আত্মরক্ষাবাহিনী' আর গেরিলা যুদ্ধের জন্য 'গেরিলা-বাহিনী' গঠন করল। তারা প্রতি গ্রামে গ্রাম-কমিটি গঠন করল। এই গ্রাম-কমিটির নাম হল 'পঞ্চায়েত'। যে সব গ্রাম নিজামের শাসন থেকে মুক্ত করা হল, সেই সব গ্রামের শাসন-ভার দেওয়া হল এই সব গ্রাম-কমিটির হাতে। মুক্ত অঞ্চলের জমিদারদের সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে গরীব কৃষক আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করা হল। এইভাবে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করল এবং ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদের নিজামশাহীর অবসান করবার সংগ্রামে পরিণত হল।

এই সংগ্রামের একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, এই সংগ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সকল স্তরের কৃষকের ঐক্য। প্রথমে ধনী কৃষক থেকে ক্ষেত-মজুর পর্যন্ত সমস্ত কৃষকই সংগ্রামে যোগদান করেছিল। কিন্তু সংগ্রাম যতই সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হতে থাকে ততই ধনী কৃষকের দল দূরে সরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারা এমন কি ক্ষেত-মজুরদের দাবি মেনে নিতেও

অস্বীকার করে। তার ফলে ক্রমশ গরীব কৃষক, ক্ষেত-মজুর আর জমিহারা কৃষকরাই এই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিদ্রোহের ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ৩০০ গ্রাম মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। এই সময় পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত 'অন্ধ্র-মহাসভা'ই এই সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। এই সময় 'অন্ধ্র-মহাসভা'র সভ্যসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। নিজাম সরকারের সৈন্যবাহিনী আর রাজাকার গুণ্ডাদলের মিলিত বাহিনী বিদ্রোহী কৃষকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে লাগল। তারা চাষীদের অন্তত এককোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিল, ২৫ খানি গ্রাম আগুনে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করেছিল, আর প্রায় ১০ হাজার ঘর ভেঙে ধূলিসাৎ করেছিল। কেবল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তারা হত্যা করেছিল মোট ৫০০০ কৃষক। তাদের আক্রমণে প্রায় ১৫ হাজার কৃষক আহত হয়েছিল, আর নিজামের জেলখানায় বন্দী হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সংগ্রাম চলেছিল পূর্ণোদ্যমে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গোটা হায়দরাবাদ রাজ্যের ৬ ভাগের এক ভাগে, অর্থাৎ তেলেঙ্গানার ৪ ভাগের ৩ ভাগ স্থানের আড়াই হাজার গ্রামে নিজামের শাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজামের শাসনমুক্ত এই বিশাল অঞ্চল পরিণত হয়েছিল ক্ষেতমজুর আর কৃষকের শাসনাধীন বিশাল এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই বিশাল মুক্ত অঞ্চলে জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত করা জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ বিঘা। এই বিপুল পরিমাণ জমি তেলেঙ্গানার মুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত-মজুর, গরীব আর মধ্যস্তরের কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। মুক্ত অঞ্চলের আড়াই হাজার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনসাধারণের সরকার আর গণ-আদালত 'পঞ্চায়েত'। এই মুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষের কিছু বেশী। মুক্ত অঞ্চলের গণ-সরকার কৃষকদের সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিল। কৃষক জনসাধারণকে বিপ্লবী রাজনীতি শেখবার জন্য বহু বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছিল, আর কৃষক যুবকদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল এক বিরাট সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনীর কাজ ছিল শান্তির সময় কৃষির কাজ করা আর নিজামের সৈন্যরা আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম কেবল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্যই চালিত হয়নি, সে সংগ্রাম কেবল কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বিলি করেই ক্ষান্ত হয়নি। তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম করেছিল হায়দরাবাদের বুক থেকে নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করতে, আর হায়দরাবাদের তেলেগু, মারাঠী ও কানাড়ী জাতীয় কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারীদের মিলিত করতে। তেলেগু, মারাঠী আর কানাড়ী জাতীয় কৃষকদের নিজামী শোষণ থেকে মুক্ত করে তাদের নিয়ে বিশাল অন্ধ্র, বিশাল মহারাষ্ট্র আর বিশাল কানাড়া রাজ্য গঠনের পথ প্রস্তুত করাও ছিল তেলেঙ্গানা-বিপ্লবের আর এক উদ্দেশ্য।

তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম কেবল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি হায়দরাবাদের নিজামশাহী আর তার পৃষ্ঠপোষক নেহেরু-প্যাটেলের ভারত সরকারের উপরেই আঘাত করেনি, তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামকে ব্রিটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিন তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষক ভারতবর্ষকে এক নূতন শিকলে বাঁধবার জন্য ব্রিটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর তেলেঙ্গানা বিপ্লবকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য আর ভারতবর্ষকে নূতন দাসত্বের শিকলে বাঁধবার জন্য ব্রিটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামের মুরুব্বি সেজেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামকে ঋণ দিয়েছিল ৭৮ কোটি টাকা (৬ কোটি পাউণ্ড) আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামের জন্য তৈরি করে দিয়েছিল তিনটি বড় অস্ত্র-কারখানা। বহু মার্কিন পরামর্শদাতাও এসে জুটেছিল হায়দরাবাদে। এই অর্থ আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে একলক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল নিজাম। এই সৈন্যবাহিনী দিয়ে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ধ্বংস করা আর হায়দরাবাদে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলাই ছিল নিজামের উদ্দেশ্য। তাই সেদিন ব্রিটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা হায়দরাবাদের স্বাধীন থাকার দাবি সমর্থন করেছিল। তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামের আঘাতে এই শয়তানী পরিকল্পনা সেদিন বানচাল হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার এক লোক-দেখানো ভূমি-সংস্কার আরম্ভ করেছিল। বাইরের দিক থেকে এই ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী প্রথার অবসান করা। কিন্তু আসলে এই ভূমি-সংস্কারের ফলে জমিদারদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই নামমাত্র ভূমি-সংস্কার চালু করা হয়েছিল কেবল মাদ্রাজে। সুতরাং সব রাজ্যেই জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম জোরের সঙ্গে চলতে থাকে। তেলেঙ্গানার পরেই এই আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে।

অন্ধ্রের চাষী আর তেলেঙ্গানার চাষী এক ভাষাভাষী আর একে অন্যের জাতভাই। কাজেই তেলেঙ্গানার চাষীদের সংগ্রাম অন্ধ্রের চাষীদের সংগ্রামের উৎসাহ যুগিয়েছিল। তাই মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকার নেহরু-প্যাটেলের কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম ধ্বংস করবার জন্য অনুরোধ জানাল। কেন্দ্রীয় সরকারও বুঝেছিল যে তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামের আগুন অবিলম্বে নিভিয়ে ফেলতে না পারলে এ আগুন ছড়িয়ে পড়বে অন্ধ্রে, মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে, উড়িষ্যায়—ভারতের সর্বত্র। সুতরাং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে নেহেরু-প্যাটেলের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিজামকে দমনের অজুহাত নিয়ে প্রবেশ করল হায়দরাবাদে—তেলেঙ্গানায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী যখন হায়দরাবাদের সমস্ত অঞ্চল, এমনকি তেলেঙ্গানাও দখল করল, তখনও কৃষকদের গেরিলা-বাহিনী তেলেঙ্গানায় পূর্ণোদ্যমে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডা-বাহিনীর বিরুদ্ধে।

নেহেরু-প্যাটেল আর নিজামের মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনীও তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে পিষে মারতে পারেনি। তেলেঙ্গানার কৃষকদের এই নূতন সংগ্রাম, সামন্ত-

প্রথা-বিরোধী বিপ্লব তখন কমিউনিস্ট পার্টি মুলতুবি রেখেছিল, অর্থাৎ ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্য এই সংগ্রামকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। কারণ, ভারতের কংগ্রেস শাসন কিছুটা স্থিতি হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকার দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করে। কমিউনিস্ট পার্টি এই সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে একটি আবেদন প্রচার করলেন। এই আবেদন অনুসারে তেলেঙ্গানার কৃষকদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের সশস্ত্র সংগ্রাম—ভারতের প্রথম সামন্ততন্ত্র-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বন্ধ হল।

সেদিন তেলেঙ্গানার সংগ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে—সংগ্রামী জনসাধারণের মধ্যে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল: চীন-বিপ্লবের পথ না আপসের পথ; তেলেঙ্গানার পথ না বুর্জোয়া নির্বাচনের পথ; অর্থাৎ বিপ্লবের পথ, না একচেটিয়া বড় বুর্জোয়া আর জমিদারগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত আইনসভায় যোগদানের পথ—কোন পথে হবে শোষণ-উৎপীড়ন থেকে ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি, আসবে জনগণতন্ত্র, আসবে সমাজতন্ত্র।

বিপ্লব যত এগিয়ে যায়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও ততই সঙ্ঘবদ্ধ হয়, নূতন নূতন কৌশলে বিপ্লবকে বিপথে নিয়ে গিয়ে তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে। তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম দেখে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীও এই সংগ্রামকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য এক নূতন কৌশল বের করেছিল। এর জন্য তারা নিযুক্ত করেছিল ভারতের শ্রমিক-কৃষকের চরম শত্রু গান্ধীর এক প্রধান শিষ্য, বিনোবা ভাবে নামক এক ব্যক্তিকে। বিনোবা ভাবে কৃষি-বিপ্লবের পাল্টা পথ হিসাবে প্রবর্তন করলেন 'ভূদান-যজ্ঞ' বা 'ভূদান-আন্দোলন'। হায়দরাবাদ থেকেই এ আন্দোলনের প্রথম আরম্ভ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা যখন তেলেঙ্গানা বিপ্লবের অবসান ঘটান হল, তার পরেই হায়দরাবাদে এসে দেখা দিলেন গান্ধীর শিষ্য বিনোবা। হায়দরাবাদেই তিনি তাঁর ভূদান-আন্দোলন প্রথম আরম্ভ করলেন। এ এক মজার আন্দোলন। ভূমিহীন কৃষকদের জমির জন্য সংগ্রামে বাধা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

বিনোবার এই আন্দোলনের মূল কথা—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা বজায় থাক, কিন্তু জমিদারগোষ্ঠী কিছু কিছু জমি দান করুক। সেই জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিলে তারা আর সংগ্রামের পথে পা বাড়াবে না, তার ফলে তেলেঙ্গানার মতো জমিদারী প্রথার কোন ক্ষতিও হবে না। বিনোবা কৃষকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গান্ধীর অহিংসা আর শান্তিনীতি দ্বারাই ভারতের ভূমি-সমস্যার সমাধান হবে, অথচ জমিদারী প্রথাও বজায় থাকবে। এই ভূদান-আন্দোলন হায়দরাবাদ থেকে আরম্ভ করার একমাত্র কারণ ছিল হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানায়ই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম চরম আকার ধারণ

করেছিল, আর সেই সংগ্রাম ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছিল।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল হায়দরাবাদের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রমিকশ্রেণীই ছিল এই সংগ্রামের প্রধান চালক শক্তি। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম একই সঙ্গে জমি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম—ভারতের জনসাধারণের, কৃষকের আদর্শ সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামই ভারতে জনগণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম প্রয়াস। সত্য বটে, এই সংগ্রাম সমগ্র ভারতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তেলেঙ্গানার গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সত্য বটে, জনগণতন্ত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই সংগ্রামের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেনি, কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তেলেঙ্গানাই ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম আহ্বান জানিয়েছে, প্রথম পথ দেখিয়েছে। তেলেঙ্গানা ভারতের কৃষি-বিপ্লব আর তার সংগ্রামের অগ্রদূত। এখান থেকেই ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরম্ভ, তার প্রথম পদক্ষেপ। তাই তেলেঙ্গানা সংগ্রাম ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ধ্রুবতারার মত তা ম্লান হবে না কোনদিন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কাকদ্বীপ-সোনারপুর-ভাঙড়ের কৃষক সংগ্রাম (১৯৪৬-৪৮)

মুখবন্ধ

আধুনিক ভারতের আগুনের অক্ষরে লেখা তিনটি নাম তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ আর ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চল। তিনটি যেন আগুনের পাহাড়। তিনটিই একদিন আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল সারা ভারতে, ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সারা ভারতের সামন্ত-রাজ-জমিদার-জোতদারদের, আর তাদের রক্ষক শাসকগোষ্ঠীর। আজও এই তিনটি নাম শুনে সামন্তরাজ-মহারাজ আর জোতদারদের দল প্রাণের ভয়ে কেঁপে ওঠে, আর সংগ্রামের উল্লাসে মেতে ওঠে শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণ। ভারতের সংগ্রামী কৃষকের বুক গর্বে ফুলে ওঠে, আর তারা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নেয়।

নকসালবাড়ী আর সোনারপুর চলতি কালের (১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) আর দুটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। প্রাচীন হলেও, একদিন বাইরের মানুষ কমই জানত, নকসালবাড়ীর নাম। এ যেন এক আগুনের পাহাড়। মনে হয় এরা এতদিন ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ যেন জেগে উঠে সংগ্রামের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল চারিদিকে। তার সেই আগুনের তাপ লেগে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সারা ভারতের জোতদার-জমিদারের দল আর তাদের রক্ষক ছোট-বড় সব মন্ত্রী-মশাইরা, আইনসভা, পার্লামেন্ট, এমনকি রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপাল পর্যন্ত, অর্থাৎ সারা ভারতের শোষক আর শাসকগোষ্ঠী।

সোনারপুর-নকসালবাড়ী, বাঙলার তথা ভারতের সবকটা রাজনৈতিক দলের মুখোশ খুলে দিয়েছে, তাদের সব নকশা ফাঁস করেছে। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সবকটা রাজনৈতিক দল উন্মাদ হয়ে উঠেছিল ধনিক-জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে তৈরি করা "আইন আর শৃঙ্খলা" রক্ষার নাম ক'রে সোনারপুর আর নকসালবাড়ীর কৃষকের সংগ্রাম-শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য, তাদের উপর পুলিস আর মিলিটারীকে লেলিয়ে দেবার জন্য। প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জোতদারদের হাতে কৃষক উচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার দান। জোতদারগোষ্ঠীর এই চিরকালের অধিকার অব্যাহত রাখার জন্যই কৃষকের সংগ্রাম-শক্তিকে চূর্ণ করা প্রয়োজন হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই তারা হত্যা করেছিল কৃষকদের মেয়ে আর শিশুদের, নেতাদের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বের করেছিল, আর তাদের জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দেবার জন্য মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। নানা দলের, নানা মতের 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার সেদিন জোতদারগোষ্ঠীর স্বার্থে তাদের মনের মত ভূমি-সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের অত্যাচার ধনিক-জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থে রচিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বিধান রায়ের কংগ্রেসী সরকারকেও নিষ্ঠুরতায় হার মানিয়েছিল।

এখনও সেদিনের সেই সংগ্রামের নামে জেগে উঠছে রণক্লান্ত, হতাশায় ভেঙ্গে-পড়া শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রাম করছে ছাটাই বন্ধ আর মজুরি বৃদ্ধির জন্য, বর্গাদার-চাষী জোতদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে—উচ্ছেদ বন্ধের জন্য, আর কৃষি-মজুর সংগ্রাম করছে মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে। সেদিনের সংগ্রামের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা তথা ভারতের আকাশে-বাতাসে।

সংক্ষেপে, সেদিনের সংগ্রাম ছিল শাসক আর শোষকগোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে কৃষকদের বৈপ্লবিক প্রতিরোধ—জমি আর জীবিকার জন্য কৃষকদের জঙ্গী সংগ্রাম।

এ সংগ্রাম শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের এক উন্নত জঙ্গীরূপ। আজ অনেকের কাছে এ সংগ্রাম আকস্মিক মনে হলেও, এ সংগ্রাম আমাদের দেশে কোন নূতন ঘটনা নয়। সারা উনিশ শতক ধরে এ সংগ্রাম চলেছে সারা বাংলাদেশে—ভারতের দিকে দিকে। এ যুগের এ সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ সংগ্রাম করেছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ-দিনাজপুরের সাঁওতাল কৃষক, এ সংগ্রাম করেছিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার রিয়াং চাষীরা। আর 'তেভাগার' জন্য সারা বাংলাদেশের কৃষক এই জঙ্গী সংগ্রামের দ্বারা জোতদারী-জমিদারী ভূমি-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করবার প্রয়াস পেয়েছিল।

বাংলাদেশময় সেই তেভাগার সংগ্রামের প্রথম সারিতে স্থান নিয়েছিল ময়মনসিংহের হাজং চাষী, উত্তর বাংলার মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর, রংপুর-জলপাইগুড়ি জেলা, আর দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ, সোনারপুর ও ভাঙরের লক্ষ লক্ষ বর্গাচাষী ও ক্ষেতমজুর। একটানা পাঁচ বৎসর (১৯৪৬—১৯৫০) কাল চলেছিল এই রক্তঝরা সংগ্রাম। সেদিন লক্ষ লক্ষ চাষীর রণ-হুংকারে সারা বাংলার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছিল, কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী আর জমিদার-জোতদারদের নাভিশ্বাস উঠেছিল, কৃষকদের রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল।

সেই সব জঙ্গী সংগ্রাম থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে উঠেছে আজকের দিনের সংগ্রাম। তাই বলা যায়, আজকের দিনের সংগ্রামের মূল নিহিত ১৯৪৬-৫০ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রামের মধ্যে—দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ-সোনারপুর-ভাঙড়ের সংগ্রামের মধ্যে, ময়মনসিংহের হাজং সংগ্রামের মধ্যে, উত্তর বাংলার তেভাগা সংগ্রামের মধ্যে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সংগ্রামের ধারা ছিল অব্যাহত। দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ-সোনারপুর-ভাঙর আজ রণক্লান্ত, স্তব্ধ। আজ আবার সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে হবে কাকদ্বীপ-সোনারপুর-ভাঙড়ের চাষীকে।

আজকের সংগ্রামকে বুঝতে হলে, সেদিনের সংগ্রামকে আজ আবার স্মরণ করতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাই আমাদের আলোচনা সেদিনের দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ আর সোনারপুর-ভাঙড়ের সংগ্রাম নিয়ে। কাকদ্বীপের 'লালগঞ্জ' (লয়ালগঞ্জ) দক্ষিণ বাংলার প্রথম ও সর্বপ্রধান রণক্ষেত্র। তাই লালগঞ্জের লাল কাহিনী সবার আগে শোনা দরকার।

কাকদ্বীপের অতীত ইতিহাস

কাকদ্বীপ দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবনেরই একটি বিশেষ অংশ। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বিশেষ কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত সুন্দরবনে ও কাকদ্বীপে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি। সুন্দরবন ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। শাসকগোষ্ঠী এই জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবনকে তুলে দিয়েছিল দেশী ও বিদেশী শোষকগোষ্ঠীর হাতে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নামমাত্র খাজনায় সুন্দরবনে বিরাট বিরাট অঞ্চল পঞ্চাশ, ষাট বা একশো বছরের জন্য ধনী ব্যক্তিদের হাতে তাদের অবাধ শোষণের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। এমন কি, প্রথম দিকে তাদের এক পয়সাও কর দিতে হত না।

এইভাবে শোষকগোষ্ঠী এসে সুন্দরবনে জেঁকে বসল। এদের নাম হল 'লাটদার'। এবার লাটদারেরা যাতে লোকজন সংগ্রহ করে দ্বীপের জঙ্গল কেটে চাষবাস আরম্ভ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও ইংরেজরা করে দিল। ইংরেজ শাসকদের হুকুমে মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগনার জমিদাররা হাজার হাজার চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করল। তারা যখন অপরের জমিতে খেটেও পেটের অন্ন যোগাড় করতে পারত না, তখন লাটদার আর ইংরেজ শাসকদের দালালরা গিয়ে তাদের সুন্দরবনের—কাকদ্বীপের জমির সন্ধান দিল। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া হাজার হাজার মানুষ প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ছুটে এল সুন্দরবনে। লাটদারেরাই হল চাষীর মহাজন। তাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, তারা সাপ, বাঘ আর কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে, শয়ে শয়ে প্রাণ দিয়ে সুন্দরবন আর কাকদ্বীপের মাটিকে সুন্দর করে তুলল। সেই সুন্দর মাটিতে ফলতে লাগল রাশি রাশি সোনার ধান।

আবার সেই সোনার ধানে বর্গী নামল, লাটদারেরা লাটের মূর্তি ধরল। প্রথমে, জঙ্গল কাটার আগে, তারা চাষীদের কথা দিয়েছিল, তারা চাষীদের নামে জমির স্বত্ব লিখে দেবে। জঙ্গল কাটার পর চাষবাস আরম্ভ হল. পাঁচ বছর কেটে গেল, তবু কোন চাষীকেই তারা জমির স্বত্ব দিল না। উপরন্তু এই পাঁচ বছরে তারা অধিকাংশ চাষীর নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে, মিথ্যা দেনার বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাদের বাস্তুভিটে পর্যন্ত লাটের খাস বলে ঘোষণা করল। এই সব চাষীদের অনেকে ভাগে জমি পেল। তারা হল ভাগচাষী। আর বাকি সকলে অন্যের জমিতে দিন-মজুরি করে কোন প্রকারে বেঁচে রইল। তারা হল ক্ষেত-মজুর।

এবার লাটদারেরা তাদের নায়েব, ম্যানেজার আর গোমস্তাদের মারফত ভাগের জমি নিয়ে জুয়াখেলা শুরু করল। এক বিঘা জমি ভাগে পেতে হলে ভাগচাষীদের সেলামী দিতে হত ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত। চাষীরা সর্বস্ব খুইয়েও ভাগে জমি পাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে জমির চাহিদা বেশী হওয়ায় পশুরা চাষীদের যুবতী মেয়ে আর স্ত্রীকেও সেলামী হিসাবে দাবি করল। দু-চার রাত্রি মেয়ে আর বৌকে কাছারীতে নায়েব-ম্যানেজারদের কাছে পাঠালে চার-পাঁচ বিঘা জমি ভাগে পাওয়া যায়। সর্বহারা চাষী তাতেও রাজী হল। এইভাবে সুন্দরবনের কাকদ্বীপের

মানুষ জমি হারাল, মনুষ্যত্ব হারাল। নায়েব-ম্যানেজারদের হাত থেকে নিজেদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য কত মা-বোনেরা যে আত্মহত্যা করল, কত স্বামী যে ইজ্জত হারানোর ভয়ে নিজের হাতে সুন্দরী স্ত্রীকে কেটে ফেলল তার হিসাব করা কঠিন।

এত অত্যাচার-অনাচার মানুষ বেশী দিন মুখ বুজে সইতে পারে না, কাকদ্বীপের মানুষও সইল না। তারা মরিয়া হয়ে বহু লাটদার, নায়েব, আর ম্যানেজার-গোমস্তাকে খুন করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। তার জন্য ইংরেজের আইনে তাদের হল ফাঁসী বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তখনও কাকদ্বীপের চাষীরা দল বাঁধতে শেখেনি, দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহ করতে শেখেনি।

বহু সংখ্যায় খুন-জখম হতে দেখে লাটদারেরা চাষীদের দাবিয়ে রাখার জন্য এক নূতন মতলব আঁটল। তাদের আরও সহকারী চাই। তাই তারা মোড়ল শ্রেণীর কিছু চাষীকে ডেকে কিছু জমি দিল, কিছু সুযোগ-সুবিধাও দিল। তাদের কাছারীতে বসিয়ে নিজেদের জাতে তুলে নিল। এইভাবে সৃষ্টি হল নূতন একটি পরগাছা-দালালের দল। এদের নাম হল 'চকদার', 'গাতিদার', 'জোতদার', 'মহাজন' আর 'ধনী চাষী'। এরা সামনে থেকে লাটদারদের শোষণ-অত্যাচারকে পাহারা দিতে লাগল, এরা হল লাটদারদের বিশ্বস্ত ভৃত্য। এবার লাটদাররা এদের সাহায্যে সুন্দরবনের কাকদ্বীপের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে রাখল। আর সঙ্গে চলল বহু রকমের বাজে আদায়—লাটদার আর তাদের নায়েব-ম্যানেজারদের মেয়ের বিয়ের আর ছেলে হওয়ার কর (খাজনা বা নজর), আরও কত কি।

এরই মাঝে এল এক ভয়ঙ্কর বন্যা। এই বন্যায় কাকদ্বীপ থানার বুধাখালি, নয়ালগঞ্জ, সিপ্লাট ও চন্দনপিঁড়ি ভেসে গেল। বন্যার পর এল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচবার জন্য চাষীদের টাকা চাই। তাদের ঋণ দিতে শকুনের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মহাজনরা এসে জমল কাকদ্বীপে। যে চাষী টিপসই দিয়ে ঋণ নিয়েছে সে আর কোনদিন মহাজনের হাত থেকে অব্যাহতি পেল না।

চন্দনপিঁড়ির শয়তান তুল্য বসন্ত মণ্ডল এক মন এক সের খেসারি দিয়ে ৫ মন ধানের দলিল লিখিয়ে নিল চন্দনপিঁড়ি, নয়ালগঞ্জ, প্রভৃতি এলাকার চাষীদের কাছ থেকে। কেউ বা ১০ টাকা ধার দিয়ে ১০০ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিল। অনেক চাষীকে মাত্র তিনখানা কাপড়ের বদলে ৫ থেকে ৭ বিঘা জমির কবালা লিখে দিতে হল। শেষে এই 'হ্যাণ্ডনোট' আর কবালারও কোন মূল্য রইল না। চাষীরা নিজেদের হাটে-বাজারে বিক্রয় করতে লাগল। চাষী হল ক্রীতদাস। অনেক চাষী দুই-এক মন ধানের জন্য এক বছর বা দেড় বছরের জন্য ক্রীতদাস হল। এদের বলা হত 'মালদার'। তেমনি এক মন ধানের বিনিময়ে অনেক দুর্ভাগা মা রাত্রির পর রাত্রি দেহ দিয়ে পশুদের লালসা মিটিয়ে সন্তানদের বাঁচাবার চেষ্টা করল। নামজাদা ব্যারিস্টার লাটদার দিন্দা সেন, শাসমল, মহারাজ শ্রীশ নন্দী, শ্রীনাথ কর, গোপী গিরি, অন্নদা দাস, বারিক সামন্ত, বসন্ত মণ্ডল, সতীশ অগস্তি প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ বিঘা

জমির মালিক লাটদার শয়তানেরা এইভাবে কাকদ্বীপে চাষীর রক্ত নিংড়ে এক 'রামরাজ্য' গড়ে তুলল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের তেভাগার সংগ্রাম

দুর্ভিক্ষের সময় চাষীদের রিলিফ দিতে কাকদ্বীপে এসেছিলেন কংসারি হালদার প্রভৃতি কমিউনিস্ট কর্মীরা। তাঁরা বললেন, ভয়ংকর শোষণ, উৎপীড়ন আর দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচতে হলে, শোষক আর শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে—লড়তে হবে জমির জন্য, জীবনের জন্য। প্রয়োজন হলে, একত্র হয়ে অস্ত্র হাতে নিতে হবে। চাষীরা মনপ্রাণ দিয়ে তাদের ডাক শুনল, তাতে সাড়া দিল। সকল চাষী কৃষক সমিতির সভ্য হয়ে গেল। কাকদ্বীপের সকল চাষী মিলে একত্র হয়ে সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করল। তারা আওয়াজ তুলল, ফসলের দু'ভাগের বদলে তিন ভাগ চাই—জমির মালিক জোতদার পাবে ফসলের এক ভাগ, আর বর্গাচাষী পাবে ফসলের তিন ভাগ। ক্ষেতমজুরের দাবি মজুরি বৃদ্ধি। জোতদারগোষ্ঠী বাধা দিল, চাষীদের তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে গেল।

চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী হল ক্ষেত-মজুর। তারাই হল এ সংগ্রামের প্রকৃত নেতা। হাজার হাজার চাষী লাঠি আর কাস্তে নিয়ে মাঠে নামল, ক্ষেতের সব ধান কেটে খামারে নিয়ে এল। প্রথমে সংগ্রামের ধ্বনি ছিল 'তেভাগা'—ফসলের তিন ভাগ। কিন্তু ভাগচাষীরা লাঠির জোরে পুরো ফসল আদায় করে নিল। ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বেড়ে গেল প্রায় ডবল। বর্গাচাষী আর ক্ষেত-মজুরদের আনন্দের কোলাহলের সিংহ গর্জনে শোষকদের বুক কেঁপে উঠল। এতকালে শোষক-উৎপীড়ক জোতদার-গোষ্ঠী আর লাটদাররা অনেকে লাট ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আর চাষীরা সমস্ত জমিজমা দখল করে ফেলল। লড়াই করে জমি দখল করা, লাটদার-জোতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেওয়া বাস্তবে পরিণত হল। নয়ালগঞ্জ আর বুধাখালিতে ক্ষেত-মজুররা লাঠির জোরে জমি দখল করে, তাতে তাদের বাসের ঘর তৈরি করল, চাষের জমি বানাল। যাদের জমি ছিল না, সংগ্রাম-কমিটি তাদেরও জমি ভাগ করে দিল। এইভাবে ক্ষেত-মজুরদের প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হল। ভাগচাষীরা লাঠির জোরে বছর বছর বর্গাদার উচ্ছেদের প্রথা বন্ধ করে জমি নিজেদের দখলে রাখল। এখন থেকেই নয়ালগঞ্জের নাম পাল্টে রাখা হল 'লালগঞ্জ।'

প্রতিরোধ সংগ্রাম

তখনও ইংরেজ ভারত ছাড়েনি, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আর জজ সাহেবরাই ছিল চাষীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কাজেই সমস্ত কাকদ্বীপের লাটদার আর জোতদারের দল গিয়ে তাদের বাঁচাবার জন্য ইংরেজ শাসকদের পায়ে মাথা কুটতে লাগল। সংগ্রামের চেহারা দেখে শাসকদেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। শাসকদের নির্দেশে বিরাট এক সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এসে কাকদ্বীপ ছেয়ে ফেলল। লালগঞ্জ, চন্দনপিঁড়ি,

রাজনগর, বুধাখালি এবং আরও অনেক স্থানে সশস্ত্র পুলিসের ক্যাম্প করা হল। লালগঞ্জের ক্যাম্পে বসান হল রেডিও।

এবার গ্রামগুলির উপর পুলিসের অত্যাচার আরম্ভ হল। এক সঙ্গে ৫০।৬০ জন রাইফেল-ধারী পুলিস এক-একটি গ্রামে ঢুকে চাষীদের বাড়িঘর ভেঙে তচনচ করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। তারা চাষীদের টাকা-পয়সা নিয়ে গেল, এমন কি ছেঁড়া কাঁথা পর্যন্ত লুট করে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিল। ৮৯।৯০ বছরের বুড়োদের পর্যন্ত কাছারীতে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রাখল। যুবকদের মেরে সঙ্গীনের ঘায়ে চোখ আর দাঁত উপড়ে ফেলা হতে লাগল। ঘরে ঢুকে মেয়েদের উপর দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচার করে তাদের অজ্ঞান করে ফেলে রাখা হল। তাদের অত্যাচার থেকে এমনকি বুড়ো আর মেয়েরাও বাদ গেল না। লালগঞ্জের গিরিশ মণ্ডলের ছয় মাসের শিশুকে মায়ের কোল থেকে টেনে নিয়ে আছাড় মারল পুলিস পশুরা। ১৬ জন চাষী পুলিসের গুলিতে নিহত হল, আর পাঁচশো চাষীকে জেলে পোরা হল।

ইংরেজ সরকার ভেবেছিল চাষীদের এই নবজাগরণ বন্দুক দিয়ে স্তব্ধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হল না। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জে উঠল লালগঞ্জের—সারা কাকদ্বীপের মানুষ, মেয়ে-পুরুষ, শিশু সকলে। তারা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, তাদের নূতন পাওয়া জমি, ঘর-বাড়ী আর মেয়েদের ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে পুলিসের এই আক্রমণ রুখতে হবে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তার জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন।

সংগঠন তৈরী হল, প্রতি পাড়ায়, প্রতি গ্রামে সবল সক্ষম যুবক-যুবতীদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সশস্ত্র দল গড়া হল। বৃদ্ধদেরও কাজ দেওয়া হল। প্রতি গ্রামের কয়েক জনকে দেওয়া হল পাহারার কাজ। তারা গ্রামের প্রবেশ-পথে লুকিয়ে থেকে পুলিসদল গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শিঙ্গা বাজিয়ে বা অন্য সংকেত করে গ্রামবাসী-দের জানিয়ে দিত। সেই সংকেত শোনামাত্র হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ দৌড়ে এসে পুলিসদলকে ঘিরে ফেলত, তাদের বাধা দিত, বন্দীদের ছিনিয়ে নিত। পুলিসের বন্দুকের সঙ্গে লড়তে হলে কেবল লাঠিতে চলে না। তার জন্য চাই দূরপাল্লার অস্ত্র। সুতরাং, হাজার হাজার তীর-ধনুক তৈরী হল, সকলকে তীর ছোঁড়া শেখানো হল। এর সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল চাষীদের মনোবল আর সংগ্রামের সংকল্প। সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগল, আত্মরক্ষা থেকে চাষীদের পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ হল।

লালগঞ্জের হাজরাঘেরি কাছারী থেকে ম্যানেজার শচীন ঘোষ রাইফেল-ধারী পুলিসের পাহারায় ধান পাচার করছিল। চাষীদের ভলান্টিয়ার দল সংবাদ পেয়ে তাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করল। রণোন্মত্ত ভলান্টিয়ার-বাহিনী দেখে পুলিসের দল রাইফেল ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল। ইতিমধ্যে ধান বোটে তোলা হয়েছিল। প্রায় এক হাজার ক্ষেত-মজুর আর ভাগচাষী বোট থেকে নায়েব-ম্যানেজারকে দিয়ে বইয়ে সেই ধান আবার কাছারীতে ফেরত আনল।

সেই সময় পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এ অঞ্চলের চারু ভাণ্ডারী। তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্রও এই কাকদ্বীপ। বহুদিন থেকেই এই গান্ধীবাদী 'তপস্বী' কৃষক-দরদী সেজে, এই অঞ্চলে আড্ডা গেড়ে ঘোরাফেরা করতেন। তাঁর সাকরেদ ছিল চারু ময়রা প্রভৃতি গুণ্ডা শ্রেণীর জোতদারগণ। এতদিনে চাষীদের উপর যে চরম শোষণ অত্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে চারু ভাণ্ডারী আর তার কংগ্রেস একটি কথাও বলেনি। তাঁর এক বুলি ছিল: "কংগ্রেসের হাতে শাসন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।" এবার চাষীদের উপর পুলিসের এই অত্যাচার আরম্ভ হলে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—

"ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুররা কংগ্রেসের অহিংসা-নীতি মানছে না। এ তাদের খুবই অন্যায়। সুতরাং তাদের উপর পুলিসের অত্যাচার তো হবেই। জমিদার-মহাজন পিতার তুল্য, তাদের সঙ্গে ঝগড়া নয়, মিলেমিশেই থাকতে হবে।"

অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে চাষীদের কিভাবে চলতে হবে, তা চারু ভাণ্ডারী মশাই আগে থেকেই বলে রাখলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইংরেজদের কাছ থেকে কংগ্রেস শাসন-ভার পেলে, একেই "ভারতের স্বাধীনতা" বলে প্রচার করল। ঐ দিন কংগ্রেসীরা সারা ভারতে উৎসব, খানাপিনা আর হৈ-হুল্লোরের জোয়ার বইয়ে দিল। আর অন্যদিকে ঐ দিন সারা কাকদ্বীপে চাষীরা লালঝাণ্ডা উড়িয়ে জমি আর বাঁচার লড়াই হাজারগুণ জোরদার করবার সংকল্প গ্রহণ করল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর শেষ হয়ে নভেম্বর পড়ল। কাঁচা-পাকা ধানে মাঠের নূতন রূপ খুলছে। কাকদ্বীপের প্রত্যেকটি মানুষের মন আর মুখের চেহারাও বদলে যাচ্ছে। চাষীদের মনে আর চেহারায় নূতন রং ধরেছে। অন্যদিকে চলেছে এক গোপন ষড়যন্ত্র—গোপনে কংগ্রেস সরকারের দারোগা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আসা-যাওয়া করছে, কাছারীগুলিতে গোপন পরামর্শ চলছে—চাষীরাও চুপ করে বসে নেই, তারাও প্রস্তুত হচ্ছে বড় রকমের লড়াইয়ের জন্য। চাষীরা বুঝতে পেরেছিল, ধান কাটার আগেই শুরু হবে সেই লড়াই।

৬ই নভেম্বর ভোরবেলা একসঙ্গে নয়খানা বোটে করে পাঁচশো সশস্ত্র পুলিস এসে নামল কাকদ্বীপে, আর সঙ্গে সঙ্গেই কাকদ্বীপের সব কটা সংগ্রাম-কেন্দ্রের উপর আক্রমণ করল। এবার ওরা মতলব করেছিল, প্রথমে চাষীদের মনোবল ভাঙতে হবে। তাই চাষীদের কুঁড়েঘরগুলোই হল এবার পশুদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। কুঁড়েঘরগুলো লুট করে সব কিছু ভেঙে তচনচ করে, তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতে লাগল। মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হল।

এদিকে পুলিস গ্রামে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সংকেত জানান হল। একসঙ্গে সব জায়গার শাঁখ বেজে উঠল। শত শত চাষী-যোদ্ধা লাঠি-বল্লম-ধনুক নিয়ে ছুটে এল শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য। মেয়েরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এল যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে। সমস্ত কাকদ্বীপে একই সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

লালগঞ্জের লাটদার গোপী গিরি মাথাপ্রতি দৈনিক ৫ টাকা দিয়ে চারশো লাঠিয়াল এনেছে, তারা ঢাল সড়কি নিয়ে তৈরি। কংগ্রেস বহু গুণ্ডা এনে এক সেবাদল তৈরি করেছিল, তারাও ১৫টা বন্দুক নিয়ে তৈরী। আর সশস্ত্র পুলিসের দল তো পেছনে আছেই।

৩০শে ডিসেম্বর থেকে ধান কেটে তারা নৌকা বোঝাই করবে। আর একদিকে মহারাজ শ্রীশ নন্দীর ম্যানেজার (হাজরাঘেরি লাটের) শচীন ঘোষ ৪০টা বন্দুক নিয়ে সাঁওতাল চাষীদের ধান লুট করবার জন্য এগিয়ে এল। এ সকল সংবাদই চাষী-যোদ্ধাদের জানা, সুতরাং তারাও তৈরী।

চাষী-যোদ্ধারাই আক্রমণ শুরু করল প্রথম। প্রায় ৫০০ চাষী-যোদ্ধা 'হাজরা-ঘেরি' কাছারীর পুলিস ক্যাম্প তিন ঘণ্টা ঘিরে রাখল, আর অন্যদিকে সাঁওতাল চাষীরা মাঠের ধান কেটে ঘরে তুলল। ৫০০ চাষী-যোদ্ধাদের উগ্র মূর্তি দেখে পুলিসের দল চুপ করে রইল। লাটদারের লাঠিয়াল আর কংগ্রেসের সেবাদল প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। সাঁওতাল চাষীরা লাটদার গোপী গিরির লাটের সব ধানই ঘরে তুলল। তেমনি অবস্থা হল লাটদার গোপী সামন্তের। ৭০০ বিঘা চকের একটা ধানও নেবার ক্ষমতা হল না তার।

লালগঞ্জ বা লয়ালগঞ্জ মৌজার একটি গ্রাম শিবরামপুর। জোতদার কাঙাল হালদার আর কুঞ্জ গাঁতা বন্দুকধারী সেবাদল আর লাঠিয়াল দারোয়ান নিয়ে জোর করে এক চাষীর ক্ষেতের ধান কেটে নিতে এল। চাষীরা তিন ভাই। তারা এবং আরও কয়েক জন লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া করল দস্যুদের। লাঠি আর তীরের ঘায়ে কাঙাল হালদার মাঠেই শয্যা নিল, আর সবাই পালিয়ে গেল। এমনি করে চলতে লাগল শত শত খণ্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বহু চাষী-বীর ধানের ক্ষেতে যুদ্ধ করে প্রাণ দিল, বহু চাষী-বীর পুলিস ঘেরা কাছারীতে দৈনিক অত্যাচারের ফলে নীরবে মৃত্যুবরণ করল।

বহু লাল ঝাণ্ডা নিয়ে চাষীদের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে লালগঞ্জে। পুলিস দল সেই শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করল। উভয় দলে জখম হল অনেক। অবশেষে পুলিস দল পালিয়ে গেল। এই খণ্ড যুদ্ধের পর অনিল আর তিন ভাই ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ ১৬ জন সশস্ত্র পুলিস এসে ঘিরে ফেলল তাদের। তাদের চিৎকার শুনে দৌড়ে এল ১০ জন চাষী-যোদ্ধা। তারা পথরোধ করে দাঁড়াল সশস্ত্র পুলিসদের, লাঠি আর বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। পুলিস আর বন্দুক তোলবারও সময় পেল না, তারা চাষীদের লাঠি আর বল্লমের ঘায়ে ধরাশায়ী হল। মুক্তি-যোদ্ধারা মুক্ত করে নিয়ে গেল বন্দীদের।

লালগঞ্জের মুক্ত অঞ্চল

লালগঞ্জের মুক্তি-যোদ্ধাদের মরণপণ-সংগ্রামে শত্রুপক্ষ স্তম্ভিত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। আপাতত লালগঞ্জে আর আক্রমণ করা সম্ভব নয় ভেবে পুলিস-ফৌজ কাকদ্বীপের অন্যান্য অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে লালগঞ্জ মৌজার

সবকয়টি লাটদারের কাছারী মুক্তি-যোদ্ধারা আক্রমণ করে দখল করে নিল, কাছারীর ম্যানেজার, বক্‌সী প্রভৃতি কর্মচারী আর লাঠিয়াল-দারোয়ানের দল প্রাণের ভয়ে লালগঞ্জ থেকে পালিয়ে গেল। লালগঞ্জে শত্রুর চিহ্নমাত্র রইল না। লালগঞ্জ হল মুক্ত অঞ্চল। এইভাবে লালগঞ্জের শত্রুর কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাঁচ হাজার বিঘা জমির উপর প্রায় আড়াই-শো ঘর চাষী কংগ্রেস শাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এল, লালগঞ্জকে শত্রুর শোষণ-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেলল। ইতিমধ্যে লয়ালগঞ্জের 'লালগঞ্জ' নামটি মুখে মুখে চালু হয়েছিল। এবার স্থানীয় সংগ্রাম-কমিটি এই মুক্ত অঞ্চলের নাম ঘোষণা করল 'লালগঞ্জ'। সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, সবচেয়ে উঁচু গাছের মাথায়, প্রত্যেকটি কাছাড়ী-বাড়ীর চূড়ায় লালঝাণ্ডা উড়তে লাগল। লালঝাণ্ডা লালগঞ্জের চাষীর মুক্ত অঞ্চলের জয় ঘোষণা করল।

লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক লাটদার দ্বারিক সামন্ত, আদিত্য সামন্ত, পুলিন দাস আর কৃষ্ণ মজুমদারের কাছারী দখল করে, পাঁচ হাজার বিঘা জমি কংগ্রেসী শাসনের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আর শোষণমুক্ত করে তার উপরে নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট। সংগ্রাম-কমিটি ঐ অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ সকল চাষীর এক সভা আহ্বান করল। সেই সভায় ঘোষণা করা হল:

"গত মে দিবসের সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এবার জমিদার-জোতদারের সমস্ত জায়গা-জমি-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তা সংগ্রাম-কমিটির আইনমত সকল চাষীর মধ্যে বিলি করা হবে।

"গত তিন মাস ধরে আমরা সমস্ত মেয়ে-পুরুষ মিলে কংগ্রেসী ফৌজের 'বাঁকা কাঠ' (রাইফেল), জমিদার, জোতদার, গুণ্ডা আর নরপশুদের সঙ্গে লড়াই করে, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি এবং অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছি। চারটা কাছারী আর প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি আমরা পুরোপুরি দখল করেছি। দ্বারিক সামন্তের কাছারী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। ওদের কাছারীর গরু-বাছুর, বাসন-জিনিসপত্র আর শত শত মন ধান সবই আমরা দখল করেছি।

"এই জমি আর ধান এবং যা কিছু আমরা পেয়েছি সবই এখন সাধারণের সম্পত্তি। সংগ্রাম-কমিটি এই ধান ও সম্পত্তি সকলকে হিসাবমত ভাগ করে দিয়েছে এবং দেবে।

"আমাদের এলাকায় আজ থেকে কেউ ভাগচাষী বা ক্ষেত-মজুর থাকবে না। সবাই এখন জমির মালিক। আমাদের ভিটে আর জমিতে আমরা স্বাধীনভাবে বাস করব, চাষ করব আর পুরো ফসল নেব।

"আমরা কংগ্রেস সরকারের আইন-কানুন-আদালত মানি না। আমাদের আইন-কানুন আর আদালত সবই হবে নূতন। জনসাধারণই বিচার করবে, জনসাধারণকে নিয়েই বিচার হবে।

"এই নূতন মুক্ত এলাকার নাম হবে 'লালগঞ্জ'। এই লালগঞ্জকে লাল রাখতে এবং আমাদের জীবন-জমিন্‌-সম্পত্তি সব কিছু কংগ্রেসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে আমরা সব মেয়ে-পুরুষ ভলান্টিয়ার হব। এই এলাকার চারদিকের ক্ষেত-

মজুর আর ভাগচাষীদের লড়াইয়ে সাহায্য করে তাদের এলাকাও আমরা লাল করে তুলব।

"ছোট-খাট জোতদারদের মধ্যে যারা আমাদের নিয়ম-কানুন মেনে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করবে, লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে পুলিসের রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে লালগঞ্জকে রক্ষার জন্য লড়াই করবে, তাদেরও আমরা সুযোগ-সুবিধা আর জমি দেব। যারা আমাদের বিরুদ্ধে যাবে তাদের আমরা দ্বারিক সামন্তের পথে পাঠাব।"

চাষেরব্যবস্থা ঃ সংগ্রাম-কমিটি এই ঘোষণা অনুযায়ী এবার কাজ শুরু করল। সেই দিন থেকেই নূতন করে জমি বিলি শুরু হল। লালগঞ্জের চাষীদের ক্ষেত-মজুরি, ভাগচাষ আর চাকরাণ-বৃত্তি ঘুচে গেল। সর্বহারা মানুষ এবার জমি আর বাস্তুভিটের মালিক হল। কাছারীর সব বাসন-পত্র বাজেয়াপ্ত করা হল। যাদের বাসন-পত্র পুলিস আর গুণ্ডারা ভেঙে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে সেগুলি বিলি করা হল। কাছারী-গুলির পুকুরের নাম হল 'লালদিঘী'। সেগুলির মাছ আর জলের উপর প্রতিষ্ঠিত হল সবার অধিকার। কাছারী থেকে বাজেয়াপ্ত করা শত শত মন ধানের একটা অংশ দিয়ে বীজধানের সমস্যা দূর করা হল। এ ছাড়া সব চাষীদের গরু আর লাঙ্গল একত্র করা হল। চাষীদের নিয়ে গড়া হল ছোট ছোট দল। সেই দলগুলির প্রত্যেকটি নিজ নিজ পল্লীর সকল জমি চাষ করবে—এই হল নিয়ম।

শাসনব্যবস্থা ঃ সংগ্রাম-কমিটি সকল চাষীদের নিয়ে সভা করে এবং সবার মত নিয়ে স্থির করল, সাধারণ চাষী সবাই চাষের কাজে মন দেবে এবং যারা শাসন-কার্য চালানোর জন্য চাষের কাজে সময় দিতে পারবে না, তাদের জমি সবাই মিলে চাষ করে দেবে। লালগঞ্জের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং অন্যান্য কাজ চালানোর জন্য বিভিন্ন কমিটি গড়া হল। কোন কমিটি চালাবে বিচার-আদালতের কাজ, কোন কমিটি করবে মুক্তি-যোদ্ধাদের দল গঠনের কাজ, কোন কমিটি যোদ্ধাদের লড়াইয়ের কায়দা-কানুন শেখাবে, কোন কমিটি অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করবে। শত্রু যাতে আকস্মিকভাবে লালগঞ্জের উপর আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য নানাস্থানে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা হল। সংক্ষেপে, একটি স্বাধীন রাজ-পরিচালনার মত সকল ব্যবস্থাই হল।

বিচারব্যবস্থা ঃ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে লালগঞ্জের আদালতে বিচারের কাজ শুরু হয়। সংগ্রাম-কমিটির উপরেই সর্বোচ্চ বিচারের ভার ন্যস্ত থাকে। তবু বিচারের সময় যারা উপস্থিত থাকে তাদেরই মত নেওয়া হয়। বিচারের সময় রায় দেবার অধিকার সকলের। আদালতে বিচার হয় প্রধানত শত্রুদের অপরাধের। মহাজন-জোতদার এমন কি লাটদারদের বিরুদ্ধেও পুরানো অত্যাচারের অভিযোগ আসে চাষীদের কাছ থেকে। আদালতে তারও বিচার হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি বিধান হয়—কারোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারোর অর্থদণ্ড, কারোর নাকমলা বা কানমলা, কারোর জুতাপেটা, কারোর হাজত-বাস ইত্যাদি। অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকেই অপরাধ স্বীকার করে। যারা লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে

প্রতিজ্ঞা করে আর কখনও অপরাধ করবে না, তারা পায় মার্জনা। আর অপরাধ স্বীকার না করলে এবং তা প্রমাণিত হলে শাস্তি অনিবার্য।

এমনি করেই নূতন জীবন শুরু হয় মুক্ত অঞ্চল লালগঞ্জের চাষীদের। কমিউনিস্ট-পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে কিভাবে মানুষ শোষণমুক্ত স্বাধীন সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে, কি করে সকল বাধা-বিপত্তি চূর্ণ করে তারা নূতন সমাজ, নূতন আইন-কানুন, আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কি করে 'মজুর-চাষী রাজ' মানুষকে প্রকৃত গণতন্ত্র, মনুষ্যত্বের অধিকার, সুখ-শান্তি দিতে পারে, তা লালগঞ্জের মানুষ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে নেয়, অন্য সবাইকে শিখিয়ে দেয়।

সংগ্রামী মানুষের পাশে লালগঞ্জ

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট সংবাদ এল পাঁচ মাইল দূরের রাধানগর মৌজার উপর আক্রমণ চলছে সশস্ত্র পুলিসদের; কংগ্রেসের সেবাদল আর গুণ্ডারা ঘর-বাড়ী লুট করছে, বৃদ্ধ আর মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। এই সংবাদ পেয়েই লালগঞ্জের ১৫০ জন মুক্তি-যোদ্ধা ছুটে চলল রাধানগরের দিকে। পথে আরও অনেকে তাদের সঙ্গে এল। রাধানগরে ঢুকেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিস আর গুণ্ডাদের উপর। বহু পুলিস আঘাত পেল। গুণ্ডারা সাংঘাতিকরূপে জখম হল, মুক্তি-যোদ্ধাদেরও অনেকে আঘাত পেল, অবশেষে পুলিস আর গুণ্ডারা প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাল। এই জয়ের আনন্দে সারা রাধানগর মৌজা মেতে উঠল, আগামী দিনের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল।

২৪শে আগস্ট সংবাদ এল। কাকদ্বীপ, মথুরাপুর ও সাগর থানার তিন দারোগা ৩৫ জন বন্দুকধারী পুলিস আর প্রায় ২০০ সেবাদলের গুণ্ডা নিয়ে রাধানগর মৌজার বাড়ী বাড়ী চড়াও হয়ে ভয়ংকর অত্যাচার চালাচ্ছে সকলের উপর। লালগঞ্জের নেতারা বুঝলেন, রাধানগরকে চূর্ণ করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে লালগঞ্জের মুক্ত অঞ্চলের উপর। ২০০ জন মুক্তি-যোদ্ধা হাতিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল লালগঞ্জ থেকে। আরও বহু মুক্তিযোদ্ধা ছুটে এল শিবরামপুর, চন্দ্রনগর, চন্দনপিঁড়ি থেকে। যোদ্ধাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৩০০ জন, তারা তিন ভাগে ভাগ হয়ে রাধানগরে প্রবেশ করল। সামনেই সশস্ত্র পুলিসের দল। মুক্তি-যোদ্ধাদের তিনটি দল একত্রে মিলে ঘিরে ধরল পুলিসদের। বেগতিক দেখে পুলিসদের কর্তা এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল, কাকদ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার শপথ নিলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। অবস্থা দেখে সেবাদলের গুণ্ডারা আগেই পালিয়েছিল।

১৬ই সেপ্টেম্বর গুপ্তচরগণ সংবাদ নিয়ে এল, কাকদ্বীপে বহু সশস্ত্র পুলিস, সেবাদলের বহু গুণ্ডা আর কংগ্রেসের বড় বড় পাণ্ডাদের এক সমাবেশ হচ্ছে আর তার পরেই লালগঞ্জের উপর আক্রমণ শুরু হবে। সেই আক্রমণ চালনা করবে কুখ্যাত জোতদার কুঞ্জ গাঁতা। চারদিকে সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হল, আর কাকদ্বীপের প্রায় সব কটি গ্রাম থেকে লালগঞ্জের মুক্ত অঞ্চলকে বাঁচাবার জন্যে শত শত মুক্তি-যোদ্ধা ছুটে আসতে লাগল। পরদিন সংবাদ এল, পুলিস আর গুণ্ডারা

লালগঞ্জের বিপুল আয়োজন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে লালগঞ্জের উপর আক্রমণের মতলব ত্যাগ করেছে। পরদিন দেখা গেল তাদের নেতা জোতদার কুঞ্জ গাঁতা আর তার দেহরক্ষীর মৃতদেহ নদীর জলে ভাসছে। এরা কিভাবে মরল তার কোন হদিসই পুলিস খুঁজে পেল না। ভয়ে দারোগা-পুলিস সবার হৃৎকম্প উপস্থিত হল, তারা পালিয়ে বাঁচল। লালগঞ্জের উপর আক্রমণ আর হল না। লালগঞ্জ লাল আলো ছড়িয়ে লাল করে তুলতে লাগল কাকদ্বীপকে।

চন্দনপিঁড়ির সংগ্রাম

বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়ি আর একটি অবিস্মরণীয় নাম। তার যোগ্য স্থান কেবল লালগঞ্জেরই পাশে। লালগঞ্জের মতই চন্দনপিঁড়ি একদিন বিধান রায় পরিচালিত বড় বুর্জোয়া-জমিদার গোষ্ঠীর রক্তাক্ত শাসনকে, জমিদার-জোতদার গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নকে উচ্ছেদ করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেদিন কৃষক নারী-পুরুষের রক্তে আর লাল পতাকার লালরঙে লালগঞ্জের মতই কাকদ্বীপের চন্দনপিঁড়িও লাল হয়ে উঠেছিল। এই চন্দনপিঁড়িরই মাতা অহল্যা তৈরি করে দিয়ে গেছেন সংগ্রামের নূতন ইতিহাস। সশস্ত্র শত্রুর সঙ্গে তাঁর ভয়লেশহীন সংগ্রাম আর জীবনদান চিরকাল সংগ্রামী-মানুষকে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাবে। লালগঞ্জের মতই চন্দনপিঁড়ির ভাগচাষী আর ভূমিহীন কৃষকের ঐতিহাসিক সংগ্রাম, তাদের নিষ্ঠা, বীরত্ব আর আত্মত্যাগ বাংলা তথা ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

(ক) মুক্ত অঞ্চল

কাকদ্বীপের ছোট একটি গ্রাম চন্দনপিঁড়ি। গ্রাম ছোট হলেও ছোট নয় সে বিপ্লবী চেতনায়, বীরত্বে, সংগ্রামে আর আত্মত্যাগে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যখন সারা কাকদ্বীপে মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল তেভাগার দাবি নিয়ে, তখন থেকেই চন্দনপিঁড়ির দেড়শো ঘর ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরও তাদের সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। লালগঞ্জের সংগ্রামের মতই চন্দনপিঁড়ির সংগ্রামও ধাপে ধাপে এগিয়ে লালগঞ্জের মতই মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল।

দেড়শো ঘর ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুর লাঠি, বল্লম আর তীর ধনুকের জোরে জোতদার-মহাজনদের হাত থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিয়ে চাষ করল, জমি বাড়ী ঘর হল চাষীদের। জোতদার-মহাজন পরেশ দাস, বসন্ত, রাইচরণ প্রভৃতি কৃষকদের শত্রুরা প্রাণের ভয়ে চন্দনপিঁড়ি থেকে পালিয়ে গেল, তাদের পোষা গুণ্ডা আর পাইক-পেয়াদারাও মার খেয়ে নাকে খত দিয়ে পালিয়ে গেল প্রাণ নিয়ে। চাষীরা জোতদার-মহাজনদের কাছারী থেকে দলিল-পত্রগুলি বের করে পুড়িয়ে ফেলল। চাষীদের দাসত্বের বন্ধন পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

চন্দনপিঁড়ির চাষীদের প্রিয় নেতা গজেন মালী, গজেন ভূঁইঞা, অশ্বিনী দাস প্রভৃতিরা লালগঞ্জের মত সব ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে জমি ভাগ করে

দিলেন, ঘরহারাদের ঘরবাড়ী তোলার ব্যবস্থা করলেন। নেতারা জানতেন, জোতদার-মহাজনরা পালিয়ে গেলেও চুপ করে থাকবে না, শান্তি আসবে না, শান্তির বদলে চাষীদের হাত থেকে জমিজমা কেড়ে নিয়ে তা আবার জোতদার-মহাজনদের হাতে তুলে দেবার জন্য তেড়ে আসবে কংগ্রেস সরকারের রাইফেলধারী পুলিস-মিলিটারি। তাই নেতারা চাষীদের নূতন পাওয়া জমির অধিকার রক্ষার জন্য ভলান্টিয়ার দল তৈরি করলেন। তাদের লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া, বন্দুক চালানো প্রভৃতি শেখালেন। ভলান্টিয়ারদের উপর গ্রাম-রক্ষার ভার পড়ল। শোষণ-মুক্ত চন্দনপিঁড়িকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হল।

(খ) কৃষক ভাইবোনদের সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণ

একদিন শত্রুরা আক্রমণ করল চন্দনপিঁড়ি গ্রামের উপর। জোতদার-মহাজনেরা রইল পিছনে। কাকদ্বীপ থানার দারোগা ১৫ জন রাইফেলধারী সিপাই নিয়ে নৌকা থেকে নামল চন্দনপিঁড়ির ঘাটে। পাহারাদার ভলান্টিয়ারদের সংকেত-ধ্বনি বেজে উঠল। চারদিক থেকে সশস্ত্র ভলান্টিয়াররা দৌড়ে এল শত্রুদের ঠেঙিয়ে বিদায় করতে। দারোগা আর সশস্ত্র পুলিসদল চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ল। সশস্ত্র পুলিস ছিল ৪৫ জন। তারা চাষীদের ভয়ংকর মূর্তি দেখে ভয়ে রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিল, ক্ষমা চেয়ে বলল, "মাপ করো আমাদের, আমরা ফিরে যাচ্ছি।" কিন্তু দারোগাবাবু সহজে নিষ্কৃতি পেল না। তাকে মাটিতে নাক ঘসে ক্ষমা চাইতে হল। সেদিন তারা চলে গেল।

আবার আক্রমণ হল পরদিনই। এবার এল সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে অনেক গুর্খা সৈন্য। তারা এসে চন্দনপিঁড়ি ছেয়ে ফেলল বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে। তারা গ্রামে ঢুকতেই চারদিকে শাঁখ বেজে উঠল, ভলান্টিয়াররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এল। সৈন্যরা গ্রামের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করেছে বড় বড় দলে ভাগ হয়ে। তাই ভলান্টিয়াররাও বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাদের বাধা দিতে গেল।

ইতিমধ্যে সংবাদ এল বহু গুর্খা সৈন্য গ্রামে ঢুকে মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। সঙ্গে সঙ্গে ১৬ জন ভলান্টিয়ার নিয়ে অশ্বিনী দাস ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন গুর্খা সৈন্যরা তারই বাড়ির উপর আক্রমণ করছে, মেয়েদের অপমান করছে, আর মেয়েরা মরীয়া হয়ে গুর্খাদের বাধা দিচ্ছে। রাইফেলধারী পুলিস আর গুর্খাদের সংখ্যা ৩৬। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে সেনদের কাছারীর নায়েব আর কংগ্রেস নেতা পরেশ দাস এবং বক্সী বসন্ত মণ্ডল।

চৌদ্দটি কৃষক মেয়ের সঙ্গে চলেছে ৩৬ জন রাইফেলধারী গুর্খা আর পুলিসের লড়াই। মেয়েদের কারো হাতে দা, কারোর হাতে বঁটি, কারোর হাতে ঝাঁটা। ৭/৮ মাসের গর্ভবতী অহল্যা পরেশ দাসের মুখে ঝাঁটার এক প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিয়েছে, পরেশ দাস মুখ ঢেকে পুলিসের পিছনে গিয়ে লুকিয়েছে। সরোজিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা গুর্খা সৈন্যের রাইফেলের নলটা চেপে ধরেছে। বাতাসী আর উত্তমী বাঁশ কাটা দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দিয়েছে একটা পুলিসের গায়ে। এমনি

করে প্রচণ্ড লড়াই চলছে ৩৬ জন পুলিসের সঙ্গে ১৪টি কৃষক মেয়ের। এমন সময় দৌড়ে এলেন কৃষক বীর অশ্বিনী তাঁর ভলান্টিয়ার বাহিনী নিয়ে।

অশ্বিনীরা সংখ্যায় ১৬ জন, হাতে তীর-ধনুক, বর্শা আর লাঠি। মুখে তাদের লালঝাণ্ডার জয়ধ্বনি, মুখে শত্রু-সংহারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তখন মেয়েদের অনেকেই আহত বন্দুকের গুলি আর সঙ্গীনের ঘায়ে। প্রায় সকলের দেহ থেকে রক্ত ঝরছে অজস্র ধারায়। তাদের শাড়ি রক্তে ভিজে লালঝাণ্ডার রঙ ধারণ করেছে। এই দৃশ্য দেখে অশ্বিনী আর তার বাহিনীর প্রত্যেকের মাথায় খুন চেপে গেল। ধনুকধারীরা দূর থেকে বৃষ্টিধারার মত তীর বর্ষণ করতে লাগল, বল্লমধারীরা বল্লমের ঘায়ে কয়েকটা পুলিসকে ধরাশায়ী করল। অশ্বিনীর লাঠির ঘায়ে কয়েকজন পুলিস আর গুর্খা সৈন্য জখম হল। অশ্বিনী যেন সংহার-মূর্তি ধরে পুলিস-গুর্খা আর কংগ্রেসী শয়তানগুলোর সামনে উপস্থিত।

অশ্বিনীর সেই সংহার-মূর্তি দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল পুলিস-গুর্খারা আর কংগ্রেসী পাণ্ডা পরেশ ও বসন্ত। তারা যেন মৃত্যুর পরোয়ানা দেখল অশ্বিনীর দৃষ্টিতে। আতঙ্কে পরেশ আর বসন্ত চিৎকার করে উঠল—"গুলি কর, গুলি কর অশ্বিনীকে, আর রক্ষা নেই।"

একটা গুর্খা সৈন্য রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে ধরল অশ্বিনীর দিকে। গুলির আঘাতে অশ্বিনীর বিশাল দেহ একবার কেঁপে উঠল, রাইফেলের গুলি বিঁধল অশ্বিনীর বুকে, গুলিটা পিঠ ফুঁড়ে বের হয়ে গেল। রক্তে সমস্ত দেহ আর কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। সেদিকে লক্ষ্য নেই অশ্বিনীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে এগিয়ে গেলেন শত্রুদের দিকে, মরবার আগে শত্রুদের সংহার করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

একটা গুর্খা সৈন্য বাতাসীকে আক্রমণ করতে উদ্যত দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অশ্বিনী। তাঁর লাঠির ঘায়ে শুয়ে পড়ল গুর্খাটা। একটা গুর্খা অহল্যার বুকে সঙ্গীন বসিয়ে দিয়েছে, অশ্বিনীর লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে সে গুর্খাটার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। এবার অশ্বিনীর দিকে তাক করে গর্জে উঠল ১০টা রাইফেল। অশ্বিনীর সমস্ত দেহ গুলিতে ফুটো হয়ে গেল, একটা গুলি তাঁর মাথা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। অশ্বিনীর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। একটা গুর্খা দস্যু তার দেহের উপর লাফিয়ে পড়ে সঙ্গীন দিয়ে তার বুকখানা চিরে ফেলল।

আর একধারে একটা রাইফেলধারী পুলিসের সঙ্গে লড়াই করছিল উত্তমী। তার হাতের দা-য়ের আঘাতে পুলিসটার একটা হাত কেটে দু'খণ্ড হয়েছিল। আর একটা পুলিসকে উত্তমীর বুকে সঙ্গীন বসাতে দেখে তার উপর লাফিয়ে পড়ল গজেন ভূঁইয়া। গজেনের সড়কি পুলিসটার দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। আর একটা পুলিস গজেনের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালাল। গজেন গুলির আঘাতে পড়ে গেল মাটিতে। সে মরবার সময় সেই পুলিসটার টুটি টিপে ধরল। পুলিসটাকে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল গজেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে দারোগা দেবেন ধর হুকুম দিচ্ছিল। আহত বাতাসী আর উত্তমী দা হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। একটা পুলিসের গুলিতে নিহত

হল বাতাসী আর উত্তমী। অশ্বিনীর বোন সরোজিনী—ভাইয়ের মৃতদেহ দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল। একটা গুর্খা সৈন্য তাকে পিছন থেকে গুলি করল। সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

সরোজিনীর মৃত্যুর পর অশ্বিনীর মৃতদেহ কোলে তুলে নিল অহল্যা। সে ছিল ৭/৮ মাসের গর্ভবতী। সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ করে সে গেল প্রিয় ভাই অশ্বিনীর মৃতদেহ উদ্ধার করতে। গুর্খা পশুরা তার তলপেটে গুলি করল, একটা পশু ছুটে এসে বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে তার তলপেট চিরে দিল। অহল্যা চিৎকার করল না, নিঃশব্দে পড়ে গেল মাটিতে। চেরা পেট দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে আবার উঠে দাঁড়াল অহল্যা অশ্বিনীর মৃতদেহ উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু আর সে চলতে পারল না, অজস্র রক্তপাতে তার দেহ দুর্বল, মাটিতে শয্যা নিল মাতা অহল্যা।

সেদিনের বিধান রায়-চালিত কংগ্রেস সরকারের পুলিস-মিলিটারীর রাইফেলের গুলি আর সঙ্গীনের আঘাত নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল গর্ভবতী মাতা অহল্যা। জন্মাবার পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে তার গর্ভস্থ সন্তানের। মায়ের মতই অহল্যার গর্ভস্থ শিশুও বুঝি মরেছে শাসকগোষ্ঠীর পশুশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে। পুলিস-মিলিটারীর রাইফেলের ধারালো সঙ্গীনের খোঁচায় অহল্যার গর্ভস্থ শিশুর দেহ ক্ষত-বিক্ষত, বুলেটের আগুনে ঝলসে গেছে তার কোমল দেহটুকু। পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে তার ছোট মাথাটি আর একখানি ছোট হাত। ও বুঝি মায়ের মতই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে শাসক-শোষকদের পশুশক্তির বিরুদ্ধে। ও বুঝি হাত নেড়ে আর চিৎকার করে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান করছে কাকদ্বীপ আর দক্ষিণ-বাংলার, সমগ্র বাংলা তথা ভারতের ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরদের, দরিদ্র চাষীদের—

"শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ লও, মাতৃহত্যার প্রতিশোধ লও, শিশুহত্যার প্রতিশোধ লও, চাষীর রক্তে রঞ্জিত জমির উপর অধিকার কায়েম কর, শোষণ-মুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তোল।"

মাতা অহল্যার বিদ্রোহী সন্তানের সে আহ্বানেই আজ বুঝি নকসালবাড়ি থেকে সোনারপুর অবধি সমস্ত ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুর নূতন করে সাড়া দিয়েছে।

* * *

বর্বর পুলিস আর গুর্খা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরেছে অশ্বিনী, মরেছে কৃষক কন্যা সরোজিনী-বাতাসী-উত্তমী, মরেছে গর্ভবতী মাতা অহল্যা। তবু বাকী সবাই মরীয়া হয়ে যুদ্ধ চালাতে লাগল পশুদের সঙ্গে। সবাই আহত, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষ রক্তবিন্দু দেহে থাকা পর্যন্ত, হাতিয়ার তোলবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা যুদ্ধ চালাবে, ভ্রাতৃহত্যার, ভগ্নীহত্যার, মাতৃহত্যার, শিশুহত্যার প্রতিশোধ নেবে। কৃষক-বীরদের রক্ত-স্রোতে ধানের ক্ষেত পর্যন্ত লাল হয়ে গেল, যেন একটা বিরাট লাল পতাকা বিছানো হয়েছে অশ্বিনীর বাড়ীর উঠোন থেকে ধানের ক্ষেত পর্যন্ত। ভলান্টিয়ারদের আরও কয়েকজন মৃত্যুবরণ করল, কয়েকজন

সাংঘাতিক আহত হয়ে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করল। পুলিস আর গুর্খারা আধমরা আর মৃতদেহগুলোকে রাইফেলের সঙ্গীনে গেঁথে টেনে হিঁচড়ে দূরে নিয়ে গেল।

(গ) চন্দনপিঁড়ির সাহায্যে লালগঞ্জ

ইতিমধ্যে চন্দনপিঁড়ির সংবাদ পৌঁছে গেছে নদীর ওপাশের লালগঞ্জে। লালগঞ্জ থেকে প্রায় ২০০ ভলান্টিয়ার নদী পার হয়ে সাঁতার কেটে চন্দনপিঁড়ি এসে পৌছালো। তারা জয়ধ্বনি করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। তাদের চিৎকার শুনে পুলিস আর গুর্খা-পশুরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল চন্দনপিঁড়ি থেকে। লালগঞ্জের ভলান্টিয়াররা যখন পৌছালো তখন যুদ্ধক্ষেত্রে বেঁচে ছিল কয়েকজন।

চন্দনপিঁড়ির সব ভলান্টিয়ার যুদ্ধ শেষ করে লালগঞ্জের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে মিলিত হল। সকলে সিদ্ধান্ত করল—এই কৃষক-হত্যার প্রতিশোধ চাই, কংগ্রেসী পাণ্ডা বসন্ত আর পরেশ দাসের মৃত্যুদণ্ড চাই।

পরের দিন সকাল বেলা ৫০০ গুর্খা সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে চন্দনপিঁড়িতে উপস্থিত হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস কমিশনার। তারা চারদিকে ঘোষণা করল—কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দেব চন্দনপিঁড়িকে। চারদিকে পুলিসের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। ছেলে-বুড়ো-মেয়ে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। সারা চন্দনপিঁড়ি দ্বীপে ১৪৪ ধারা জারি হল। গজেন মালি প্রভৃতি নেতারা আত্মগোপন করলেন।

বেলা ১০টার সময় ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস কমিশনার আর ৫০০ পুলিস ও সৈন্যকে অবাক করে দিয়ে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বের হল মৃতদেহগুলিকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা। অশ্বিনী আর অহল্যার মৃতদেহ লাল পতাকায় মুড়ে রাখা হয়েছে সবার সামনে। পুলিস আর মিলিটারীর সেই বিরাট শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করবার সাহস হল না। সংগ্রামী জনতার স্রোতে ভেসে গেল বিধান সরকারের ১৪৪ ধারার আদেশ।

এদিকে আত্মগোপনকারী নেতাদের সভায় পরেশ দাস আর বসন্তকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। মৃত্যুদণ্ড কাজে পরিণত করবার জন্যে নিযুক্ত হল কয়েকজন ভলান্টিয়ার। কয়েকদিন পর একদিন সকাল বেলা দেখা গেল পরেশ আর বসন্তের মৃতদেহ নদীর ঘাটে ভাসছে। সারা গ্রামে সংবাদ রটে গেল, ১৪৪ ধারা, ৫০০ সিপাহীর উপস্থিতি উপেক্ষা করে সমস্ত চন্দনপিঁড়ির মানুষ ভেঙ্গে পড়ল নদীর ঘাটে—দুই শয়তানের দুষ্কৃতির চরম ফল প্রত্যক্ষ করবার জন্য।

(ঘ) কংগ্রেস শাসনের স্বরূপ

পাঁচশত পুলিস আর গুর্খা সৈন্যের বর্বর শাসন শুরু হল চন্দনপিঁড়ির বুকের উপর। দস্যুরা কামানের গোলায় দ্বীপটিকে গুড়িয়ে দেয়নি বটে, কিন্তু তারা গুড়িয়ে দিল প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি সংসার। অন্ধ-আতুর-সবল-সুস্থ প্রত্যেকটি মেয়ে-পুরুষকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখল। বাকী লোকদের উপর চলল অবর্ণনীয়

অত্যাচার। দস্যুরা চাষীদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দিল, বহু মেয়েকে ধর্ষণ করল, জিনিস-পত্রে আগুন ধরিয়ে দিল, বাসন, হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। এমনি করে অত্যাচার চলল দশ দিন। কিন্তু তবু শান্তি এল না চন্দনপিঁড়িতে। গ্রামে আছে কেবল মেয়েরা। এবার তারাই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

(ঙ) মেয়েদের সংগ্রাম

গ্রামের সব পুরুষদের ধরে নিয়ে যাবার পর মেয়েরা একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ৮।১০ দিনের মধ্যেই তারা সামলে নিল। তারা গোপনে গ্রামের সমস্ত মেয়েকে নিয়ে কয়েকটি দল তৈরি করল, সংকেত ঠিক করল, পুলিসের সতর্ক পাহারার মধ্যেও নদী পার হয়ে লালগঞ্জের মুক্ত অঞ্চলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। লালগঞ্জ থেকে উপবাসীদের জন্য খাদ্য এল, বস্ত্রহীনদের জন্য কাপড়-চোপড় এল। পুলিস আর গুর্খা সৈন্যদের অত্যাচারে বাধা দেবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করল। দা, বটি, ভানি, কুড়ুল—এইসব হল তাদের অস্ত্র।

একটি ১৯ বছরের মুসলমান বৌ হল চন্দনপিঁড়ির মেয়ে বাহিনীর পরিচালিকা। স্বামী তার ফেরার, বোরখা ফেলে সেই এবার এগিয়ে এসেছে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে, মেয়েদের মান-ইজ্জত রক্ষা করতে।

কংগ্রেসী গুণ্ডারা রাত্রিকালে দল বেঁধে বের হত 'শান্তি' প্রচার করতে। তারা সুযোগ পেলেই যুবতী মেয়েদের উপর অত্যাচার করত। মেয়েদের একটি দল পশুদের হাত থেকে এক যুবতীর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে বটি দিয়ে জবাই করল দুটো কংগ্রেসী গুণ্ডাকে। শয়তানের রাত্রিকালের 'শান্তি' প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েদের সাহস দেখে বুড়িরাও এসে তাদের দলে যোগ দিল। তারা এবার বলল, "সবাই মিলে মাঠে নামব, অশ্বিনী, অহল্যা, সরোজিনী, বাতাসী, উত্তমীর রক্তমাখা ধান মাঠ থেকে এক আঁটি হলেও কেটে ঘরে তুলব।"

সত্যিই পুলিস-গুর্খাদের পাহারা উপেক্ষা করে একদিন ২০টি মেয়ে সকাল বেলায় মাঠে নামল। প্রখর সূর্যের আলোয় ধারালো কাস্তের ফলাগুলো ঝকমক্ করে উঠল। পুলিস-গুর্খাদের কেউই এগোতে সাহস করল না তাদের কাছে। প্রত্যেকে এক আঁটি করে ধান কেটে ঘরে নিয়ে এল।

এ বছর চন্দনপিঁড়িতে এই একটি দিনই ধান ঘরে গেল। সবাই মাথায় তুলে নিল সে ধান। যার জন্য এত রক্ত আর জীবন-দান, তা সার্থক হল। মেয়েরা জয়ের আনন্দে চারদিকে খবর পাঠাল—"মাঠের ধান ঘরে তুলেছি, প্রতিজ্ঞা রেখেছি। এবার ঘরে শুকিয়ে মরলেও দুঃখ থাকবে না।"

(চ) সংগ্রামের সাময়িক বিরতি

মেয়েদের ধান কাটার দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিসের বড়কর্তা। তারা বুঝতে পারল, মেয়েদের পিছনে রয়েছে গজেন মালি প্রভৃতি

আত্মগোপনকারী নেতারা। যতদিন তাদের ধরা না যাবে ততদিন চূর্ণ করা যাবে না চন্দনপিঁড়ির সংগ্রাম-শক্তিকে, শান্ত হবে না চন্দনপিঁড়ি।

কর্তৃপক্ষ আরও বহু পুলিস আর সৈন্য নিয়ে এল, ঘর থেকে বার হওয়া বন্ধ হল সকলের—এমন কি শিশু আর বালকদেরও। তারা ধরে নিয়ে আটক করল ছেলে-বুড়ো-বুড়ী সবাইকে। নেতাদের গোপন আড্ডা বের করবার জন্য তাদের উপর চলল অমানুষিক অত্যাচার। অত্যাচারে মরে গেল কয়েকজন, চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেল অনেকে। তবু কারো মুখ থেকে বার হল না একটি কথাও।

পুলিস জাল পাতল নেতাদের ধরার জন্য। যোগাযোগ রক্ষার জন্য নেতারা রাত্রিকালে চলা-ফেরা করতেন। একদিন রাত্রে নদীপথে নৌকায় যাবার সময় চন্দন-পিঁড়ির প্রিয়তম নেতা গজেন মালী পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তারপর আরও কয়েকজন নেতা ধরা পড়ে গেলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক অত্যাচার চলল ঘরে ঘরে। অবশেষে ধীরে ধীরে চন্দনপিঁড়ির প্রতিরোধ-সংগ্রামের আগুন স্তিমিত হয়ে গেল। এ হল সংগ্রামের সাময়িক বিরতি মাত্র।

* * *

চন্দনপিঁড়ির সংগ্রাম বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছে। অশ্বিনী-অহল্যা-বাতাসী-উত্তমী-সরোজিনীদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগের আদর্শ চিরকাল কৃষক-সংগ্রামে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাবে। অনেক কাল কেটে গেছে, এখনও কাকদ্বীপের মানুষ নদী দিয়ে নৌকা করে যাবার সময় চন্দনপিঁড়ির ঘাটে নৌকা বাঁধে, ভাই অশ্বিনী আর মাতা অহল্যার নাম করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

চন্দনপিঁড়ির ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরের সংগ্রাম শেষ হয়নি—তার সাময়িক বিরতি হয়েছে মাত্র। ৯০ বছরের বৃদ্ধ নীলমণি মাইতি পশুদের হাতে শত অত্যাচার সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে সবাইকে ডেকে বললেন—

"ওরে, তোরা কোনদিন লালঝাণ্ডা ছাড়িস নে। ও ঝাণ্ডা তোদের আর তোদের ভাইবোনদের, অশ্বিনী আর অহল্যাদের রক্তে লাল হয়ে আছে।" সে কথা চন্দন-পিঁড়ির মানুষ ভোলেনি কোনদিন, তারা লালঝাণ্ডা ছাড়েনি কোনদিন। এবার সময় এসেছে, অশ্বিনী-অহল্যার রক্তে আরও লাল হয়ে ঐ ঝাণ্ডা আবার উড়বে চন্দন-পিঁড়ির উপর, ঝাণ্ডার লাল রঙে লাল হয়ে যাবে চন্দনপিঁড়ির আকাশ।

বুদাখালির সংগ্রাম

(১)

প্রথমে লালগঞ্জ, তারপর চন্দনপিঁড়ি, আর বুদাখালি। এই তিনটি নামই বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। লালগঞ্জ আর চন্দনপিঁড়ির মতই বুদাখালির বীর ভাগচাষীদের সংগ্রাম, তাদের বীরত্ব, সাহস, তাদের আত্মত্যাগ সমস্ত সংগ্রামী মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবে।

(২)

লালগঞ্জ আর চন্দনপিঁড়ির মত বুদাখালিও একটি মৌজা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়। অন্যসব মৌজার মত বুদাখালির মৌজার ভাগচাষীরাও জোতদার-মজুতদারদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে চঞ্চল হয়ে উঠল লালগঞ্জের ডাকে। চাষের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল ছোট-খাট সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাগ-চাষীদের সাহস, দৃঢ়তা আর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

ডিসেম্বর মাস, চারদিকে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। ১৫ই ডিসেম্বর বুদাখালির সব ভাগচাষী মিলে ধান কাটতে গেল নিজেদের জমিতে। কংগ্রেসী সেবাদল আর জোতদারদের দল ১৮ জন রাইফেলধারী পুলিস নিয়ে পূর্ব থেকে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল কোন কাছাকাছি জায়গায়। তারা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল চাষীদের উপর।

১০।১২ বছরের একটি ছেলে ধানের বোঝা মাথায় ক'রে বাড়ি যাচ্ছিল। কংগ্রেসী পশুরা তার মাথা থেকে ধান কেড়ে নিয়ে নির্মমভাবে মারতে লাগল ছেলেটিকে। তার মাথা ফেটে গেল, মাথা আর নাক-মুখ দিয়ে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরতে লাগল। কংগ্রেসী পশুদের এই বর্বরের মত আচরণে ক্ষেপে গেল সকল মেয়ে-পুরুষ। তারা ছুটে এল ছেলেটিকে রক্ষা করতে।

তিন-চারশো স্ত্রী-পুরুষ দা-লাঠি-বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এল, তারা ঘিরে ধরল সেবাদলের গুণ্ডা আর সশস্ত্র পুলিসদের। শুরু হয়ে গেল বুদাখালির রক্তাক্ত সংগ্রাম। ছেলেটিকে পশুদের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছিল ১৯ বছরের চাষী-বৌ পাখী। পাখী ছিল পূর্ণ গর্ভবতী। একটা পুলিস বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখীর পেটে আঘাত করল। রক্তাক্ত দেহে আর্তনাদ করে উঠল পাখী, পেট চেপে ধরে শুয়ে পড়ল সে। ঐ স্থানেই তার গর্ভপাত হয়ে গেল।

এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে মাথায় খুন চেপে গেল সব স্ত্রী-পুরুষ চাষীদের। তারা মরীয়া হয়ে লাঠি-বল্লম চালাতে লাগল। গুণ্ডাদের অনেককে তারা জখম করল, তারা নিজেরাও জখম হল অনেকে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী সেবাদলের আরও বহু গুণ্ডা এসে যোগ দিয়েছিল। তারা ছিল সবাই সশস্ত্র, কিন্তু চাষীরা তেমন প্রস্তুত ছিল না। চাষীদের বেশীর ভাগ জখম হল। সে দিনের মত সংগ্রাম তাড়াতাড়ি শেষ করে কংগ্রেসী গুণ্ডারা আর পুলিস দল চলে গেল।

এই ঘটনায় আগুন জ্বলে উঠল বুদাখালির প্রত্যেকটি মেয়ে-পুরুষের বুকে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল তারা, সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের মিটিং বসল। তারা শত্রুকে চরম আঘাত দেবার আর আত্মরক্ষা করবার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলল। পাড়ায় পাড়ায় জোয়ানদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল তৈরী হল। মেয়েরাও পিছিয়ে রইল না, তাদের নিয়ে তৈরী হল পৃথক দল।

প্রস্তুত হবার পূর্বেই শত্রুরা আঘাত দিল। ১৫ই ডিসেম্বরই রাত্রি ৯টার সময় ৪ জন অফিসারের নেতৃত্বে ৫০ জন পুলিস নিয়ে জোতদার আর সেবাদলের গুণ্ডারা

অতর্কিতে আক্রমণ করল গ্রামের উপর। চাষীরা তৈরী হবার সময় পেল না। ঐ দিন সন্ধ্যায় মাত্র তারা সব পরিকল্পনা তৈরি করেছে, এখনও কাজ আরম্ভ হয়নি।

পুলিস আর গুণ্ডারা চাষী নেতাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অমানুষিক, অত্যাচার করল। নন্দপতি, বিহারী, গবুয়া হালদার, শিবু মণ্ডল, হরিশ মণ্ডল প্রভৃতি নেতাদের বাড়ী গিয়ে তারা ঘর ভেঙ্গে দিল, প্রচণ্ড প্রহারে অজ্ঞান করে ফেলল অনেককে। দুইটি চাষী-বৌ-এর উপর পাশবিক অত্যাচার করল। তারপর তারা আরও বেশী করবে বলে শাসিয়ে গেল।

এই ঘটনায় ক্রোধে ফেটে পড়ল বুদাখালির চাষীরা। পরদিন সকাল থেকেই তাদের পরিকল্পনা মত কাজ শুরু হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা হল, গ্রামের চারিদিকে পাহারা বসল। এবার মেয়ে-পুরুষ সবাই তৈরী।

(৩)

চারদিকে চলেছে সংগ্রামের আয়োজন। চাষীদের মুখে এক কথা: "জমি আর ধান দখলে রাখ, ধান নিজ খামারে তোল, জোতদার-লাটদারদের খামার থেকে ধান কেড়ে নিয়ে এস, অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।" চাষীরা যেখানেই সেবাদলের গুণ্ডাদের, জোতদার, লাটদার আর তাদের অত্যাচারী কর্মচারীদের দেখতে পেল সেইখানেই তাদের মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রাখল। গুণ্ডারা বহু সংখ্যায় দল না বেঁধে, সশস্ত্র না হয়ে তাদের ঘাঁটি থেকে বের হওয়া বন্ধ করল। ২২শে ডিসেম্বর সকালে কংগ্রেসী সেবাদলের বড় পাণ্ডা ভূষণপতি একাকী পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটি বর্শা হাতে করে। দুঃসাহসী ১২/১৩ বছরের দুটি ছেলে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করল তাকে। হঠাৎ এই আক্রমণে দিশাহারা হয়ে গেল সে। সে সুযোগে ছেলে দুটি বেদম প্রহার করল গুণ্ডা সর্দারকে। ভূষণপতি একফাঁকে হঠাৎ দৌড়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই, ভূষণপতি ফিরে এল একদল পুলিস নিয়ে। ইতিমধ্যে সংবাদটি বড়োরা সবাই জেনে গেছে। তাই তারাও তৈরী হয়েই ছিল। তারা পুলিসদলকে ঘিরে প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত করে ফেলল। শত্রুরা পালিয়ে গেল প্রাণের ভয়ে। এ হ'ল বুদাখালির চাষীদের প্রথম জয়।

পুলিস আর গুণ্ডারা মার খেয়ে পালাবার সময় একজন কর্মীকে পথে একা পেয়ে ধরে নিয়ে গেল তাদের ঘাঁটিতে। তারা ঠিক করল, যে চাষীদের হাতে মার খেয়েছে এই কর্মীটির উপর তার প্রতিশোধ নেবে। তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে ১৫জন পুলিস আর গুণ্ডা মিলে কর্মীটিকে সারাদিন ধরে প্রহার করল, কিন্তু তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারল না। এই প্রহারের ফলে কর্মীটি মৃতপ্রায় আর চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গেল।

এইসব ঘটনায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল সমস্ত বুদাখালি মৌজার মানুষ। সব স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রতিজ্ঞা নিল—এর প্রতিশোধ নেব, মাঠ থেকে ধান কেটে আনব, —একসঙ্গে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলে—সেই জমি থেকেই ধান আনব যেখানে ঐ কংগ্রেসী শয়তানরা ১৯ বছরের চাষী-বৌ পাখীর গর্ভপাত ঘটিয়েছে।

৩০শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে ৬০জন চাষী স্ত্রী-পুরুষ মিলে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে ধান কাটতে গেল মাঠ থেকে। তাদের সঙ্গে অসমর্থ দেহ নিয়ে পাখীও গেল। নিজ হাতে তার সমস্ত কলঙ্ক মুছে দেবে—এই তার পণ। স্বামী তার জেলখানায় আটক। তারই কথা স্মরণ করে প্রতিজ্ঞা নিল পাখী, ধান কাটতে কেউ বাধা দিলে নিজের হাতে তার দা'খানাকে সেই শয়তানের বুকে বসিয়ে দেবে—তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। ভাগচাষীরা সবাই মিলে ক্ষেতের ধান কাটল। শয়তানরা কেবল দেখল দূরে দাঁড়িয়ে।

৩১শে ডিসেম্বর মাঠে নামল আরও মেয়ে-পুরুষ সারাদিন ধান কাটল তারা, শত শত মন ধান ভাগচাষীদের ঘরে উঠল।

এদিকে পুলিস-বাহিনী আর সেবাদলের গুণ্ডারা ঝোপে-ঝাড়ে ওৎ পেতে ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন চাষীদের এক প্রিয় নেতা। একা পেয়ে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করল। তিনি তাঁর গ্রেপ্তারের কথা গ্রামবাসীদের চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন।

এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে শত শত চাষী মেয়ে-পুরুষ হাতিয়ার নিয়ে দৌড়ে এল তাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করতে। পুলিসদল ছুটে পালাচ্ছিল ভয় পেয়ে। কিন্তু চাষী-জনতা তাদের ঘিরে ফেলল, তাদের নেতাকে ছিনিয়ে নিল। পুলিস-বাহিনীও শিকার পালাতে দেখে বেপরোয়া হয়ে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল কংগ্রেস্ পাণ্ডা বিজয়মাধব। গুলিতে বহুলোক আহত হল, সংকটাপন্ন হল চাষী-নেতা নীলকণ্ঠ, সুরেন আর সুধীরের অবস্থা। চাষীদের লালঝাণ্ডার শ্রেষ্ঠ সন্তান তারা। তারাই পুলিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের প্রিয় নেতাকে। তারাই তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতে নিজেরা গুলির ঘায়ে ভীষণ জখম হয়েছে।

বীর চাষীরা পুলিসের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করে সব আহতদের সরিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু সরাতে পারল না তারা নীলকণ্ঠ, সুরেন আর সুধীরকে। তখন তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। চেষ্টা করলে হয়ত তাদের বাঁচানো যেত, কিন্তু পুলিস বর্বরেরা সেই অবস্থাতেই তাদের জেরা আরম্ভ করল গোপন সংবাদ জানবার জন্য। তারা যখন কোন সংবাদই পেল না তখন তারা মরণাপন্ন তিন চাষী-বীরকে লাথি মেরে আর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সুধীরের মৃত্যু হল সঙ্গীনের ঘায়ে। চাষী বীরের বুক থেকে সঙ্গীনের ঘায়ে রক্ত বেরল ঝলকে ঝলকে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না একটিও।

বুদাখালির সংগ্রামী মানুষ এর পরেও দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাল, আরও কয়েকজন বীরের মত লড়াই করে প্রাণ দিল। তারপর বড় বড় সৈন্যবাহিনী আর সারা বাংলা-দেশ থেকে জড়ো করা সশস্ত্র গুণ্ডাদের অমানুষিক অত্যাচার, হত্যা, ঘর জালানো, পাশবিক অত্যাচার আর নির্বিচার গ্রেপ্তারের ফলে ধীরে ধীরে বুদাখালীর সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই সব বর্বর অত্যাচারের মধ্যে চাষীরা প্রতিশোধ নিতে

ছাড়েনি। তাদের চোরা আক্রমণে বহু পুলিস, গুণ্ডা আর বিহারী জানা প্রভৃতি কয়েকজন সেরা দালাল প্রাণ দিয়ে অমানুষিক অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

আজও বুদাখালির মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে এই সব সংগ্রামের কাহিনী, তাদের প্রিয় সন্তান নীলকণ্ঠ, সুরেন আর সুধীরের মত আত্মদানের কাহিনী, শুনে তাদের বুক আনন্দে-গর্বে ফুলে ওঠে, তারা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শপথ নেয়—দিন আসুক, শহীদ-বীরদের হত্যার প্রতিশোধ নেব, কাকদ্বীপ থেকে জমিদারী আর জোতদারীর শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত মুছে দেব।

সন্দেশখালির সংগ্রাম

(ক)

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ। ক্যানিং থানার সন্দেশখালি মৌজা। অনেক আগেই লালগঞ্জের গরম হাওয়ায় সংগ্রামের ঝড় উঠেছিল এ অঞ্চলে। তারপর হল সারা বাংলা ক্ষেত-মজুর সম্মেলন। এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিল ক্যানিং থানার ৯০ জন ক্ষেত-মজুর। তাদের মধ্যে সন্দেশখালির প্রতিনিধিরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী। তারা সম্মেলন থেকে ফিরে এল সংগ্রামের নূতন প্রেরণা নিয়ে, লালগঞ্জের আদর্শ নিয়ে, নূতন মানুষ হয়ে। এই সম্মেলন থেকে ফিরে এসেই প্রতিনিধিরা সমস্ত থানায় ছড়িয়ে পড়ল, মৌজায় মৌজায় সংগ্রামের ডাক পৌঁছে দিল। তারা সংগ্রামের ধ্বনি দিয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে বলল: "কৃষি-বিপ্লবের মুক্তি-ফৌজ আমরা, কংগ্রেস শাসনের নাগপাশ থেকে আমরা মুক্ত করব আমাদের এলাকা, আমরা খেতে চাই পেট ভরে, বাঁচতে চাই মানুষের মত। তার জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব জমিদার-জোতদার আর অন্য সব শত্রুদের সঙ্গে।"

(খ)

শালুক আর ঘাস-লতাপাতা খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল ক্যানিং থানার শত শত ক্ষেত-মজুর। মহাজনের কাছে ধান আর টাকা চাইতে গিয়ে লাথি, ডাণ্ডা খেয়ে ফিরে এসেছে তারা। লাঠিয়াল আর বন্দুক দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেশখালির কুখ্যাত রমানাথ জোতদার। তাই শেষ পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠল—"দখল কর ধানের গোলা, ধান বিলি করে দাও ঘরে ঘরে, অনাহার মৃত্যু থেকে বাঁচাও ছেলে-মেয়েদের, বুড়ো-বুড়িদের আর সমস্ত মানুষকে।"

প্রথম দিনেই বহু ধানের গোলা দখল হল, দু'শো মন ধান বিলি করা হল সন্দেশখালিতে। বহুদিন পরে পেটভরা ভাতের স্বাদ পেল ক্ষুধার্ত মানুষ। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তারা কাজ শুরু করল আবার। ৪৫জন ক্ষেত-মজুর গিয়ে রমানাথ জোতদারের ধানের গোলা লুট করল পরদিন। রমানাথ তার বন্দুকধারী পাইক আর লাঠিয়ালদের নিয়ে চম্পট দিল সন্দেশখালি থেকে। পুলিস এসেছিল ধানের গোলা পাহারা দেবার জন্য। বিদ্রোহী ক্ষেত-মজুরদের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে তারাও ভয়ে পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহী ক্ষেত-মজুররা ধানের গোলা লুট করে হস্তগত করল মোট পাঁচশো মন

ধান। শত শত ক্ষুধার্ত মানুষের অভাব মিটবে তাতে। তাই সংগ্রাম-কমিটি ৮।১০ খানি লাটের লোকেদের আহ্বান করল ভাগ করে ধান নিয়ে যাবার জন্য। দলে দলে ছুটে এল মেয়ে-পুরুষ লাঠি আর লালঝাণ্ডা নিয়ে। বস্তা বস্তা ধান নিয়ে গেল তারা।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জোতদার রমানাথ। তার ছিল বিরাট মহাজনী কারবার। সব ক্ষেত-মজুর আর গরীব চাষী দল বেঁধে রমানাথের কাছারী আক্রমণ করল—আগুন দিয়ে সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দিল। এদিকে খবর এল রমানাথের লাঠিয়ালরা দুজন কৃষক-কর্মীকে আটক করেছে। খবর পেয়ে ২০ জন মুক্তিফৌজ ছুটে এল লাঠি আর বল্লম নিয়ে। তাদের দেখে পালিয়ে গেল লাঠিয়ালরা, মুক্ত হল কৃষক-কর্মীরা।

(গ)

দলে দলে পুলিস সন্দেশখালিতে ছুটে এল। দু'শো জন ক্ষেত-মজুর তাদের হাতে বন্দী হল। কিন্তু তাতেও বন্ধ হল না ধানের গোলা লুট করা। সন্দেশখালির শুকদোয়ানি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জোতদার দ্বারিক শর্মা। তার বাড়ী আর কাছারীর গোলায় রয়েছে হাজার মনেরও বেশী ধান। এ ছাড়া কাছারীতে আছে—কাপড়, চিনি আর তেলের গুদাম। দ্বারিকের চোরাকারবার চলে এসব দিয়ে।

দুর্গামণ্ডপ, গাবলেড়ে, দাউদপুর আর শুকদোয়ানির পাঁচশো ক্ষেত-মজুর একত্র হয়ে লালঝাণ্ডা আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘেরাও করল দ্বারিকের বাড়ি আর কাছারী। বিদ্রোহীরা দ্বারিক আর লাঠিয়ালদের দড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখল একটা ঘরের মধ্যে। তারপর বড় বড় গোলাগুলো ভেঙে ধান লুট করল। একদিনে হাজার মনেরও বেশী ধান বিলি করা হল। কাছারীতে চোরাকারবারের জন্য জমানো ছিল আটশো জোড়া ধুতি, চারশখানা গামছা আর টিন টিন কেরোসিন, বস্তা বস্তা চিনি আর লবণ। তাও দখল করল বিদ্রোহী ক্ষেত-মজুররা। তারপর তারা দ্বারিকের মহাজনী কারবারের ক্যাস-ঘরও দখল করল। এই ক্যাস-ঘরে ছিল লক্ষ টাকারও বেশী তেজারতি-মহাজনী খাতা, দলিল, খত, হাতচিটা। সব কাগজপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ছাই হয়ে গেল জমিদারী, জোতদারী আর মহাজনী-শোষণের কাগজরূপী যন্ত্রগুলো। ফেরার পথে পুলিস এল—বিদ্রোহীদের বাধা দিয়ে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল সব জিনিসপত্র। কিন্তু শেষ অবধি পুলিসকেও পালাতে হল।

(ঘ)

পরদিন ৪৫ জন সামরিক পুলিস বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে সন্দেশখালিতে এসে উপস্থিত হল। এক জায়গায় পাঁচজন চাষীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা তাদের উপর গুলি চালাল। তার ফলে দুইজন ক্ষেত-মজুর মারা গেল। গুলিচালনার সংবাদ পেয়ে চারদিক থেকে প্রায় পাঁচশো চাষী দৌড়ে এল লাঠি, বল্লম

আর লালঝাণ্ডা নিয়ে। তারা এসে ঘিরে ফেলল সিপাইদের। অবস্থা খারাপ দেখে পুলিস বাহিনীর কর্তারা হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল, সেবার রেহাই পেল পুলিসের দল।

(ঙ)

ধান নিতে গিয়ে বুলেট খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে শুকদোয়ানির চাষী। এতেও ভয় পেল না কেউ। বসিরহাটের এস. ডি. ও. সাহেব নিজে এলেন চাষীদের বুঝিয়ে লুঠ করা ধান-চাল ফেরত দেবার জন্য। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হল। চাষীরা এস. ডি. ও. সাহেবের ভাঁওতায় না ভুলে আবার চারদিকের ধানের গোলা লুট করতে শুরু করে দিল। শত শত মন ধান-চাল দখল করে আগরবাটি গ্রামে বিলি করা হল। একদল পুলিস বাধা দিতে এসে ভয় পেয়ে ফিরে গেল।

এরপর সন্দেশখালি মৌজার সংগ্রামকে গলা টিপে মারবার জন্যে ছুটে এল পাঁচশো সশস্ত্র পুলিসের এক বিরাট বাহিনী। ২-৩ দিনের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশো ক্ষেত-মজুর পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হল। পুলিসের দল এক মাসের মধ্যে কয়েকবার গুলি চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করল। গুলিতে জখম হয়েছিল বহু লোক। পুলিস গ্রামে গ্রামে ঢুকে চাষীদের ঘরবাড়ী ভেঙে তচনচ করে ফেলল। হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বুড়ো-বুড়ি আকাশের নীচে আশ্রয় নিল, উপোস করে দিন কাটাতে লাগল। এমনি করে একদিন শেষ হল সন্দেশখালির বীর ক্ষেত-মজুরদের অপূর্ব সংগ্রাম।

বুরুলের সংগ্রাম

(ক)

২৪ পরগনার অপর এক দিকে দীর্ঘকালের সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে বীরের মত দাঁড়িয়ে আছে বুরুল। বুরুল ২৪ পরগনার কংগ্রেসেরও সবচেয়ে পুরানো ঘাঁটি। এমন কি কংগ্রেসের জন্মস্থান বললেও চলে। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি এক সভায় বুরুলের বিদ্রোহী ক্ষেত-মজুররা ১৪৪ ধারা জারি করে দিল—কংগ্রেসের পাণ্ডারা আর বুরুলে ঢুকতে পারবে না।

বুরুলের সংগ্রাম শুরু হল ছাত্রদের ব্যাপার নিয়ে। বুরুল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেশীর ভাগই গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুরের ছেলে। গরীব বলেই তাদের উপর চলত বিদ্যালয়ের কর্তা কংগ্রেসীদের নানা রকমের নির্যাতন। তারই প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট করে বসল। তারা দাবি করল—সব ছাত্রদের জন্য চাই সমান অধিকার আর সমান ব্যবহার।

জমিদার চণ্ডী ঘোষ সুন্দরবনের চার হাজার বিঘা জমির মালিক। সেই হল বুরুল বিদ্যালয়ের বড় কর্তা। গরীবের ছাত্রদের বেয়াদপি দেখে ক্ষেপে গেল চণ্ডী ঘোষ। সে বুরুলের কংগ্রেসী পাণ্ডা মুরারী শরেণকে নিয়ে চাষীর ছেলেদের অন্যায়

আবদারের শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত করল। তারা দুজনে মিলে বিদ্যালয় তালা বন্ধ করে দিল। তাদের আহ্বানে বুরুলে এলেন মন্ত্রী বিমল সিংহ ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু পণ্ড হল কংগ্রেসীদের এই হীন ষড়যন্ত্র। বুরুলের সব ছাত্র একজোট হয়ে দাঁড়াল, তাদের সঙ্গে যোগ দিল জনসাধারণ। তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেলেন মন্ত্রী বিমল সিংহ। ছাত্ররা অনশন করেছিল, বিদ্যালয় তালাবন্ধ করার প্রতিবাদে। জোর করে তাদের অনশন ভাঙাবার জন্য এল একদল পুলিস। ছাত্রদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র আর জনসাধারণের চাপে পুলিসের দল হটে যেতে বাধ্য হল। কংগ্রেসীরা গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল কয়েকজন সিপাইকে দিয়ে ছাত্র-নেতাদের কয়েকজনকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের হাতে সিপাইদেরই একজন মারা পড়ল। সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার পর পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, আওয়াজ উঠল—"চণ্ডী ঘোষ আর মুরারী শরেণের মাথা চাই।"

প্রাণের ভয়ে চণ্ডী ঘোষ আর মুরারী শরেণ পালিয়ে গেল বুরুল আর তার আশ-পাশের অঞ্চল থেকে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বুরুল থেকে বিদায় হল কংগ্রেসের তেরাঙা ঝাণ্ডা, আর তার বদলে উড়তে লাগল রক্তরাঙা লালঝাণ্ডা। বিধান রায় তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বুরুলের ব্যাপার শুনে ক্ষেপে গেলেন বিধানবাবু, বুরুলকে ঠাণ্ডা করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন দু'শো গুর্খা সৈন্য। আন্দোলনের নেতাদের দেখামাত্র তাদের উপর গুলি করবার হুকুম হল।

(খ)

পুরো আড়াই মাস ধরে প্রলয় তাণ্ডব চলল বুরুল আর আশপাশের গ্রামগুলির উপর। শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হল, কিন্তু নেতাদের ধরা সম্ভব হল না। মুরারী শরেণ আর চণ্ডী ঘোষ ফিরে এসেছিল গুর্খা সৈন্যদের পিছু পিছু। সামনের ১৫ই আগস্টের উৎসব জাঁকজমক করে পালন করার সিদ্ধান্ত নিল তারা। দু'দিন আগে কংগ্রেস-পাণ্ডা বিজয় সিং নাহার বুরুলে এলেন কংগ্রেস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

কংগ্রেসীদের মিটিং সবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ ১২ জন মাত্র ভলান্টিয়ার লাল-ঝাণ্ডা নিয়ে এসে উপস্থিত হল সেই কমিউনিস্ট নেতা, যাকে দেখামাত্র গুলি করে মারবার হুকুম হয়েছিল। তারা মিটিংয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে লালঝাণ্ডার জয়ধ্বনি করবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিং নাহার আর মিটিংয়ের সব লোকজন পিছন দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলেন। পুলিসরাও পালাল তাঁদের সঙ্গে।

মিটিংয়ের স্থান অধিকার করল বুরুলের সাধারণ মানুষ আর চাষীরা। তারা সিদ্ধান্ত নিল ১৫ই আগস্ট তেরাঙা ঝাণ্ডার বদলে লালঝাণ্ডা উড়বে বুরুলের ঘরে ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্বত্র, আর সমস্ত মানুষের শোভাযাত্রা বের হবে দুপুর বেলা। ১৫ই আগস্ট ৮০জন অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিস এসে পৌছাল বুরুলে। তারা ঘাঁটি করে

বসল পথের ধারে ধারে—কমিউনিস্টদের শোভাযাত্রা বের করতে দেবে না তারা। কংগ্রেসীরা মিটিং ডেকেছে লাটখোলায়। কিন্তু একজন লোকও সেখানে যায়নি।

এমন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল লালঝাণ্ডায় সুশোভিত বিরাট শোভাযাত্রা। প্রায় এক হাজার ক্ষেত-মজুর আর সাধারণ মানুষ এক হাজার লাঠির মাথায় লালঝাণ্ডা বেঁধে আকাশ লাল করে, আর কমিউনিস্ট পার্টির জয়ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছে নিষিদ্ধ শোভাযাত্রা। সকলের আগে শোভাযাত্রার সামনে চলেছে রেনেগ্রামের বৃদ্ধা কৃষক-মাতা রেবতী দাসী।

পুলিস মরীয়া হয়ে গুলি চালাল শোভাযাত্রার উপর। কয়েকজন আহত হল। তবু এগিয়ে চলল শোভাযাত্রা। আবার গুলি চলল, আবার আহত হল দু'চারজন। কিন্তু শোভাযাত্রা থামল না, আপন গতিতে এগিয়ে চলল। মুরারী শরেণ আর চণ্ডী ঘোষ পালিয়ে গেল প্রাণের ভয়ে, পুলিসবাহিনী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লাল-ঝাণ্ডার শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল দৃঢ় পায়ে,—আকাশ লাল করে, আর কমিউনিস্ট পার্টির জয়ধ্বনিতে চারদিক কাঁপিয়ে, যেমন করে চলে আসছে প্রথম দিন থেকে; চিরদিন চলবে লালঝাণ্ডার সে শোভাযাত্রা।

সোনারপুর-ভাঙড়

(ক)

দক্ষিণের সোনারপুর-ভাঙড় এলাকা। কংগ্রেস-মন্ত্রী জমিদার হেম নস্করের জমিদারী। জমিদার নস্করমশাই আবার মস্তবড় মাছের ব্যাপারী। তাঁর হাজার হাজার বিঘা 'ভাসা' জমি। কৃষকের সর্বনাশ করে নদী মজিয়ে 'ভাসা' এলাকা করেছেন জমিদারবাবুরা মাছের ব্যবসা করবার জন্য। মাছের ব্যবসা তো নয়, মানুষের—কৃষকের জীবনের বিনিময়ে টাকা আয় করা। টাকার কুমীর হেম নস্করের প্রত্যেকটি টাকা চাষীর জমাট বাঁধা রক্ত আর খাদ্য ভিন্ন আর কিছু নয়।

কংগ্রেস-মন্ত্রী, কুখ্যাত জমিদার হেম নস্করের মাছের ব্যবসা দিন দিন ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন আর অনুগৃহীতদের মেছোভেড়ি প্রতি বছরই বেড়ে চলে কৃষকদের জমি গ্রাস করে। হেম নস্করের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন চব্বিশ পরগনা জেলার কংগ্রেসের সম্পাদক, জমিদার হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী। হেম নস্করের মতই চাষীদের ঘৃণার পাত্র এই কংগ্রেসী জমিদার হৃদয়হীন হৃদয়ভূষণ। শত শত চাষীকে জমিজমা আর ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে এই এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে ছিল এই মানুষরূপী শয়তানের দল। চাষীদের সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে ভিক্ষের মত দু'আনা চার আনার পয়সা মজুরি হিসেবে ছুড়ে ফেলে দিত এরা, নয়তো মর্জি হলে তাও দিত না।

দারা গ্রামের ষাট বছরের বুড়ো রমানাথ মণ্ডল ৮।১০ দিন উপোস করে মরল। মরার আগে সে মহাজন আর জমিদারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছিল এক মুঠো ভাতের জন্য। কিন্তু ভাতের বদলে সে পেয়েছিল লাথি আর গলাধাক্কা।

সমস্ত এলাকার চাষীদের চোখ খুলে গেল রমানাথের মৃত্যুতে। মনে প্রাণে সবাই উপলব্ধি করল—চুপচাপ বসে থাকলে, না খেয়ে মরতে হবে এলাকার সব চাষীদের ; বাঁচতে হলে গায়ের জোরে ধান কেড়ে নিতে হবে, প্রাণ বাঁচাতে হবে লাঠির জোরে। এমন সময় ডাক এসে গেল লালগঞ্জের—কাকদ্বীপের মতই চেতনা আর সাহস জাগানো ধ্বনি শোনা গেল—'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ', 'জমিদার-মহাজনদের গোলা দখল কর, ধান কেড়ে নিয়ে বিলি কর'। বনগ্রাম, বেওতা, বাতাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে একত্র হল, জমিদার-মহাজনদের গোলা দখল করে বিলি করে দিল শত শত মন ধান। এসব গ্রামের যুবকরা হল লাঠি আর বল্লমধারী ভলান্টিয়ার।

ধান বিলি করার পরই ৪।৫ শত লোকের আদালত বসল। ভলান্টিয়ার-বাহিনী ধরে নিয়ে এল অত্যাচারী জোতদার, মহাজন আর তাদের অত্যাচারী কর্মচারীদের। জনসাধারণের আদালতে চরম শাস্তি হল তাদের। এরাই চাষীর সর্বনাশ করে বহু ধন-সম্পদ জমিয়েছিল। আদালতের বিচারে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল।

চাষীদের বিদ্রোহের সংবাদ পুলিসের কাছে পৌঁছুতে দেরী হল না। বহু রাইফেলধারী পুলিস আর ফৌজ নিয়ে ভাঙড় থানার দারোগা এসে উপস্থিত হল। তাদের সঙ্গে এল ২৪ পরগনা জেলার পুলিসের বড় কর্তা, জনসাধারণের হাতে যেসব জোতদার আর মহাজন বন্দী হয়ে শাস্তি ভোগ করছিল, পুলিস আর ফৌজ তাদের মুক্ত করতে চেষ্টা করল। দুঃসাহসী ভলান্টিয়ার-বাহিনী তাদের বাধা দিল। ভলান্টিয়ারদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তারা সেদিনের মত পালিয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল।

(খ)

গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি তৈরী হল। জোতদার আর জমিদারদের জমি দখল করে, মৌজায় মৌজায় জমি বিলি করা হল। ক্ষেত-মজুর আর ভাগচাষীরা জমি পেল। এবার আরম্ভ হল মেছোভেড়ি দখল করার কাজ। মেছোভেড়ি দখল করে তা থেকে লোনা জল বার করে দিতে হবে, তারপর তাতে ফসল ফলাতে হবে। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল : দখল কর সমস্ত ভেড়ী, ভেঙে চুরমার করে দাও নস্করদের শোষণ-ব্যবস্থা। তিউড়ি, নয়বাস, খেয়াদা, সাহেবের আবাদ—চারদিকে চলল ভেড়ী দখলের কাজ। ভেড়ী-মজুরদের প্রধান নেতা হলেন সোনারপুরের ২নং সাহেবের আবাদের তুলসী নস্কর। কংগ্রেস-কর্মী হেম নস্কর মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। তার একজন বখরাদার ভূপতি নস্করের উপর ভার পড়ল চাষীদের এই আন্দোলন দমন করার। ভূপতি নস্কর, শ্রীচরণ নাগ্নে এবং অন্যান্য জোতদার আর জমিদারের নেতৃত্বে ২৫ জন সশস্ত্র পুলিস ভেড়ী-মজুরদের উপর আক্রমণ করল সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে। ভেড়ী-মজুরদের আন্দোলনের কর্মী বামাচরণকে পুলিস তিহুড়িয়া স্কুলের মাঠ থেকে ডেকে নিয়ে গেল এবং প্রায় এক রশি (৮০) হাত দূরে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করল। বিদ্যুতের মতো এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। চারদিক

থেকে চাষী, জনতা এসে ঘিরে ধরল পুলিসদের। তারা তাদের প্রিয় বামাচরণকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য পুলিসের উপর আক্রমণ করল। সেই সুযোগে বামাচরণ পুলিসের হাত ছাড়িয়ে জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের লাঠির ঘায়ে শুয়ে পড়ল তিন-চারটা পুলিস। ভূপতি নস্করের হুকুমে পুলিস জনতার উপর গুলি চালাল। প্রথম শহীদ হলেন ষাট বছরের বৃদ্ধ মতি ধাড়া। তা দেখে মরিয়া হয়ে চাষীরা পুলিসদের আক্রমণ করল।

পুলিস পাগলের মত গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। সেই গুলি উপেক্ষা করে চাষীরা পুলিসের বন্দুকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। বামাচরণ দারোগার গালে এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে তাকে শুইয়ে দিল, ছিনিয়ে নিল দারোগার হাতের রিভলভার। তারপর সে ঐ রিভলভার দিয়ে মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে লাগল পুলিসদের লক্ষ্য করে। কয়েকটা পুলিস ধরাশায়ী হল। এত কাছ থেকে রাইফেল ছোঁড়া যায় না। চারদিক থেকে ইট আর লাঠির আঘাত লেগে পুলিস শেষ অবধি পালাতে শুরু করল। চাষীরা তাদের বহুদূর তাড়া করে নিয়ে গেল। পথে পুলিসের উন্মত্ত গুলি ছোঁড়ার মুখে দ্বিতীয় শহীদ হল দাশু।

দু'দিন পরে পাঁচশো সশস্ত্র পুলিসসহ উপস্থিত হল ২৪ পরগনার পুলিসের বড় কর্তা। তারপর আরম্ভ হল ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব। তা চলল তিনমাস ধরে। কোন ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরের ঘর আস্ত রইল না। কোন যুবক চাষী আর সক্ষম পুরুষ পুলিসের গ্রেপ্তার থেকে রেহাই পেল না। কত যে যুবতী মেয়ে আর বৌ এদের অত্যাচারের শিকার হল তার হিসাব নেই। এই ভয়ংকর অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে অবশেষে একদিন সোনারপুর আর ভাঙড়ের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল।

দক্ষিণ বাংলার ঐতিহাসিক সংগ্রামের শিক্ষা

১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বছর ধরে চলেছিল দক্ষিণ বাংলার ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরদের এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম। সাহস, বীরত্ব, সাংগঠনিক বুদ্ধি ও নিপুণতার দিক থেকে উত্তর বাংলা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা প্রভৃতি স্থানের 'তেভাগা' সংগ্রামের মতই দক্ষিণ বাংলার এই 'তেভাগা' সংগ্রামও কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দক্ষিণ বাংলার এই দীর্ঘ সংগ্রামে যে সব চাষী-বীররা দেশী-বিদেশী বুর্জোয়া-জমিদার-গোষ্ঠীর কংগ্রেসের পূর্ণ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের সাহস ও বীরত্ব যে কোন দেশের গণ-সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই সংগ্রামে চাষীদের মায়েরা, স্ত্রীরা আর বোনেরাও পিছিয়ে থাকেনি। তারাও তাদের বীর সন্তান, বীর স্বামী আর বীর ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে পুরুষদের মতই। চন্দনপিঁড়ির চাষীমাতা অহল্যা, চাষী ভাই অশ্বিনী দাস, আর গজেন ভূঁঞা, চাষীভগ্নী সরোজিনী, বাতাসী, উত্তমী, বুদাখালির চাষীভাই নীলকণ্ঠ, সুধীর, সুরেন, শিবরামপুরের নগেন দলুই, সন্দেশখালির দুই সর্দার ভাই ভাঙড়ের মনি ধাড়া আর দাশু প্রভৃতির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আর নির্ভীক আত্মদান

চিরকাল বাংলার কৃষকদের সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে, চিরদিন এদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলা তথা ভারতের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে। এই সংগ্রামের শিক্ষা নতুন শক্তিদান করবে আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, দীর্ঘকালব্যাপী বীরত্বপূর্ণ এই সংগ্রাম থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? এই সংগ্রামের অজস্র রক্ত আর জীবন দান দক্ষিণ বাংলার জোতদার-জমিদার ভিত্তিক মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার কৃষি-শোষণের মূল উপড়ে ফেলতে পারল না কেন, কেবল কংগ্রেস শাসনের মিলিটারির পশুশক্তির দাপটেই, সন্ত্রাসের ফলেই এ সংগ্রামের অবসান হল কেন—আর ব্যর্থই বা হয়ে গেল কেন? এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তরই হবে এই সংগাম থেকে আমাদের প্রধান শিক্ষা, পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথনির্দেশ।

মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ বাংলার এই সংগ্রাম সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী তেভাগা সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অংশ বলে, খণ্ডিত আকারে কেবল দক্ষিণ বাংলার এই সংগ্রামের ত্রুটি-বিচ্যুতির পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। তা কেবল সম্ভব সারা বাংলা-দেশের তেভাগা সংগ্রামের আলোচনার পরেই। আপাতত কয়েকটি প্রধান ত্রুটির কথা আলোচনা এখানে করা হল।

(১) দক্ষিণ বাংলার এই সংগ্রাম ছিল জমির ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ আদায়ের সংগ্রাম—তেভাগার সংগ্রাম। সুতরাং এই সংগ্রাম ছিল মূলত আর্থ-নীতিক সংগ্রাম। জমিদারী-জোতদারী-মহাজনী প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি। এ সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা উচ্ছেদের পরিবর্তে কেবল ধান কেড়ে নেবার, আপা-তত বাঁচার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। সংগ্রামী ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে, দেশী-বিদেশী ধনিক আর জমিদার গোষ্ঠীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদার-জোতদার-মহাজন গোষ্ঠীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূলোচ্ছেদ করেই কৃষকের পূর্ণ মুক্তি সম্ভব—খাদ্য সমস্যার, বাঁচার সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেবল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই যে এই কৃষি বিপ্লবের সংগ্রাম পরিচালিত হবে। তাও কোনদিন শ্রমিক-শ্রেণী বা কৃষকসম্প্রদায়কে শেখানো হয়নি। এই রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবই সমগ্র 'তেভাগা' সংগ্রামের ব্যর্থতার মূল কারণ এবং এই শিক্ষার অভাবের ফল হিসাবেই সাংগঠনিক ও অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছে।

(২) এই মৌলিক শিক্ষার অভাবের জন্যই ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুররা লাঠির জোরে ধান কেটে ঘরে তুলে আর জোতদার-জমিদার-মহাজনদের গোলা থেকে ধান লুঠ করে, অর্থাৎ তখনকার মতই খাদ্য সংগ্রহ করে মনে করত যে, তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। ফলে, আংশিক সাময়িক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের মধ্যে সংগ্রামের দৃঢ়তা, সংগ্রামের শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা আর সংগঠনমূলক আয়োজন প্রভৃতিতেও চরম শৈথিল্য দেখা দিয়েছে।

(৩) মূল রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবের ফলেই সংগ্রামী চাষীরা বুঝতে পারেনি

যে, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষি বিপ্লবের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য। এই শিক্ষার অভাবেই চাষীরা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম কৌশল, অর্থাৎ জনযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করতে পারেনি। তাই তারা কেবলমাত্র লাঠি আর বল্লম সম্বল করে সুশিক্ষিত সামরিক পুলিস আর সৈন্যবাহিনীর বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে সেকালের রাজপুত-বীরদের মত সংগ্রাম করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে, পরাজিত হয়েছে। এই প্রকার অসমান যুদ্ধে এই ভাবে সাহস আর বীরত্ব দেখান যায়, কিন্তু জয়লাভ করা যায় না।

(৪) শত্রু যেখানে সুশিক্ষিত, উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত, আর জনসাধারণ শিক্ষাহীন, সংগঠনহীন, অস্ত্রহীন, সেখানে জনযুদ্ধের কৌশলই প্রধান সংগ্রামী কৌশল, একমাত্র কৌশল হওয়া উচিত।

(৫) কাকদ্বীপ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল—একটি সুগঠিত রাজনৈতিক চেতনার অভাবের জন্য এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটির মধ্যেই সমস্ত সংগ্রাম সীমাবদ্ধ রাখায় চাষী-ভলান্টিয়ারদের পক্ষে প্রয়োজন মত পিছু হঠার, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার এবং আবার দলবদ্ধ হওয়ার কোন সুবিধা ছিল না বললেই চলে। কাজেই এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটির উপর শত্রুপক্ষের সমস্ত সামরিক শক্তি সংহত করে এবং তা একযোগে নিয়োগ করে কাকদ্বীপের সংগ্রামকে চূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। কাকদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একযোগে এই সংগ্রামকে বিস্তৃত করতে পারলে শত্রুর পক্ষে তার সামরিক শক্তিকে একটিমাত্র সংগ্রাম-কেন্দ্রের উপর নিয়োগ করা সম্ভব হত না। তার ফলে চারদিকে বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে চাষীদের পক্ষে হয়ত দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হত।

(৬) চাষীদের এই সংগ্রামে প্রথমে স্বতস্ফূর্তভাবে আরম্ভ হলেও পরে কমিউনিস্ট পার্টিই এই সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল। সুতরাং দক্ষিণ বাংলার এই সংগ্রামের সফলতা বা ব্যর্থতার প্রধান দায়িত্ব কমিউনিস্ট পার্টির। কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক। এই উভয় দায়িত্ব পালনে পার্টি ব্যর্থ হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি সারা জীবনে কোনদিন শ্রমিক-কৃষকদের শেখায়নি যে—কৃষি বিপ্লবই কৃষক সংগ্রামের মূল কথা। এই সংগ্রাম চালাতে গেলে যে ধরনের সংগ্রাম-কৌশল (অর্থাৎ জনযুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করতে হয়, তার জন্য যে বিশেষ ধরনের সংগঠন গড়তে হয়, এসব কিছুই কমিউনিস্ট পার্টি চাষীদের শেখায়নি। কৃষকদের সংগ্রামের সংকল্প, সাহস, দৃঢ়তা প্রভৃতির কোন অভাব ছিল না, অভাব ছিল কেবল মূল রাজনৈতিক আর সাংগঠনিক শিক্ষার। তারা সে শিক্ষা পেতে পারত কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকেই। কিন্তু পার্টি তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, যে-কোন কারণেই হোক, এই বাংলাদেশব্যাপী 'তেভাগার সংগ্রাম'কে উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার, এমন কি শেষ পর্যন্ত চালাবার ইচ্ছাও কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। তাই পার্টি এই সংগ্রামকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং কৃষকরাও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

তেভাগার সংগ্রাম*

১. দিনাজপুর জেলার সংগ্রাম

"সম্প্রতি (১৯৭৩) বালুরঘাটের খাঁপুর গ্রামে তেভাগা-সংগ্রামের রজত জয়ন্তী পালিত হইল। এই খাঁপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র পুলিস ঐ সংগ্রাম দমনের জন্য কৃষকদের উপর একদিনে ১২১ রাউণ্ড গুলিবর্ষণ করিয়া ২২ জন কৃষককে হত্যা করে। আহতদের বালুরঘাট হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার মৃত্যুপথযাত্রী একজন কৃষককে তাঁহার শেষ ইচ্ছা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি চান?' ক্ষীণকণ্ঠে সংগ্রামী কৃষকটি উত্তর দিলেন—'তেভাগা চাই।' তারপরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেদিন তেভাগার দাবি ঐ জেলার নিপীড়িত কৃষকদের মনে কত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা ঐ উক্তি হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

"১৯৪৬-৪৭ সালের ধানকাটার মরশুমের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে অবিভক্ত বাংলার প্রায় ১৯টি জেলার কৃষকরা ঐ তেভাগা-সংগ্রামে যোগদান করে। সংগ্রামের প্রধান এলাকা ছিল উত্তরবঙ্গ : দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ঐ অঞ্চলে বর্গাদাররা আধিয়ার নামে পরিচিত। আর এই আধিয়ার কৃষকদের অধিকাংশই ছিল রাজবংশী বা ক্ষত্রিয় এবং সাঁওতাল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং কৃষক সমিতির পরিচালনায় ঐ সংগ্রাম সংগঠিত হইয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহের যে ব্যাপক বিস্ফোরণ সেদিন ঘটিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ২২টি থানার আধিয়ার কৃষকরা ঐ সংগ্রামে যোগ দেয়। এই এক জেলাতেই চারটি অঞ্চলে পুলিসের গুলিতে ৪০ জন কৃষক শহীদ হয়। দুই হাজার কারাবরণ করে। শত শত কৃষক কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উপেক্ষা করিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করেন ও আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কৃষকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ঐ সকল ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহৃত হয়।"

(সুশীল সেনের প্রবন্ধ)

---

* যে-সকল প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত : তেভাগা-সংগ্রাম (রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৭৩ : ১। সুশীল সেন : অবিস্মরণীয় তেভাগা-সংগ্রাম ও দিনাজপুর ; ২। গুরুদাস তালুকদার : তেভাগা-আন্দোলনে কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ; ৩। কালী সরকার : চিয়ারশাই শেখ জিন্দাবাদ ; ৪। অজিত রায় : দিনাজপুর তেভাগা-সংগ্রামের সম্পর্কে স্মৃতিচারণা ; ৫। সুনীল সেন : তেভাগা-আন্দোলন প্রসঙ্গে ('সপ্তাহ,' সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৯৭১-এর শারদীয়া সংখ্যা)।

১৯৩৯ সালের আধিয়ার আন্দোলন

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় জোতদারদের নানা-রকম আবোয়াব ও বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকেরা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই আন্দোলনে কৃষকরা জোতদারের খামারের পরিবর্তে নিজেদের গোলায় (খোলানে) ধান তুলত। ধান কেটে জোতদারের খামারে তুললে আধিয়ার কৃষকরা তাদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকও পেত না। এই দুই জেলার জোতদার খুব বড় আর শক্তিশালী, নিজেদের অর্ধাংশ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকত না, তারা চাইত সমস্ত ফসল। তারা মার্চা, তহুরী, গোলাপূজা, বরকন্দাজী, মণ্ডপ সেলামী, হাতী খোরা (হাতীর খোরাকী) নানা পার্বন, গাজন, থিয়েটার প্রভৃতি বিভিন্ন অজুহাতে বে-আইনীভাবে দফায় দফায় ধান কেটে নিত এবং কর্জকরা ধান পরিশোধ করার নামে আধিয়ার কৃষকের অংশ থেকে দ্বিগুণ-তিনগুণ ধান কেড়ে নিত। এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধেই কৃষকরা সেদিন প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই সংগ্রামের ফলেই শেষ পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও মহকুমার শাসকের মধ্যস্ততায় এক আপস হয় এবং স্থির হয় জোতদারের বাড়ির পরিবর্তে 'দশের খোলান'-এ অর্থাৎ মধ্যস্থ স্থানে ধান তোলা স্থির হয়। পরবর্তীকালে জোতদাররা এই চুক্তি মানতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ

১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা দ্বারা নিযুক্ত 'ভূমি-রাজস্ব কমিশন' (ফ্লাউড কমিশন)-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই কমিশন বর্গাদারদের জন্য উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা দেবার সুপারিশ করে। ১৯৪০ সালেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই যশোহর জেলার পাঁজিয়া নামক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশন হয় এবং এই সম্মেলনে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত ও গৃহীত হয়। পাঁজিয়া সম্মেলনেই বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবি নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

সংগ্রামের আয়োজন ও ধ্বনি

তখনও যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের মধ্যেই আসে ১৯৪৩ সালের মহাভয়ঙ্কর মন্বন্তর। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কৃষক সমিতিগুলি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল 'রিলিফ' ও খাদ্য-আন্দোলন নিয়ে। মন্বন্তরের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আরম্ভ হয় সংগ্রামের আয়োজন। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি—এই তিন পার্টির জেলা-কমিটির যুক্ত অধিবেশন করেন। এই অধিবেশনে জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার শেষে নেতৃবৃন্দের আলোচনার ভিত্তিতে ভবানী সেন যুক্ত আন্দোলনের দাবিগুলি ধ্বনির আকারে উপস্থিত করেন। এই

ধ্বনিগুলির মধ্যে তিনটি ধ্বনি পরবর্তীকালে সমগ্র উত্তরবঙ্গের তেভাগার সংগ্রামের প্রধান ধ্বনি হয়ে উঠেছিল। সেই তিনটি ধ্বনি হল: (১) নিজ খোলানে (গোলায়) ধান তোল; (২) আধি (অর্ধেক) নাই—তেভাগা চাই; (৩) কর্জা (ধার করা) ধানের সুদ নাই। "এই রণধ্বনি লইয়াই সেদিন আধিয়ার কৃষকরা সমগ্র উত্তরবঙ্গ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।"

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচন হয় এবং তাতে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি—এই তিন জেলায় বিশেষত তপসিল আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের প্রচার-অভিযানের মধ্য দিয়া উপরিউক্ত দাবিগুলি এই তিনটি জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। দিনাজপুরে রূপনারায়ণ রায় জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে প্রাধান্য পেয়েছিল জমিদারী ও জোতদারী প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামের ধ্বনি। এই নির্বাচনে জোতদারদের প্রতিনিধি পরাজিত হয়। তার ফলে কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এই নির্বাচনী সংগ্রাম ও কৃষকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা তেভাগার সংগ্রামকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়।

১৯৪৬ সালে খুলনা জেলার মৌভোগ নামক স্থানে জেলার কৃষক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ' বিষয়ক প্রস্তাবে জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলন থেকে বর্গাদারদের জন্য তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবি করা হয়। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক কৃষক 'কাউন্সিল' থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পরবর্তী ফসল কাটার সময়ই তেভাগা সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে। অক্টোবর মাসে দিনাজপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টি কমিটি ও কৃষক সমিতি সংগ্রাম আরম্ভের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সংগ্রামের পরিকল্পনাও রচিত হয়। এই পরিকল্পনায় নিজ খোলানে ধান তোলার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

"গ্রামের মাঠে মাঠে তখন পাকা ধানের সোনালী রংয়ের সমারোহ। আর হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে সমারোহ লালঝাণ্ডা ও লাঠিধারী ভলান্টিয়ারদের। স্লোগানে স্লোগানে সারা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিতেছে। পাকা ধানের শীষগুলিও কাঁপিতেছে। সংগ্রামের দামামা বাজিয়া চলিয়াছে। 'কমরেড ইনক্লাব'—ঐ ধ্বনিতেই বজ্রমুষ্ঠি উঁচাইয়া কৃষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ জানাইতেছে। অন্য গ্রামের প্রস্তুতির খবরাখবর লইতেছে। গ্রামের পর গ্রামে ঐ একই চিত্র। গ্রামগুলি হইয়া উঠিয়াছে জমাট বাঁধা কৃষক-ঐক্যের প্রতীক। ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারী-কৃষক, কিছুটা স্বচ্ছল অবস্থার···সকলেই আধিয়ারের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছে, ভলান্টিয়ার হইয়াছে।

"কমরেড গুরুদাস তালুকদারের এলাকাটি ছিল জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল। ঠাকুরগাঁর ঐ পশ্চিমাঞ্চল ছিল জেলার পার্টির ও কৃষক-সমিতির সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। ঐ এলাকা হইতেই ধান কাটা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং উহা শুরু করার

দায়িত্ব দিয়া পার্টির জেলা-সম্পাদককে ঐ এলাকায় পাঠান হয়।" (সুশীল সেনের প্রবন্ধ)।

ঠাকুরগাঁয়ের সংগ্রাম

ধান কাটা শুরু হয়েছে। একদল ভলান্টিয়ার লালঝাণ্ডা নিয়ে ধান কাটছে, অন্য সবাই পাহারা দিচ্ছে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ সবাই মাঠে নেমেছে। ধান কেটে আধিয়ারের বাড়িতে তোলা হল। পুলিসদল নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, তারা বাধা দিল না। পরদিন সশস্ত্র পুলিসদল গ্রামে ঢুকল। তারা গ্রামে হানা দিয়ে জেলা-সম্পাদকসহ ৩২ জন কৃষক-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ধান চুরির অভিযোগে সকলকে ঠাকুরগাঁ শহরে চালান দিল। কিন্তু ধান কাটা বন্ধ হল না। পুলিস এবার মাঠে নেমে ভলান্টিয়ারদের ধান কাটায় বাধা দিতে গেল। কৃষক মহিলা কর্মী দীপশ্বরী লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মাঠের মাঝখানে। দীপশ্বরী লাঠি নিয়ে ছুটে গেলেন পুলিসদলের দিকে। তাঁর পেছনে ছুটল ভলান্টিয়াররা। দীপশ্বরীর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে পুলিসদল পিছু হটল, পালিয়ে গেল মাঠ ছেড়ে। দীপশ্বরীর সাহস আর পুলিসদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় জ্বলে উঠল কৃষক যোদ্ধারা। জোরকদমে চলল ধান কাটা সব এলাকায়। পুলিসদল মাঠে নেমে ধান কাটায় আর বাধা দিল না। কিন্তু সব এলাকায়ই কর্মীদের নামে মিথ্যা ধান চুরির দায়ে হাজার হাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল। অন্যদিকে আধিয়ার কৃষকেরা দ্রুত ধান কেটে নিজ খোলানে তুলতে লাগল। পুলিসকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকল কৃষক ভলান্টিয়াররা।

চিরির বন্দর এলাকার সংগ্রাম

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর শহরের নিকটবর্তী চিরির বন্দর এলাকায় এই দিন সশস্ত্র পুলিস কৃষকদের উপর গুলি চালায়। এই গুলিবর্ষণের ফলে শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নিহত হয়। এরা দুইজনই দিনাজপুরের তেভাগা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। সমিরুদ্দিন ছিলেন ক্ষেত-মজুর, আর শিবরাম গরীব সাঁওতাল কৃষক। গুলিবর্ষণের পূর্বে ক্ষেতে কর্মরত আধিয়ার কৃষক ও ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে পুলিসের এক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সময় একজন পুলিস সাঁওতাল আধিয়ারদের ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

* * * * *

গ্রামে আধিয়ার কৃষকদের ধান কাটা চলছে। পুলিসও গ্রামে গ্রামে হানা দিচ্ছে, ধান কাটা বন্ধ করার জন্য হুকুম জারি করছে। মাঝে মাঝে সংঘর্ষ চলছে। পুলিস গ্রামে ঢুকলেই চারদিকে ঘণ্টাধ্বনি হয়, কাঁসর-শঙ্খ বেজে ওঠে, আর ধ্বনি ওঠে—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। এসবই গ্রামের মেয়েদের কাজ। পুরুষ যোদ্ধারা আত্মগোপন করে ধান কাটার কাজ করছে, পুলিসকে বাধা দিচ্ছে। শঙ্খ-ঘণ্টা-

কাঁসর বেজে উঠলেই সব বাড়ি থেকেই কৃষক মহিলারা লাঠি, ঝাঁটা, দা-বটি, কুড়ুল যে যা হাতের কাছে পায় তাই নিয়ে পুলিসকে বাধা দিতে ছুটে আসে। সর্বত্রই চলেছে এই প্রকার প্রতিরোধ।

রাত দুপুরে ঠুমনিয়া পার্টি অফিসে সংবাদ এল, রানীশঙ্কাইল-এ একটি বন্দুকধারী পুলিস মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি অসম্মানজনক উক্তি করে গালি দেয়। রাজবংশী স্ত্রী কৃষক-নেতা ভাণ্ডনীর নেতৃত্বে কৃষক মহিলারা পুলিসটিকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে। ঠুমনিয়া থেকে পুলিসটিকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত ভাণ্ডনী একটি বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঐ পুলিসকে ঘরে আবদ্ধ করে পাহারা দিল। বিভিন্ন রকমের বীরত্বের নজীর সৃষ্টি করেছে মহিলারা।

সংগ্রামের জন্য কৃষক সমিতি সংগঠন মজবুত করার জন্য ধ্বনি তুলেছিল: 'এক-লাঠি, এক মানুষ, এক টাকা'। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী থেকে দিতে হবে একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক সমিতির সভ্য এবং এক টাকা সংগ্রাম তহবিলে চাঁদা। কৃষকরা এসব কাজ শেষ করেই সমিতির অফিসে আসত সমিতির পরবর্তী নির্দেশের জন্য।

এই আধিয়ারদের একটি বড় অংশ ছিল মুসলমান। জেলার মুসলিম লীগের নেতারা নোয়াখালি থেকে কিছু মৌলভী আমদানি করে ঐ সব মুসলমান কৃষকদের দিয়ে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেছিল, তারা কৃষক-নেতা হাজি মহম্মদ দানেশকে খুন করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। এই দাঙ্গা ও খুনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয় মুসলমান আধিয়ার কৃষকরাই।

আগে অনেক আধিয়ার চাষী ধান কাটার পর নিজ নিজ ভাগের ধান জোতদারের খামারে জমা রাখত। এই জমা রাখা ধানকে বলা হয় পুঁজ। জোতদাররা আধিয়ারদের এই জমা রাখা ধান বাজেয়াপ্ত করতে পারে—এই আশঙ্কায় আধিয়াররা সমিতির অনুমতি নিয়ে জোতদারদের খামার থেকে পুঁজ ভেঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল। আপনা থেকেই এই পুঁজভাঙ্গা আন্দোলন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। "হাজার হাজার ভলান্টিয়ার দিনের পর দিন লালঝাণ্ডা হাতে লইয়া মিছিল করিয়া জোতদারের খামার হইতে নিজ নিজ ধানের পুঁজ ভাঙ্গিয়া লইয়া নিজ নিজ বাড়ির খোলানে মজুদ করিতে লাগিল। জোতদাররা এবার আতঙ্কিত হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহারা গিয়া ভিড় করিল জেলা-শহর আর মহকুমা শহরে, কেহবা ছুটিল কলিকাতায়। জেলা হইতে সহস্র সহস্র টেলিগ্রাম ছুটিল মন্ত্রীদের কাছে। লুটতরাজ ও ডাকাতির কাল্পনিক অভিযোগ আনা হইল সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা নিশীথনাথ কুণ্ডু জোতদারদের এক প্রতিনিধি-দল লইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। জোতদারদের চাপে লীগ-সরকার পিছু হটিল। গেজেটে প্রকাশিত হইলেও 'তেভাগা-বিল'টি আইন-সভায় উত্থাপিত হইল না। ইহার পরিবর্তে আসিল নৃশংস দমন-পীড়ন। জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি পুলিস-ক্যাম্প বসিল। সেই সকল ক্যাম্প হইতে শুরু হইল গ্রামে গ্রামে ব্যাপক পুলিসী অভিযান।"

খাঁপুরের রক্তঝরা সংগ্রাম

পতিরাম-খাঁপুর অঞ্চলেও পূঁজ ভাঙ্গার জঙ্গী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ভলান্টিয়াররা দলবেধে পতিরাম জোতদারের খোলান থেকে ধানের পূঁজ ভেঙ্গে আধিয়ারদের নিজ খোলানে তুলে দেয়। এই আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গী আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনই পার্শ্ববর্তী খাঁপুর গ্রামে ব্যাপক আকারে আরম্ভ হয়। খাঁপুরের সিংহকাছারীর জোতদার খুব প্রতাপশালী। এই জোতদারের ধানের খোলান ঘেরা ছিল না। একদিন এক আধিয়ার কৃষকের গরু এই জোতদারের খোলানের ধান খেয়ে ফেলে। জোতদার ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে তার বরকন্দাজদের হুকুম দেয় গরু ধরে খোঁয়াড়ে পাঠাতে। এই হুকুম পেয়ে বরকন্দাজরা গরু ধরে খোঁয়াড়ে নিয়ে চলল। কৃষকরা বরকন্দাজদের কাছ থেকে গরু কেড়ে নেয়। জোতদার পুলিস ডেকে পাঠায়। একদল সশস্ত্র পুলিস ১০ জন আধিয়ার কৃষকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করে। গ্রেপ্তারের সংবাদ চারদিকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিক থেকে ভলান্টিয়াররা ছুটে এল পুলিসদের বাধা দিতে। কৃষকরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিসদের বাধা দেয়। ভলান্টিয়ার আর কৃষকরা মিলে পুলিসদলকে ঘিরে ফেলে। এই ভাবে ঘেরাও হয়ে পুলিসরা উন্মত্তের মত গুলি চালাতে শুরু করে। তারা মোট ১২১ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে এবং তার ফলে ২২জন কৃষক নিহত হয়, আহত হয় বহু কৃষক। ঐদিনই খাঁপুরে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। এই সমাবেশ থেকে জোতদারের খোলান থেকে পূঁজ ভাঙ্গার আন্দোলন অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করা হয়।

এরপর থেকে মুসলিম লীগ সরকারের নির্দেশ উত্তরবঙ্গের তেভাগা সংগ্রাম রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য পুলিস চারদিকে বে-পরোয়াভাবে গুলি চালাতে আরম্ভ করে। খাঁপুরের পরেই পুলিস গুলি চালায় ঠাকুরগাঁর পশ্চিম অঞ্চলে ঠুমনিয়ায়। এই গুলিচালনার ফলে এখানকার পার্টি-নেতা সুকুরচাঁদ ও তার স্ত্রীসহ চারজন কৃষক নিহত হন। খাঁপুর-ঠুমনিয়ার গুলি চালনার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁ শহরে এক বিরাট কৃষক-সমাবেশ হয়। পুলিস এই সমাবেশকে বে-আইনী ঘোষণা করেই সমাবেশের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং তার ফলে পাঁচজন কৃষক নিহত হয়। সারা জেলায় দমন-নীতির তাণ্ডব চলতে থাকে। দিনাজপুর জেলার সংগ্রাম ক্ষেত্রগুলিকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। পুলিস কৃষকদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে কৃষকদের মারপিট, গ্রেপ্তার ও লুটপাট করতে থাকে। তারা আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে জোতদারের বাড়িতে তুলে দিতে শুরু করে। কৃষকেরা বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লয়। পুলিসরা জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। মেয়েদের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার। কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের ফলে কৃষকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে, সংগ্রাম ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে আসে। তারপরেই আসে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট—স্বাধীনতা।

কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা[১]

তেভাগার সংগ্রাম যত জোরের সঙ্গে চলতে থাকে ততই সেই সংগ্রামে বাধা দেবার জন্য জোতদার-পুলিসের ক্রিয়া-কলাপও বেড়ে যায়। প্রতাপশালী জোতদাররা লীগ সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অধিক সংখ্যায় পুলিস ও সশস্ত্র পুলিস নিয়ে আসে। এই পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে কৃষক ও মেয়ে ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন স্থানে বারবার সংঘর্ষ হয়। কয়েকটি ঘটনা:

(১) আটোয়ারী থানার রামপুর মলানি গ্রামে সশস্ত্র পুলিসদের সঙ্গে কৃষকদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুরুষরা ক্ষেতে নেমে ধান কাটছিল, আর মেয়েরা জমির চারদিকে আলের উপর দাঁড়িয়ে দা, কুড়ুল, বটি, ঝাড়ু প্রভৃতি নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। সশস্ত্র পুলিস গ্রামে ঢুকেই কৃষকদের ধান কাটায় বাধা দেবার জন্য এগিয়ে আসে। কৃষক-মেয়েরা তখন দা, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে পুলিসদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গাইন (ধান ভাঙ্গার জন্য কাষ্ঠ দণ্ড) দিয়ে পিটিয়ে পুলিসদের ৫।৬টি বন্দুক ভেঙ্গে দেয়। হাজার হাজার মেয়ে-ভলান্টিয়ার তখন পুলিসদের ঘিরে ফেলেছে। পুলিসদল ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এই মেয়ে বাহিনীর নেতা ছিলেন রোহিনী বর্মণ আর জয়মণি বর্মণ।

কয়েক দিন পর আবার আধিয়ার কৃষকরা ধান কাটা শুরু করে। জোতদার তার বন্দুক নিয়ে এসে কৃষকদের উপর গুলি চালায়। কৃষক ভলান্টিয়াররা জোতদারকে তার বন্দুকসহ গ্রেপ্তার করে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে নিয়ে যায়। বিচারে জোতদারের ২০০ টাকা জরিমানা হয়।

(২) পুলিসের এক জমাদার পুলিসদল নিয়ে গ্রামে ঢুকে বাঘা বর্মন নামে এক-জন কৃষক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। হাজার হাজার মেয়ে ভলান্টিয়ার দা, কুড়ুল, তীর-ধনুক নিয়ে জমাদার ও পুলিসদের ঘেরাও করে। জমাদারের হুকুমে পুলিসেরা গুলি চালালে চারজন আহত হয়। ভাগুনী ও রোহিনীর বাহিনী গাইন চালাতে আরম্ভ করে। তার ফলে ছয় জন পুলিস বন্দুক ফেলে পালিয়ে যায়। মেয়েরা জমাদারকে গ্রেপ্তার করে। জমাদার তখন ক্ষমা চেয়ে অব্যাহতি পায়।

(৩) পুলিস ঠুমনিয়ার লোকাল :অফিস ও কৃষক আদালতের হেড অফিস বালিয়াডাঙ্গি 'থানা' আক্রমণ করে। মনকটু সিং আর তার ভাইপো নেন্দোল সিং এবং শুকুরচাঁদ সিং ও তার স্ত্রী সুরমা পুলিসের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়। মনকটু সিং দুই হাতে লাঠি ঘুরিয়ে পুলিসদের বাধা দেয়। গুলিতে তার পেট ফুটো হয়ে নাড়িভুঁড়ি বের হয়। তবুও সে বাঁহাতে পেট চেপে ধরে ডান হাতে লাঠি চালায়। দুইজন পুলিসের মাথা ফেটে যায়। সেও গুলিতে নিহত হয়ে শহীদ হয়।

(৪) 'চিয়ারশাই শেখ জিন্দাবাদ': চিয়ারশাই শেখ সিংহবাহিনী জোতদারের জমিতে হাল-কৃষির কাজ করে। অত্যন্ত গরীব কৃষক। সমিতির সে নেতা। জেলায় দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব ভয়ঙ্কর আকারে দেখা দিয়েছে। তখন ১৯৪৩ সাল। সমিতির

১। রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থের গুরুদাস তালুকদার ও কালী সরকারের প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগৃহীত।

মিটিংয়ে স্থির হয়েছে জমিদার-জোতদারের মজুত ধান-চাল উদ্ধার করে জনগণের মধ্যে সরকারী দরে বিলি করতে হবে। একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চিয়ারশাই শেখ দেখল, খাঁপুরের সিংহবাহিনী কাছারী থেকে ২৫ খানা ধানবোঝাই গরুর গাড়ী চলেছে সারবন্দী হয়ে একের পর এক। ধান রাতারাতি চোরাই চালান হচ্ছে হিলি বন্দরে, মিল-মালিকের গুদামে; এই কাণ্ড দেখে চিয়ারশাই আর স্থির থাকতে পারল না। একাই সে লাঠি হাতে করে রুখে দাঁড়াল ধানবোঝাই গাড়ীর সারির সামনে। হাঁক দিল—"খবরদার! গাড়ী থামাও, ধানের চোরাচালান চলবে না।" সমস্ত গাড়ী আটকে গেল। চিয়ারশাইকে ডিঙিয়ে গাড়ী চালাবার সাহস কারোর ছিল না। একে তো সে কৃষক সমিতির নেতা, তার উপরে মস্তবড় জোয়ান, অতবড় জোয়ান এ অঞ্চলে আর নেই। তাকে অগ্রাহ্য করবে কে!

তবু চেষ্টা হল, জমিদারের কাছে খবর গেল। সিংহবাহিনী কাছারির মালিক মহাপ্রতাপশালী জমিদার অসিত মোহন সিংহরায়। আর চিয়ারশাই শেখ তো তার চাকর, তার হাল-কৃষক, অতি দরিদ্র এক সামান্য ব্যক্তি। জমিদারের হুকুমে তার নায়েব-গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ সবাই এল চিয়ারশাই শেখকে বোঝাতে, গাড়ি ছেড়ে দিতে। ভয় দেখান থেকে অনুরোধ পর্যন্ত সবই হল, কিন্তু কাজ হল না। চিয়ারশাই ভয় পেয়ে পালাবার পাত্র নয়। হৈ-হল্লায় চিয়ারশাইয়ের দলে লোক বেড়ে গেল, সমস্ত খাঁপুর-কৈগ্রামের সমস্ত কৃষক এসে দাঁড়াল চিয়ারশাইয়ের পাশে। সংবাদ শুনে ছুটে এলেন কৃষক-নেতা কৃষ্ণদয়াল মোহান্ত।

কৃষ্ণদয়াল মোহান্তকে জমিদার ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়ীতে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড অভিযোগ আনলেন চিয়ারশাইয়ের বিরুদ্ধে। কারণ, চিয়ারশাই তাঁরই কাছারির হাল-কৃষক, তাঁর গোলাম, সেও কিনা তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছে! শ্রীমোহান্ত জমিদারবাবুকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন, "চিয়ারশাই আপনার ধানের গাড়ী আটকেছে সমিতির নির্দেশে, এই দুর্ভিক্ষের দিনে আমরা ধান-চালের মজুতদারি-চোরাকারবারি হতে দেব না। এই ধান সরকারী দরে জনগণের মধ্যে বিলি করা হবে।" তাই করা হল। চিয়ারশাই আর তার সাথী হোপান মাডি, গুরুচরণ, ভবানী, নীলমাধব প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমোহান্ত রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ২৫ গাড়ি ধান বিলি করলেন বাড়ি বাড়ি ঘুরে। এরপর এল ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা সংগ্রামের ডাক।

তেভাগা সংগ্রামে চিয়ারশাই: তেভাগা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ প্রায় সমগ্র দিনাজপুর জেলাকে প্লাবিত করেছে। লাঠি, তীর-ধনুক নিয়ে হাজার হাজার কৃষকের মিছিল হয়। বড় বড় জোতদার-জমিদার সব পালাচ্ছে, তাদের বন্দুকগুলি পড়ে আছে, কিন্তু ধরবার লোক নেই, সব পালিয়েছে, তাদের বাড়ি জনশূন্য।

খাঁপুর-কৈগ্রামের জোতদার-জমিদাররা পুলিসের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতি-আক্রমণের এক নূতন পরিকল্পনা করল। তারা ইচ্ছা করেই তাদের খোলান (খামার) ঘিরল না। তাদের উদ্দেশ্য, কৃষকদের ছেড়ে দেওয়া গরু ধান খেতে খামারে ঢুকলেই পুলিসের সহযোগিতায় কৃষকদের উপর শেষ আঘাত দেবে।

একদিন সিংহবাহিনী জোতদারের খোলানে কৃষকদের একটি গরু ঢুকল। জোতদাররা তৈরী হয়েই ছিল। তারা গরু ধরে পাইক-বরকন্দাজদের পাহারায় বালুরঘাটে পাঠাল। গরুর মালিক গরু আনতে গিয়ে মার খেয়ে ফিরে এল। এমন সময় চিয়ারশাই কাছেই কোথাও ছিল। তার কাছে খবর গেল। তার নেতৃত্বে কয়েক শত কৃষক বরকন্দাজদের ঘিরে গরু কেড়ে নিল। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

১৯ তারিখ রাত্রি ১২টার পর সশস্ত্র পুলিসের তিনখানা ট্রাক ঢুকল খাঁপুরে। পুলিসরা ট্রাক থেকে নেমে কৃষকদের বাড়ী ঢুকে সবাইকে বিছানা থেকে টেনে তুলতে লাগল। এর প্রতিবাদে সমস্ত মেয়ে-পুরুষ ক্রোধে ফেটে পড়ল। সমস্ত কৃষক ট্রাকের সামনে জমা হল। তাদের নেতা চিয়ারশাই সবার সামনে। তার বাড়ির কাছের রাস্তাটি সরু হয়ে গেছে। সেখানে চিয়ারশাই তার বাহিনী নিয়ে একটি নিমগাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দিল। রাস্তার মাঝখানে এক বিরাট গর্ত খুঁড়ে হাতিয়ার নিয়ে তারা তৈরী হয়ে থাকল। এই অবস্থা দেখে ট্রাক পিছোতে লাগল। পিছোতে গিয়ে একটি ট্রাক পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। পুলিসের চালক গুলিবর্ষণের হুকুম দিল। শুরু হল সামনা-সামনি যুদ্ধ—অসম যুদ্ধ। একদিকে রাইফেল, আর অন্যদিকে প্রায় নিরস্ত্র কৃষকরা। গুলিবর্ষণের ফলে ২২ জন কৃষক নিহত হল, আহত হল অনেকে। চিয়ারশাই পর পর তিনটি গুলি খেয়ে শহীদ হয়। প্রথমে সে লাঠি দিয়ে পুলিসদের আক্রমণ করে। তখন একটি গুলি খেয়ে সে দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটি শাবল নিয়ে এসে ট্রাকের চাকা কাটার চেষ্টা করে। সেই সময় তার লাগে আর একটি গুলি। সে পড়ে যায় মাটিতে। পুলিসরা আর একটি গুলি করে তার বুকের উপর। এর পরই চিয়ারশাইয়ের মৃত্যু হয়। চিয়ারশাই শেখ জিন্দাবাদ।

রংপুর জেলার সংগ্রাম[১]

রংপুর জেলার সবচেয়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ডিমলা ও ডোমার থানা এবং সংলগ্ন দক্ষিণের জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ তেভাগা আন্দোলনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল।

'আধি নাই, তেভাগা চাই'। পরিকল্পনা অনুসারে ধান কাটা আরম্ভ হল। অবনী বাগচী, মণ্টু মজুমদার, বিষাদু বর্মন, কছির মিঞা প্রভৃতি কমরেডগণ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। জেলা, আঞ্চলিক ও স্থানীয় কমরেডগণ বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। হাজার হাজার কৃষক লাল-পতাকা উড়িয়ে, লাঠি হাতে মিছিল করে পূর্বনির্দিষ্ট ক্ষেতে সমবেত হয়ে ধান কাটা শুরু করল। লালঝাণ্ডা গেড়ে চারদিকে পাহারা রেখে ধান কাটা চলতে লাগল।

"ডোমার থানার তেভাগা অঞ্চলটি তখনকার কলিকাতা-দার্জিলিং রেলপথের

১। মণিকৃষ্ণ সেনের প্রবন্ধ 'তেভাগা আন্দোলনে রংপুর' থেকে তথ্য সংগৃহীত।

উত্তরদিকে অবস্থিত। রেলগাড়ী বা শুধু ইঞ্জিন যাতায়াতের সময় রেল-শ্রমিকগণ ইঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়ে জঙ্গী কৃষকগণকে অভিনন্দন জানাতেন। প্রত্যুত্তরে সংগ্রামী কৃষকগণ আওয়াজ তুলতেন: 'শ্রমিক-কৃষক এক হও'। 'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হও'।" (মনিকৃষ্ণ সেনের প্রবন্ধ)

ক্রমশ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। নূতন নূতন অঞ্চল, বিশেষ করে মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি থেকে মেহনতী কৃষকগণ আন্দোলনের কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রাখতে শুরু করে। তাদের দাবি: 'কমরেড নেতা পাঠান, আমরা প্রস্তুত'। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক বিষের উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমান কৃষকদের মেহনতী অংশ মুসলিম লীগের বেড়াজাল ভেঙে তেভাগার সংগ্রামের ময়দানে এসে সমবেত হল।

আধিয়ার কৃষকদের আকস্মিক আক্রমণে জোতদাররা প্রথম দিকে দিশাহারা হয়ে পড়ে। তারপর সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে তারা এই আন্দোলন ভেস্তে দেওয়ার জন্য সাম্প্রদায়িকতার পথ গ্রহণ করে। হিন্দু প্রধান গ্রামে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী পাণ্ডারা, আর মুসলমান প্রধান গ্রামে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মোল্লা-মৌলভীদের আনাগোনা শুরু হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান জোতদারদের মিলিত সভায় গৃহীত সাম্প্রদায়িক অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত জোতদারদের গৃহ-ভৃত্যরাই ফাঁস করে দেয়। তার ফলে জোতদারদের এই চক্রান্ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং কৃষক-কর্মীরা এই সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে যায়।

হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মিলিত তেভাগার আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক ও বেগবান হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেভাগা কমিটি গঠিত হয় এবং এইসব কমিটির নেতৃত্বে নূতন নূতন এলাকায় ধান কাটা শুরু হয়। তেভাগা আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় যুবনেতা দীনদয়াল, কালাচাঁদ, চুকদ্দি, সিরাজুদ্দিন, বিবাহু, সুবল, বাচ্চামিঞা, পাঁচুতুড়ি, নারায়ণ ব্যানার্জী, প্রভৃতির নাম কৃষকদের মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও জোতদারদের তরফ থেকে কোন আক্রমণ বা গোলমাল হলেই স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করত। তা শুনে ভলান্টিয়ার বাহিনী লাঠি হাতে ছুটত ঘটনাস্থলের দিকে। লালঝাণ্ডা আসছে, দীনদয়াল আসছে শোনামাত্র জোতদারদের বাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাত। এতে কৃষকদের মনোবল বৃদ্ধি পেত।

আধিয়ারের বাড়িতে ধান

"নূতন বিপদ। মুখে হাসি নেই। অনেকের চেহারাই বিষাদমাখা। সন্ধ্যার আগুন তাপানোর আসরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, হেতু অনিদ্রা, কারণ দুশ্চিন্তা। এতদিন উদাম (শূন্য) ঘরে নাক ডাকিয়ে ডাকিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাত। বর্তমানে ঘরে লক্ষী (ধান)। একে স্থানাভাব তার উপর চোরের ভয়। সত্যই বিপদ। হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে যারা ক্ষেতে ধান ফলায় ও মাচা (ধান রাখার গোলা) বেঁধে জোতদার-মহাজনের ধান রাখার ব্যবস্থা করে, তাদের ঘরে আজ

লক্ষী এসেছে, কিন্তু স্থানাভাব। পার্টির হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হল, কিষাণীদের সভা বসল। মাচাবাঁধা কিষাণদেরও ডাক পড়ল। যুক্ত কমিশন বসল। সাধ্যমত প্রত্যেকেরই মাচার ব্যবস্থা হল। পরবর্তীকালে পুলিসী রেকর্ডে জানা যায়, ঐ সময় প্রায় ছয় মাসকাল পর্যন্ত ডিমলা থানায় চুরি-ডাকাতি হয়নি। সকলের ঘরেই খাবার, চুরি-ডাকাতির প্রয়োজন কোথায় ?"

"গাইন (ধান ভাঙার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠদণ্ড) হাতে এতদিন কিষাণীরা পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। ঘরে ধান আসায় তাদের সামাজিক চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে নজর পড়েছে। সভা করে পার্টির কাছে দাবি রাখা হল, মেয়েদের খৈ-মুড়ি বানানো এবং ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। মেহনতী মা-বোনদের মধ্যে এই জেলায় আত্মরক্ষা সমিতির প্রচার ও বিস্তারে কমরেড রাণী মুখার্জির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" (মণিকৃষ্ণ সেনের প্রবন্ধ)

পাল্টা-আক্রমণ

ওদিকে শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। কলিকাতার মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিসের সাহায্য নিয়ে জোতদাররা পাল্টা-আক্রমণের ষড়যন্ত্র করল। বিভিন্ন স্থানে শুরু হল পুলিসের হামলা। স্থানে স্থানে পার্টি-নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। জেলার নেতাদের বেছে বেছে ভারতরক্ষা-আইনে গ্রেপ্তার করা হল। রাত্রির অন্ধকারে পুলিসদলের গ্রাম ঘেরাও করে কৃষকদের মারধর ও গ্রেপ্তার চলল। জোতদাররাও সক্রিয় হয়ে উঠল। তাদের আকস্মিক আক্রমণে কৃষকনেতা তন্নারায়ণ বন্দুকের গুলিতে নিহত এবং বাচ্চা মহম্মদ প্রভৃতি বহু কৃষকনেতা গুরুতর-রূপে আহত হলেন।

কৃষকরা চুপ করে মার খেল না। তারা আর তাদের ভলান্টিয়ারগণ দা, বটি, লাঠি-কুড়াল হাতে নিয়ে হাজার হাজার কৃষক মিছিল করে রাস্তায় নামল। তারা অত্যাচারের প্রতিকার এবং হত্যার প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করল। তারা জোতদার আর তাদের গুণ্ডাবাহিনীকে সুযোগ মত আক্রমণ করে তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করল। তার ফল হল চমৎকার। জোতদাররা ঘর বাড়ি ছাড়ল, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে রইল এখানে-ওখানে, অনেকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হল।

ঐতিহাসিক মিছিল

"সংগ্রামী কৃষকদের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা বেড়ে চলল। তাদের শ্রেণী-চেতনা ও সঙ্গত ক্রোধকে সঠিক পথে পরিচালনার উদ্দেশ্য নিয়ে পার্টি ও কৃষক সমিতির ডাকে মহকুমা শহর নিলফামারীতে প্রতিকার ও প্রতিরোধের দাবিতে এক বিরাট মিছিল বের করার নির্দেশ এল।

"ডিমলার মেহনতী মানুষ বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ মিছিলে সামিল হলেন। পুষ্টির অভাবে দেহ শীর্ণ। উত্তর-বাংলার প্রচণ্ড শীতেও বস্ত্রাভাবে অর্ধনগ্ন! ছোট

ছোট চেহারার মানুষগুলো জমায়েত হলেন। হাতে সকলেরই প্রমাণ সাইজের বাঁশের লাঠি। চোখে-মুখে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুন। দুপুরের পরই মিছিল ছুটল, ছুটল ডোমারের দিকে। ধ্বনি উঠল: হত্যার বিচার চাই; যাদুমিয়ার কাল্লা (মাথা) চাই, জোতদারি নিপাত যাক; তেভাগা আইন পাস কর; কৃষক-মজুর এক হও; লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ।

"ঝাড়-জঙ্গল ভেঙে মিছিল ছুটছিল। রাস্তার দুধারের পাড়া ও গ্রাম থেকে জঙ্গী মানুষ সামিল হচ্ছিলেন।……অপূর্ব দৃশ্য; অগণিত মানুষ ছুটছে, দৌড়োচ্ছে, লক্ষ্য স্থির: প্রতিকার চাই, প্রতিশোধ চাই, প্রতিরোধ চাই। …জানা গেল, অদূরে রেল কারখানা শহর সৈয়দপুরে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, ইংরেজ আমলে যেমনটি হত, তেমনই—মসজিদের সামনে বাজনা ঐরূপ কোন ছুতানাতা উপলক্ষ্য করে রেল কারখানার হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকগণ দাঙ্গা করছিল এবং গ্রাম অঞ্চলে দাঙ্গা বিস্তৃতির আশঙ্কা ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুঞ্জন শোনা গেল: এরা নাস্তিক, জাতি-ধর্ম নেই, হিন্দু-মুসলমান একসাথে খায়, ইত্যাদি…দারুণ দুশ্চিন্তা, হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, বেশীর ভাগই সংগঠনের বাইরের, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে মিছিলে এসেছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া, জরুরী সভা বসল। কিন্তু নেতারা কুল-কিনারা পাচ্ছিলেন না।

"সামনে এসে দাঁড়াল কয়েকটি যুবক। তারা বলল, হামার হাত্‌ত ছাড়ি দেও; চিন্তা না করেন। ছেড়ে না দেওয়ার পথ কোথায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বনি উঠল—"দাড়ি-টিকি (হিন্দু-মুসলমান) ভাই ভাই, লড়াইয়ের ময়দানে জাতিভেদ নেই।" সাম্প্রদায়িকতার গুঞ্জন বন্ধ হল, তড়িৎ বেগে আবহাওয়ার পরিবর্তন হল, ক্লান্ত কমরেডগণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। 'দাড়ি' ও 'টিকি' হাতে হাত মিলিয়ে রান্নাপর্ব সমাধা করলেন। ব্যবস্থা খুবই সামান্য, আধাসিদ্ধ চাল-ডাল। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ও বসে কমরেডগণ মুঠি মুঠি গলাধঃকরণ করলেন। ধ্বনি উঠল: 'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হও।'

"নানা প্রকার আতঙ্কজনক গুজবের মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটল। ভোরে আবার যাত্রা। ডোমারের কমরেডগণ যোগ দিলেন। পথিমধ্যে মিছিলের কলেবর বাড়তে লাগল। গন্তব্য নিলফামারী শহর। অর্ধপথে মিছিল থামিয়ে বিশ্রামের অবকাশে খোঁজ নিয়ে জানা গেল—ষড়যন্ত্র গভীর। খোলা গাড়িতে নিলফামারী শহরে লাশ আনা হচ্ছে। দাড়িওয়ালা লুঙ্গিপরা লাশ দেখিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর আবার মিছিল চলল। ধ্বনি উঠল:

হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।
মেহনতী মানুষের জাতিভেদ নাই॥
জোতদারী ষড়যন্ত্র ধ্বংস কর।
তেভাগা আইন পাস কর॥

"ছোট শহর নিলফামারী। দুপুরের দিকে শহরের উপকণ্ঠে মিছিল পৌঁছুল। চারদিক ধূলায় অন্ধকার, যেন রাজপুতানা অঞ্চলের আঁধি (ধূলার ঝড়)। হাজার

হাজার মানুষের পায়ে ওঠা ধূলায় আমাদের দেখা যাচ্ছিল চেহারায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-হীন কতকগুলি চলন্ত মূর্তি। অবিরাম চিৎকারে গলাভাঙা, ধ্বনিগুলির তাৎপর্য সহজে বোধগম্য হচ্ছিল না। শহরের লোক পালাতে লাগল। ঐদিন ছিল শাগামাছার হাট। হাট ভেঙে গেল, দোকান-পাট ফেলে লোকজন প্রাণ নিয়ে পালাল। মিছিল নিকটবর্তী হলে লালঝাণ্ডা চেনা গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে লালাঝাণ্ডা দেখে শহরবাসীদের আতঙ্ক দূর হল। স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল।

"মিছিল শহরে ঢুকল। জলঢাকা-কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কমরেডগণ যোগ দিলেন। গোটা শহর প্রদক্ষিণ করা হল। ধ্বনি উঠল: 'খুনের বিচার চাই। তেভাগা আইন পাস কর। দাঙ্গা বন্ধ কর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ, ইত্যাদি।

"মিছিল অন্তে ময়দানে সভা বসল। সভাপতির ভাষণে কৃষকনেতা কমরেড দীনেশ লাহিড়ী বক্তব্য রাখলেন: জোতদাররা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান আধিয়ারের শ্রেণীশত্রু। শ্রেণীশত্রুরা আমাদের মেহনতী কৃষককে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। শ্রমিক অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে শ্রমিক-কৃষক ও হিন্দু-মুসলমান আধিয়ারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা আমাদের সংগ্রামী ঐক্য ধ্বংস করতে চায়। অতএব আমাদের শপথ:

'একজন মেহনতীর বদলে
সাতজন জোতদার।'

"২৫ হাজার লাঠি উর্ধ্বে উঠল। লাঠিতে লাঠিতে শব্দ করে প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝাতে বেগ পেতে হল না। ঐ মুহূর্তে ঐ স্থানেই দাঙ্গা থামল।

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে তেভাগা সংগ্রাম[১]

"১৯৪৬ সালের ৬-৭-৮ ডিসেম্বর আসামের লামডিং-এ 'বেঙ্গল-আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স য়ুনিয়ন'-এর চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হল: 'বাংলা ও আসামের কৃষকরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য তেভাগা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে, যে-সমস্ত জমির মালিকরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা ফসলের এক তৃতীয়াংশের বেশী পাইবার অধিকারী নহেন।'

"গ্রামের গরিব ভাগচাষীদের সমর্থনে রেল-শ্রমিকদের এই প্রস্তাব শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের উৎসমুখ খুলে দিল। শুধু তাই নয়, ভাগচাষীদের দাবির জন্য রেল-শ্রমিকরা ও চা-শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে সেদিন শোষণের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লবের যে-উৎসমুখ খুলেছিল তার কাহিনী চিরস্মরণীয়।"[২]

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগার সংগ্রাম হয়েছিল বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ,

১। বিমল দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে শ্রমিক-কৃষকের রক্তের রাখীবন্ধন' (রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ)

২। বিমল দাসগুপ্তের প্রবন্ধ।

সুন্দরদীঘি প্রভৃতি অঞ্চলে। এই অঞ্চলগুলি এখন বাংলাদেশের মধ্যে। এই জেলার বিশাল ডুয়ার্স অঞ্চলটি ছিল তখন অসংগঠিত। এই অঞ্চলটি তিস্তা নদীর ওপারে। একদিন মালবাজারের রেল-শ্রমিকদের য়ুনিয়ানের অফিসে কয়েকজন আদিবাসী মানুষ এসে উপস্থিত হল। তারা এসেছে ওদলাবাড়ি থেকে লালঝাণ্ডার ইতিহাস জানবার জন্য। তারা শুনেছে, তিস্তার ওপারে তেভাগার সংগ্রামে কৃষক-নেতা মাধব দত্তের মাথা ফেটেছে; তারা এও জেনেছে যে, তাদের সংগ্রাম সমর্থন করেছে রেল-শ্রমিক য়ুনিয়ান। তাই তারা এসেছে রেল-শ্রমিকদের য়ুনিয়ানের অফিসে। যেন লালঝাণ্ডাই টেনে এনেছে তাদের এই শ্রমিক য়ুনিয়ানের অফিসে। তাদের লালঝাণ্ডা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখে য়ুনিয়ন অফিস থেকে তাদের একটি লালঝাণ্ডা উপহার দেওয়া হল শ্রমিক-কৃষক সংহতির প্রতীক হিসাবে।

১৯৪৬ সালের ৩রা মার্চ দোমোহনীতে এক জনসভার আয়োজন করা হল। এসভা কেবল শ্রমিকেরও নয়, কেবল কৃষকেরও নয়, এ হল শ্রমিক-কৃষকের যুক্ত সভা। এই অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষকের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তাই এই সভায় যোগদান করতে এল অগণিত সংখ্যায় রেল-শ্রমিক, চা-বাগানের শ্রমিক, আর ভাগচাষী ও কৃষক। সভায় শ্রমিক ও কৃষকরা এল হাজারে হাজারে।

"দোমহনীর সেই সভা শুধু সভা হল না, সারা ডুয়ার্সের রেল-শ্রমিক, চা-শ্রমিক এবং ভাগচাষী ও কৃষকদের উত্তাল তরঙ্গ উঠল। লালমণির হাট থেকে মাদারী-হাট এই দু'শো মাইল রেলপথের উপর ডুয়ার্সের জন-জীবন ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনা পয়সায় নয়—টিকেট করে। ট্রেন, আরও ট্রেন, স্পেশাল গাড়ির জন্য সে কি চাপ। শেষ পর্যন্ত চা চালান দেবার বগিগুলি কর্তৃপক্ষ দিল। কিন্তু তাতেও ধরে না। পায়ে হেঁটে রওনা হল শত শত। মেয়েরা চলেছে পিঠে বাচ্চা বেঁধে। ছেলেদের কাঁধে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, মাথায় চিঁড়ে-মুড়ির পোঁটলা।

এই সভা থেকে গভীর প্রেরণা পেল আধিয়ার কৃষকেরা। তাই এই সভার পরেই শুরু হয়ে গেল তেভাগার সংগ্রাম। রেল-শ্রমিকরা কৃষকেরই সন্তান, কৃষক। তাদের অনেকে এগিয়ে এল তেভাগার সংগ্রামে যোগদান করতে, নেতৃত্ব দিতে। তাদের একজন রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান মণি সিং। মণি সিং প্রথমে সাত দিনের ছুটি নিয়ে তেভাগার সংগ্রামে যোগদান করতে বের হলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন বুধন, গ্যাংম্যান গুটি, ট্রাফিক জমাদার যদুনাথ সিং এবং আরও অনেকে। পয়েন্টস্‌ম্যান মণি সিং সংগ্রামে যোগদান করতেন আধা-মিলিটারি পোশাকে—পায়ে বুট, মোটা ফুল মোজা, পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট, গায়ে গরম ওভারকোট, মাথায় টুপি। ৭ দিনের ছুটি নিয়ে মণি সিং যোগদান করেন সংগ্রামে। তারপর তিনি আর রেলের কাজে ফিরে যাননি।

এই অঞ্চলে তেভাগার সংগ্রাম প্রথম আরম্ভ হয়েছিল বাতাবাড়ি, পাগলা দেউলিয়াবাড়িতে। এখানকার ধান কাটার কাজ শেষ করে তেভাগার বাহিনী প্রবেশ করে তিস্তা নদী পার হয়ে নেওড়া মাঝিয়া নাথী এলাকায়। এখানে তেভাগার বাহিনী শিবির স্থাপন করল বালগোবিন্দের মাঠে। আন্দোলনের সময় এই মাঠের

নাম রাখা হয়েছিল 'পলাশীর মাঠ'। এখানে জোতদারদের পক্ষ হয়ে পুলিস প্রথম গুলি চালায়। গুলিবর্ষণে নিহত হয় চারজন, আহত হয় ২২ জন। হতাহতদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন ওদলাবাড়ি চা-বাগানের শ্রমিক—পাতরাস মাঝি, বুধু ওরাও, কর্মা খাড়িয়া, লছমন সিং প্রভৃতি।

মহাবাড়ির গয়ানাথের খোলানে তেভাগার সংগ্রাম ব্যাপক আর প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। মেটেলি থানার মহাবাড়ি থেকে মাল থানার পানোয়ার বস্তি পর্যন্ত প্রায় আট মাইল রাস্তা জুরে তেভাগার ধান কাটা চলে। এখানেও জোতদারের পক্ষে পুলিস তেভাগার বাহিনীর উপর গুলি চালায় এবং তার ফলে চারজন নিহত আর সাতজন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে একজন ছিল ৮ বছরের বালক। তার হাতে ছিল লালঝাণ্ডা। বালকটিকে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিসের উপর। তারা পুলিসদের হাত থেকে তাদের রাইফেল কেড়ে নিল, কয়েকটাকে ভেঙে ফেলল আর বাকিগুলোকে লুকিয়ে রাখল।

"গুলিতে আহতদের মধ্যে একজন আজও আছেন ওদলাবাড়িতে, নাম বুনি ওরাও। দীর্ঘদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগছেন। গুলি খাওয়া আর এক কমরেড, পুরিয়া মানকী মুণ্ডা মারা গেছেন দু'বছর হল। রেলের ট্রাফিক জমাদার যদুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে পার্টি বে-আইনী হবার পর আত্মগোপন করেন এবং সেই অবস্থার মধ্যেই টি. বি. রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

"আত্মগোপন করে চলার অবস্থায় পটল ঘোষ ও আমি একদিন পল্লীর এক রেল লাইনের উপর একজন কৃষককে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের চেনার পর সে আনন্দে আত্মহারা। ঘরে নিয়ে চা দিল চিঁড়ে দিল। পরে একটি ভাঙা রাইফেল দেখিয়ে বলল, এটা দিয়ে তার ছেলেকে পুলিস খুন করেছিল বলে আজও সে পুলিসের এই রাইফেল লুকিয়ে রেখেছে।"

(বিমল দাশগুপ্তের প্রবন্ধ)

এই অঞ্চলের ফসলের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। মাল থানা ঘেরাওয়ের ঘটনাটি তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

তেভাগার সংগ্রামের মধ্যে একদিন রটে গেল, তেভাগা সৈনিকদের একজনকে মাল থানার পুলিস গ্রেপ্তার করে থানার মধ্যে আটক রেখেছে। দ্রুতগতিতে খবরটি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। প্রায় হাজার দশেক শ্রমিক-কৃষক মাল থানা ঘেরাও করল। তার ফলে মাল-মঙ্গলবাড়ি রোড জাম হয়ে রইল কয়েক ঘণ্টা। সংবাদ শুনে জলপাইগুড়ি শহর থেকে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেট রওনা হলেন মাল থানার দিকে। কিন্তু পুলিস-সুপারের গাড়ি এগোবে কি করে, ৫-৬ মাইল পথ তেভাগার বাহিনী জাম করে রেখেছে। চালসার কাছে পুলিস-সুপারের জিপ গাড়ি আটক হয়ে পড়ল। তেভাগার বাহিনীর সৈনিকরা পুলিস সাহেবকে বলে দিল—প্রবেশ নিষেধ। সংবাদ এল মালবাজারে নেতাদের কাছে। তারা নেতাদের নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছে। নেতারা নির্দেশ দিলেন, পুলিস সাহেবকে ছেড়ে দাও, তার সঙ্গের সশস্ত্র পুলিসদের আটকে রাখ। তেভাগার সৈনিকরা পুলিস সাহেবের মাথার টুপি খুলে নিল,

সাহেবকে বলল পায়ে হেঁটে থানায় যেতে। জিপ গাড়ি রাস্তায় পড়ে রইল। থানায় এসে পুলিস সাহেব নেতাদের ডেকে থানার সব ঘর দেখালেন—থানায় কারোকে আটকে রাখা হয়নি। এর পর নেতাদের কথায় ঘেরাও তুলে নেওয়া হল। পরের দিন থেকে সমস্ত অঞ্চলে জারি হল ১৪৪ ধারা আর ব্যাপক গ্রেপ্তার।

যশোরের মুক্ত অঞ্চল[1]

তেভাগার সংগ্রামে যশোর জেলায় মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এগারখান, বড়েন্দার, দুর্গাপুর, পাঁজিয়া, কেশবপুর, মনিরামপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে বিরাট এলাকায়। লালটুপি পরা স্বেচ্ছাসেবকের বহুদল দিনরাত এই বিশাল মুক্ত অঞ্চলে সতর্ক প্রহরীর কাজ করত।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময় একদিন ভোর বেলায় কয়েক গাড়ি রাইফেলধারী পুলিস প্রবেশ করল দুর্গাপুর অঞ্চলে। নিয়ম ছিল, মুক্ত অঞ্চলে পুলিস বাহিনী প্রবেশ করলে জয়ঢাক পিটিয়ে সংকেত করার। এক গ্রামে জয়ঢাক বাজলে আশে-পাশের সব গ্রামে জয়ঢাক বাজত এবং তার ফলে গোটা অঞ্চল সতর্ক হয়ে যেত। দুর্গাপুরে পুলিস ঢুকলে দুর্গাপুর ও অন্যসব অঞ্চলে জয়ঢাক বেজে উঠল। কিছুক্ষণ জয়ঢাক বেজে তা থেমে গেল।

জয়ঢাকের বাজনা শুনেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক মাঠে নেমে এল নানা রকমের হাতিয়ার নিয়ে—কারোর হাতে সড়কি, কারোর লাঠি, কারোর হাতে দা। অনেকের হাতেই ছিল ঢাল আর সড়কি। সশস্ত্র কৃষকরা এগিয়ে গেল পুলিস যেদিকে গেছে সেই দিকে। পুলিস বাহিনী ফিরে আসছিল মার্চ করে। রাস্তায় কৃষক বাহিনী আর পুলিস বাহিনী মুখোমুখি হল। পুলিসের সংখ্যা কয়েকজন অফিসার নিয়ে প্রায় ৭০ জন, আর কৃষকরা কয়েক হাজার, ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

একজন অফিসার এগিয়ে এসে বলল, "আপনারা রাস্তা বন্ধ করবেন না, পুলিসকে যাবার পথ করে দিন।" পার্টি-নেতা নূরজালাল জবাব দিলেন, "আগে পুলিস বাহিনীকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কেন কৃষকের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে, কেন তাদের বাড়ি তচনচ করা হয়েছে, কেন কৃষক সমিতির অনুমতি না নিয়ে এই অঞ্চলে আপনারা প্রবেশ করেছেন। যতক্ষণ এই প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কৃষকরা না পাবেন ততক্ষণ পুলিস বাহিনীকে তারা যাবার কোন রাস্তাই দেবেন না।" আর একজন অফিসার এগিয়ে এসে নেতাদের বোঝালেন পুলিসকে রাস্তা দেবার জন্য। কিন্তু কোন ফল হল না। নূরজালালের এক কথা, "পুলিসকে আগে জবাবদিহি করতে হবে"।

নূরজালালের উত্তর শুনে পুলিস অফিসাররা একত্র হয়ে কি পরামর্শ করলেন। তখন ঘটনাস্থলে কয়েকশত সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক সমবেত হয়েছে। তাদের হাতে বিভিন্ন হাতিয়ার। যাদের হাতে ঢাল-সড়কি, তারা সামনে এগিয়ে এল—মনে হল

১। পলাশ রায়ের 'যশোরের মুক্ত অঞ্চল' প্রবন্ধ অবলম্বনে।

পুলিসের আক্রমণ আসন্ন। পুলিস অফিসাররা আক্রমণের সিদ্ধান্তই নিল। দেখা গেল, রাইফেলধারী পুলিসরা দুই সারিতে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তুলে নিশানা করছে। নূরজালাল নির্দেশ দিলেন, "যাদের কাছে ঢাল-সড়কি আছে তারা প্রস্তুত হোন। দেখা গেল, তারাও পুলিসের মত সুশৃঙ্খলভাবে ঢালের আড়ালে হাঁটুগেড়ে বসে নিশানা ঠিক করছে।

পুলিসের একজন অফিসার চিৎকার করে বলল, "ফায়ার"। সঙ্গে সঙ্গে নূরজালাল গম্ভীর গলায় পাল্টা নির্দেশ দিলেন, "কমরেডগণ, একটা গুলির শব্দ হলে ওদের সব-কটাকে আপনারা সড়কি দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবেন—মনে রাখবেন, ওদের বুলেট লক্ষভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনাদের বড় বড় সড়কিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।"

"ভাবছিলাম এখুনি হয়তো আমরা তিনজন সহ বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ব—বাঁচব কি মরব পরের কথা। প্রতিটি সেকেণ্ডে মনে হচ্ছে যেন সুদীর্ঘ এক একটি যুগ। 'স্লোগান' বন্ধ হয়ে গেছে। সব নিস্তব্ধ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, গুলির আওয়াজ হল না। অফিসারটি আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'ফায়ার'। কিন্তু না, এবারেও গুলির আওয়াজ হল না। অফিসারটি এবার ক্ষেপে গেলেন—'ফায়ার', 'ফায়ার' করে কয়েকবার চিৎকার করলেন, তবু গুলি চলল না। দেখা গেল, পুলিস বাহিনী উঠে দাঁড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো হল, তারপর রাস্তার পাশে একটা বড় আম গাছের তলায় আশ্রয় নিল। আমাদের কাছে পুরো ঘটনাটাই যেন অবিশ্বাস্য এবং অপ্রত্যাশিত মনে হল। কিছুটা সময় পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া কেউ কোন কথাই বলতে পারলাম না। স্তব্ধতা ভেঙে কমরেড নূরজালালের কণ্ঠস্বর শোনলাম, 'কমরেডস্, পুলিস গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। এই সমস্ত গরিব পুলিস চাকরির জন্য বন্দুক ঘাড়ে করে এখানে এসেছেন সত্য কথা, কিন্তু এঁরাও আপনার আমার মত গরিব চাষীর সন্তান—ঘরে খাবারের অভাবের জন্যই পুলিসে চাকরি নিয়েছেন। আজ যখন আমাদের উপর গুলি চালাতে পুলিস অফিসারটি ওঁদের উপর হুকুম করছিল—ওঁদের চোখে তখন ভেসে উঠছিল ওঁদের গ্রামের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা, যারা আমাদের মতই চাষী—তাই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে ওঁদের মন রাজী হয় নি'......"

এই ঘটনার দুইদিন পর 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়, "নড়াইলের কৃষক-জনতার উপর পুলিসের গুলি চালাতে অস্বীকৃতি"।

খুলনা জেলার তেভাগার সংগ্রাম[১]

১৯৪০ সালের সংগ্রাম

১৯৪০ সালের কথা। গ্রামে গ্রামে বৈঠক শুরু হয়েছে। বৈঠক বসেছে বলোটি গ্রামে। ঐ অঞ্চলের নেতা ডোবার বিভূতি রায়, সুবল মিত্র (প্রবন্ধের লেখক),

১। সুবল মিত্র: 'মৌভোগ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতি' প্রবন্ধ অবলম্বনে (তেভাগা সংগ্রাম—রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ)।

প্রভাত মুখার্জি, মহেন্দ্র খাঁ, সহদেব মণ্ডল, মধু মোল্লা এবং আরও অনেকে এসে ঐ সভায় বললেন, 'এবার জমির মালিককে আমরা আধাআধি ফসল দেব না, চাষী নেবে তিনভাগের দুভাগ, একভাগ মালিকের। অনেকেই বললেন, ব্যাপারটা জরুরী, কৃষকদের বাঁচতে হবে। এই অঞ্চলের সব গ্রাম সভা ফসল পাকার আগে শেষ করতে হবে। সভাগুলি হবে গোপনে। সকলে স্থির করলেন, একমাসের মধ্যে গ্রাম সভা শেষ করে সিদ্ধান্ত নেব —তেভাগা হবে কিনা। খুলনার সদর থানার এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে এবং ফকিরহাট থানার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে গ্রাম বৈঠকের ব্যবস্থা হল। সুষ্ঠু ভাবে গ্রাম সভা হল। পুলিসের আনাগোনা বেড়ে গেল, কিছু কর্মী গ্রেপ্তার হলেন, অন্য সবাই গা-ঢাকা দিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন। সংঘর্ষও হল কয়েক জায়গায়। কিন্তু তেভাগার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে দ্রুতবেগে। ভূ-সম্পত্তির মালিক মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আতঙ্কিত হল, অনেকে পুলিসের আশ্রয় নিল। তারা গা-ঢাকা দেওয়া কর্মীদের নামে থানায় ডায়েরী করল। গোয়েন্দা দপ্তর সক্রিয় হয়ে উঠল। এই অবস্থায় ঠিক হল, সমস্ত কৃষকদের জড়ো করে প্রথম ধানকাটা শুরু হবে বলোটি গ্রাম থেকে। ধানক্ষেতে পাহারা দেবার দায়িত্ব নিলেন কৃষক সভার লেঠেলরা।

শীতের রাতে মশাল জেলে প্রায় ৫০০ কৃষক মাঠে নামল ধান কাটতে। জমিদার-দের লেঠেলরাও জড়ো হল মাঠের ধারে। তাদের সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষ হল কৃষক সভার লেঠেলদের। জমিদারের লেঠেলরা প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়ে গেল। অনেক কৃষক আহত হল সড়কি ও লাঠির ঘায়ে। পরের দিন পুলিস এসে গ্রাম ঘিরে ফেলল। তারা গ্রামে কোন পুরুষকে না পেয়ে কয়েকজন স্ত্রীলোক আর বালককে ধরে নিয়ে গেল।

এরপর স্থির হল, একসঙ্গে অনেকগুলি গ্রামে ধানকাটা হবে। অনেকগুলি গ্রামে কৃষকরা ধান কেটে ঘরে তুলল। জমিদারদের লেঠেলদের সঙ্গে বহুস্থানে কৃষক সভার লেঠেলদের সংঘর্ষ হল, পুলিস বহু কৃষককে গ্রেপ্তার করল।

একদিন একটি ঘটনা ঘটল ঘটভোগ গ্রামে। বিত্তবান ও অল্পবিত্ত পরিবারের পক্ষ হয়ে একদল লোক জোর করে কৃষকদের কাটা ধান কেড়ে নিতে এল। এর ফলে তাদের সঙ্গে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কৃষক ও মুসলমান কৃষকদের ভীষণ সংঘর্ষ হল। তার ফলে বহু কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারেরও অনেকে আহত হল। এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন কৃষক-দরদী বাহিরদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক যতীন ব্যানার্জি মহাশয়। কিন্তু কৃষকরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁকেও লাঠির আঘাত করল। তিনি আহত অবস্থায়ও কৃষকদের কাছে আবেদন করলেন, "তোমরা শান্ত হও, তেভাগা নিয়ে আমরা আজই আলোচনায় বসব, আমি তোমাদের শত্রু নই। তোমরা সংঘর্ষ থেকে বিরত হও, আর রক্তক্ষয় করো না।"

কৃষকদের মধ্যে অনেকে তাকে চিনতে পেরে ছুটে এল, তাঁর শুশ্রূষা করল, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইল। তাঁর আবেদনে কৃষকরা শান্ত হল। সেইদিন রাত্রেই বৈঠক বসল। শিক্ষক মহাশয়ের চেষ্টায় স্থির হল, মাত্র তিন বিঘা জমির মালিকের যাদের

অন্য কোন জীবিকার ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ ঐ তিন বিঘা জমির উপরই যাদের ভরণ-পোষণ নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রে তেভাগা প্রয়োগ করা হবে না। এই সিদ্ধান্তে উভয় পক্ষ সম্মত হল। আরও স্থির হল, যদি কোথাও বিপদ দেখা দেয় তবে কৃষক সমিতি ও জমির মালিকদের যুক্ত-কমিটি বিচার করে যা রায় দেবে তা উভয় পক্ষ মেনে নেবে।

ঘটভোগ গ্রামের এই ঘটনা অন্যসব গ্রামে প্রচারিত হওয়ায় সবাই তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু লালচন্দ্রপুরের জমিদার এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে তার লেঠেলদের দিয়ে ঢাল-সড়কি, এমন কি বন্দুক নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে বহু লোক আহত হয়।

এই তেভাগার সংগ্রাম নূতন নূতন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পর বৎসর ১৯৪১-৪২ সালে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তার ফলে কোন কোন এলাকায় জমির মালিক ও পুলিস একত্রে মিলে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়। আবার, কোন কোন এলাকায় কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধান কেটে ঘরে তোলে এবং জমির মালিকদের দিয়ে তেভাগা স্বীকার করিয়ে নেয়।

১৯৪৬ সালের সংগ্রাম

১৯৪৬ সালে মৌভোগে ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন (প্রাদেশিক) হয়। এই সম্মেলনে এক সঙ্গে সারা বাংলায় তেভাগার আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর শুরু হয় সারা বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। শত শত কৃষক লাঠি ও গুলির আঘাতে নিহত ও আহত হয়। তারপর শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের উস্কানিতে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে বাগেরহাটের কৃষকেরাও রুখে দাঁড়াল। মৌভোগের ৬০ বছরের বৃদ্ধ এয়াছিন ফকির (অন্ধ) এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা গিরিধর মণ্ডল স্বেচ্ছাসেবক হয়ে সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রচার করেন। কৃষক সভার কর্মীরাও সর্বত্র গ্রাম-বৈঠক করে কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত করেন। সেই জন্যই মৌভোগ অঞ্চলে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

"লক্ষ লক্ষ কৃষক লালঝাণ্ডা নিয়ে ধান কাটতে শুরু করলেন। এবার আধি নয়, তেভাগা। মোটামুটি বলা যায়, খুলনা জেলার সদর মহকুমা বাগেরহাট মহকুমা এবং সাতক্ষীরা মহকুমায় আংশিক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল। রূপসা নদীর তীর থেকে বাগেরহাট নদী পার হয়ে চিতলমারি পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কচুয়া থানা, রামপাল, মরনখোলা, বটেৰাটা, দাকোন প্রভৃতি থানা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে তেভাগা আন্দোলন হয়।" (সুবল মিত্রের প্রবন্ধ)

দাকোন থানায় স্থানীয় কৃষক নেতা হিমাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথমই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিসের গুলিতে বহু কৃষক নিহত ও আহত হয়। কৃষক নেতা সুরেন বিশ্বাসও গুরুতররূপে আহত হন।

"একদিকে প্রচণ্ড কৃষক আন্দোলন, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কৃষকদের মনে

এনে দিল সংশয়। আমরাও চুপ করে বসে রইলাম না। গ্রামে গ্রামে কৃষকেরা নেমে পড়লেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। কৃষক ভলান্টিয়াররা দিনরাত গ্রামে পাহারা দিলেন। এরপর অবস্থা শান্ত হল।” (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

ময়মনসিংহের তেভাগার আন্দোলন[১]

“উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় নীলচাষীদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পর এই প্রথম এ শতাব্দীর ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগার লড়াই বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে।

“১৯৪৬ সালে একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উস্কানি ও ষড়যন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গস্রোত। এই পটভূমিতে ‘কমিউনিস্ট’ পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে তেভাগার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আওয়াজ ওঠে এবং গ্রামবাংলা বিক্ষোভের আগুনে ফেটে পড়ে। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই শহরমুখী গণ-আন্দোলনের পরিধি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত হয়।”[২]

সমগ্র ভারতের জেলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিংহ বৃহত্তম। আয়তনে এই জেলা য়ুরোপের ইতালী দেশ অপেক্ষাও বৃহত্তর। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পূর্বে এই জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষাধিক, আর এই বিপুল জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ জনই ছিল ভাগচাষী।

১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলিকাতায় যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম প্রধান ময়মনসিংহ জেলায়ও এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিস্তার ঘটে, চারদিকে বিভেদের শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অবস্থার মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান এবং হাজং, গারো, কোচ, ডালু, বানাই প্রভৃতি আদিবাসী কৃষকদের জমি ও ফসলের দাবিতে সম্মিলিত সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তা ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং উত্তেজনার মধ্যে তেভাগার সংগ্রাম এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তেভাগার সংগ্রামের মাধ্যমে এক অখণ্ড হিন্দু-মুসলিম সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে।

“এই জেলায় কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের নেতৃত্বে ইতিপূর্বেই ১৯৩৭-৩৮ সালে ‘টংক প্রথা’ (ধানে খাজনা দেওয়া) রহিতের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে—টংক চাষীদের এই সংগ্রাম সমগ্রভাবে জেলার কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজকে উদ্দীপিত করে তোলে। টংক আন্দোলনে যেমন প্রধানত আদিবাসী কৃষকদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল, তেমনি প্রধানত মুসলিম কৃষকরা ছিল তেভাগার লড়াইয়ে পুরোভাগে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে এই সংগ্রাম

১। আশু দত্ত: ‘ময়মনসিংহে তেভাগা আন্দোলনের এক অধ্যায়’ প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।
২। আশু দত্ত: ময়মনসিংহের তেভাগা আন্দোলন।

একই তরঙ্গস্রোতে এগিয়ে চলে এবং এই সংগ্রামী ঐক্য ময়মনসিংহের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নুতন সম্ভাবনার সূচনা করে।

"তেভাগা চাই, ফসল কেটে ঘরে তোল, দখল রেখে চাষ কর, টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, জান দেব তবু ধান দেব না, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, প্রভৃতি দাবিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা গর্জে ওঠে এবং ১৯৪৬-এর নভেম্বরে সারা জেলায় তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে যায়। পূর্ব-নির্ধারিত ও শুধু সংগঠিত এলাকার মধ্যেই এই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকেনি।"

মাত্র এক সপ্তাহ আগে কিশোরগঞ্জের চাতল ও বাঘাটা এলাকায় এক মহিলা সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নিহত হয়। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই এলাকারই শতাধিক মুসলিম এবং ৪৭টি হিন্দু ভাগচাষী পরিবার জোতদারদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ছোট জোতদারেরা কৃষক সমিতির সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসায় পৌঁছাতে বাধ্য হয়।

চাতলের কৃষক সমিতি ভাগচাষী ও জোতদারদের সমস্যা নিয়ে একটি সালিশী বোর্ড গঠন করে। এর ফলে ছোট ছোট প্রায় ৫০ জন জোতদার ভাগচাষীদের সঙ্গে আপস করে। বড় জোতদারেরা ভাগচাষীদের কোন দাবি মানতে সম্মত হল না।

এই এলাকার অন্যতম ধনী জোতদার ললিত বাগচী ও ফটিক বাগচী ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে পুলিসের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। এই সংবাদ জানতে পেরে হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ একযোগে জোতদার বাগচীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ভয় পেয়ে ললিত বাগচী জেলা কৃষক সমিতির কাছে বয়কট তুলে নেবার জন্য আপসের প্রস্তাব পাঠায়।

ময়মনসিংহ জেলার কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী এলাকা কিশোরগঞ্জ মহকুমা। এই মহকুমার রসিদাবাদ, করিমগঞ্জ, নিয়ামতপুর, নীলগঞ্জ প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলের কৃষকগণ তেভাগার দাবিতে সংগ্রাম শুরু করে এবং জোতদারের খামারে ধান তোলা বন্ধ করে দেয়। পুলিস জোতদারদের পক্ষ হয়ে কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। হরনাথ মণ্ডল নামে একজন কৃষক-কর্মীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে জোতদারের বাড়ীতে আটক রাখে এবং জোতদারের পক্ষে পুলিস হরনাথের বাড়ি থেকে সমস্ত ধান লুট করে নিয়ে যায়। বানীগ্রাম অঞ্চলে পুলিস দাঙ্গা-বিরোধী শান্তি কমিটির নেতা অমর বাগচী, নরেন্দ্র দাসসহ বহু কৃষক-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হাটে হাটে ঢোল দিয়ে ঘোষণা করে: যে ভাগচাষীরা প্রচলিত নিয়ম মানবে না অর্থাৎ ফসলের তিন ভাগ দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন কোন এলাকায় পুলিসই দিন-মজুর হিসাবে জোতদারদের ফসল কাটার কাজে সাহায্য করে। অনেক এলাকায় ভাগচাষীরা ফসল কাটতে শুরু করলে সশস্ত্র পুলিস ভাগচাষীদের কাজে বাধা দেয় এবং তাদের গুরুতরভাবে জখম করে।

নেত্রকোনা মহকুমায় ভাগচাষীদের তেভাগার সংগ্রাম জঙ্গীরূপ গ্রহণ করে।

সশস্ত্র পুলিসের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের সংগ্রামে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুররাও যোগদান করে। বহুস্থানে পুলিসের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ হয়।

তেভাগার সংগ্রাম চলাকালে অবিভক্ত বাংলার গভর্নর বরোজ সাহেব ময়মনসিংহ জেলা সফর করে এবং একটি সভায় তেভাগার বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেয়। লাট সাহেবের এই বক্তৃতার পর থেকে সমগ্র জেলায় জোতদারদের পক্ষে এবং ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পুলিসী সন্ত্রাস আরম্ভ হয়। জোতদারদের ফসলের অর্ধেক দিতে অস্বীকার করার অভিযোগে তিন শতাধিক ও কমিউনিস্ট কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়। এমনকি বিচার বিভাগের হাকিমরাও জোতদারদের পক্ষে এবং ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। নেত্রকোণার মহকুমা হাকিম প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে এবং জোতদারদের প্রতিশ্রুতি দেয়ঃ "আপনারা মামলা দায়ের করুন, আমি কমিউনিস্টদের উচিত শিক্ষা দেব।" এই এলাকা সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে স্থানীয় মহকুমা শাসকের এক নোট উদ্ধৃত করে বলা হয়ঃ

"কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ও উস্কানিতে কলিয়াটি ও সিংহের বাংলায় ভাগচাষীরা প্রতিটি জমির সমুদয় ফসল কেটে জোতদারদের খামারে না তুলে নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যায়। এইভাবে তারা প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে চলেছে। জমির মালিকদের অভিযোগক্রমে আমি জামিনের অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছি।"

আন্দোলনের বিস্তার

এই পুলিসী জুলুম ও দমন-নীতি সত্ত্বেও সংগঠিত এলাকার আন্দোলনের সংবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারিত হওয়ার পর বিভিন্ন স্থানের কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তেভাগার সংগ্রামে যোগদান করতে থাকে। কৃষক সমিতি তেভাগার বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি ইস্তাহার প্রচার করে। এই ইস্তাহারটি পড়েই কতকগুলি অসংগঠিত এলাকার ভাগচাষীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তেভাগা কায়েম করে এবং কৃষক সমিতি গড়ে তোলে। টাঙ্গাইলের গোপালপুর, সাহজানপুর, মধুপুর, নন্দনপুর ও আরও কতকগুলি সংগঠিত ও অসংগঠিত এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। টাঙ্গাইলে আন্দোলনের জোর দেখে জোতদারেরা ভাগচাষীদের তেভাগার দাবি মেনে নেয়। জামালপুর মহকুমা শহরের নিকটবর্তী রসিদপুর, চন্দ্রা, বগাবাইদ প্রভৃতি মুসলমান প্রধান ৮টি এলাকায় ভাগচাষীরা সভা ও মিছিল সহকারে তেভাগার আন্দোলন শুরু করে। কয়েকটি এলাকায় জোতদারেরা ভাগচাষীদের তেভাগার দাবি মেনে নেয়।

আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রাম

ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসী কৃষকরাও এই সংগ্রাম থেকে পিছনে ছিল না। আদিবাসী কৃষক অঞ্চল নালিতাবাড়িতে তেভাগার সংগ্রামে প্রথম শহীদ হলেন সর্বেশ্বর ডালু। তেভাগার সংগ্রামে এই অগ্রনী জঙ্গী কৃষক-কর্মী জোতদারের

গুণ্ডাদের আক্রমণে নিহত হন। কৃষকনেতা সর্বেশ্বর ডালুর হত্যার প্রতিবাদে এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। জোতদারদের শূন্য খামারগুলো তখন পুলিসের ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ কৃষকরা এই এলাকার তিনটি খামার আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

৮ই ডিসেম্বর সুসংয়ে তেভাগার সমর্থনে ও টংক প্রথার উচ্ছেদের দাবিতে পাঁচ হাজারেরও বেশী আদিবাসী কৃষক ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক বিরাট সভা করে। এই সভা থেকে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানান হয়।

ছাত্র-আন্দোলনের সমর্থন

এই সময় ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিস গুলিবর্ষণ করে। তার ফলে ছাত্রনেতা অমলেন্দু নিহত হয় এবং বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী শ্রীমতী অনিতা ঘোষসহ আরও কয়েকজন গুলিবর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়। এই গুলি চালনার প্রতিবাদে শহরের সমস্ত মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বিক্ষোভের ফলে ময়মনসিংহ শহরের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। শহরের সমস্ত মানুষ রাজপথে নামে এবং প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রা দিনরাত চলে। "এইভাবে গ্রামাঞ্চলে তেভাগা ও টংক বিরোধী সংগ্রামের পাশে পাশে শহরের বিক্ষোভ আন্দোলন এই জেলার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে এক নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।" (আশু দত্তের প্রবন্ধ)

সরকারী দমন-নীতি

এই সময় ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিল কুখ্যাত ব্যাস্টিন সাহেব। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গ্রাম ও শহরের এই আন্দোলন রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর মহকুমার সংগঠিত কৃষক এলাকাগুলোতে এক পরিকল্পিত দমননীতি চালাতে শুরু করে। সেই সঙ্গে আদিবাসী এলাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিরীহ ও নিরস্ত্র কৃষকদের উপর সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারি লেলিয়ে দেয়। এই আদিবাসী কৃষকদের উপর উন্মত্ত পুলিস ও মিলিটারি অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে আদিবাসী কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে থাকে, তাদের হাতে বহু কৃষক হতাহত হয়। সমগ্র জেলা যেন একটি বন্দীশিবিরে পরিণত হয়।

"বিশেষভাবে 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' বাহিনীকে পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী কৃষক এলাকায় মোতায়েন করা হয়। 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস' বাহিনী আর সশস্ত্র পুলিস এলাকা অবরোধ করে এবং তাদের মিলিত অভিযান চলতে থাকে এলাকার প্রতি প্রান্তে। ফলে এই অঞ্চলে লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, হত্যা, গ্রেপ্তার, জেল প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

"৩১ জানুয়ারী বহেরাতলী গ্রামে ব্যাস্টিনের মিলিটারি-পুলিসের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে। ১৭ বছরের কৃষকবধূ কুমুদিনীকে পুলিস জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তাকে রক্ষার জন্য সুরেন্দ্র ও রাসমনির নেতৃত্বে প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগ সর্বকালের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতুলনীয় গৌরবোজ্জল কাহিনী।"

(আশু দত্তের প্রবন্ধ)

১লা ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র পুলিস বাহিনী "কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান" বলে কথিত লেঙ্গুরা গ্রামে প্রবেশ করে এবং প্রায় ২০টি কৃষক পরিবারের ঘরবাড়ি ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়। তারা কৃষকনেতা ললিত সরকারের সমস্ত ধান লুট করে নিয়ে যায়। এই পুলিসী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তখনকার অবিভক্ত বাংলা-দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ভবানী সেন নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দেন :

"ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের আরও বিভিন্ন জেলায় ভাগ-চাষীদের উপর বেপরোয়া পুলিসী হামলা চলছে। এই ভাগচাষীরাই গায়ের রক্ত জল করে ফসল উৎপন্ন করে এবং তারা এই উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য দাবি উপস্থিত করেছে। এবং সরকার নিযুক্ত ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত ফ্লাউড কমিশনও ১৯৪০ সালে ভাগচাষীদের এই দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে সুপারিশ করে।"

এ ছাড়া কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী ময়মনসিংহে পুলিস-মিলিটারির অত্যাচার সম্পর্কে উল্লেখ করে গান্ধী, নেহরু, জিন্না ও প্যাটেলের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। এই তারবার্তায় তিনি লিখেছিলেন :

" 'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল' গুলি চালিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সুসং পরগনার কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করছে। বহু নিরস্ত্র কৃষক ও কৃষক রমণীদের খুন করা হয়েছে। দুর্গাপুর, নালিতাবাড়ি, কলমাকান্দা, শেরপুর—এই চারটি থানার বহু গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রামের খাবার লুট করেছে, স্ত্রীলোকদের বে-ইজ্জত করেছে, আহত করেছে। বহু বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। মেসিনগান, টমিগান, উড়োজাহাজ—এসব আনা হয়েছে। জনসাধারণ অভুক্ত, আহত, অরক্ষিত। আপনাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনীয়।"

"ঐ তেভাগা টংক আন্দোলন যখন আরও উচ্চ স্তরের সংগ্রামের মাধ্যমে আমূল ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে বৈপ্লবিক পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল তখনই হল দেশভাগ। বিদেশী শাসন-ক্ষমতা আপসে হস্তান্তরিত হল দেশীয় শাসকদের হাতে। কিন্তু গভীর ক্ষোভ ও লজ্জার কথা, আজও চাষীদের মৌলিক দাবি প্রতিষ্ঠিত হল না। সেদিন বাংলার দিকে দিকে তেভাগার দাবিতে এবং টংক উচ্ছেদের জন্য কৃষক অভ্যুত্থানের সেই অবিস্মরণীয় আগুনঝরা দিনগুলোর কথা বাংলার মেহনতী, সংগ্রামী মানুষ কোনদিন ভুলবে না।"

(আশু দত্তের প্রবন্ধ)

মেদিনীপুরে তেভাগা সংগ্রাম[১]

মেদিনীপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্য

"মেদিনীপুর জেলার কৃষক সমাজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে ছিল সবচেয়ে আগুয়ান। ১৯২০-২৪ সালে অসহযোগ আন্দোলনে, ১৯৩০-৩৪ সালে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে সমান বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, কর বন্ধ আন্দোলনে চার-ছয় আনা চৌকিদারী কর না দিয়ে বহুমূল্যের গরু-ছাগল ও তৈজস-পত্রাদি পুলিসকে ক্রোক করে নিয়ে যেতে ছেড়ে দিয়েছে, তেমনি আবার এই জেলায় তিন-তিনটি অত্যাচারী সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার ঘটনায় হাসিমুখে অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছে উৎসাহ নিয়ে। ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামের সাথে ব্রিটিশের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য ব্রিটিশ-জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে লড়াই, খড়্গপুর থানায় ধারেন্দা পরগনার সাঁজাভাঙা আন্দোলন, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, ময়না থানাগুলিতে আনিশুনি আবওয়াব আদায় বন্ধ ও কর্জাধানের সুদ কমানোর আন্দোলন এবং জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তমলুক, পাঁশকুড়া, দাসপুর, কেশপুর ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি থানাগুলিতে সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম দীর্ঘ বছর ধরে চলেছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ডাকা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে এ জেলার কৃষক সমাজ সারা জেলাতেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন ১৯৪২-এর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু, তারও বিরুদ্ধে লোন, রিলিফ ও বাঁচার সংগ্রামে কৃষকরা পিছিয়ে পড়েনি।

* * *

এই বিপুল সংগ্রামী ঐতিহ্য নিয়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বিপুল করভারে জর্জরিত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য-সংকটের চাপে পিষ্ট হয়ে মেদিনীপুরের কৃষক সমাজ, বিশেষ করে গরিব কৃষক, ভূমিহীন ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুর জীবনের অভিজ্ঞতায় এক নূতন চেতনা নিয়ে এগিয়ে এল প্রাদেশিক কৃষক সভার তেভাগা প্রতিষ্ঠার নূতন সংগ্রামের ডাকে। কৃষক সভার ধ্বনি ছিল —"এই ফসলেই তেভাগা চাই," "রসিদ ছাড়া ধান নেই"; সুতরাং "জোতদারের খামার নয়, চাষীর হেফাজতে খামারে ধান তোল, তেভাগার দাবি আদায় কর"। কৃষক সভার এই ডাক জেলার সমগ্র ভাগচাষ-প্রধান অঞ্চলে গরিব কৃষক ও ভূমিহীন ভাগচাষীদের কাছে বাঁচার পথ হিসাবে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করল।

জেলার কৃষক নেতৃত্ব স্থির করল জেলার ভাগচাষ-প্রধান অঞ্চলগুলিতে এই আন্দোলন দ্রুত সংগঠিত করতে হবে, কৃষি-মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলতে হবে। এ ছাড়া, সংগ্রামী ভাগচাষীদের পাশে ছোট ও মাঝারী রায়ত প্রজাদেরও সমবেত করার জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে "বাকী-বকেয়া খাজনা মকুব, হাজাশুকায় খাজনা ছাড় এবং উপযুক্ত সেচ ও জল-নিকাশীর সুব্যবস্থার" দাবিতে খাজনা বন্ধ আন্দোলনও

১। ভূপাল পাণ্ডা : 'মেদিনীপুরে তেভাগার সংগ্রাম' প্রবন্ধ অবলম্বনে।

ব্যাপক ও জোরদার করে তুলতে হবে, তা না হলে ব্রিটিশ সরকারের পুলিসের আক্রমণে একক ভাগচাষীদের সংগ্রাম বিছিন্ন ও পরাজিত হতে পারে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রত্যককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান হল। জেলার তেভাগার সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে ভূপাল পাণ্ডা, অনন্ত মাজি. সরোজ রায়, রাখাল বাগ, বঙ্কিম গিরি, পতিত জানা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের উপর। আরও সিদ্ধান্ত হল, তমলুক মহকুমা, বিশেষ করে নন্দীগ্রাম থানা, ব্যাপক ভাগচাষ-প্রধান বলে এখানেই আন্দোলন সুসংগঠিত করে সফলতা লাভের পথে নিয়ে যেতে হবে। তেভাগার আন্দোলনের জন্য ছাত্রকর্মীদেরও সংগঠিত করা হল। তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে ব্যাপক প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলে পাঠান হল। মহিলা নেত্রী বিমলা মাজিকে পাঠান হল মেয়েদের সংগঠিত ও সংগ্রামে সামিল করার জন্য।

এই গরিব ভূমিহীন ভাগচাষীদের উপর সরকার ও জোতদার-মহাজনদের শোষণ-উৎপীড়ন চলত সবচেয়ে বেশী, আর এরাই সংখ্যায় কৃষক সাধারণের অধিকাংশ। এই জন্যই তেভাগার সংগ্রাম সেই সময়কার সব আন্দোলন থেকে ব্যাপক ও জঙ্গীরূপ গ্রহণ করে। যে সব বড় জোতদারের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক ও জঙ্গীরূপ গ্রহণ করে, তারা হল নন্দীগ্রাম থানার মনুচকের দেওয়ান সাহেব, কেন্দেমারীর জানা পরিবার, মহম্মদপুরের পড়ুয়া ও মাইতি পরিবার, গড়চক্রবেড়্যার খাঁ পরিবার, কালীচরণপুরের সাগরদাস পরিবার, গোপালচকের সিং পরিবার; মহিষাদলের মাইতি পরিবার, সুতাহাটার শ্যামচরণ ত্রিপাঠী, পাঁশকুড়ার হরিসাধন চক্রবর্তী চৌধুরী, ময়নার আসনামের দাস পরিবার, কেশপুর-আমনপুরের চৌধুরী পরিবার প্রভৃতি। এই সব বড় জোতদারের অধীনে ভাগচাষী-প্রধান গ্রামগুলিতে কৃষকদের সংগ্রাম কমিটি গঠন করে প্রত্যেক মালিকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। আর ঐ সব আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধিদের এবং জেলা কৃষক-নেতাদের নিয়ে থানা সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠে। এই সব আঞ্চলিক কমিটি দ্বারাই বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুসারে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। প্রতিগ্রামে সংগ্রাম কমিটির অধীনে গঠিত হয় জঙ্গী কৃষক যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং জঙ্গী মেয়েদের নিয়ে নারী বাহিনী।

"তেভাগার দাবির ন্যায্যতা, ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ, রসিদ না দিয়ে জোতদার-মহাজন শ্রেণীর নির্মম শোষণের ঘটনাবলী তুলে ধরে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কৃষকদের প্রতিবাদ ও ভাগচাষীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাটে-বাজারে ব্যাপক প্রচার ও পোস্টারিং চলে। মাঝে মাঝে সংগঠিত কৃষক বাহিনীর লালঝাণ্ডা উড়িয়ে আন্দোলন, এলাকা জুড়ে জঙ্গী 'কৃষক ভলান্টিয়ার মার্চ' সমগ্র এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেলার সর্বত্র ভাগচাষীদের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামের পর গ্রামে ভূমিহীন ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুরেরা এই আন্দোলনের সামিল হয়ে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে। সর্বত্রই একই আওয়াজ—'এই ফসলেই তেভাগা চাই; রসিদ

ছাড়া ধান নাই; মালিকের খামার নয়, চাষীর পঞ্চায়েত খামারে ধান তোল; তেভাগার দাবি আদায় কর'।"

এদিকে প্রচণ্ডভাবে আতঙ্কিত বড় বড় জোতদার-মালিকগোষ্ঠী জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের দরবারে গিয়ে ধর্না দিতে থাকে। তাদের দাবি—"সর্বনাশ হল, গ্রামের ছোটলোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে ঐ লালঝাণ্ডার দল, ওরা ধান নিয়ে পালাচ্ছে, আমাদের কি হবে? এখনই পুলিশ চাই, ঐ পাণ্ডাদের গ্রেপ্তার করুন। ওরা হিংসা, খুন-জখম, বে-আইনি লুটপাট, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, ওদের দমন করুন।"

ইংরেজ শাসকরাও তাদের এই গোলামদের রক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে থানায় থানায় সশস্ত্র পুলিস বাহিনী পাঠাতে থাকে। আন্দোলনের সমস্ত এলাকাগুলিতেই মাঝে মাঝে পুলিস ক্যাম্প বসে যায়। পুলিস প্রধানত দখল করে গ্রামের জোতদারের নিজ বাড়ি, কাছারি-বাড়ি বা গ্রামের স্কুলগুলি।

"এরপর শুরু হয় মাঠের ধান খামারে তোলার সংগ্রাম। আতঙ্কিত বড় জোতদার-মালিকগোষ্ঠী এখন সমস্বার্থে ছোট-মাঝারি জমির অ-কৃষক মালিক মধ্য-বিত্তদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে দিনরাত পরামর্শ চালায় কী করে এই চাষীদের একতা ভাঙ্গা যায়—ধান নিজ খামারে আনা যায়। সুকৌশলে প্রথমত একদিকে মিথ্যা প্রচার—"মালিকের খামারে যে ধান তুলবে, সে বাকী বকেয়া মকুব পাবে। জমি তার কায়েম থাকবে। যে না আনবে—বাকী ধানের নালিশ হবে, পুলিসে ধরে জেলে পাঠাবে, ঘরবাড়ি লুট হবে, সবংশে ধ্বংস হবে'।"

জোতদারদের অপকৌশল ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জেলার সংগ্রাম কমিটির সুস্পষ্ট নির্দেশ হল: "জোতদারদের খামারে নয়, চাষীর নিয়ন্ত্রণাধীন পঞ্চায়েত খামারে একত্রে ধান তোল।" "সুতরাং বরাবরের মত গ্রামকে গ্রাম একত্রে মিলে একধার থেকে সমস্ত ধান দিনে কাটবে, আবার যে দিন ধান উঠবে—সর্বত্র একই সঙ্গে নিজ নিজ মাঠের ধান তুলবে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের খামারে। ক্যাম্পের পুলিস এলে নিজ নিজ চাষের ক্ষেতে ধান কাটতে থাকবে—পুলিস দূরে চলে গেলে, কাটা ধান চাষীর খামারে তুলে নেবে। কোন কাটা ধান মাঠে ফেলে রাখবে না।"

এইভাবে পুলিসকে এড়িয়ে বিভিন্ন মালিকের প্রায় সারা মাঠের ধান চাষীরা দল বেঁধে নিজেদের পঞ্চায়েত খামারে তুলে নিল। কিন্তু পুলিস ক্যাম্পের পাশে কয়েক শো বিঘা জমির ধান তখনও মাঠে পড়ে আছে। কীভাবে ঐ ধান তোলা হবে তাই নিয়ে পরামর্শ চলল। কমিটির স্থানীয় নেতারা দাবি তুলল—যে করেই হোক ঐ ধান কেটে আনতেই হবে, নচেৎ লালঝাণ্ডার ইজ্জৎ থাকে না। প্রয়োজন হলে শত শত কৃষকের জঙ্গী মিছিল দিয়ে ক্যাম্প পুলিসদের ঘেরাও করে ঐ ধান তুলে আনতে হবে।

কিন্তু কৃষকদের জিদ—ঐ ধান পুলিসকে প্রতিরোধ করে কেটে আনতে হবে। স্থির হল, পরের দিন সকালেই চারদিক থেকে শত শত কৃষকদের মিছিল এসে পুলিসের ক্যাম্প ঘেরাও করবে—ধান তোলা হবে। আরও স্থির হল, প্রথম বাহিনীকে

ফলমূল সংগ্রহ করে, আবার কখনও বা ঝুম প্রথায় তাদের সামান্য জমি চাষ করে। তাদের এই জমিচাষ নির্ভর করে জমি, শস্য, বীজ প্রভৃতি যোগাড়ের সুযোগ-সুবিধার উপর। অনেক আদিবাসী মানুষের দারিদ্র এত ভয়ঙ্কর যে তারা বন থেকে তেঁতুল আর মহুয়া ফুল সংগ্রহ করে, আর তাই সমতল ভূমির বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে কোন রকমে জীবন ধারণ করে। বাজারে তারা এক মন তেঁতুলের বিনিময়ে পায় এক কিলোগ্রাম লবণ। অনেকে আবার ভীষণ অভাবের সময় জমিদারদের ক্ষেতে খামারে কাজ করে, তার জন্য তাদের দেওয়া হয় দিনে ২০ থেকে ৪০ পয়সা মাত্র।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতাল আদিবাসীদের মতই গিরিজন আদিবাসীরাও শোষণের এক ভয়ঙ্কর যাঁতাকলে সারা জীবন পিষ্ট হয়। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীই প্রথম গিরিজন আদিবাসীদের অঞ্চলে প্রবেশ করে পণ্য বিনিময়ের বদলে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন করে এবং তার ফলে গিরিজন আদিবাসীদের সহজ-সরল জীবন, জীবিকা ও সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটো: প্রথমত, মুদ্রায় রাজস্বের বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত, বন-সম্পদের উপর দখল প্রতিষ্ঠা। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে আদিবাসীদের জীবনে শোষণ ও দুঃখ-যন্ত্রণার বন্যা নেমে আসে। তারা হয়ে পড়ে সরকারী কর্মচারী, সমতল ভূমির ব্যবসায়িগোষ্ঠী আর জমিদার-মহাজনদের নির্মম শোষণ-উৎপীড়নের শিকার। এতদিন বনভূমি ছিল আদিবাসীদের জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। এবার সরকারী কর প্রভৃতি আদায়ের ব্যবস্থা ছাড়াও ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠী বন-সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশাল বনভূমির বড় বড় অঞ্চলগুলিকে সংরক্ষিত করে রাখল বনের কাষ্ঠ আহরণের উদ্দেশ্যে। আর এই কাজের জন্য নিযুক্ত করল অসহায় আদিবাসীদের অতিসামান্য পারিশ্রমিকে। একাজের জন্য বহু বন-কর্মচারী চাষবাসের জন্য এবং বনের ফলমূল আহরণের জন্য গিরিজনদের কাছ থেকে গায়ের জোরে আদায় করত ঘুষ, সেলামী প্রভৃতি। বনের কাঠ প্রভৃতি সম্পদ আহরণের জন্য নিযুক্ত হত বহু ঠিকাদার। তারা অতি সামান্য পারিশ্রমিকে আদিবাসী গিরিজনদের দিয়ে গাছ কাটাত এবং কাটা গাছ বহন করাত সমতল ভূমিতে। এরা সবাই গিরিজনদের যথেচ্ছভাবে শোষণ করত সেকালের দাস ও ভূমিদাসদের মত।

ইংরেজ শাসকদের দ্বারা সংরক্ষিত অঞ্চলগুলিকে বলা হত 'এজেন্সি অঞ্চল'। বিশেষভাবে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এই অঞ্চলগুলির দেখাশোনা করত। এইসব ব্যবস্থার ফলে সমতল ভূমির জমিদাররাই হত বনভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃত মালিক। আর গিরিজনরা হত দাস, গৃহভৃত্য বা দাস-শ্রমিক। এই শ্রমিকদের অর্থে পারিশ্রমিক বা মজুরি দেওয়ার পরিবর্তে দেওয়া হত দুইবেলা দুমুঠো খাবার। প্রভুদের জন্য এই শ্রমিকদের বন থেকে আহরণ করে দিতে হত তেঁতুল, হলুদ, আদা প্রভৃতি দ্রব্য। তার জন্য এদের ভাগে জুটত দুই-একটা পয়সা মাত্র। এই সমগ্র শোষণ উৎপীড়নের ব্যবস্থাই চলেছে স্বাধীনতা লাভের পরেও। এই অসহনীয়

অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য প্রথম থেকেই গিরিজনদের মধ্যে জেগে উঠেছিল সংগ্রামের চেতনা।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গিরিজন আদিবাসীদের জমিদারগোষ্ঠীর বর্বরসুলভ শোষণ-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্য, তাদের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাবার জন্য, তাদের মধ্যে সংগ্রামী চেতনার উন্মেষের জন্য সেদিনের (সংযুক্ত) কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত অন্য কোন দল সামান্য মাত্র চেষ্টাও করেনি। ভি. এম. নায়ার তাঁর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত গিরিজন-বিদ্রোহের বিবরণে লিখেছেন :

"এই অঞ্চলের কংগ্রেস কর্মীদের বেশীর ভাগই ছিল জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এই সংরক্ষিত অঞ্চলে কোন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতা কোন দিনই যাননি। তখনকার বিধান-সভার সভ্য ছিলেন একজন স্বতন্ত্র পার্টির লোক। তিনিও ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।"

গিরিজনদের সংগ্রামের ঐতিহ্য

অতীতে, ১৯০০ সালে গিরিজন আদিবাসীরা প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল। তখন সালুর সংরক্ষিত অঞ্চলের আদিবাসীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অবশ্য এই বিদ্রোহ কয়েকদিনের মধ্যেই পরাজিত হয়। শ্রীকাকুলামের পার্বত্য আদিবাসী গিরিজনদেরও বিদ্রোহের ঐতিহ্য আছে। শ্রীকাকুলামের পার্শ্ববর্তী বিশাখাপত্তনমের সংরক্ষিত অঞ্চলের গিরিজনরা ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন ও জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আলুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে সংগ্রাম চালিয়েছিল। সেদিন গিরিজনরা সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে ইংরেজ-রাজের পুলিসী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রায় তিন বৎসর কাল ধরে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়েছিল। সীতারাম রাজু শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই বিদ্রোহও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে আন্দোলন চলেছিল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পালাকোণ্ডা এজেন্সি অঞ্চলে পাল্লে রামুলু নামক একজন স্কুল-শিক্ষকের নেতৃত্বে স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মিগণ গিরিজনদের এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন আরম্ভ হয় স্থানীয় কর আদায়কারী তহশিলদারদের বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে। গিরিজনরা বহু সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদান করে। তাদের নিয়ে আন্দোলনের নেতা রামুলু প্রথম গঠন করেন 'গিরিজন সঙ্ঘম'। সকল প্রকার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই ছিল এই সংগঠন তৈরির উদ্দেশ্য। ১৯৫৭-৫৮ সালে রামুলু মিলিত হন এই অঞ্চলের বিখ্যাত নেতা ভেম্পাতাপু সত্যনারাণমের সঙ্গে। উভয়ে মিলে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে গিরিজনদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলের প্রথম ব্যাপক আন্দোলন হয় ১৯৫৯ সালে জমিদার ও বন-অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা গিরিজনদের বলপূর্বক বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে। বেগারপ্রথা-বিরোধী এই

সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। এই জয়লাভের ফলে গিরিজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে ওঠে।

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আদিবাসী গিরিজনদের সঙ্গে সঙ্ঘমের যোগাযোগ আরও নিবিড় হয় এবং প্রায় ৩০ বর্গমাইল অঞ্চলের প্রায় সব গ্রামে সঙ্ঘমের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে হয় গিরিজন সঙ্ঘমের প্রথম সম্মেলন। এই সময় সঙ্ঘমের প্রধান দুই নায়ক ছিলন সি. পি. আই. (এম) পার্টির সত্যনারায়ণ ও আদি-ভাৎলা কৈলাসন। তাঁরা দুইজনেই ছিলেন স্কুল শিক্ষক। এই দুই কমিউনিস্ট নায়কের পরিচালনায় গিরিজনরা যেসব দাবি নিয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে সংগ্রাম চালিয়েছিল সেসব দাবি ছিল ঃ

(১) সমস্ত পতিত জমি গিরিজনদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

(২) গিরিজন নয় এমন লোকেরা অর্থাৎ জমিদার, সাহুকার প্রভৃতিরা গিরিজন-দের কাছ থেকে বে-আইনীভাবে যেসব জমি দখল করেছে তা অবিলম্বে গিরিজনদের হাতে ফেরত দিতে হবে।

(৩) গিরিজনদের উপর বে-আইনীভাবে চাপান ঋণ খারিজ করে দিতে এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে হবে।

(৪) গিরিজনরা বন থেকে যেসব জিনিস আহরণ করে তা উচিত মূল্যে কিনে নিতে হবে। গিরিজনদের প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উচিত মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

(৫) চাষের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও বলদ গিরিজনদের সরবরাহ করতে হবে।

(৬) যারা গিরিজনদের বেগার খাটতে বাধ্য করে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

(৭) জীবিকা নির্বাহের ব্যয় অনুসারে মজুরি ধার্য করতে হবে।

(৮) ঘরবাড়ী তৈরি করার জন্য গিরিজনদের বন থেকে কাষ্ঠ আহরণ করতে দিতে হবে।

(৯) গিরিজনদের শিক্ষা, সংস্কৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) গিরিজন অঞ্চলকে স্বয়ং-শাসিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হবে এবং তার শাসন-কার্য পরিচালনার ভার গিরিজনদের হাতে দিতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে গিরিজন আদিবাসীরা প্রায় সবগুলি দাবিই আদায় করতে সক্ষম হয়। তারা যেসব দাবি আদায় করে তার কয়েকটি হল ঃ

(১) ১৯৫৯ সাল থেকে জমিদার ও সাহুকাররা যেসব জমি বে-আইনীভাবে গিরিজনদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল সেই জমি তারা পুনরুদ্ধার করে। এইভাবে ১৯৬৭ সালের মধ্যে তারা প্রায় সাতশত একর জমি পুনর্দখল করেছিল।

(২) ভাগচাষী গিরিজনরা জমিদার ও সাহুকারদের ফসলের অংশ দুই-তৃতীয়াংশের বদলে এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

(৩) ১৯৬৭ সালের মধ্যে গিরিজনরা ১৫ শত একর জমি দখল করতে সক্ষম হয়।

(৪) বেগার-প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

(৫) কৃষি-শ্রমিকদের বাৎসরিক মজুরি ৬ ব্যাগ শস্য থেকে ১৪ ব্যাগে বৃদ্ধি হয়।

(৬) গৃহনির্মাণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য গিরিজনরা বন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহের অবাধ অধিকার লাভ করে। ইত্যাদি

একতাবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা এইসব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও দাবি আদায় করতে পারার ফলে গিরিজনদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জেগে ওঠে। একতাবদ্ধ সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকল গিরিজন পরিবারের যুবক ও বয়স্ক লোকেরা 'গিরিজন সঙ্ঘম'-এর সভ্য হয়। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গিরিজনদের রাজনৈতিক চেতনারও বিকাশ ঘটে এবং দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে ঐসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসনকার্যেও তারা নিজেদের অধিকার জাহির করতে আরম্ভ করে। সঙ্ঘমের সভ্যরাই গ্রামের জনসাধারণের বিবাদ ও বিভিন্ন সমস্যাবলী মিটিয়ে দেয়, তারাই পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, ছোট ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এ সবের সঙ্গে সঙ্গে চলে মহিলাদের প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তির আন্দোলন। মহিলারা পার্টি-নেতাদের প্রচারে ও আলোচনায় উৎসাহিত হয়ে 'মহিলা সঙ্ঘম'-এর প্রতিষ্ঠা করে। তারা সংসারের বড় কর্তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মহিলা সঙ্ঘমের সকল সভা-সমিতিতে যোগদান করে, নিজেরা আলোচনা-বৈঠক করে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়-অবিচার ও বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং সমাজে নারীর ন্যায্য ও সম্মানজনক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন চালায়।

নূতন পর্যায়ের সংগ্রাম

গিরিজন আদিবাসীরা তাদের একতাবদ্ধ আন্দোলনের জোরে অনেকগুলি দাবি আদায় করেছিল। তখন তাদের আন্দোলনের চাপে জমিদার-সাহুকার আর বনের সরকারী কর্মচারীরা সাময়িকভাবে পিছু হটেছিল বটে, কিন্তু তারা হাল ছাড়েনি। ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে তারা আবার আক্রমণের মতলব আটে। আবার তারা গিরিজন আন্দোলনকে পিষে মারবার জন্য প্রস্তুত হয়।

১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে পার্বতীপুরম তালুক গিরিজন সঙ্ঘমের সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই সম্মেলনে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন গিরিজনদের প্রিয় নেতা, সি. পি. আই. (এম)-এর পার্বতীপুরম জেলা কমিটির সম্পাদক ভি. রামলিঙ্গাচারী আর ঐ জেলার গিরিজন সঙ্ঘমের সম্পাদক আদিভাৎলা কৈলাসম। পথে তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর আক্রমণ করল জমিদার-সাহুকারদের গুণ্ডারা। এই দুই নেতা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেও, নিহত হলেন দুইজন গিরিজন আদিবাসী নেতা। সম্মেলনের গিরিজন প্রতিনিধিরা যাচ্ছিল সম্মেলনে। পথে তাদের উপরেও আক্রমণ হল। তারা যখন সম্মেলন স্থানের নিকটবর্তী নেভিদি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন দুইজন জমিদার তাদের গুণ্ডাদল নিয়ে গিরিজনদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের চিৎকার শুনে দৌড়ে

এল বহু গিরিজন আক্রান্তদের রক্ষা করতে। জমিদার দু'জন তাদের বন্দুক দিয়ে গুলি চালাল প্রতিনিধিদের উপর। গুলির আঘাতে নিহত হলেন দুইজন গিরিজন নেতা, আহত হল অনেকে। লেভিদি গ্রামের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আদালতে মামলা হল। মামলার রায়ে বিচারক খুনি জমিদার দু'জনকে বে-কসুর মুক্তি দিল। এই রায় শুনে গিরিজনরা শপথ নিল, খুনি জমিদার আর সাহুকারদের হত্যা করে এই গিরিজন হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই।

মার্চ মাসের গোড়ার দিকে গিরিজনরা তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তারা সশস্ত্র হয়ে জমিদারদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে আরম্ভ করল। তার ফলে সমগ্র শ্রীকাকুলাম জেলায় সকল স্তরের জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হল। অন্যদিকে পুলিসও সর্বত্র সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে গিরিজনদের এই নূতন আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার চেষ্টা আরম্ভ করল।

তখন জেলার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গিরিজনদের এই জঙ্গী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এই অবস্থায় টি. নাগিরেড্ডি, সি. পুল্লারেড্ডি প্রভৃতি মাওপন্থী নেতারা গিরিজনদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের আয়োজন আরম্ভ করেন। গিরিজনদের এই সশস্ত্র গেরিলা-সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করা হল :

(১) জমিদারদের সুরক্ষিত খাদ্যগোলা আক্রমণ করে খাদ্য ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেড়ে নেওয়া ; (২) পূর্বে নেওয়া সমস্ত ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করা ; (৩) গিরিজন অঞ্চল থেকে সকল জমিদার ও সাহুকারদের (মহাজনদের) বিতাড়িত করা ; আরও স্থির হল, যারাই গিরিজনদের বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধে চালাতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম। সুতরাং প্রাথমিক কাজ হল "শ্রেণী-শত্রুদের হত্যা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিস-বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালানো।"

এই সংগ্রাম আরম্ভের তারিখ স্থির করা হল ১৯৬৮ সালের ২৫শে নভেম্বর। উপরিউক্ত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুব কর্মীদের নিয়ে গেরিলা দল গঠনের কাজও চলতে লাগল। বনের মধ্যে গেরিলা যোদ্ধাদের বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেওয়া হল।

এবার আরম্ভ হল সংগ্রাম। গেরিলা যোদ্ধাদের পাহারায় সুরক্ষিত হয়ে কয়েক শত গিরিজন এক সঙ্গে এক একজন জমিদারের বাড়ি ও খামার আক্রমণ করে সব কিছু লুটে নিয়ে যেত। তারা এমন কি খড়কুটা "একটুকরা সুতো বা একটা সুচও জমিদারের জন্য ফেলে রেখে যেত না।" এই প্রকারের আক্রমণ ও লুটপাটের ফলে গিরিজন অঞ্চলের জমিদারদের হৃদকম্প শুরু হল, তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে লাগল প্রাণের ভয়ে। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী পাঠাল গিরিজন অঞ্চলে গিরিজন বিদ্রোহ দমন করার জন্য। গিরিজনদের সশস্ত্র গেরিলা দলগুলিও বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে সশস্ত্র পুলিস দলগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

সশস্ত্র পুলিসও বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিরিজন অঞ্চলে, গিরিজনদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রদেব উপর গুলিবর্ষণ করে, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল। আর গিরিজনদের গেরিলা দলগুলি ও গিরিজন চাষীরা একত্রে মিলে পুলিসের এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগল। ১৯৬৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রায় ২০০ সশস্ত্র পুলিস আভিরি অঞ্চলে এক বড় রকমের আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের একটি বিবরণ নিম্নরূপ :

"এই আক্রমণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিরোধে সমস্ত পাহাড় অঞ্চল কেঁপে উঠল। ভোর বেলা জনসাধারণ পুলিস দলকে এগিয়ে আসতে দেখেই পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির জনসাধারণকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে আহ্বান করল। এই আহ্বান শুনে গ্রামগুলি থেকে প্রায় ৫০০ লোক তীর-ধনু নিয়ে ছুটে এল। সমবেত গিরিজনরা মিলে তীর, পাথরের টুকরা আর একটি বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়ে পুলিস দলকে বাধা দিল। এই বাধা দানের ফলে পুলিসদের পক্ষে গ্রামে ঢোকা সম্ভব হল না। ভয় পেয়ে পুলিস দল পিছন ফিরে পালাতে শুরু করল। বিদ্রোহী গিরিজনরাও তাদের পিছনে তাড়া করে তীর আর পাথরের টুকরা ছুড়ে পুলিসদের নাজেহাল করে তুলল। পুলিস দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।......গিরিজনরা বড় বড় পাথরের টুকরা ছুড়ে আর গাছের ডাল ভেঙ্গে তাই দিয়ে পুলিসদের পিছন থেকে আক্রমণ চালাল। এইভাবে পুলিসরা ছুটে গিয়ে প্রায় তিন মাইল দূরে সমতল ভূমির এক গ্রামে আশ্রয় নিল।" "এই আক্রমণ ও পাল্টা-আক্রমণে আহত হয়ে দুইজন পুলিস কনেস্টবল আর একজন সার্কেল ইনস্‌পেকটর নিহত হল।" পুলিস দল আবার ২৩শে ডিসেম্বর আভিরি অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েছিল। এই আক্রমণও গিরিজনরা তীর আর পাথরের টুকরা ছুড়ে ব্যর্থ করে দিয়েছিল।"

"আভিরির উপর এই দ্বিতীয় আক্রমণের সময় জনসাধারণ পুলিসদের দূর থেকে দেখে, পথের ধারে লুকিয়ে থেকে শত্রুর অপেক্ষায় রইল। পুলিসরা কাছে আসতেই একজন গেরিলা যোদ্ধার বন্দুকের গুলি খেয়ে একজন কনেস্টবল মাটিতে পড়ে গেল। ভয় পেয়ে পুলিসেরা এবারও পালিয়ে গেল। এই ঘটনার পর গিরিজনদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। তারা তাদের গ্রামের কাছে পুলিস দেখা-মাত্র এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করত। তার ফলে কয়েকজন পুলিস নিহত হল। এইভাবে গিরিজনদের সংগ্রাম চলতে লাগল।"

বিদ্রোহের সাফল্য ও ব্যর্থতা

গিরিজন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ ও গিরিজন বিদ্রোহের ফলে গিরিজনরা তাদের গ্রামাঞ্চল থেকে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠী, সাহুকার ও স্থানীয় অন্যান্য উৎপীড়কদের বিতাড়িত করতে পেরেছিল। গেরিলা দলগুলির আক্রমণের ফলে পুলিসের উৎপীড়ন অন্তত কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের 'লিবারেশন' পত্রিকায় প্রথম থেকে শ্রীকাকুলাম জেলায় গেরিলা যুদ্ধের

ফলে যে সব সফলতা লাভ হয়েছিল তার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। বিবরণটি নিম্নরূপ :

"শ্রীকাকুলাম ও অন্ধ্রের বিভিন্ন জেলায় বৈপ্লবিক সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে অভূতপূর্বরূপে লাল অঞ্চলের বিস্তার ঘটছে। এইসব লাল অঞ্চলের বেষ্টন ও ধ্বংস সাধনের জন্য শত্রুর অব্যাহত প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও 'এজেন্সি' অঞ্চলের ৩০০টি গ্রামে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে আছে। ভীত-সন্ত্রস্ত জমিদারগোষ্ঠী এই অঞ্চল থেকে পালিয়ে গেছে। তার ফলে এজেন্সি অঞ্চলে এখন শ্রেণীশত্রুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এখন এখানে কোন সরকারী ব্যবস্থাই কাজ করে না। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বন-বিভাগের অথবা রাজস্ব-বিভাগের কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির কোন কর্মচারীও এখানে আর প্রবেশ করতে পারে না। গেরিলা দলের লোকেরা এবং গ্রামরক্ষী দলের সভ্যরা লুণ্ঠনকারী পুলিসের আক্রমণ থেকে গ্রামগুলিকে রক্ষা করার কাজে সকল সময় ব্যস্ত। কৃষকদের বৈপ্লবিক সংগঠন 'রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি' দ্বারাই স্থানীয় শাসন-কার্য ও উৎপাদন পরিচালিত হয়, আর সকল প্রকার বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা হয়। এই সমিতির কেবল 'এজেন্সি' অঞ্চলের সভ্য-সংখ্যাই আট হাজার। এখানে 'রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি'ই রাষ্ট্র-ক্ষমতার নূতন রূপ। যেসব জমির মালিক পালিয়ে গেছে, অথবা যারা গেরিলাদের হাতে নিহত হয়েছে, কিংবা যেসব জমিদার তাদের জমিজমা স্বেচ্ছায় দান করেছে, সেই সব জমি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের কাজ এই সমিতিই করছে। সমিতি শীঘ্রই এইসব জমি গরীব চাষী ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার কাজ আরম্ভ করবে। এখানে প্রত্যেক গ্রামে গণ-আদালতই জনসাধারণের মধ্যেকার বিবাদ মিটিয়ে দেয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই গণ-আদালত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে জনগণের ঐক্য সুদৃঢ় করে তুলেছে। (সোসাইটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ, Vol. I, No. 4 থেকে উদ্ধৃত)।

উপরিউক্ত এই বিবরণ এমনকি সরকারী নথিপত্রেও মোটামুটি স্বীকার করা হয়েছে। সরকারী বিবরণে দেখা যায়, অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম জেলার ১৯৬৮-৬৯ সালের গিরিজনদের এই সংগ্রাম কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা জমিদার, সাহুকার, ব্যবসায়ী, বন-বিভাগের অত্যাচারী কর্মচারী ও পুলিসের মোট ৪৮ জনকে হত্যা করেছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা পুলিসের বিভিন্ন দল ও ঘাঁটির উপর আক্রমণ করেছে ৯৯ বার, আর গেরিলারা শত্রুদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে অপহরণ করেছে ১৫ জনকে। গিরিজনদের গণ-আদালতে এই ১৫ জনের বিচার হয়েছে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড থেকে জরিমানা পর্যন্ত শাস্তিদান করা হয়েছে। বিদ্রোহী গিরিজনরা জমিদারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে অনেকগুলি বন্দুক ও বন্দুকের গুলি এবং বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্য দখল করেছে। (সোসাইটি অ্যাণ্ড চেঞ্জ, Vol. I, No. 4, P. 21)।

সংগ্রামের সাময়িক অবসান

গিরিজনদের বিদ্রোহ যখন দ্রুত বিস্তারলাভ করছিল, ঠিক তখনই অন্যদিকে অন্ধ্রের প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার প্রভৃতি ও পুলিস চরম আঘাত দিয়ে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময় পুলিসের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল। এবার আরম্ভ হল বিদ্রোহীদের উপর চূড়ান্ত আঘাত। ১৯৭০ সালের গোড়া থেকেই পুলিসের চূড়ান্ত আঘাতে বিদ্রোহ স্তব্ধ হয়ে অবসানের মুখে এসে দাঁড়াল।

ইতিপূর্বে, ১৯৭০ সালের মে মাসে এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক পঞ্চাদি কৃষ্ণমূর্তি বিদ্রোহের ৬জন প্রধান কর্মীসহ পুলিসের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিদ্রোহের আরও ১৩ জন প্রধান নেতা পুলিসের সঙ্গে তথাকথিত সংঘর্ষে নিহত হন। এদের মধ্যে ছিলেন ভাস্কর রাও, থামাদা গণপতি, আপ্পাল স্বামী, সুব্বা রাও পাণিগ্রাহী প্রভৃতি। এর কিছুদিন পরেই এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক তেজেশ্বর রাও, ডাঃ শিবরাম রেড্ডি, মল্লিকার্জুন, ভুবনমোহন পট্টনায়ক ও নাগভূষণ পট্টনায়ক পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৯৭০ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় পুলিস সকল শক্তি নিয়ে শ্রীকাকুলামের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করে। এই আক্রমণের মধ্যে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক এম. ভি. রমনমূর্তি নিহত হন এবং প্রায় দেড়হাজার গেরিলা যোদ্ধা গ্রেপ্তার হয়। ১৯৭০ সালের ১৮ই জুন অন্ধ্র সরকার সদম্ভে ঘোষণা করে যে, পুলিসের আক্রমণের ফলে বিদ্রোহের গণভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া এই বিদ্রোহের মূল ও সর্বপ্রধান নায়ক ভেম্পাতাপু সত্যনারায়ণ ও আদিভাৎলা কৈলাসম ১০ই জুলাই পুলিসের গুলিতে নিহত হন। এই দুই নেতার মৃত্যুর পর অন্ধ্রপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ঘোষণা করেন, বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হয়েছে, বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে। ইতিমধ্যে পুলিসের আক্রমণের ফলে মোট ৬০টি গেরিলা দলের মধ্যে মাত্র দুইটি ব্যতীত আর সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। এই দুইটি দলও পরে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর পর এই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ অবসান হয়।

পরবর্তীকালের গিরিজন সংগ্রাম (১৯৮২)[১]

শ্রীকাকুলাম জেলার সংগ্রামের পর এবার গিরিজন আদিবাসীদের সংগ্রাম আরম্ভ হয় অন্ধ্রপ্রদেশের ভিন্ন এক অঞ্চলে, পূর্ব-গোদাবরী জেলায়। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসের ২৯শে নভেম্বর সকাল ১০টার সময় অন্ধ্র সরকারের সশস্ত্র পুলিস গুলি চালিয়ে গিরিজন সঙ্ঘমের কুঞ্জম-রাজুলু আর মাদাকাম লক্ষাইয়া নামক দুই নেতাকে হত্যা করে। এই অঞ্চলে এরা দুইজনই প্রথম শহীদ।

ঘটনাটি নিম্নরূপ : বিভিন্ন গিরিজন অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেও জমিদাররা

১। এই সংগ্রামের সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে Jaswanta Rao : Land & Girijans (Frontier, Vol. 15, No, 21, 8. 1. 83) প্রবন্ধ থেকে।

পুলিসের সাহায্যে গিরিজন আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়েছিল। গিরিজনরা সঙ্ঘমে একতাবদ্ধ হয়ে ঐসব জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তাতে চাষ করে ফসল ফলায়। জমিদাররা পুলিসের সাহায্যে ঐ সব জমির ফসল নষ্ট করার চেষ্টা করে। গিরিজনরা তাতে বাঁধা দিলে সশস্ত্র পুলিসদল আসে জমিদারদের সাহায্য করতে। এই অঞ্চলের গিরিজনরাও সবাই মিলে তীর-ধনু নিয়ে পুলিসদের বাধা দেয়। জমির ফসল রক্ষা করতে মাঠে নামে গিরিজন পুরুষ-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই মিলে। জমিদারদের উস্কানিতে পুলিসরা গুলি চালালে উপরিউক্ত কুঞ্জম রাজালু আর মাদাকাম লক্ষাইয়া নামক দুইজন গিরিজন নেতা নিহত হন।

এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল জমিদার-সাহুকারগোষ্ঠী আর পুলিসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গিরিজনদের আন্দোলন। এই অঞ্চলের গিরিজনরা শ্রীকাকুলামের গিরিজনদের সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তারাও গিরিজন সঙ্ঘম গঠন করে একতাবদ্ধ হয় এবং তীর-ধনু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্থানীয় শোষক-উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে।

তারা ঘোষণা করে, জমির অধিকার চাষীর জন্মগত অধিকার। জমিদারগোষ্ঠী আর বন-বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের বাধাদান অগ্রাহ্য করে তারা জমি চাষ করে। এই সংগ্রামের চেতনা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল জমিদার-সাহুকারদের খামারে কর্মরত গিরিজন কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘকালের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তারা মনেপ্রাণে বুঝেছিল, জমির অধিকারই তাদের জীবন-মরণের সমস্যা, যে করেই হোক জমিদার-সাহুকারদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া তাদের জমি উদ্ধার করতেই হবে, আর তা করতে হবে সংগ্রাম করে। তারা দলে দলে জমিদার-সাহুকারদের খামারের শ্রমিকের কাজ ছেড়ে দিয়ে গিরিজন সঙ্ঘমে একতাবদ্ধ হয় এবং সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাদের সংগ্রামের প্রথম রূপ হল জমিদার-সাহুকারদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া জমি দলবদ্ধভাবে চাষ করা।

অন্ধ্র-সরকার এতদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে চুপ করেছিল। এবার গিরিজনদের জমি কেড়ে নিয়ে চাষ করতে দেখে অন্ধ্র সরকার বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠল। গিরিজনদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে সরকার অবিলম্বে এই অঞ্চলে দলে দলে সশস্ত্র পুলিস পাঠাল। অন্ধ্র সরকার প্রচার করল, টি. নাগিরেড্ডির পরিচালনায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা আইনসম্মতভাবে নির্বাচিত সরকারের উচ্ছেদের জন্য হিংসার আশ্রয় নিয়েছে এবং জমিদারদের জমি ও সম্পত্তি কেড়ে নেবার জন্য গিরিজন চাষীদের উত্তেজিত করছে, জমিদারদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

অন্ধ্র সরকার অবিলম্বে আদালতে 'নাগিরেড্ডি ষড়যন্ত্র-মামলা' আরম্ভ করল, আর এই মামলায় বহু গিরিজন ও তাদের নেতাদেরও অভিযুক্ত করে মামলা চালাতে লাগল। এই মামলা ও বহু গিরিজনকে গ্রেপ্তার করার ফলে গিরিজন আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু গিরিজন ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নানারকমের উদ্ভট প্রচার চলল মামলার সঙ্গে সঙ্গে, আর চলল এই অঞ্চলে কৃষি-সংস্কারের ধাপ্পাবাজি। এই সময়, ১৯৭৫ সালে ঘোষিত হল কেন্দ্রীয় সরকারের

জরুরী অবস্থা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল নূতন করে গিরিজনদের উপর জমিদার-সাহুকার ও পুলিসের আক্রমণ, তাদের গ্রেপ্তার ও আবার জমি কেড়ে নেওয়া।

জরুরী অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠিত হয়ে গিরিজন সঙ্ঘম আবার আন্দোলন আরম্ভ করল। এবার গিরিজন সঙ্ঘম 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা' আন্দোলনের সাহায্য নিয়ে জমিদারদের দ্বারা জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করল। গিরিজন প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হল ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে। এই সম্মেলন থেকে দাবি জানান হল, জমিদারদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া সমস্ত জমি ফেরত দিতে হবে, গিরিজনরা বহুকাল থেকে বনভূমিতে যে সব অধিকার ভোগ করে এসেছে সেই সব অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, জমি থেকে গিরিজনদের উচ্ছেদ, আর তাদের ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে পোড়ানো বন্ধ করতে হবে, ইত্যাদি।

এই সম্মেলন থেকে গিরিজনরা বেরিয়ে এল নূতন মানুষ হয়ে, নূতন তাদের চেতনা, নূতন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা। তারা অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিল। প্রথমেই তারা জমিদারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া সরকারী জমি দখল করে চাষ করল, তার ফসলও তারা ঘরে তুলল। এর বিরুদ্ধে অন্ধ্র সরকারের পুলিস ২০০ জন গিরিজনের বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা মামলা দায়ের করল এই বলে যে ঐসব জমি সরকারই চাষের ব্যবস্থা করে এবং সরকারই জমির ফসল নেয়। এই মামলায় সরকারই শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। এরপর শুরু হল গিরিজনদের উপর নূতন করে পুলিসের উৎপীড়ন। গিরিজনদের গ্রামে গ্রামে পুলিসের চৌকি বসান হল, চলল নির্বিচারে গ্রেপ্তার। সবকিছু সত্ত্বেও গিরিজনরাই লৌহদৃঢ় একতা আর তীর-ধনুকের জোরে ফসল ঘরে তুলল, সেই জমি আবার চাষও করল গিরিজনরাই। গিরিজন চাষীদের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে এবার ধানের ফসল ফলল প্রচুর। তখন ১৯৮২ সাল।

আবার ফসল কাটার পালা। গিরিজনরা জানত, জমিদার আর সরকারের পুলিস এবার প্রচণ্ড বাধা দেবে ফসল কাটতে। গিরিজন সঙ্ঘম গিরিজনদের সভা ডাকল ফসল কাটার আয়োজন করার জন্য। পুলিস সভার উপর ১৪৪ ধারা জারি করল। সভা হল না। গিরিজনদের ফসল কাটায় বাধা দেবার জন্য বহু সশস্ত্র পুলিস এল। গিরিজন সঙ্ঘম স্থির করল, ফসল কাটায় পুলিস বাধা দিলে চাষীরা তীর-ধনুকের জোরেই ফসল কাটবে। শত শত গিরিজন চাষী ক্ষেতে নামল ধান কাটতে তীর-ধনুক হাতে নিয়ে। তারা একদিনেই তিন একর (২১ বিঘা) জমির ফসল কেটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। নভেম্বর মাসের শেষদিকে জমিদাররা গিরিজনদের জোয়ারের ক্ষেতে প্রায় ২৫০শো গরু-মোষ ঢুকিয়ে দিল শস্য নষ্ট করার জন্য। সংবাদ পেয়ে প্রায় ৫০০ গিরিজন স্ত্রী-পুরুষ লাঠি আর তীর-ধনু নিয়ে দৌড়ে এল গরু-মোষ তাড়াতে। জমিদাররা আর তাদের গুণ্ডারা এল গিরিজনদের বাধা দিতে। গিরিজনদের তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে গেল। এর পরে এল সশস্ত্র পুলিসের

দল। কিন্তু গিরিজনরা ধনুকে তীর জুড়ে রুখে দাঁড়াতে ভয় পেয়ে পুলিস দলও পালিয়ে গেল।

শত শত গিরিজন স্ত্রী-পুরুষ সন্ধ্যাকালে ক্ষেতে নামল ফসল কাটতে। কয়েক শো গিরিজন যুবক তীর-ধনু নিয়ে পাহারা দিতে লাগল। গিরিজনদের ফসল কাটতে দেখে দৌড়ে এল ৩০জন সশস্ত্র পুলিস। গিরিজন যুবকরা ধনুকে তীর জুড়ে প্রস্তুত হয়ে রইল পুলিসদের বাধা দেবার জন্য। এইভাবে চলল দু'ঘণ্টা। পুলিস দল শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিরিজনদের উপর আক্রমণ না করে চলে গেল। গিরিজনরা জমিদারদের গরু-মোষ আটকে রাখল। মাঠের ফসল কেটে ঘরে তুলল গিরিজন চাষীরা। জয় হল গিরিজনদের একতাবদ্ধ সংগ্রামের।

এদিকে জমিদারদের প্ররোচনায় অন্ধ্র সরকার স্থির করল, জমিদারদের গরু মোষ আটক রাখা আর ফসল কাটার জন্য গিরিজনদের শাস্তি দিতে হবে। ১৯৮২ সালের ২৮শে নভেম্বর ৫০জন সশস্ত্র পুলিস সকাল বেলায় এসে ঢুকল গিরিজনদের গ্রামে। তারা যাকে পেল তাকেই গ্রেপ্তার করল। গিরিজন স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে বাধা দিতে এল পুলিসদের। ২৯শে নভেম্বর গ্রামের অনেক লোক মিলে জমিদারদের গরু-মোষ পাহারা দিচ্ছিল এমন সময় গ্রামে একদল সশস্ত্র পুলিস ঢুকল। তখন বেলা ১০টা। পুলিস গ্রামে ঢুকেই বহু টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়ে গিরিজনদের তাড়িয়ে গরু-মোষগুলোকে মুক্ত করল। জমিদাররা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা তাদের গরু-মোষ নিয়ে চলে গেল। গিরিজনরা নাকে কাপড় বেঁধে তীর-ধনু নিয়ে পুলিসকে তাড়া করল। পুলিস তাদের উপর গুলি চালাল বৃষ্টিধারার মত। গুলির আঘাতে গিরিজন সঙ্ঘের নেতা কুঞ্জম রাজুলু আর মাদাকাম লক্ষাইয়া নিহত হলেন। গিরিজন স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শপথ নিল—এই হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই।

ষড়বিংশ অধ্যায়

নানকার বিদ্রোহ[১] ঃ আসাম

'নান' শব্দের অর্থ

নানকার বিদ্রোহের ঘটনা-ক্ষেত্র আসামের শ্রীহট্ট জেলা

'নান' শব্দের অর্থ রুটি। রুটি অর্থেই 'নান' শব্দ থেকে 'নানকার' শব্দের উদ্ভব। যে লোককে কেবল রুটি, অর্থাৎ কেবল খাদ্য দিয়ে রাখা হত তাকেই বলা হত নানকার। গৃহ-পালিত পশুর মত কেবল ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে প্রাচীন যুগের দাস-মালিকেরা যেমন দাস রাখত তেমনি এযুগের শ্রীহট্টের নানকারদেরও কেবল খাদ্য দিয়ে খাটান হত। তাদের বেতন দেওয়া হত না। নানকারদের মালিকরা ছিল এযুগের জমির মালিক জমিদারশ্রেণী, তারা দাসদের অর্থাৎ নানকারদের মালিক। 'নান' শব্দটি বাঙলা শব্দ নয়, উর্দু ভাষার শব্দ। মোগল আমল থেকেই এর প্রচলন, অর্থাৎ মোগল আমল থেকেই নানকার প্রথার প্রচলন। শ্রীহট্ট জেলায় নানকার প্রথা 'বেগার-প্রথা' বা 'চাকরাণ-প্রথা' নামেও পরিচিত।

জমিদার তার নানকারকে বসবাসের জন্য ছোট একটা ভিটা আর দু-চার বিঘা জমি বরাদ্দ করত। তার জন্য নানকারকে দিনরাত কাজ করতে হত তার জমিদারের জমিতে। তাই নানকার হল অর্থনীতির ভাষায় 'ভূমিদাস'। জমিদার ডাক দিলেই নানকারকে সশরীরে উপস্থিত থেকে জমিদারের হুকুম মত কাজ করতে হত। এই কাজের জন্য নানকারকে কোন মজুরি দেওয়া হত না। বিনা মজুরির এই খাটুনিকে বলা হত 'হদ' বা 'বেগারি'। আর নানকারদের বলা হত 'নানকার প্রজা', 'হুদুয়া প্রজা' বা 'বেগার প্রজা' প্রভৃতি।

নানকার যে জমি চাষ করত তা জমিদারের খাস দখলী এলাকা বলে গণ্য হত। তাই তার বিলি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে জমিদারের মর্জি ছাড়া আর কোন আইন বা প্রথাই কার্যকরী ছিল না। জমিদার তার ইচ্ছামত এক নানকারকে উচ্ছেদ করে আর এক নানকারকে দিতে পারত। কোন আইন-আদালত তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার অধিকারী ছিল না। তাই জমিদারকে মেনে চলাই ছিল নানকার প্রজার নিজের ভিটায় টিকে থাকবার একমাত্র শর্ত।

নানকার প্রজার ভিটা ও জমিজমার বন্দোবস্ত ছিল একেবারেই অস্থায়ী, তার উপর এই জমিজমার ব্যবহারেও নানকার প্রজার কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। এই জমি বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধক প্রভৃতির অধিকারও তার ছিল না। এই জমিতে কোন

১। এই কাহিনীর তথ্যসমূহ মূলত শ্রীহট্টের কমিউনিস্ট নেতা ও নানকার বিদ্রোহের প্রধান নায়ক অজয় ভট্টাচার্যের 'নানকার বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। —সুপ্রকাশ রায়।

গাছ জন্মালে তার উপর একমাত্র অধিকার থাকত জমিদারের। নানকার প্রজার অধিকার থাকত কেবলমাত্র ভিটায় বাস করার উপর।

নানকার প্রজাকে সারা জীবন চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করতে হত। প্রতিদিনের জীবন যাপন ছিল তার পক্ষে দুঃসাধ্য। বিপদকালে নির্ভর করার মত কিছুই তার থাকত না। তার চাষের হাল, বীজ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে নানকার নিয়মিতভাবে তার নিজের জমিতে চাষ আবাদও করতে পারত না, তাই তার জমিতে ফসল ফলত নামমাত্র। সুতরাং প্রায়ই সমস্ত পরিবার নিয়ে তাকে কাটাতে হত উপবাস বা অর্ধ-উপবাসে।

নানকার প্রজার জীবন ও শ্রমশক্তির উপর জমিদারের ছিল একচেটিয়া অধিকার। জমিদারের হাঁকে-ডাকে, অর্থাৎ জমিদারের যখনই প্রয়োজন হত তখনই নানকারকে ছুটে যেতে হত। নানকারকে ঘরের খেয়েই তাকে জমিদারের বেগার খাটতে হত। জমিদারের বেগার খাটা কেবল পুরুষেরই কাজ ছিল না, নানকার মেয়েদেরও তা ছিল বাধ্যতামূলক। জমিদারের ডাকে পুরুষ, নারী, এমন কি বালক-বালিকাদেরও বেগার খাটতে হত।

জমিদারী শাসনব্যবস্থায় সরকারী কোর্ট-কাছারির কোন স্থান ছিল না। নানকার প্রজার জন্য জমিদারী কাছারিগুলিই ছিল কোর্ট-কাছারি, আর জমিদার ও তার নায়েব-মুন্সীরাই ছিল জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-হাকিম। এদের মুখের কথাই ছিল আইন। তাদের মুখের কথায়ই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যেত, তাদের মুখের কথার বিরুদ্ধে কোন আপিল বা ওজর-আপত্তি চলত না। জমিদারী-কাছারিগুলিতে এমন সহস্র বিচারের অভিনয় চলত।

জমিদারের কাছারির বিচারে যদি নানকার প্রজার অবাধ্যতার জন্য শাস্তিদানের রায় হত, তবে সেই শাস্তি হত অতি ভয়ঙ্কর ও ঘৃণাব্যঞ্জক। সেই শাস্তি ছিল কিল, চড়, জরিমানা থেকে আরম্ভ করে বেত মারা, জুতাপেটা, হাত-পা বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা, দুটি আস্ত বাঁশের ফাঁকে বা তক্তার তলায় হাত, পা বা গোটা দেহটা ফেলে দু পাশে চেপে ধরে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের করা, লোহার শিক পুড়িয়ে গায়ে সেকা দেওয়া, বদ্ধ ঘরে অভুক্ত অবস্থায় এক সপ্তাহেরও বেশী দিন আটক রাখা প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ যেত না। জমিদারের লোকদের প্রহারের ফলে যদি কোন নানকারের মৃত্যু ঘটত, তবু তার আত্মীয়-স্বজন গলা ছেড়ে কাঁদতে পারত না।

নানকারদের বিদ্রোহ

নানকাররা এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটাবার চেষ্টা সব সময়ই নানাভাবে চালিয়ে এসেছে। নানকার-প্রথার দীর্ঘ ইতিহাসে তার প্রমাণ চারপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নানকারদের অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য এবং নেতৃত্বের অভাবে কোন সংগঠিত ও ব্যাপক বিদ্রোহ কখনও ঘটেনি, এই চেষ্টা এতদিন ব্যক্তিগত প্রতিবাদ, একক বিরোধিতা, গোষ্ঠীগত বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু

তার পরবর্তীকালে বৃহত্তর ও সংগঠিত এবং ব্যাপক বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের পটভূমি রচনা করেছে। নানকার বিদ্রোহের নায়ক শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ

"ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ বেয়ে সিলেট জেলার নানকার সমাজ অবশেষে শেষ সীমান্তে এসে পৌছল, বিদ্রোহের আগুনে চারদিক ঝলসে দিয়ে তারা ইতিহাস সৃষ্টি করল। সিলেট জেলায় এই বিদ্রোহের কালটা হল ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল। তারপর নানকার-প্রথা আইনত লোপ পেয়েছে। কিন্তু লোপ পায়নি সামন্তব্যবস্থা। প্রচুর সম্ভাবনাময় এই বিদ্রোহটি ইতিহাসের পাতাকে পুরোপুরি ওল্টাতে পারেনি।"

"স্বাভাবিকভাবেই লাঞ্ছনা, অপমান ও অত্যাচার যেখানে নিত্যদিনের ঘটনা, বিদ্রোহ সেখানে আপনা-আপনি অঙ্কুরিত হয়। আপনার জীবন রক্ষার তাগিদে নানকার সমাজকে তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে হয়েছিল।

(১) **সুখাইড় বিদ্রোহ (১৯২২-২৩)** ঃ সুখাইড় গ্রামের নানকার প্রজাদের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের আপাত কারণ যে ঘটনাটি তা এই গ্রামের একটি অতি সাধারণ ঘটনা, মূল কারণ নানকার প্রজার উপর জমিদারের বিভিন্ন অমানুষিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ।

একদিন গ্রামের এক নানকার প্রজার এক বয়স্থা কন্যার উপর জমিদারের দৃষ্টি পড়ে। তখনই জমিদার তার পাশবিক লালসা মিটাবার জন্য মেয়েটিকে ডেকে পাঠায়। অন্যান্য জমিদারির মত এই জমিদারির নিয়ম ছিল মেয়েটির বাবা বা মাকেই মেয়েকে নিয়ে যেতে হত জমিদারের কাছে। কিন্তু এবারে তা হল না। মেয়ের বাবা ও মা মেয়েকে জমিদারের কাছে পৌছে দিতে অস্বীকার করল, আর মেয়েটি জমিদারের লোককে তীব্র ভাষায় গাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে জমিদার তার গুণ্ডাবাহিনীকে নানকারের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় মেয়েটিকে ধরে আনতে। জমিদার তার ঘরে মেয়েটিকে আটক করে রাখে।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের নানকার প্রজারা একত্রে মিলে জমিদারের বাড়ি চড়াও হয়ে বন্দিনী মেয়েটিকে মুক্ত করে আনে। জমিদার নানকারদের এই ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের শাস্তি দেবার আয়োজন করে। নানকাররাও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা জমিদারের সঙ্গে অসহযোগ আরম্ভ করে, তারা জমিদারের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে, তার কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের ভিটা-জমি আগলে বসে থাকে। এই সংবাদ শুনে জমিদার দূর গ্রামের আত্মীয়-স্বজন ও জমিদারের সাহায্য প্রার্থনা করে। তার উত্তরে নানকাররাও দূরবর্তী গ্রামগুলির নানকারদের সাহায্য প্রার্থনা করে। এইভাবে সুখাইড় গ্রামের নানকারদের বিদ্রোহ নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের নানকারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, বিদ্রোহ ছড়াল দূরবর্তী সুনামগঞ্জ মহকুমার গৌরারঙ্গ ও শ্রীহট্ট সদর মহকুমার বোয়ালজুর গ্রাম দুটিতেও। দীর্ঘ দুই বছর কাল এইসব গ্রামের জমিদাররা নানকারদের দিয়ে কাজ করাতে পারেনি।

এই বিদ্রোহ চলেছিল ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। তারপর ইংরেজদের

শাসনযন্ত্রের সহায়তায় জমিদারদের সমবেত আঘাতের ফলে বিদ্রোহে পরাজয় ঘটে। এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন সুখাইড় গ্রামের নানকার সমাজের নেতা ব্রজবাসী দাস। বিদ্রোহের অবসানের পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ বলে জমিদাররা তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছিল। কিন্তু অনেকের মতে ব্রজবাসী খাসিয়া পাহাড়ের পথে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন।

(২) **কুলাউড়া বিদ্রোহ (১৯৩১-৩২) :** শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ ভাগে রেল-জংসন কুলাউড়া। জংসন, পুলিস কেন্দ্র প্রভৃতির কারণে এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সুখাইড় বিদ্রোহের মত কুলাউড়া বিদ্রোহ একটা স্থানীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। এই বিদ্রোহের মূলে ছিল নানকারদের শ্রেণীগত রাজনৈতিক চেতনা, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের শোষণ-উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের প্রেরণা। এর উৎস ছিল ১৯২৯-৩২ সালের বিশ্বজোড়া ধনতন্ত্রের আর্থনীতিক মহাসংকট ও ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। কুলাউড়ার নানকার প্রজারা সেদিন বলেছিল "দেশের স্বাধীনতার অর্থ যদি হয় নিজের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তবে আমরা আর জমিদারের বেগার খাটব না।" এই ধ্বনি নিয়েই কুলাউড়ার নানকার প্রজারা ১৯৩১ সালে জমিদারের বেগার খাটা বন্ধ করে দিল।

সেই সময় কংগ্রেসের যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল কুলাউড়া গ্রাম ছিল তার একটি প্রধান কেন্দ্র। এই আন্দোলনের প্রভাব স্থানীয় নানকার প্রজাদের উপরে গভীরভাবেই পড়েছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে থাকে। আর এই জাতীয় সংগ্রাম থেকে তাদের প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস বেড়ে যায়। গ্রামের সবচেয়ে নিগৃহীত, নিঃস্ব নানকার প্রজারাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামকে সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত করে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

কিন্তু কুলাউড়ার কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল জমিদারদের উপর নির্ভরশীল। নানকার প্রজারা জমিদারগোষ্ঠীর বেগার খাটা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারগোষ্ঠীও পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ করে এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও সদলবলে জমিদারদের সাহায্যে অগ্রসর হয়। তার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই শেষপর্যন্ত নানকারদের বেগার-বিরোধী সংগ্রামের পরাজয় ঘটে।

(৩) **ভানুবিল বিদ্রোহ (১৯৩০-৩২) :** ভানুবিল অঞ্চলে কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছে বহুদিন থেকে। জমিদারী শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে এই অঞ্চলের কৃষকগণ তাদের একটা সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। পৃথিমপাশার কুখ্যাত জমিদার আলী আমজাদ খাঁর জমিদারি ছিল এই ভানুবিল অঞ্চল। এই অঞ্চলটি শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। এই জেলার সর্বত্র জনসংখ্যার প্রধান অংশ বাঙালী, কিন্তু ভানুবিল অঞ্চলে প্রধানত মণিপুরী কৃষকদের বাস। ভাষায়, চেহারায় ও সংস্কৃতিতে এরা বাঙালীদের থেকে অনেকটা ভিন্ন হলেও এই মণিপুরীরা আর বাঙালীরা সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের দিক থেকে কেউ কারোর চেয়ে কম নয়। উনিশ শতকে ইংরেজরা যখন মণিপুর দখল করে নেয় তখন

এই মণিপুরীরা মণিপুর ত্যাগ করে শ্রীহট্ট জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। ভানুবিলের মণিপুরী কৃষকরা তাদেরই একটি অংশের বংশধর। এরা যেমন মণিপুরে ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অধীনে, তেমনি শ্রীহট্টে—ভানুবিলে এসেও পড়ল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী শোষণের যাতাকলে। কিন্তু স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য মণিপুরে সরল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যে নিষ্ঠা ও সরলতা তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, এখানকার পরাধীন অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের সহচর ধূর্ত জমিদারের কাছে তা মোটেই মর্যাদা পেল না। জমিদার ও তার কর্মচারীরা মণিপুরী কৃষকদের শ্রমের ফসল অবাধে লুঠ করতে লাগল। তাদের উপর সমানে চলল শোষণ-উৎপীড়ন-লাঞ্ছনা। এখানেও জীবন হয়ে উঠল বিষাক্ত। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে অবশেষে তারা জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তারা বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নিয়ে আয়োজন করতে লাগল।

১৯৩০ সাল। এই সময় আরম্ভ হয় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘরের কংগ্রেস কর্মীরা ইংরেজ-বিরোধী কার্যে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কৃষকদের মধ্যেও তারা প্রচারকার্য চালায়। এই প্রচার কার্যের ফলে ভানুবিলের সংগ্রামী কৃষকেরাও প্রভাবিত হয়। কংগ্রেস তার আইন-অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে খাজনা ও কর বন্ধের ধ্বনি তোলে। তার ফলে ভানুবিলের সংগ্রামী কৃষক জনসাধারণ কংগ্রেসকে সত্যিকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগঠন বলে গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ভানুবিল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভানুবিলের মণিপুরী কৃষকরা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নিষ্ঠা ও সরলতা নিয়ে ১৯৩২ সালে জমিদারের খাজনা ও সরকারী কর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়।

কৃষকদের এই সরকার ও জমিদার-বিরোধী বিদ্রোহ দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার ও জমিদার-পক্ষ প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে। সরকারী সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিস এবং জমিদারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী কৃষকদের গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে কৃষকদের মারপিট ও সম্পত্তি লুঠ করতে থাকে। তারা কৃষকদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে জিনিসপত্র লুঠপাট করল, মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল, হাতী দিয়ে জমির ফসল নষ্ট করল। কিন্তু এত অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখেও কংগ্রেস কর্মীরা কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এল না, তারা ইংরেজ সরকার এবং জমিদারের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও জানাল না। এর ফলে কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহের স্বরূপ কৃষকদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। এরপর কৃষকেরা অহিংস আন্দোলনের শর্তাবলী অগ্রাহ্য করে নিজেদের চির-পরিচিত সক্রিয় প্রতিরোধের, অর্থাৎ অস্ত্র হাতে করে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পন্থা অবলম্বন করল। সরকার ও জমিদারের বর্বর বাহিনীগুলির হিংস্র আক্রমণ ও কৃষকদের সক্রিয় প্রতিরোধে সমগ্র ভানুবিল অঞ্চল রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল।

"সরকারী সৈন্য ও পুলিস বহু সংখ্যায় আহত হল, জমিদারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বিধ্বস্ত হল, সরকার ও জমিদারের পোষা হাতীগুলি আহত হয়ে পালিয়ে গেল। আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, পুনরাক্রমণ, প্রতিরোধ অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। কৃষকের ঘরবাড়ী পুড়ল, বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ল। বিপর্যস্ত কৃষকেরা পার্শ্ববর্তী

ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করলেন।”

কৃষকদের এই সক্রিয় প্রতিরোধ শুরু হতেই কংগ্রেস নেতারা 'হিংসা' বলে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু কৃষকগণ তাতে কান না দিয়ে নিজেদের সংগ্রাম চালাতে লাগল। তার ফলে কংগ্রেসী নেতারা ভানুবিল বিদ্রোহের দায়িত্ব অস্বীকার করে বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গ ত্যাগ করল। অবশ্য যে সব কংগ্রেস কর্মী মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের ঘর থেকে এসেছিল তারা কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে কৃষকদের ছেড়ে যেতে পারল না।

ইংরেজ সরকারের সৈন্য ও পুলিস এবং জমিদারের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর অত্যাচার ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে দেশে ও বিদেশে প্রতিবাদ উঠতে লাগল। বাংলাদেশের আইন-সভায়, দিল্লীতে বড়লাটের কাউন্সিলে ও কেন্দ্রীয় আইন-সভায়, এমন কি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টেও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা করে সৈন্য ও পুলিস এবং জমিদারের গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচার অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। তাদের বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুক প্রভৃতি হাতিয়ার নিতান্তই অকেজো হয়ে পড়ল। এই অত্যাচারের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে, উপযুক্ত চালক ও দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সমর্থনের অভাবে শেষ পর্যন্ত কৃষকদের মনোবল ভেঙে পড়ল। বহু সংখ্যক কৃষককে গ্রেপ্তার করে তাদের মামলা-মোকদ্দমা শুরু হল।

“আদর্শগত সমর্থন ও বিপ্লবী নেতৃত্ব না পেয়ে ভানুবিলের বিদ্রোহ অবশেষে সংস্কারবাদী খাতে বয়ে না গিয়ে পারেনি। খাজনার নিরিখ নির্ধারণ, প্রজাস্বত্বের সীমানা নির্ধারণ, জমিদারী শোষণ-অত্যাচারের মধ্যেই ছিটেফোঁটা সুবিধালাভের চেষ্টায় পর্যবসিত হল।”

সুরমা উপত্যকার সংগঠিত নানকার-বিদ্রোহ (১৯৪৭)

সুরমা উপত্যকায় সংগঠিত কৃষক-আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৩৬ সালে। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের বিপর্যয় এবং তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের (জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের) ব্যর্থতার ফলে সংগ্রামী মনোভাব-সম্পন্ন কর্মীরা শ্রেণী-আন্দোলন ও শ্রেণী-সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমার বেহেলী গ্রামে সুরমা উপত্যকা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ হাজারে হাজারে ছাপিয়ে সারা শ্রীহট্ট জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব পাস হয় তা ছিল—জমির উপর প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা, নানকার প্রথা ও বেগার প্রথার অবসান, জমিদারের বে-আইনী আদায় ও জুলুমবন্ধের দাবি। কৃষক-সমিতির কর্মীরা শত শত সভা-সম্মেলন ও শোভাযাত্রা করে সম্মেলনের মূল দাবি প্রচার করেন। এর ফলে সারা জেলার কৃষকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগে ওঠে। এই সময় সুনামগঞ্জের বংশীকুণ্ডার জমিদারদের অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহারের

বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের কৃষকরা আন্দোলন করে। এর ফলে জমিদারের অত্যাচার-জুলুমের মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পায়। এটাই হল এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রথম জয়।

তারপর আসে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে জমিদারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কৃষকেরা প্রধানত জমিদার-বিরোধী প্রার্থীদেরই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

এই নির্বাচনে কৃষক সমিতির নেতা প্রজাবন্ধু করুণাসিন্ধু রায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। এর ফলে কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। করুণাসিন্ধু রায় আসামের আইন পরিষদে শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব বিল উত্থাপন করেন। এই বিলকে কেন্দ্র করে আইন পরিষদের বাইরে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সারা জেলার কৃষকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রজাস্বত্বের দাবিতে কৃষক কর্মীদের নেতৃত্বে শত শত কৃষক পায়ে হেঁটে দুর্গম খাসিয়া পাহাড় অতিক্রম করে শিলংয়ে অভিযান করে। এই অভিযানের প্রথম ফল হিসাবে বহু এম. এল. এ.-র বিরোধিতায় সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

এর পরবর্তী কয়েক বছরে সারা সুরমা উপত্যকায় কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ জোরদার হয়ে ওঠে। কৃষক আন্দোলনের চাপে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বাধ্য হয়ে জমির উপর রায়তী প্রজাদের জোতস্বত্ব স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সবচেয়ে শোষিত ও নির্যাতীত নানকার কৃষকদের দাবি, অর্থাৎ বেগার-প্রথার অবসান ও তাদের জমিবাড়ীর উপর জোতস্বত্বের দাবি অগ্রাহ্য হয়।

নানকার আন্দোলন ও বিদ্রোহ

১৯৪৬ সালে বাংলাদেশে যখন ভাগচাষীদের 'তেভাগার আন্দোলন' ব্যাপকভাবে আরম্ভ হল, তখন আসামের নানকার কৃষকদের মধ্যেও সংঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হতে লাগল। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে শ্রীহট্ট জেলার লাউতা-বাহাদুরপুরের নানকার কৃষক এবং মানেশ্বর ও দাসের বাজারের অন্যান্য কৃষকরাও ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে। নানকার কৃষকরা নানাভাগে বিভক্ত ও অসংগঠিত। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তাদের মধ্যে সংগ্রামের স্পৃহা এবং দৃঢ় ঐক্য গড়ে ওঠে। এই সব অঞ্চলের সকল কৃষক সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়। নানকার কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছিল, সেই আগুন একদিন জ্বলে ওঠে।

যে অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে নানকার প্রজারা সেদিন বিদ্রোহের পতাকা ওড়াল, সে প্রকারের ঘটনা এর আগে বহুবার ঘটেছে। তখন তা ঐক্যবদ্ধ ছিল না বলে তারা সেই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে তারা সেই অত্যাচার আর মুখ বুজে সহ্য করল না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াল একতাবদ্ধ হয়ে।

শ্রীহট্ট জেলার লাউতা-বাহাদুরপুরের সকল নানকার প্রজা একযোগে সকলে

জমিদার বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিল। তারা জোরগলায় দাবি করল: (১) হদ, বেগার প্রথার অবসান চাই; নানকার প্রথার অবসান চাই। (২) নানকার প্রজার জমি-বাড়ীর উপর জোতস্বত্ব স্বীকার করা চাই।

জমিদাররা সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে পড়ল। তারা অনেক টাকার লোভ দেখিয়েও আর কাজের লোক পেল না। নানকার কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে দাঁড়াল সমস্ত এলাকার কৃষকেরা। লাউতা-বাহাদুরপুরের সাধারণ প্রজারাও জমিদার-বাড়ী যাওয়া ও খাজনা দেওয়া একযোগে বন্ধ করল নানকার আন্দোলনের সমর্থনে। তারা নানাভাবে নানকার আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল।

কৃষক সমিতির অফিস থেকে নেতারা নানকার আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। জমিদার-বাড়ীর পরিবর্তে কৃষকদের সকল বিচারের কাজ চলত কৃষক-সমিতির অফিসে। আন্দোলনের সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল।

নানকার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে। তখন আসামের শাসন-কার্য পরিচালিত হত কংগ্রেসের দ্বারা। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এগিয়ে এল এবং নানকার প্রজাদের আন্দোলন দমন করার জন্য দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল। কংগ্রেসী জমিদার শ্যামাপদ দেবের বাড়ীতে পুলিস-ঘাঁটি বসান হল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জমিদারগণ নানকার-আন্দোলন দমন করার জন্য একযোগে পুলিসের নির্দেশ মত কাজ করতে লাগল। বহু নানকার প্রজাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাদের পরিবারের লোক-জনের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালান হল।

কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচার সত্বেও নানকার আন্দোলন ক্রমশই বিস্তার লাভ করল এবং শক্তিশালী হয়ে উঠল। নূতন নূতন অঞ্চলের নানকার ও সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হতে লাগল এবং আন্দোলনের শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল—একটি ভারত ও অপরটি পাকিস্তান। শ্রীহট্ট জেলার যে অঞ্চলে নানকার প্রজাদের আন্দোলন চলছিল সেই অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। স্বভাবতই পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল মুসলিম লীগ পার্টি। মুসলিম লীগ ক্ষমতায় বসেই নানকার আন্দোলন দমন করবার জন্য বিভেদনীতি ও দমননীতি একসঙ্গে চালাতে লাগল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুলিস-ঘাঁটি বসল মুসলিম লীগের নেতা শ্রীহট্ট জেলার বাহাদুরপুরের জমিদারের বাড়ীতে। ব্যাপকভাবে শুরু হল গ্রেপ্তার ও শারীরিক উৎপীড়ন। কিন্তু অত্যাচার চলার সঙ্গে সঙ্গে নানকার ও অন্যান্য কৃষকের মিলিত শক্তি ও সংগ্রামী মনোবল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। কৃষকদের বয়কট আন্দোলন আরও জোরদার হল। কৃষকরা জমিদার বাড়ীর বাজার বয়কট করে কৃষক সমিতির বাজার স্থাপন করল। এমনকি স্থানীয় তালুকদাররাও কৃষকদের আন্দোলন সমর্থন করল।

নানকার কৃষক ও অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাল। কিন্তু কৃষক সাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির

সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হল। আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সংগ্রামী কৃষকগণ স্পষ্ট বুঝতে পারে যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, দুই প্রতিষ্ঠানই জমিদার-গোষ্ঠীর স্বার্থের রক্ষক। এই জন্যই ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হল। অবশ্য শেষপর্যন্ত আন্দোলনের চাপে পড়ে কোন কোন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা নানকার প্রজাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে নানকার কৃষকদের মামলা পরিচালনার জন্য যে 'ডিফেন্স কমিটি' গঠিত হয় তাতে শ্রীহট্ট জেলার কয়েকজন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে নানকার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে।

এই অবস্থায় নানকার কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও উত্তর শ্রীহট্ট মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে যুক্ত 'ডেপুটেশন' দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া শ্রীহট্ট জেলা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি ভিন্ন 'ডেপুটেশন' যায়। এর পর মুসলিম লীগ সরকার ভালভাবেই উপলব্ধি করে যে, তাদের দমন-নীতি ও বিভেদ-নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং এই কৃষক-আন্দোলন ব্যাপক গণ-সমর্থন লাভ করেছে। এরপর মুসলিম লীগ সরকার নানকার কৃষকদের অবস্থা ও দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করে। এই তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট হাতে পেয়ে এবং নানকার আন্দোলনের আরও বিস্তার ও শক্তি দেখে মুসলিম লীগ সরকার নানকার কৃষকদের বাড়ি ও অর্ধেক জমির উপর কৃষকদের জোতস্বত্ব স্বীকার করে নেয়।

জমির লড়াই

কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার লাউতা-বাহাদুরপুর অঞ্চলে সরকার ও জমিদার-গোষ্ঠীর নতুন আক্রমণ আরম্ভ হয়। নানকার আন্দোলনের নেতাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয় এবং তাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে জমিদাররা হিন্দু কৃষকদের জমি জোর করে দখল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সমিতির আহ্বানে কৃষকগণ একতাবদ্ধভাবে জমি রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কৃষক সভার নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক লাঠি, বল্লম প্রভৃতি হাতিয়ার নিয়ে বাধা দেবার ফলে জমিদারদের পক্ষে হিন্দু কৃষকদের জমি দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর লীগ সরকার জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষকদের অত্যাচার আরম্ভ করে এবং কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু পুলিসী অত্যাচার সত্ত্বেও কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ, জঙ্গী আন্দোলন এগিয়ে চলে।

সরকার ও জমিদারগোষ্ঠী প্রচার করল যে, কমিউনিস্টরা পাকিস্তান ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। এর ফলে মুসলমান কৃষকদের একাংশের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই সুযোগে সরকার গ্রামাঞ্চলে একদল সৈন্য পাঠায় এবং কয়েকটি স্থানে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর সৈন্যেরা গুলিবর্ষণ করে। সকল স্থানে কৃষকেরা বীরের মত গুলির সম্মুখীন হয়। গুলিচালনার ফলে পাঁচজন কৃষক বীর শহীদ

হন, আহত হন বহু কৃষক। গুলিচালনায় আহত অবস্থায় যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিল। গ্রামে গ্রামে পুলিসের ঘাঁটি বসান হয়। কৃষকদের গ্রেপ্তার চলতে থাকে।

শ্রীহট্টে টঙ্ক আন্দোলনের বিস্তার[১]

ময়মনসিংহ জেলার হাজং অঞ্চলের টঙ্ক আন্দোলন ময়মনসিংহের সংলগ্ন এলাকা শ্রীহট্ট জেলার হাজং এলাকায়ও বিস্তার লাভ করে। সেখানেও হাজং কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে টঙ্ক প্রথা অবসানের দাবিতে সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং সকল প্রকার জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

টঙ্ক আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার প্রচণ্ড দমন-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ সরকার পলাতক কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার এবং সাধারণ কৃষকদের উপর নির্যাতন চালাবার জন্য ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি পুলিস ঘাঁটি বসায় এবং সশস্ত্র পুলিস গ্রামে ঢুকে পাইকারীভাবে সাধারণ কৃষকদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে হাতিয়ার নিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। এর ফলে কৃষক ও পুলিসের মধ্যে বহু স্থানে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়।

১৯৫০ সালের ৬ই মে শ্রীহট্টের হাজং এলাকায় একটি গ্রামে মে দিবসের একটি সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় বক্তৃতা করছিলেন শ্রীহট্টের কৃষক নেতা রবি দাস। এই সভা হচ্ছিল গোপনে, কিন্তু পুলিস সভার সংবাদ জেনে যায়। সংবাদ পেয়ে এক বিরাট সশস্ত্র পুলিস দল গ্রাম ঘেরাও করে এবং গ্রামের মধ্যেই রবি দাসকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর পরেও হাজংদের আন্দোলন চলতে থাকে এবং পুলিসের গুলিবর্ষণে আরও কয়েকজন হাজং চাষী শহীদ হন।

১। ময়মনসিংহের টঙ্ক আন্দোলন সম্পর্কে রাসমণির কাহিনী দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

বাংলার ডাকাত ও ডাকাতি[১]

বাংলাদেশে ডাকাতের সৃষ্টি

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আর ইংরেজ লেখকদের মধ্যেও অনেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিকৃত করে এবং সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে নিজেদের ভারতবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই সব প্রচারের একটি হল ভারতবর্ষের বিশেষত চুরি-ডাকাতি ও চোর-ডাকাত সম্বন্ধে তাদের ধারণা। তারা ভারতবর্ষের চুরি-ডাকাতিকে ভারতীয় জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষকদের একটি পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, ভারতবর্ষে চুরি-ডাকাতির একমাত্র কারণ চোর-ডাকাতদের স্বভাব এবং অল্প সময়ের মধ্যে ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষের ডাকাতরা বংশ-পরম্পরায় এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছে, সুতরাং এ তাদের বংশানুক্রমিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের আরম্ভকাল থেকে শেষ পর্যন্ত এই ছিল এদেশে চুরি-ডাকাতি সম্বন্ধে শাসকদের একমাত্র ধারণা। তারা ইংলণ্ডের ডাকাতদের সঙ্গে বাংলাদেশের ডাকাতদের তুলনা করে বলেছেন :

"বাংলাদেশের ডাকাতরা ইংলণ্ডের ডাকাতদের মত নয়। ইংলণ্ডের ডাকাতরা ডাকাতি করতে বাধ্য হয় আকস্মিক অভাবের তাড়নায়। কিন্তু বাংলাদেশের ডাকাতদের পেশাই ডাকাতি, তারা বংশানুক্রমিক ডাকাত। তারা দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং ডাকাতি করে যা পায় তা দিয়েই তাদের পরিবার প্রতিপালিত হয়।"

প্রথম যুগের ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসও এই রকম ধারণাই পোষণ করতেন। তিনি বাংলাদেশের ডাকাতদের পরিচয় দিয়ে ইংলণ্ডে লিখে পাঠিয়েছিলেন :

"বাংলাদেশের ডাকাতরা খুনি দস্যুদের জাতি। তারা বংশানুক্রমে সমাজের বিরুদ্ধে সকল সময় যুদ্ধ চালিয়ে, গ্রাম, ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে আর গ্রামবাসীদের হত্যা করে জীবিকানির্বাহ করে।"

এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন শাসকরা যা-ই বলুক না কেন, একথা আজ প্রায় সবাই জানে যে, যেদিন থেকে সমাজে শোষণব্যবস্থা ও তার অনিবার্য পরিণতিরূপে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়েছে সেইদিন থেকেই শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে জীবনধারণের আর কোন উপায় না দেখে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি পাপের পথ আবিষ্কার করেছে। ইংরেজ শাসনের আগে তুর্কি-আফগান এবং মোগল-যুগেও ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়ন ও দারিদ্র্যের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য

১। সুপ্রকাশ রায় : 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত।

স্থানেও সাধারণ মানুষের একটি অংশ চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করতে বাধ্য হত। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্থানে ডাকাতের সংখ্যা হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, প্রথমত, একদিকে ব্যবসায়ের নামে ইংরেজ বণিকদের ব্যাপক লুণ্ঠনের ফলে তাঁতী প্রভৃতি কারিগরগণ কর্মহারা হয়ে অধিক সংখ্যায় ডাকাতের দলকে পুষ্ট করেছিল, এবং অপরদিকে অত্যধিক খাজনা ও নানা প্রকারের করের চাপে জমিজমা, ঘরবাড়ি হারিয়ে কৃষকরা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসকগণ ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশ ও বিহার প্রদেশে সমগ্রভাবে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের একাংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত তাদের লুণ্ঠনের অংশীদাররূপে একটি জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করল, আর তাদের হাতে তুলে দিল গ্রামাঞ্চলের শাসনভার। অবশ্য সেই জমিদারশ্রেণীও দেখা দিল ডাকাত রূপে। এই জমিদাররা গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার পেয়ে সরকারী ক্ষমতার জোরে জমিজমা থেকে প্রজা উচ্ছেদ আর প্রত্যক্ষভাবে ডাকাতি দ্বারা প্রজাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত। জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ বাহিনীও কুখ্যাত ডাকাতদের নিয়েই গঠিত হত। তাদের দ্বারা লুট-করা ধনসম্পদের মোটা অংশ নিত জমিদাররা। এই প্রকারের শোষণ-উৎপীড়ন ও লুটপাটের ফলে কৃষকরা পথের ভিখারী হয়ে আত্মরক্ষার জন্য বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। এই অমানুষিক অবস্থার ফলে ইংরেজ শাসনের প্রথম থেকেই বাংলাদেশ ও বিহারে অগণিত মানুষ "ডাকাত" রূপে দেখা দিয়েছিল। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড বেচার নামে একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সেই সময়ের গভর্নর-জেনারেলের কাছে একখানি পত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ শাসন ও তার অমানুষিক লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ইংরেজ লেখকদের লেখা থেকেই জানা যায় যে, ইংরেজ শাসনের বর্বরসুলভ শোষণ-উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই দেখা দেয় ১৭৭৬ সালে সর্বধ্বংসী 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এই মন্বন্তরে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মরেছিল। মৃতদেহগুলি পোড়াবারও লোক ছিল না। ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ (এক কোটি) আর বিহারের এক-তৃতীয়াংশ (পঞ্চাশ লক্ষ) মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

যে দেশে শাসকগোষ্ঠী নিজেরাই ভয়ঙ্কর শোষণ-উৎপীড়নের দ্বারা প্রজা-সাধারণের সর্বস্ব কেড়ে নেয়, দেশের অন্নদাতা কৃষককে পথের ভিখারী করে তোলে, সমগ্র দেশকে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলে দেয়, সে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্য চুরি-ডাকাতির সহজ উপায় অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। ১৮ শতকের শেষভাগের এবং ১৯ শতকের বাংলাদেশের ডাকাত ইংরেজ বণিক-শাসনেরই সৃষ্টি।

জমিদারী প্রথার ফলে ডাকাত সৃষ্টি

ইংরেজ শাসনের পূর্বে, নবাবী আমলেও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-উৎপীড়নের ফলে জমিজমা ও ঘরবাড়ি হারিয়ে একদল মানুষ চুরি-ডাকাতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

করত। কিন্তু সে সময় শোষণের মাত্রা সীমাবদ্ধ ছিল বলে ডাকাতের সংখ্যা অল্পই ছিল। ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনের কাল থেকে এই সংখ্যা হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ শাসনকালে বাংলা ও বিহারে যে বিপুল সংখ্যক ডাকাত সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বণিক-শাসনের কৃষিনীতিরই অনিবার্য ফল। প্রথমে 'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' ও 'দশশালা বন্দোবস্ত' এবং পরে ১৭৯৩ সালের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর মারফত ইংরেজ শাসনের সহায়করূপে যে নূতন জমিদার-গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছিল তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশে এক বিশাল ডাকাতশ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজ প্রভুদের ও নিজেদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাবার জন্য বাংলা ও বিহারের কৃষক সম্প্রদায়কে জমিজমা ও ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে ভিক্ষুকে পরিণত করেছিল। এই কৃষক-ভিক্ষুকরাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য ডাকাতির পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। স্পষ্টবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিক জেমস্ মিল জগৎবাসীর কাছে এই সত্য উদ্ঘাটিত করে লিখেছিলেন:

"একটা ভয়ঙ্কর অনিষ্টের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অনিষ্টটি প্রধানত জমিদারী প্রথারই অনিবার্য পরিণতি। তা হল ডাকাতি বা দলবদ্ধ লুণ্ঠন। তা বাংলাদেশে ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, যখন থেকে রায়তগণ জমিদারী ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল, তখন থেকেই তাদের অধিকারগুলি একে একে হরণ করে যেভাবে তাদের ক্রোধে উন্মাদ করে তোলা হয়েছিল, তার ফলেই ডাকাতি এমন ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।"

'জমিদার' নামক অতি ভয়ঙ্কর একটি শোষকশ্রেণী সৃষ্টি করে আর তাদের হাতে শোষণ-উৎপীড়নের অবাধ ক্ষমতা দিয়ে তাদেরই হাতে বাংলা ও বিহারের কৃষক সম্প্রদায়কে তুলে দেওয়ার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠতে থাকে। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিবার্য কুফল যখন বাংলা ও বিহারকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল, তখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে জমিদারী প্রথার ফলাফল অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি 'সিলেক্ট কমিটি' গঠন করে। এই কমিটির কাছে ঐতিহাসিক জেমস্ মিল স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেন:

"জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলাদেশে ডাকাতির প্রধান কারণ। যেভাবে জমির অধিকার ও জমির স্বত্ব থেকে চাষীকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার ফলেই চাষীরা প্রাণ বাঁচাবার অন্য কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে এই উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।"

"নূতন জমিদারী ব্যবস্থাই বাংলাদেশে ডাকাতি বৃদ্ধির মূল কারণ"। বাংলা-দেশের সর্বত্রই ডাকাতেরা কৃষিজীবী, অর্থাৎ কৃষক।

জমিদার ডাকাত

মোগল শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা-দেশে দেখা দিয়েছিল এক ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা। সেই অরাজকতার সুযোগে নূতন তৈরী জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে পাঁচসালা, দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত সমস্ত চাষের জমির উপর অবাধ অধিকার লাভ করে বাংলার

কৃষক সম্প্রদায়কে জমির অধিকার ও স্বত্ব থেকে গায়ের জোরে উৎখাত করতে শুরু করে। এ পর্যন্ত অর্থাৎ মোগলযুগ পর্যন্ত কৃষক সম্প্রদায় দেশের রাজাকে জমির উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব বাবদ দিয়ে নির্বিবাদে জমি ভোগ করে আসছিল। সে সময় প্রকৃতপক্ষে কৃষকগণই জমির দখলী স্বত্ব ভোগ করত। কিন্তু ইংরেজ বণিক শাসকরা কৃষকদের সেই দখলী স্বত্ব কেড়ে নিয়ে তা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত তাদের প্রতিনিধি হিসাবে জমিদারগোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করে।

জমিদারগোষ্ঠী ইংরেজ শাসকদের সাহায্যে কৃষককে তার জমির দখলী স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করার জন্য যে নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেছিল, তার তুলনা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অল্পই আছে। এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে:

"১৭৯৩ সালের পর (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর) জমিদারগোষ্ঠী যে দু'টি প্রধান কৌশলে চাষীর দখলী স্বত্ব ধ্বংস করেছিল তার প্রথমটি ছিল চাষীকে তার ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করা, দ্বিতীয়টি চাষীর সর্বনাশ সাধন। নির্বিঘ্নে ব্যাপক ও তীব্রভাবে উৎপীড়ন করাই ছিল এই উভয় কৌশল কাজে পরিণত করার সহজ উপায়। আর বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়নের মধ্যে জমিদারদের দিক থেকে ডাকাতিই ছিল সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী। কারণ, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তের মধ্যে।"

ডাকাতির কৌশলটা ছিল জমিদারদের আয়ত্তাধীন, কারণ পেশাদার ডাকাতরা ছিল তাদের পোষা। নিরীহ কৃষকদের উপর সেই পোষা ডাকাতদের লেলিয়ে দিয়ে কৃষকদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করা হত, আর কৃষকরাও সবকিছু হারিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ডাকাতদের দলে যোগ দিত। এই অবস্থা চলেছিল ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত।

জমিদারদের এই অবাধ লুণ্ঠন আর ডাকাতির প্রধান সহায় ছিল স্বয়ং ইংরেজ বণিক শাসকরা। ইংরেজ শাসকরা জমিদারদের নানাভাবে সাহায্য করত বলেই জমিদারগোষ্ঠী নির্বিঘ্নে পেশাদার গুণ্ডা-ডাকাতদের দিয়ে বাংলার কৃষকদের ধ্বংস করতে পেরেছিল। জমিদাররা যাতে নির্বিঘ্নে এ কাজ করতে পারে তার জন্যই ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে শাসকরা গ্রামাঞ্চলের শান্তিরক্ষার ভার গুণ্ডা-ডাকাতদের মুরুব্বি জমিদারদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। জমিদাররা সচ্চরিত্র গ্রামবাসীদের পরিবর্তে গ্রামের পেশাদার ডাকাত ও গুণ্ডাদেরই দারোগা, পাইক প্রভৃতি রূপে গ্রামের শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত করত। বলা বাহুল্য, এই গুণ্ডা পাইক আর দারোগাদের কোন বেতন দেওয়া হত না। বেতনের পরিবর্তে তাদের দেওয়া হত ডাকাতি ও লুটতরাজের অবাধ স্বাধীনতা। জমিদারদের পরামর্শে আর নির্দেশেই তারা ডাকাতি ও লুটতরাজ করত এবং ডাকাতি করা ও লুণ্ঠনের দ্বারা তারা যে অর্থ সংগ্রহ করত তার একটা মোটা অংশ জমিদারদের হাতে তুলে দিত। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেকালের গভর্নর-জেনারেল স্বয়ং লিখেছেন:

"জমিদার ও তাদের কর্মচারীরা পুলিসের চাকরি সবচেয়ে কুখ্যাত ডাকাত আর গুণ্ডাদের কাছে বিক্রয় করত। এই ডাকাত আর গুণ্ডারা অবাধে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার করত। সব জমিদারির অবস্থাই ছিল মোটামুটি একই প্রকার। প্রত্যেক জমিদারই একটি করে ডাকাত দল পুষত। আবার একথাও সবাই জানত যে, প্রত্যেকটি ডাকাতদলের সঙ্গেই কোন না কোন জমিদারের সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে।"

১৮৩৭ সালের পুলিস-রিপোর্টে বলা হয়েছে : "জমিদারের বেতনভুক ডাকাত, পুলিস আর চৌকিদারদের ডাকাতির আগে ছুটি দেওয়া হত। ডাকাতির দিন গ্রামে উপস্থিত থাকলে পাছে কেউ তাদের ডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করে, সেই জন্যই ডাকাতির আগে তাদের ছুটি দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হত।"

এইভাবে ইংরেজ শাসকরা নূতন তৈরি করা জমিদারগোষ্ঠীর সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে কৃষকদের বলপূর্বক জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে বাংলার গ্রাম-সমাজ ধ্বংস করে ফেলেছিল। জমিজমা হারিয়ে কৃষকদের একাংশ প্রাণ বাঁচাবার জন্য ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তির পথ অবলম্বন করল, আর অধিকাংশ মরিয়া হয়ে জমিদার ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হল। এটাই ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে ডাকাতের সংখ্যাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সে সময় থেকে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যায় সশস্ত্র ডাকাত দেখা দিয়েছিল এবং তাদের উপদ্রব প্রায় সমগ্র উনিশ শতকে অব্যাহতভাবে চলেছিল।

ইংরেজ শাসকেরা বাংলার কৃষককে জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে যে ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তির ভিত্তি তৈরি করেছিল, সেই ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে তাদের শাসনব্যবস্থাকেও বিপন্ন করে তুলেছিল। তাই শাসকগণ বাধ্য হয়ে ১৮৩৫ সালে বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে একটি 'ডাকাতি কমিশন' নিয়োগ করে। কিন্তু এই 'কমিশন'-এর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে বাংলার ডাকাতি দমন করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩৫ সালে ওয়েলবি জ্যাকসন নামে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে বাংলাদেশের ডাকাতি সম্বন্ধে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। জ্যাকসন সাহেব বিভিন্ন জেলায় ঘুরে যে 'রিপোর্ট' পেশ করেন তাতে বলা হয় :

"এখন বাংলাদেশে ডাকাতি একটি অতি সাধারণ ঘটনা, আর এতে প্রায়ই নরহত্যা ঘটে থাকে। এখন সকলেই জানে যে, এই সকল ডাকাতি জমিদারদের 'লাঠিয়াল' বলে পরিচিত ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারাই সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই ভাড়াটে গুণ্ডাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বিহারের অধিবাসী। আমাদের পুলিসবাহিনীর পক্ষে এই ডাকাতদের ও ডাকাতের দলগুলিকে দমন করা অসম্ভব।"

বর্তমান কালের মত সেকালেও বাংলাদেশের বাগ্‌দি, মাঝি, নমশূদ্র প্রভৃতি এবং বিহারের দোসাদ, কুর্মী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি ছিল সবচেয়ে দরিদ্র ও উৎপীড়িত। তাদের অনেকেই বহু পূর্বে জমিজমা ও ভিটামাটি হারিয়ে ডাকাতের

দলে পরিণত হয়েছিল। জমিদাররা তাদের মধ্য থেকে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকগুলিকে নিয়ে লাঠিয়াল ও পুলিস-বাহিনী গঠন করত।

জমিদার-নীলকর-বিরোধী 'ডাকাত'

মহানুভব 'বিশে ডাকাত'

"ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগের ভয়ঙ্কর অরাজকতার সময় দেশের মধ্যে এমন মানুষ খুব অল্পই ছিলেন, যাঁরা অসহায় কৃষক জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের মহাশত্রু, জমিদার-নীলকর-ইংরেজ শাসকদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারতেন, জনসাধারণের জন্য অকাতরে আত্মদান করতে পারতেন। যে দুই-একজন মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবার জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরাও সরকারী নথিপত্রে এবং বিদেশীদের রচিত ইতিহাসে 'দস্যু-ডাকাত' নামে অভিহিত হয়েছেন। এই সব তথাকথিত 'ডাকাত'দের মধ্যে বিশ্বনাথ বা 'বিশে ডাকাত' খ্যাতি-অখ্যাতিতে সর্বাগ্রগণ্য।"[১]

বিশ্বনাথের জীবনীকার শ্রীবিমলেন্দু কয়াল মহাশয় বিশ্বনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন:

"এইরূপ ঐতিহাসিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার দিনে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সূত্রপাতের প্রথম আমলে বাংলার এক নিভৃত পল্লীতে অধুনা বিস্মৃত-স্মৃতি এক বাঙালী বীরের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। সেদিনের বৈদেশিক শাসক সম্প্রদায়ের কূট চক্রান্তে কলঙ্ক-কালিমায় এই বীরের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। 'দস্যুর' অখ্যাতি আখ্যায় তাঁহার খ্যাতির কাহিনী আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। (ইংলণ্ডের) শেরউড বনভূমির দস্যু রবিনহুড যে ইংরেজদের জাতীয় জীবনে মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, সেই ইংরেজরা ব্রাহ্মণীতলার বনভূমির বাঙালী বীরকে 'দস্যু' আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হীনভাবে হত্যা করিয়াছে। ধনীর ধন লুণ্ঠন করিয়া বিশ্বনাথ অকাতরে তাহা দরিদ্রের জন্য বিলাইয়া দিত। বিশ্বনাথ দরিদ্রের জন্য ডাকাত সাজিয়াছিল।"[২]

নদীয়া জেলার ইতিহাসে লিখিত আছে:

"বিশ্বনাথ জাতিতে বাগ্‌দি এবং ব্যবসায়ে ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দান-শৌণ্ডকতার জন্য তাহাকে 'বাবু' আখ্যা দান করা হইয়াছিল। কথিত আছে, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র ও অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ-ধনীর যম ছিল। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রের বিবাহের

১। সুপ্রকাশ রায়: ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৩৬৬।
২। প্রবন্ধ, 'যুগান্তর' পত্রিকা, ২২শে নভেম্বর, ১৯৫৩।

ব্যয় বহন করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।"[১]

শ্রীমোহিত রায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :

"বিশ্বনাথের দানের খ্যাতি লোকবিশ্রুত ছিল। কৃপণ-ধনীর যম ছিল বিশ্বনাথ। ডাকাতি করা অর্থ সে নিজে খুব কমই ভোগ করত, প্রায় সমস্ত অর্থই বিলিয়ে দিত দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণের মধ্যে।...দরিদ্র পোষণই ছিল বিশ্বনাথের জীবনের ব্রত। বিশ্বনাথের প্রদত্ত অর্থে বহু দরিদ্র পরিবার প্রতিপালিত হয়েছে, বহু কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা উদ্ধার পেয়েছে।[২]

নদীয়া জেলার চাপরা থানার অন্তর্গত গাদড়া-ভাতছালা নামক গ্রামে বিশ্বনাথের জন্ম। বিশ্বনাথ জাতিতে ব্যগ্রক্ষত্রিয় বা বাগদি। তাঁর পিতা-পিতামহ কৃষিকার্য দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্রময় গ্রাম-সমাজের জমিদার-নীলকর আর ইংরেজগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত-উৎপীড়িত শত-সহস্র অসহায় মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিশ্বনাথ পিতা-পিতামহের অনুসৃত নিরুপদ্রব জীবন ত্যাগ করে গ্রামের সেই অসহায় মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ডাকাতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। কারণ, সেকালের সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ জমিজমা, ভিটামাটি থেকে উচ্ছিন্ন কৃষকের প্রাণ বাঁচাবার জন্য একমাত্র ডাকাতির পথই খোলা ছিল। বিশ্বনাথ ডাকাতির নামে শোষণ-উৎপীড়নকারী ধনীদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে তা দ্বারা দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্ষুধায় কাতর অসহায় মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বনাথের ডাকাতির পথ বিদ্রোহেরই পথ। বিশ্বনাথ ডাকাত ছিলেন না, ছিলেন বিদ্রোহের নায়ক।

বুদ্ধিতে ও দেহের শক্তিতে বিশ্বনাথের কোন তুলনা ছিল না। এই দুইটি গুণের সাহায্যেই বিশ্বনাথ তাঁর ডাকাতদল তৈয়ার করতে পেরেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বনাথের ডাকাতদল এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয়। 'নদীয়া জেলার ইতিহাস'-এ লিখিত আছে :

"বিশ্বনাথের সুবৃহৎ দলে সহস্রাধিক বলবান ব্যক্তি সর্বদা সশস্ত্র হইয়া প্রস্তুত থাকিত। ইহাদের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল, যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক, শিশু ও গোজাতির উপর কোন অত্যাচার না করে।" (পৃঃ ৫৯)।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল তাঁর 'বিশে ডাকাত' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"বিশ্বনাথ ডাকাত হইল বটে, কিন্তু অসাধারণ ডাকাত হইল। তাহার মহত্ব, তাহার দেশপ্রীতি, অসাধারণ দানশীলতা, নারীর প্রতি অসাধারণ শৌর্য, শিশুর প্রতি অপরিসীম অনুকম্পা ও দরিদ্রের প্রতি অবিমিশ্র সহানুভূতি তাহাকে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল। যেখানে সে দেখিয়াছে মানবতার

১। কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া-কাহিনী, পৃঃ ৫৯।

২। শ্রীমোহিত রায় : 'কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ' (প্রবন্ধ—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ই অক্টোবর, ১৯৬১)।

প্রতি ঘৃণা ও লাঞ্ছনা, সেখানেই সে ক্ষিপ্র পদে উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্যায় ও অত্যাচারের কবল হইতে নির্যাতিতকে রক্ষা করিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলাকামী ব্যক্তিরা গভীরতম শ্রদ্ধায় বিশ্বনাথের কাছে মস্তক অবনত করিত। ডাকাতের চৌর্যবৃত্তির মহামানবের হৃদয়বৃত্তির সহিত মহামিলন সাধিত হইল। ডাকাত বিশে এক অপূর্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার সুনাম ও খ্যাতি দেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল। বীরত্বে ও মহত্বে গঠিত বিশ্বনাথের কাহিনী সেইদিন বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যে, গাথায় ও গানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।" (যুগান্তর পত্রিকা, ২২শে নভেম্বর, ১৯৫৩)

বিশ্বনাথের ডাকাতি করবার নিয়ম ছিল অভিনব। বিশ্বনাথ কখনও পূর্বে সংবাদ না দিয়ে কারোর বাড়ী ডাকাতি করতে যেতেন না। তিনি ডাকাতির জন্য যেতেন কেবল ধনীদের বাড়ী, তিনি বা তাঁর দলের কেউ কখনও দরিদ্র বা পথচারীদের কোন ক্ষতি করেন নি। কোন গৃহে ডাকাতি করতে যাবার আগে বিশ্বনাথ ধনী গৃহস্বামীকে জানিয়ে দিতেন যে, তিনি রাত্রিকালে তার বাড়ীতে অতিথি হবেন। গৃহস্বামী নির্বিবাদে বিশ্বনাথকে তাঁর দাবি অনুযায়ী টাকা দিয়ে দিলে তিনি নিরুপদ্রবে সেখান থেকে চলে যেতেন, গৃহস্বামী বা গৃহের অন্য কারোর কেশাগ্রও স্পর্শ করতেন না।

ডাকাতি করা অর্থে বিশ্বনাথ ও তাঁর সম্প্রদায় প্রতি বছর মহাসমারোহে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতেন। এই উপলক্ষে বিশ্বনাথ নিজহাতে পঙ্গু, বৃদ্ধ, শিশু ও দুস্থদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করতেন।

সে সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুঠিগুলি ছিল শয়তানের আড্ডা, কৃষক-শোষণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা নামমাত্র মূল্য দিয়ে কৃষক-তাঁতীদের কাছ থেকে জোর করে মসলিন প্রভৃতি বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তা ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা আয় করত। তাদের এই অত্যাচারের ফলে বাংলার তাঁতীরা পথের ভিখারী হয়ে যায়, বহু তাঁতী তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে লাঙল নিয়ে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করত। এই সময় নদীয়ার শান্তিপুর ছিল তাঁতের কাপড়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইংরেজদের কুঠিগুলির অত্যাচারে শান্তিপুরের তাঁতীদের চরম দুর্দশা দেখা দেয়। তাঁতীদের এই দুর্দশায় অস্থির হয়ে বিশ্বনাথ কুঠিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। কয়েকটি কুঠিতে ডাকাতি করে বিশ্বনাথ বহু অর্থ লুণ্ঠন করলেন এবং ইংরেজ কুঠির বাঙালী কর্মচারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দিলেন। এর ফলে কুঠির পরিচালকদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

বিশ্বনাথের নীলকর-বিরোধী সংগ্রাম

'বিশে ডাকাত' বা বিশ্বনাথ সর্দারের জীবনীকার শ্রীহারাধন দত্ত নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বনাথের সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখেছেন:

"ইংরেজ আমলের সেই উষালগ্নে আমাদের দেশে নীলকরদের খুব প্রভাব ছিল। নীলকরদের কাছে জমিদারি ইজারা দেওয়া হত। ইজারা দিতে জমিদাররা বাধ্য

হতেন। আইনে সুবিচার ছিল না। যে অপরাধে দেশীয় জমিদাররা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতেন, সেই অপরাধে য়ুরোপীয় নীলকরেরা মুক্তিলাভ করত। সামান্য কারণে চাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলত। খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল প্রতিদিনের ঘটনা।...গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত নীলকর সাহেবরা। বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা, নিরীহ প্রজাদের কয়েদ করবার তো অবধিই ছিল না। নীলকরদের অত্যাচারে সেকালের বাংলাদেশ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।...বিশ্বনাথের অভ্যুত্থান ভূমিতে বিশেষ করে চূর্ণীর তীরে তীরে—হাঁসখালি, ময়ূরহাট, কৃষ্ণপুর, বাবলাবন, রাণীনগর. চন্দননগর, চৌগাছা, খালবোনিয়া, গোবিন্দপুর, আসননগর প্রভৃতি গ্রামে সুবৃহৎ অট্টালিকাময় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজও চোখে পড়ে।...এই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সেখানে কেউই ছিল না। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না।

"বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীলকর আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও প্রথম পথিকৃত বলে আমি অভিহিত করতে চাই। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক। সেকালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক প্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে সেকালের এই দুর্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যু বরণ করে নীল-আন্দোলনের প্রথম শহীদ হন। ডাকাত হিসাবেই আমরা বিশ্বনাথের গল্প শুনে এসেছি—কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে তিনি নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলায় নীল-আন্দোলনের প্রথম অগ্রপথিক—এবিষয়ে মতান্তর হওয়ার অবকাশ নেই। এটাই বিশ্বনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ-কীর্তি—বিশ্বনাথ বিদ্রোহী।"

(প্রবন্ধ—'বিদ্রোহী বিশ্বনাথ')

উনিশ শতকের শুরুতে বিশ্বনাথের ক্রিয়াকলাপ নীলকুঠি লুণ্ঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেভাবে হোক তিনি নীলকর সাহেবদের জব্দ করবেন। তখন নদীয়ায় স্যামুয়েল ফেডী নামে এক দুর্দান্ত কুঠিয়াল ছিল। নীলকর ফেডীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই তাঁর প্রথম কাজ হল। ফেডীর নীলকুঠিটা ছিল তখনকার নদীয়ার জেলা-শাসক মিঃ ইলিয়টের বাংলোর পাশেই। কিন্তু বিশ্বনাথ তাতে ভীত হলেন না। এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে ফেডীর নীলকুঠি আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন। এই আক্রমণে ফেডীর অনেক অনুচর নিহত হয়। ফেডীর স্ত্রী ভয় পেয়ে কুঠির পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মাথায় কালো হাঁড়ি চাপা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। বিশ্বনাথ তা দেখে মহিলার জীবন রক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বনাথের মুসলমান অনুচর মেঘা সর্দার বিশ্বনাথের আদেশে ফেডীকে বাগদেবী খালের তীরে এক জঙ্গলের মধ্যে ধরে নিয়ে আসে। ফেডী ছিল একটি শয়তানতুল্য লোক এবং ভীষণ অত্যাচারী। তার জন্য বিশ্বনাথের সব অনুচর ফেডীর প্রাণদণ্ড দাবি করে।

ফেডী সেদিন বিশ্বনাথের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, জীবনে সে এই ঘটনা কোথাও প্রকাশ করবে না। বিশ্বনাথ করুণায় বিগলিত

হয়ে অনুচরদের প্রাণদণ্ডের দাবি উপেক্ষা করে তাকে মুক্তি দেন। কিন্তু মুক্তিলাভ করার পরই ফেডী বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্বনাথ ও তাঁর কয়েকজন অনুচরকে ধরিয়ে দেয়। বিশ্বনাথ ও তাঁর অনুচরদের দিনাজপুর জেলে আটক করা হয়। বিশ্বনাথ কয়েক দিন পরই তাঁর অনুচরগণ সহ জেল থেকে পালাতে সক্ষম হন। জেল থেকে বেরিয়েই বিশ্বনাথ ফেডীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথ তাঁর বাহিনীসহ আবার ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে ফেডীর গৃহ আক্রমণ করেন। লেডিয়ার্ড নামে আর একজন নীলকরও ফেডীর গৃহে বাস করত। তারা দুজনেই বন্দুকের শব্দে জেগে ওঠে। তারা দেখতে পায় যে তাদের বাংলো ডাকাতদের দ্বারা বেষ্টিত হয়েছে। প্রচণ্ড বাধাদান সত্বেও বিশ্বনাথ ও তাঁর বাহিনী চারদিক থেকে বাংলোর মধ্যে ঢুকে বহুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ফেডীকে বন্দী করেন। নীলকর লেডিয়ার্ড অনেকক্ষণ তার বন্দুক দিয়ে গুলিবর্ষণ করেও ডাকাতদের বাধা দিতে পারেনি। অবশেষে লেডিয়ার্ড ডাকাতদের বল্লমের আঘাতে ভীষণ আহত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। বিশ্বনাথ ফেডীর কোষাগারটি খুঁজে বের করে তার সমস্ত অর্থ হস্তগত করে। এই ডাকাতিতে বিশ্বনাথদের লাভ হয় বহু অস্ত্রশস্ত্র ও নগদ সাতশত টাকা এবং আরও বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী। বিশ্বনাথের অনুচরগণ ফেডী ও লেডিয়ার্ডকে গৃহের বাইরে অনেক দূর টেনে নিয়ে যায়। তাদের ইচ্ছা ছিল দুই নীলকরের নাক আর কান কেটে নেওয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাত হলে দিনের আলো ফুটে ওঠে। ডাকাতরা আর বিলম্ব না করে লুণ্ঠিত অর্থ, অস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে স্থান ত্যাগ করে।

বিশ্বনাথের গ্রেপ্তার ও হত্যা

শান্তিপুরের কুঠি ও ফেডীর নীলকুঠি লুণ্ঠনের পর শাসকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিশ্বনাথ ও তাঁর দলটিকে ধ্বংস করার আয়োজন করতে থাকে। কলিকাতা থেকে ব্ল্যাকওয়ার নামক একজন ইংরেজ সেনাপতিকে একটি ইংরেজ সৈন্যদল ও বহু দেশীয় সৈন্যসহ নদীয়ায় পাঠান হয়। ব্ল্যাকওয়ার নদীয়ায় উপস্থিত হয়ে বিশ্বনাথকে বিনাযুদ্ধে বন্দী করার উদ্দেশ্যে চারদিকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। এই সময় এক ধনীর গৃহে ডাকাতি করবার সময় বিশ্বনাথের কয়েকজন অনুচরকে ইংরেজরা বন্দী করতে সক্ষম হয়। এই অনুচরদের মধ্যে একজন ছিল বিশ্বনাথের পালিত পুত্র। সে পুরস্কারের লোভে বিশ্বনাথের গোপন বাসস্থান ইংরেজদের কাছে বলে দেয়।

এইভাবে বিশ্বনাথের গোপন বাসস্থানের সংবাদ পেয়ে একদিন ভোর রাত্রে ফেডী, সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার ও জেলা-শাসক ইলিয়ট একটি সৈন্যদল নিয়ে নদীয়া জেলার কুনিয়ার নিকটবর্তী এক জঙ্গলে বিশ্বনাথ ও তাঁর অনুচরদের ঘিরে ফেলে। এই ঘেরাও থেকে পালাবার কোন উপায় না দেখে অনুচরদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিশ্বনাথ সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে অনুচরদের আত্মরক্ষার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি ফেডীর সামনে উপস্থিত হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন :

"ক্ষেডী, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। কিন্তু আমি কোনদিন কোন অন্যায়ের পোষকতা করি নাই। আমি আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছি, তাহা অগণিত অত্যাচারিত মানুষের পরম কল্যাণের জন্যই করিয়াছি। তাহার প্রতিদানে যদি কোন শাস্তি আমার প্রাপ্য হয়, আমি তাহা সহাস্যে গ্রহণ করিব।"

(শ্রীবিমলেন্দু কয়াল : প্রবন্ধ 'বিশে ডাকাত')

এই কয়টি কথা বলে বিশ্বনাথ জেলা-শাসক ইলিয়টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজ শাসকগণ বিশ্বনাথের ভয়ে এরূপ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, অবিলম্বে এক বিচারের প্রহসন করে সঙ্গীদেরসহ বিশ্বনাথকে হত্যা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

"এই মহান মানবদরদী কৃষকবীরের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা ভীরু ইংরেজ দস্যুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"গঙ্গার তীরভূমিতে তাঁহাদের প্রকাশ্যভাবে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং তৎপরে তাহাদের মৃতদেহ একটি লোহার খাঁচায় পুরিয়া এক অশ্বত্থ গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কিংবদন্তি আছে, বিশ্বনাথের উন্মাদিনী জননী কর্তৃপক্ষের নিকট পুত্রের কঙ্কাল ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ সেই করুণ আবেদনে কর্ণপাত করে নাই। …বিশ্বনাথের তিরোধানে সেদিন সারা দেশে এক গভীর বেদনা অনুভূত হইয়াছিল। লোককাব্যে, গাথায় ও সঙ্গীতে আজিও তাহা মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। নদীয়ার নিভৃত পল্লীর চারণ-কবিদের গানে আজিও তাঁহার মূর্ছনা শোনা যায়।"

(বিমলেন্দু কয়াল : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

বুড়িবালামের তীরে—
যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টা (১৯১৫)

যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ও নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় থেকেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর বাংলাদেশের বিপ্লবী যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়। এই দায়িত্ব পালন করে যতীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন।

যতীন্দ্রনাথের জন্ম নদীয়া জেলার কয়া নামক গ্রামে। কলিকাতায় যখন অনুশীলন সমিতি নামে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তখন থেকেই এই সমিতির সক্রিয় কর্মী রূপে আবির্ভূত হন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন 'নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন' হয়েছিল তখন যতীন্দ্রনাথ সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭ সালে কেবলমাত্র দৈহিক শক্তি দ্বারা এক বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঘটাকে হত্যা করায় তিনি সহকর্মীদের নিকট থেকে "বাঘা যতীন" আখ্যা লাভ করেন।

আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলায় অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি নেতাদের কারাদণ্ডের পর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অবিনাশ চক্রবর্তী। তিনি যতীন্দ্রনাথকে তাঁর সহকারী রূপে গ্রহণ করে সমিতির কার্য পরিচালনা করতেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর যখন বাংলাদেশে আবার বৈপ্লবিক সংগ্রামের নূতন জোয়ার দেখা দেয়, তখন অবিনাশ চক্রবর্তীর পরামর্শে যতীন্দ্রনাথকে যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের পদ দান করা হয়।

পার্টির প্রধান পরিচালকের পদ লাভ করেই যতীন্দ্রনাথ প্রথমে বিচ্ছিন্ন কর্মীদের ও বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করতে আরম্ভ করেন। আলিপুর মামলার পর যুগান্তর সমিতি বহু অংশে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই অংশগুলির মধ্যে যাতে অন্তত কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা চলে তার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে কলিকাতার বিভিন্ন দল সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রাখলেও কার্যক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের পরিচালিত যুগান্তরের মূল অংশের সঙ্গে সহযোগিতা করত। এই সময় যতীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করা। এ কার্যে বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁকে বিশেষ সাহায্য দান করেছিলেন এবং তার ফলে যতীন্দ্রনাথ এ কার্যেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।

যতীন্দ্রনাথ 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'-য় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি এই মামলা

থেকে মুক্তি লাভ করলেও সরকারী চাকরি থেকে পদচ্যুত হন। এর পর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গের যুগান্তর সমিতির বিভিন্ন অংশ, মাদারীপুর সমিতি, ময়মনসিংহের যুগান্তর শাখা, উত্তরবঙ্গের যুগান্তর ও অনুশীলন শাখা প্রভৃতি তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাঁর এই চেষ্টার ফলে তিনি যে সব সহকর্মী লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মাদারীপুরের পূর্ণদাস; বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ, উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যোগেন দে-সরকার, খুলনার সতীশ চক্রবর্তী, যশোহরের বিজয় রায়, কলিকাতা ও ২৪ পরগনার নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়—মার্টিন) যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় সংগ্রামের দুই ভিন্ন ধারা

১৯১২ সালের শেষ ভাগ থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গতি মন্দীভূত হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। কংগ্রেস আপসপন্থীদের কবলে পড়ে একটা বার্ষিক মজলিশে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এক বিপুল জাগরণ দেখা দেয়। ১৯০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় পূর্বেই ভারতের জনগণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অপরাজেয় নয়, সুতরাং ব্রিটিশ শক্তিকেও পরাজিত করা সম্ভব। মহাযুদ্ধের প্রথম থেকেই সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য বহুগুণ বেড়ে যায়। তার ফলে এক বিরাট গণ-আন্দোলন মাথা তুলতে থাকে। এই নূতন গণ-জাগরণের মধ্যে কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এতদিন জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতদিন মুসলমান নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করায় মুসলমান জনসাধারণও এতদিন জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল। এবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সমাবেশের ফলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার পন্থা ত্যাগ করে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণও ক্রমশ অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করতে থাকে। তখন থেকে স্বায়ত্ত-শাসন হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতাদের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। এই দাবিকে ভিত্তি করেই ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উনিশজন বে-সরকারী হিন্দু-মুসলমান সদস্য দেশের ভাবী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করেন তা নিয়ে দেশের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণরূপে আপসপন্থীদের কবলে। উক্ত দাবি

নিয়ে এখন আন্দোলন আরম্ভ করলে যুদ্ধের ফলে বিপন্ন ব্রিটিশ শক্তি আরও বিপন্ন হবে—এই মনে করে তারা আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেন। এমন কি তারা আগের চেয়ে আরও বেশী করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা আরম্ভ করে দেন।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃত্ব সংগ্রাম বন্ধ রাখলেও সেই নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করেই জনসাধারণের সংগ্রাম বেড়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে জাতীয় সংগ্রাম দুইটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনকে সত্যিই বিপন্ন করে তোলে। এই দুই আন্দোলনের একটি অ্যানি বেশান্ত, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির নেতৃত্বে 'হোমরুল' বা স্বায়ত্বশাসনের দাবি নিয়ে সারা ভারতবর্ষকে চঞ্চল করে তোলে, আর অপরটি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টারূপে ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে চরম আঘাত দিতে উদ্যত হয়।

১৯১৪ সালে অ্যানি বেশান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেই জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দল ও নেতাদের মিলনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। কিন্তু এই চেষ্টা তখন সফল হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর তিনি মাদ্রাজে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করে 'হোমরুল' বা স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে, ১৯১৪ সালের জুন মাসে বালগঙ্গাধর তিলক কারাদণ্ড ভোগ করে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি বোম্বাইয়ে 'ন্যাশনাল লীগ' স্থাপন করে পৃথকভাবে 'হোমরুল'-এর পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ১৯১৫ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে এই 'হোমরুল' আন্দোলনে যোগদান করার ফলে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এইভাবে একদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও অপর দিকে 'হোমরুল'-এর দাবি নিয়ে জাতীয় আন্দোলন সারা দেশকে চঞ্চল করে তোলে। সংগ্রামের চাঞ্চল্য কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতাদের নিশ্চেষ্ট থাকতে দিল না। কংগ্রেসের একাংশের মধ্যেও সংগ্রামের মনোভাব দেখা দেয়। কিন্তু এই নেতাদের বেশীর ভাগের মনোভাব ছিল এই যে, যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন শাসকদের বিপদ-গ্রস্ত করা চলবে না। এমনকি এককালের বিপ্লবী ও চরমপন্থী নেতা তিলকও তখন এই মত সমর্থন করেছিলেন।

শাসকগণ ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারের মামুলি আশ্বাস দিয়ে তাদের পূর্বনীতিই অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায়। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে 'ভারতরক্ষা আইন' পাস হয়ে গিয়েছিল। এই আইন অনুসারে সরকার যাকেই বিপজ্জনক বলে মনে করবে তাকেই গ্রেপ্তার, আটক বা অন্তরীণ করবার ক্ষমতা লাভ করে।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগ থেকেই 'ভারতরক্ষা আইন'-এর প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এই বর্বর সুলভ আইনের কবলে পড়ে বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের শত শত যুবক বিনা বিচারে আটক হল। যাঁরা কেবল 'হোমরুল'-এর দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিলেন সেই আপসপন্থী নেতারাও এই আইনের কবল থেকে অব্যাহতি পেলেন না। "রাজদ্রোহ"-মূলক বক্তৃতার জন্য তিলকের নিকট

৪০ হাজার টাকা জামিন স্বরূপ দাবি করা হয়। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলিও বিনাবিচারে কারাগারে আবদ্ধ হন। দমন-নীতির দাপটে জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকারী দমন-নীতির বিভীষিকা যতই বেড়ে যেতে থাকে ততই ব্রিটিশ শাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম ব্রিটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে তোলে।

বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের অতুলনীয় সাহস ও বুদ্ধি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। বিপ্লবীরা তাদের সাহস ও আত্মত্যাগের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের শ্রদ্ধালাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কানাইলাল ও সত্যেন বসু দ্বারা আলিপুর জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীর হত্যার সংবাদ শুনে প্যারী নগরীর তৎকালের সোস্যালিস্ট দলের মুখপত্র 'হুম্যানিতে' পত্রিকা নাকি বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিল, "ভারতীয় বিপ্লবীরা যে প্রকারে শত্রু-পুরীর ভিতর বসেও রক্ষী-বেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতি-দ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছে তা জগতের বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথম।"[১]

ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টা ব্রিটিশ-বিরোধী জার্মানদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা তখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহস ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে বিপর্যস্ত করার জন্য তাদের ব্যবহার করার মতলব আঁটল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করে সমগ্র বিশ্বে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ভারতের জনসাধারণের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা তা বুঝেও জার্মানদের সাহায্যে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে স্বাধীনতা লাভের জন্য আয়োজন আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই আয়োজন আরম্ভ হয়েছিল। য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ আসন্ন।

১৯০৫ সালে হরদয়াল নামক একজন পাঞ্জাবী ছাত্র ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের কাছে বিপ্লববাদে দীক্ষা নেন। বৈদেশিক সাহায্যে ভারতে বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে হরদয়াল ১৯১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় আমেরিকায় 'গদর সমিতি' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ই হরদয়াল জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মেনীর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচারের

১। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ৬০।

জন্য মার্কিন সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়ে আমেরিকা থেকে পালিয়ে জার্মেনীর রাজধানী বার্লিন নগরীতে উপস্থিত হন।

এর আগে সুইজারল্যাণ্ডে 'আন্তর্জাতিক ভারত কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। চম্পকরমন পিল্লাই নামক এক মাদ্রাজী যুবক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। জার্মেনীতে গিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার করার জন্য তিনিও বার্লিন নগরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। বার্লিনে তিনি হরদয়াল, তারকনাথ দাস, বরকতুল্লা, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত এই পাঁচজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁদের সহযোগিতায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন বিপ্লবী এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই প্রতিষ্ঠান জার্মান সামরিক দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতে থাকে।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি'র সভ্যগণ প্রথম দিকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ-বিরোধী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা ছাপিয়ে চারদিকে প্রচার করতেন। তারপর যুদ্ধ যতই জোরে চলতে আরম্ভ করে তাঁদের ক্রিয়া-কলাপও ততই বেড়ে যায়। এই সময় জার্মান বাহিনী যে সব ব্রিটিশ সৈন্যদল বন্দী করেছিল তাদের মধ্যে বহু ভারতীয় সৈন্যও ছিল। তাদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাবার ভার পড়ে বরকতুল্লার উপর। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন এবং শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধের সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছাপাখানা স্থাপনের ভার গ্রহণ করেন পিল্লাই স্বয়ং। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক ব্যক্তিকে আমেরিকার পথে ব্যাঙ্ককে পাঠান। হেরম্বলাল গুপ্ত গেলেন আমেরিকায়। সেখানে তিনি বোয়েন নামক একজন জার্মান সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবস্থা করেন যে, বোয়েন ব্যাঙ্কক শহরে গিয়ে সামরিক শিক্ষা দিয়ে একটি সৈন্যদল তৈরি করবে, তারপর সেই সৈন্যদল নিয়ে ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ চালান হবে। এই ব্যবস্থার প্রধান ভার পড়ে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর উপর।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

(১)

এবার জার্মান সামরিক বিভাগের সহযোগিতায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাংগঠনিক পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের বাইরে পূর্ব-এশিয়ায় দুইটি সংগঠন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে, আর অপর কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হল ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটাভিয়া শহরে। ব্যাঙ্কক থেকে আমেরিকার 'গদর সমিতি'র সঙ্গে এবং ব্যাটাভিয়া থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষার ব্যবস্থা হল। চীনের সাংহাই নগরীতে অবস্থিত জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে উভয় কেন্দ্রের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল এবং সাংহাইয়ের জার্মান দূত আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরীর জার্মান দূতের মারফত বার্লিনের সঙ্গে

যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। প্রবাসী বিপ্লবীরা এইভাবে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে এবার ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অগ্রসর হন।

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক এক মারাঠী যুবক ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বাঙালী যুবক আমেরিকা থেকে জাহাজ যোগে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হন। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে পিংলে যান পশ্চিম-ভারতে, আর সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং পূর্ব-এশিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন ও ভারতীয়-দের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মান সাহায্য লাভের সংবাদ যতীন্দ্রনাথকে জানান।

(২)

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন ভারতের বাইরে বিপ্লবের সাংগঠনিক আয়োজন শেষ করে খাস ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তার পূর্ব থেকেই বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ করে দিয়ে-ছিলেন। তারা হিসাব নেন, কোন জেলায় কত বন্দুক ও রিভলভার আছে, কোথায় কোথায় সরকারী ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার আছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কত সৈন্য বিপ্লবীদের সহায়তা করবে, কোথায় পুল উড়িয়ে দিয়ে সৈন্য-চলাচল-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলতে হবে, ইত্যাদি। ঢাকার বিপ্লবীরা পঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাহায্যে ঢাকায় অবস্থিত শিখ সৈন্যদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলার বিপ্লবী যুবকেরা গোপনে দ্রুত সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। জেলায় জেলায় বন্দুক ও রিভলভার চুরি একটা আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ঠিক এই সময়, ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে 'রডা' কোম্পানীর ৫০টি মাউসার পিস্তল ও তার ৪৬ হাজার কার্তুজ চুরি হয়। এই সময় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির পরামর্শে ও নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের যুগান্তর সমিতির নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় দুইটি "ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করেন। এইগুলির একটি হল 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে এক কাপড়ের দোকান এবং অপরটি হল 'হ্যারি অ্যাণ্ড সনস্' নামে বিবিধ পণ্য সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি পরিচালনা করতেন রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপর দোকানটির নাম পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী ও যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী হরিকুমার চক্রবর্তীর নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল এবং তিনিই এর কার্য পরিচালনা করতেন। উড়িষ্যার বালেশ্বরে 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সনস'-এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত দুইটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বালেশ্বরের 'য়ুনির্ভাসাল এম্পোরিয়াম' ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এদিকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও জার্মান

সাহায্য লাভের সম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে উল্লাসিত হয়ে ওঠেন এবং বাইরের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করে জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা বৈদেশিক সাহায্যের পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেন। তাঁদের মনে এই সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত জার্মানদের এই অস্ত্র সাহায্যের পিছনে তাদের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। তাই তাঁরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে জার্মান সাহায্যের শর্তসমূহ পরীক্ষা করে দেখেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য জার্মেনীর কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই কোন শর্ত আরোপ করেছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়েই জার্মানরা ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। বিপ্লবীদের জার্মান অস্ত্র সাহায্য গ্রহণের শর্ত ছিল নিম্নরূপ :

"বিপ্লবীরা জার্মান গভর্নমেন্টের নিকট হইতে একটি জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিবে। ...ভারত স্বাধীন হইলে তাহা পরিশোধ করা হইবে। জার্মান সামরিক শক্তির ভারতে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতেই থাকিবে।" "কেবল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এবং বাংলার বিপ্লবীদের শিক্ষার জন্য জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞ দিয়া জার্মেনী ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে।"[১]

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদের এক পরামর্শ-বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই জার্মেনীর অস্ত্র-সাহায্যের উপর ভিত্তি করে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। জার্মেনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অবিলম্বে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই জার্মেনী থেকে অর্থ-সাহায্য এসে পৌছাবার অপেক্ষায় না থেকে বিপ্লবীরা নিজেরাই ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে ১১ই জানুয়ারী বেলেঘাটায় ও ২২শে ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরীচে ডাকাতি করে বিপ্লবীরা মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

অভ্যুত্থানের আয়োজন

উপরিউক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়। মার্চ মাসে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক এক ব্যক্তি এই সংবাদ নিয়ে কলিকাতায় উপস্থিত হয় যে, জার্মানরা ব্যাটাভিয়ার পথে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, কাজেই বাংলার বিপ্লবীদের অবিলম্বে ব্যাটাভিয়ায় লোক পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন

১। সুকুমার রায় : 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ১১২-১৩।

করা কর্তব্য। এই সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা পরামর্শ করে ব্যাটাভিয়ায় গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে শেষ ব্যবস্থাদি করার জন্য নরেন ভট্টাচার্যকে[১] পাঠিয়ে দেন। নরেন্দ্রনাথ 'সি. মার্টিন' নাম গ্রহণ করে এপ্রিল মাসে ব্যাটাভিয়ার যাত্রা করেন। এই ব্যাপারে এপ্রিল মাসেই অবনী মুখার্জীকেও জাপানে পাঠানো হয়।

এই সময় বেলেঘাটা ও গার্ডেনরীচের ডাকাতির জন্য পুলিস যতীন মুখার্জীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করে তোলে। এই অবস্থায় বাংলাদেশে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার বালেশ্বরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। বাংলার বিপ্লবীরা যখন তাঁদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করেন, তখনই অপর দিকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের 'সান পেড্রো' নামক বন্দর থেকে 'এস. এস. ম্যাভারিক' নামক একখানি জাহাজ বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এদিকে 'মার্টিন' নামধারী নরেন্দ্রনাথ ব্যাটাভিয়ায় এসে উপস্থিত হন। ব্যাটাভিয়ার জার্মান কনসালের কাছ থেকে তিনি সংবাদ পান যে, ভারতবর্ষের বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য একজাহাজ অস্ত্র ও গোলাবারুদ করাচীর দিকে আসছে। এই অস্ত্রবোঝাই জাহাজখানি যাতে করাচী না গিয়ে বাংলাদেশে আসে 'মার্টিন' তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর অনুরোধে স্থির হয় যে, জাহাজখানি সুন্দরবন অঞ্চলের রায়মঙ্গল নামক স্থানে আসবে এবং সেই স্থান থেকে বিপ্লবীরা জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাগুলি নামিয়ে নেবে। মার্টিন এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কলিকাতার 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' কোম্পানীর কাছে এই ভাষায় টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দেন : "ব্যবসায়ের সংবাদ খুবই সন্তোষজনক"। এর উত্তরে জুন মাসের গোড়ার দিকে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' থেকে 'মার্টিন'কে অবিলম্বে টাকার ব্যবস্থা করার জন্য টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। এর পর ব্যাটাভিয়া থেকে জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স'-এর নামে মোট ৪৩ হাজার টাকা পাঠানো হয়। এর মধ্যে ৩৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় এবং বাকি টাকা পুলিস সন্দেহবশে আটক করে।

এই সকল ব্যবস্থা করে 'মার্টিন' জুন মাসের মাঝামাঝি সময় বাংলাদেশে ফিরে আসেন। 'মার্টিন' ফিরে আসার পর অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা অভ্যুত্থানের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষ। এই বৈঠকে 'ম্যাভারিক' জাহাজ থেকে অস্ত্র ও গোলাগুলি নামিয়ে নেবার পরিকল্পনা তৈরী হয়। 'ম্যাভারিক' জাহাজে পাঠানো হয়েছিল ৩০ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য চার শত রাউণ্ড কার্তুজ (মোট এক লক্ষ বিশ

১। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ইনিই পরবর্তীকালে 'এম. এন. রায়' নাম গ্রহণ করেন।

হাজার কার্তুজ) এবং দুই লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাগুলি গোপনে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ, সুতরাং এর জন্য ভাল ব্যবস্থা চাই। এই কঠিন কাজটির ভার পড়ে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষের উপর। তাঁরা এই অস্ত্র ও গোলাগুলি জাহাজ থেকে নামিয়ে নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে ঐ সব জিনিস ভাগ করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন :

(১) নোয়াখালির দক্ষিণে হাতিয়া (সন্দীপ); এখানে বরিশালের বিপ্লবীরা এই অস্ত্রগুলি বুঝে নেবে এবং পূর্ববঙ্গের সব জেলার বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেবে।

(২) কলিকাতা।

(৩) বালেশ্বর।

যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণ পরামর্শ করে এইভাবে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি তৈয়ার করেন : বাংলাদেশে সরকারের সৈন্য-বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বেশী নয়, সুতরাং সরকারের সামরিক শক্তি উচ্ছেদ করার পক্ষে বিপ্লবীদের শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু অভ্যুত্থান আরম্ভ হওয়া মাত্র বাংলাদেশের বাইরে থেকে ইংরেজরা নিশ্চয়ই আরও সৈন্য পাঠাবে। এই আশঙ্কা করে বিপ্লবের নায়কগণ সৈন্য-চলাচলের পথ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই জন্য বাংলাদেশের তিনটি প্রধান রেলপথ বন্ধ করা প্রয়োজন, রেলপথের উপরের বড় বড় পুলগুলি উড়িয়ে দিলেই রেলপথগুলি অচল হয়ে পড়বে। স্থির হল, স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার বালেশ্বরে ঘাঁটি করে মাদ্রাজ রেলপথ অচল করে দেবেন। চক্রধরপুরে ঘাঁটি করে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ বন্ধ করবেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়; আর সতীশ চক্রবর্তী অজয় নামক স্থানে গিয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের প্রধান পুলটি উড়িয়ে দেবেন। নরেন্দ্র চৌধুরী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তী নোয়াখালির হাতিয়ায় গিয়ে একটি বাহিনী তৈরি করবেন, সেই বাহিনী প্রথমে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিকে মুক্ত করবে এবং পরে তারা সেই বাহিনী নিয়ে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হবেন। কলিকাতার বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করবেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁরা প্রথমে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রাগারগুলি দখল করে পরে 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গটি দখল করবেন, তারপর অধিকার করবেন খাস কলিকাতা। আর 'ম্যাভারিক' জাহাজে যে সব জার্মান সামরিক অফিসার আসছে তারা পূর্ববঙ্গে থেকে একটি সৈন্যবাহিনী তৈরি করে তাদের সামরিক শিক্ষা দেবে।

ইতিমধ্যে 'ম্যাভারিক' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানো সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করা হয়। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় অন্য কাজে চলে যান এবং তাঁর কাজের ভার পড়ে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি রায়মঙ্গলের এক জমিদারের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করেন। জমিদারটি এই উদ্দেশ্যে লোকজন ও আলোর ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হন। কথা ছিল, 'ম্যাভারিক' জাহাজটি রাত্রিকালে রায়মঙ্গল পৌঁছে আলোর সঙ্কেত করবে। স্থির হয়েছিল যে, ১৯১৫ সালের ১লা জুলাই থেকে অস্ত্রগুলি বিলি করা আরম্ভ হবে। জাহাজ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এসে পৌঁছাবার কথা। সুতরাং অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক রায়মঙ্গল

থেকে নৌকায় করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়। তাঁরা সেখানে ১০ দিন অপেক্ষা করেন, কিন্তু 'ম্যাভারিক' জাহাজের কোন সন্ধান মিলল না, এমন কি এই বিলম্বের জন্য ব্যাটাভিয়া থেকেও কোন সংবাদ এল না।

'ম্যাভারিক' এল না, কিন্তু ৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে এক বাঙালী যুবক এসে উপস্থিত হল। এই বাঙালী যুবকটি ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক পাঞ্জাবী বিপ্লবীর কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এল যে, শ্যামের জার্মান কনসাল নৌকায় করে পাঁচ হাজার রাইফেল ও তার কার্তুজ এবং এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা ভাবলেন, 'ম্যাভারিক' জাহাজের পরিবর্তেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁরা এই বাঙালী যুবকটির মারফত ব্যাঙ্ককে সংবাদ পাঠান যে, মূল পরিকল্পনার যেন কোন পরিবর্তন করা না হয়, এবং 'ম্যাভারিক' জাহাজের অবশিষ্ট অস্ত্র যেন রায়মঙ্গলের পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরে সন্দীপের হাতিয়া ও বালেশ্বরে অথবা ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোকর্ণী নামক স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে পুলিস রায়মঙ্গলে অস্ত্র আসার সংবাদ জেনে ফেলে।

জুলাই মাসে পুলিস জেনে ফেলে যে, বিদেশ থেকে বহু অস্ত্র রায়মঙ্গলে এসে পৌঁছাচ্ছে। পুলিস অবিলম্বে রায়মঙ্গল অঞ্চলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং এই সংবাদের সূত্র ধরে চারদিকে অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে। ৭ই আগস্ট পুলিস 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্‌স'-এর দোকানে খানাতল্লাস করে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং কয়েকটি মূল্যবান গোপন সংবাদ জেনে ফেলে। এই দুর্ঘটনায় বিপ্লবীরাও সতর্ক হয়ে যান। কলিকাতা থেকে ব্যাটাভিয়ায় এখন সংবাদ পাঠান বিপজ্জনক বুঝে এক ব্যক্তি ১৩ই আগস্ট বোম্বাই হয়ে সেখান থেকে ব্যাটাভিয়ায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জার্মান কনসালকে সতর্ক করে দেয়। এই নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্রনাথ অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন।

বুড়িবালামের যুদ্ধ

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং মাদ্রাজ-রেলপথ অচল করে দেবার ভার নিয়ে বালেশ্বর চলে এসেছিলেন। বালেশ্বরের যেখানে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে মহানদীর সেই মোহনার নিকটবর্তী কাপ্তিপোদা নামক স্থানের নিকটস্থ এক জঙ্গলে ঘাঁটি করে তিনি অস্ত্র-বোঝাই জার্মান জাহাজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে কলিকাতায় যে সব ঘটনা ঘটল তা তিনি বিন্দুমাত্রও জানতে পারলেন না।

কলিকাতার 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্‌স'-এর দোকান খানাতল্লাস করে পুলিস উক্ত কোম্পানীর বালেশ্বর শাখা 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর নামটি পেয়ে যায় এবং আরও কিছু কাগজ-পত্র হস্তগত করে। পুলিস এই সব কাগজ-পত্রের মধ্যে 'কাপ্তিপোদা' নামক স্থানটির উল্লেখ দেখতে পায়। এই স্থানটি ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিস খোঁজ করতে করতে কাপ্তিপোদায় এসে উপস্থিত হয়। এই স্থানে

পুলিসের আনাগোনা দেখে যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর সঙ্গীদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, পুলিস তাঁদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে গেছে। তা বুঝতে পেরে যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারজন সঙ্গীসহ জঙ্গলের পথে বুড়িবালাম নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা যখন নদী পার হচ্ছিলেন তখন গ্রামের চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতিরা তাঁদের দেখে ফেলে। তারা বুঝতে পারল যে, এঁদের খোঁজেই পুলিস ঘুরছে। তারা গ্রামবাসীদের সাহায্যে বিপ্লবীদের ধরার জন্য এগিয়ে আসে। এর ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিপ্লবীদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন গ্রামবাসী নিহত ও আহত হয়। গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেলে বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এই সংবাদ পেয়ে পুলিসের এক বিরাট দল জঙ্গল ঘিরে ফেলে। যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর সঙ্গীরা বুঝলেন, আর পালাবার উপায় নেই। তাঁরা স্থির করলেন, কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবেন না, বীরের মত শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দেবেন। তাঁরা সশস্ত্র পুলিসবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। যুদ্ধক্ষেত্র উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীর। এক-দিকে বাংলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়,[১] মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ, আর অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের অগণিত সশস্ত্র পুলিস ও একদল রাইফেলধারী অশ্বারোহী সৈন্য। এই অসমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা নদীতীরের বালুকারাশির মধ্যে এক অপূর্ব 'ট্রেঞ্চ' তৈরি করলেন। পুলিসদল নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তাঁরা সেই 'ট্রেঞ্চ'-এর মধ্যে থেকে শত্রুপক্ষের উপর প্রাণপণ গুলিবর্ষণ আরম্ভ করলেন। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে শত্রুপক্ষের কয়েকজন ধরা-শায়ী হল। এই অভাবনীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবীদের সাহস দেখে শত্রুরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। দুই পক্ষের গুলিবর্ষণ চলল বহুক্ষণ। পুলিস ও সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে বিপ্লবীদের দুইজন সাংঘাতিকরূপে আহত হলেন। তাঁদের একজন চিত্তপ্রিয় ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আর অপরজন হলেন বিপ্লবীদের সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁর দেহ গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীর অবসন্ন। এখনও অক্ষত রয়েছেন তিনজন—তিনটি বালক। তিনজন প্রাণপণ গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন, বীরের মত প্রাণ দেবার জন্য তাঁরা তখন উন্মাদ। এমন সময় সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তির সাদা নিশান উড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন।

'ট্রেঞ্চ'-এর মধ্য থেকে একখানি সাদা কাপড় উড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার সংকেত জানান হল, শত্রুপক্ষ হাপ ছেড়ে বাঁচল। পুলিসদলের অধিনায়ক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এগিয়ে এলেন। এই বীর যোদ্ধাদের দেখে বিস্মিত হলেন, মাথার টুপি খুলে মৃত যোদ্ধার প্রতি সম্মান দেখালেন, তারপর তাঁর টুপিতে করে নদী থেকে জল এনে আহতদের পান করালেন। তখন যতীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষ ভীষণরূপে আহত,

---

১। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী : ইনিই ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনভোকেশন' হলে পুলিস-ইনস্পেকটর সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করেছিলেন।

চিত্তপ্রিয় মৃত, আর মনোরঞ্জন ও নীরেন অক্ষতই রয়েছেন। পরদিন, ১০ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলা যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। পরে নীরেন ও মনোরঞ্জন ইংরেজরাজের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন, আর জ্যোতিষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পরে বহরমপুর জেলে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান।

বুড়িবালামের যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ডেপুটি পুলিস কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবও উপস্থিত ছিল। সে আদালতে ব্যারিস্টার জে. এন. রায়ের প্রশ্নের উত্তরে যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছিল:

"আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে হয়েছে বটে, কিন্তু আমি যতীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি। তিনিই একমাত্র বাঙালী যিনি 'ট্রেঞ্চ'-এর মধ্যে থেকে সম্মুখযুদ্ধে জীবন দান করেছেন।"

চট্টগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৩০)

বাংলাদেশের তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা

এযুগের বৈশিষ্ট্য

১৯২৮ সালের মধ্যভাগ থেকে ১৯৩৪ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার যুগ। ১৯২৪-২৫ সালের অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রচেষ্টার শেষ দিকে দমন-নীতির ফলে বিপ্লবীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক বছর জেলখানায় আটক থাকার পর ১৯২৮ সালে মুক্তিলাভ করেন। তারপর আরম্ভ হয় তৃতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার যুগ।

একদিকে যেমন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন ১৯২০-২১ সালের গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসে তখন বিশাল আকার ধারণ করেছিল, তেমনই অন্যদিকে সেই জাতীয় আন্দোলনের আর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই বৈপ্লবিক সংগ্রামও দুই বারের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এসে মধ্যশ্রেণীর ভিতর বহুগুণ বিস্তার লাভ করেছিল এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছিল। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও আদর্শের সংঘাতে সারা ভারতের বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ও আদর্শের ক্ষেত্রেও একটা মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তনের কারণগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. **হতাশা ও আর্থিক সংকটের পরিণতি :** এ যুগের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র আগের যুগগুলি অপেক্ষা বহুগুণ বেশী বিস্তার লাভ করে। এর কারণ প্রধানত দুটি : প্রথমত, গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক গণ-চরিত্র গ্রহণ ও তার অনিবার্য ফল স্বরূপ ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রামী মনোভাবের বিকাশ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে আপসপন্থী মনোভাবের প্রাধান্য ; দ্বিতীয়ত, ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট এবং সেই আর্থিক সংকটের অনিবার্য আঘাতে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি।

গান্ধীর উদ্ভাবিত ও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন সারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব জাতীয়তা-বোধ ও সংগ্রামের সংকল্প জাগিয়ে তোলে। কিন্তু ১৯২১ সালের শেষ দিকে সেই দেশব্যাপী জাতীয় সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌছাবার পূর্ব-মুহূর্তে কংগ্রেসের প্রধান নেতা গান্ধী কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রত্যাহৃত হবার ফলে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর অনাস্থা জেগে ওঠে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর যুবকগণ কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন থেকে যে ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকট আরম্ভ হয় তা দ্রুত সারা দুনিয়াকে গ্রাস করে ফেলে। ব্রিটেনের আর্থনীতিক জোয়ালে আবদ্ধ ভারতবর্ষের আর্থিক জীবনেও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতর বেকারের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে যায়। তার ফলে চরম আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যশ্রেণীর ভিতর চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রামের মনোভাব প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই মনোভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়েই বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রসার লাভ করে। একথা তখনকার সরকারী রিপোর্টেও স্বীকার করে বলা হয়েছিল :

"বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপ এই কয়েক বছরে তীব্র হয়ে উঠেছে, বিপ্লবীরা একটা বৈপ্লবিক মনোভাব ব্যাপক আকারে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই মনোভাব শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করেছে। মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত অংশের মধ্যে বেকার-সমস্যা এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই বেকার-সমস্যা বিপ্লবীদের প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।"

বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারীদের যোগদান : প্রথম যুগে বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারীদের আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু এযুগে বহু নারী এই সংগ্রামে যোগদান করে বহুক্ষেত্রে অপূর্ব দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। তাদের এই সংগ্রামে যোগদান করার প্রধান কারণ হল, প্রথমত, ব্যাপক জাতীয় গণ-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ নারীদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রামী মনোভাবের সৃষ্টি ; দ্বিতীয়ত, নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও তার ফলে বহির্জগৎ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই সব কারণে একদিকে যেমন ১৯৩০-৩১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে নারীরা ক্রমশ অধিক সংখ্যায় যোগদান করে, তেমনি এই সময়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামেও নারী বিপ্লবীদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যায়। নারীরা বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করে এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করে এই সংগ্রামকে বহুগুণে শক্তিশালী করে তোলে। বাংলাদেশের বহু নারী নিজেদের এবং তাদের পরিবারবর্গের জীবন ও সাংসারিক শান্তি বিপন্ন করেও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বে-আইনী সাহিত্য লুকিয়ে রেখেছে এবং নিজেদের অঙ্গ থেকে অলংকার খুলে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলার নারীদের এই প্রকার সাহায্যই অন্যতম কারণ যার জন্য এযুগের বৈপ্লবিক সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছিল এবং তা দমন করা শাসকদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে পড়েছিল। একথা স্বীকার করে সরকারী রিপোর্টেও বলা হয়েছে : "নারীরা যে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং তাদের যোগদানের ফলে পুলিসের পক্ষে বিপ্লবীদের দমন করা কঠিন হয়ে উঠেছে।" (জয়েন্ট কমিটি রিপোর্ট অন ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম, ১৯৩৩-৩৪, পৃষ্ঠা ৩৩৮)

বিপ্লবীদের 'রিভোল্ট' বা 'অ্যাডভান্স' দল : 'রিভোল্ট' বা 'অ্যাডভান্স' দলের সৃষ্টি ১৯২৮-৩৪ সালের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নূতন দলকে ভিত্তি করেই এযুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়।

১৯২৩-২৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লব-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকেই এই নূতন দলের সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়, আর তা আরম্ভ হয়েছিল জেলখানার মধ্যে বসে।

১৯২৪-২৫ সালে সরকারী 'অর্ডিনান্স'-এর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা দলে দলে গ্রেপ্তার ও কারাগারে আবদ্ধ হয়। কারাগারে আবদ্ধ হবার পর বিপ্লবীদের মধ্যে এক ব্যাপক ও গভীর আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার বিষয় হল: (১) ১৯২৩-২৫ সালের ও তার পূর্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনের উপায় নির্ণয়; (২) পরবর্তী বিপ্লব-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

এই উভয় বিষয়েই বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। একপক্ষে গেলেন বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির প্রধান নেতারা, আর বিভিন্ন সমিতির তরুণ বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী নেতারা হলেন অপর পক্ষ। প্রবীণ নেতাদের মতে, পূর্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ হল উপযুক্ত আয়োজনের অভাব। তাঁরা বললেন, উপযুক্ত আয়োজনের অভাবেই বিপ্লব-প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছে, সুতরাং কারাগার থেকে মুক্তির পরে পুনরায় অবিলম্বে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ না করে প্রথমে আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে এবং যতদিন সেই আয়োজন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তরুণ বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী নেতারা ছিলেন এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের মতে, বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ আয়োজনের অভাব নয়, বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে সহযোগিতার অভাব ও তাদের আভ্যন্তরিক কলহই ব্যর্থতার মূল ও প্রধান কারণ। তাঁরা বললেন, বিভিন্ন বিপ্লবী-দলকে, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের প্রধান দুটি দলকে—অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতিকে—অবিলম্বে কাজের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আর কেবলমাত্র গুপ্তহত্যার দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির বদলে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে হবে। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নেও গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। প্রবীণ বিপ্লবীরা ছিলেন নিজ নিজ দলের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার বিশেষ পক্ষপাতী, আর তরুণ নেতারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আশু বিপ্লবের স্বার্থে দলীয় স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। জেলখানায় থাকতেই উভয়পক্ষের এই মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে। তাঁদের বাইরে আসার পর এই মতভেদ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। প্রবীণ বিপ্লবীরা তাঁদের মতে অটল হয়ে থাকেন এবং এঁদের বিরুদ্ধে তরুণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। এই অবস্থা চলার পর এই দুই পক্ষের মধ্যে আপস অসম্ভব বুঝে সকল দলের কর্মীরা অবশেষে নিজ নিজ মূলদলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সকলে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়ায়। তরুণ কর্মীরা নিজ নিজ মূল দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সম্মিলিত হয় বলে এই সম্মিলিত দলকে 'রিভোল্ট-গ্রুপ' বা 'বিদ্রোহী দল' নামে অভিহিত করা হত। পরে এদের বলা হত 'অ্যাড্‌ভান্স' বা 'অগ্রদূত' দল। এই 'রিভোল্ট গ্রুপ' বা সম্মিলিত দলের মধ্যে থাকে অনুশীলন পার্টি

ও যুগান্তর সংযুক্তদলের কর্মিগণ। 'যুগান্তর সংযুক্ত দল' বলতে বোঝাত মূল যুগান্তর সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, হুগলী ও চট্টগ্রামের যুগান্তর দলের শাখা-পার্টিগুলিকে। এইভাবে একটি নূতন দল গড়ে ওঠে। ঢাকার সতীশ পাকড়াশী; চট্টগ্রামের সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী; কলিকাতার যতীন দাস ও বিনয় রায়; বরিশালের নিরঞ্জন সেন; ত্রিপুরার প্রভাস চক্রবর্তী প্রভৃতি এই নূতন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৮-৩৪ সালের, অর্থাৎ সর্বশেষ স্তরের বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রধানত এদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়।

'রিভোল্ট গ্রুপ'-এর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

১৯২৯ সালের প্রথম ভাগে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে নূতন বিপ্লবী দলের, অর্থাৎ 'রিভোল্ট গ্রুপ'-এর, নেতারাও সমবেত হন। রংপুরে বসেই অম্বিকা চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, যতীন দাস, বিনয় রায় ও নিরঞ্জন সেন একত্রে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা যে কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেন তা গুপ্তহত্যা বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের কর্মপন্থা নয়। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, কেবলমাত্র গুপ্তহত্যা বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব। তাঁদের আলোচ্য কর্মপন্থা ছিল দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন। এই দলের অন্যতম নায়ক সতীশ পাকড়াশীর কথায়:

"আমরা এবার ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করে বিপ্লবী কর্মধারার উচ্চতর পন্থার প্রতিষ্ঠা করব। একই সময় বিভিন্ন স্থানে শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।—তার ফলে নিষ্ক্রিয়তার স্থানে শুদ্ধ-সক্রিয় এক জাতীয় আন্দোলন দাঁড়িয়ে যাবে।"[১] এই ছিল এই বিপ্লবীদলের কর্মপন্থার মূল কথা।

রংপুরের আলোচনা-বৈঠকেই এই কর্মপন্থা গৃহীত হয় এবং উক্ত কর্মপন্থা অনুসারে পরিকল্পনাও মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়। এই পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ:

"তিন জেলায় (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালে) অস্ত্রাগার আক্রমণ, ঢাকা ও কলিকাতার ছোট ছোট ঘাঁটি আক্রমণ, একই দিনে একই সময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান—শুধু এই পরিকল্পনা নিয়েই আরম্ভ, তারপর অবস্থানুযায়ী আরও কতকগুলি ব্যবস্থা করার কথা হয়। পরবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঐ প্ল্যানেরই একটি অংশ।" (সতীশ পাকড়াশী: 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৫৩)

এই নূতন দলের সৃষ্টি ও নূতন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে বলা হয়েছে:

"প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসের অবস্থা হল এই যে, দুইটি প্রধান দলের—অনুশীলন ও যুগান্তরের—প্রধান নেতারা একত্রে মিলে একটা সাধারণ অভ্যুত্থানের দুঃসাহসী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন।...১৯২৮ ও ১৯২৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশন সমগ্র ভারতের বিপ্লবীদের মিলনের সুযোগ এনে দেয়। এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সেই সভায় একটা সাধারণ অভ্যুত্থানের

১। সতীশ পাকড়াশী: 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৫৩।

পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং তাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়।" (পূর্বোক্ত সরকারী রিপোর্ট, পৃঃ ৩২৯)।

এই পরিকল্পনা অনুসারে নেতাদের এক একজনের উপর এক একটি কাজের ভার দেওয়া হয়। পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। এ কাজের ভার পড়ে যতীন দাসের উপর। তাছাড়া উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ভারও ছিল তাঁর উপর। এই ভার নিয়ে যতীন দাস উত্তর-ভারতে চলে যান এবং ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময় ভগৎ সিং প্রভৃতির সঙ্গে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষ, বরিশালের নিরঞ্জন সেন এবং ঢাকার সতীশ পাকড়াশী একত্রে অভ্যুত্থান সম্পর্কে শেষ আলোচনার জন্য কলিকাতায় মিলিত হন। অস্ত্রের অভাব মিটাবার জন্য তাঁরা প্রথমেই তিনটি জেলার (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের) তিনটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা করতে থাকেন। নভেম্বর মাসেই এই অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত জানিয়ে একটি লাল ইস্তাহার বের করে বাংলাদেশের যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করা হয়।

* * * *

চট্টগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের প্রধান নায়ক সূর্য সেনের বাড়ি ছিল চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে। ১৯১৬ সালে তিনি বহরমপুর কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দেন। বহরমপুর কলেজে পড়বার সময়ই উক্ত কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৯১৮ সালে সূর্য সেন চট্টগ্রামে ফিরে এসে একটি নূতন বিপ্লবী দল গঠন করেন। এই দলটি যুগান্তর সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে থাকে। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সূর্য সেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে একত্রে সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই সময় স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সূর্য সেন হন এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। সেই সময় থেকেই তিনি হলেন চট্টগ্রামের "মাস্টারদা"। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হবার পর সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করেন। এই সময়, অর্থাৎ ১৯২৩ সালে এই বিপ্লবীদলের দ্বারা আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীর টাকা লুণ্ঠিত হবার পর সূর্য সেন ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী আত্মগোপন করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে মামলার বিচারে প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি আবার আত্মগোপন করে কলিকাতায় পালিয়ে আসেন। কলিকাতায় থাকার

সময় পুলিস একদিন তাঁর গোপন আশ্রয়স্থলে হানা দিলে তিনি পুলিসের চক্ষে ধুলো দিয়ে তাদের বেড়াজাল থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই আবার গ্রেপ্তার হয়ে দুই বছরকাল আটক থাকেন। এর পর মুক্তিলাভ করে তিনি আবার আত্মগোপন করেন।

১৯২৮ সালে বিপ্লবীদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হবার পর সূর্য সেন আবার প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ করতে থাকেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে বিপ্লবের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় প্রবীণ ও নবীন দলের মতভেদ প্রবল আকার ধারণ করলে তিনি নবীন দলের (রিভোল্ট গ্রুপের) অন্যতম নায়ক হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করতে থাকেন। নবীন দলের নেতৃবৃন্দ একই সময়ে তিনটি জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করেন চট্টগ্রাম তার মধ্যে একটি। সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের নিজ জেলা চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের ভার গ্রহণ করেন।

অভ্যুত্থানের আয়োজন

পূর্বে অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশাল—এই তিনটি জেলায় তিনটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তারপর তিন জেলার বিপ্লবীরা নিজ নিজ জেলায় গিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। যাঁরা কলিকাতায় কাজ আরম্ভ করেছিলেন তাঁরা অল্প দিনের মধ্যেই মেছোবাজার ও অন্যান্য স্থান থেকে গ্রেপ্তার হন।

এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া মাত্র চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বিশেষ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের ভয় হয় পাছে পুলিস মেছোবাজারের ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রামের সম্পর্ক জেনে ফেলে। এরপর তারা আরও সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত আয়োজন করতে থাকেন।

সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে একদিকে যেমন জেলার কংগ্রেসের কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, তেমনি অপর দিকে কংগ্রেসের কাজের মধ্য দিয়ে বহু যুবককে বিপ্লবীদলের সভ্য করা হয়। জেলার সর্বত্র যুব-সমিতি ও শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপিত হয় এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের মারফত একটি সুশৃঙ্খল বিপ্লবী যুবকদল গড়ে ওঠে। দলের পরিচালকদের চেষ্টায় এই যুবকদল বন্দুক-রিভলভার ছোঁড়া, মোটর চালনা প্রভৃতি শিক্ষা করে। এদের একটি সৈন্যবাহিনীরূপে গড়ে তোলা হয়। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ ছিলেন এই বাহিনীর পরিচালক।

অবশেষে তাঁদের আয়োজন শেষ হলে কাজ আরম্ভ করার দিন স্থির হয় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮ই এপ্রিল তারিখটি চিরদিন লাল অক্ষরে লিখিত থাকবে। কারণ, ভারতের মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবীরা এ পর্যন্ত বহু বৃহৎ পরিকল্পনা রচনা করেছেন, এমন কি চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরিকল্পনা অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ পরিকল্পনা হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তার একটিও কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এই পরিকল্পনাটি

ব্যতীত অন্য সব পরিকল্পনাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যা হোক, বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ও তাঁর সহকারী অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতির নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

'রিভোল্ট গ্রুপ' বা নবীন দলের বাংলাদেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা একটি স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ : (১) চট্টগ্রাম শহরের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ঘাঁটি ও ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে হবে ; (২) চট্টগ্রামে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করে সেখানকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দখল করে পুলিস ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হবে ; (৩) চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকা ও কলিকাতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করতে হবে ; (৪) চট্টগ্রামের সঙ্গে বাইরের রেল ও টেলিফোন-সংযোগ বিনষ্ট করতে হবে ; (৫) পাহাড়তলীর য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের বন্দী করা হবে।

এই কাজগুলি সুসম্পন্ন করার জন্য এক একজন প্রধান পরিচালকের নেতৃত্বে কয়েকটি দল গঠন করে এক এক দলের উপর এক একটি কাজের ভার দেওয়া হয়। প্রথম দলের ভার গ্রহণ করেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ, দ্বিতীয় দলের ভার গ্রহণ করেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন, তৃতীয় দলের ভার পড়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর, চতুর্থ দলটিকে রেলপথ ধ্বংসের ভার দিয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধূম নামক স্থানে। এ ছাড়া ২০ জনের একটি দলকে 'রিজার্ভ' হিসাবে রাখা হয়।

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘোষণা-পত্র

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে 'ভারতের রিপাবলিকান আর্মি' এই নামে একখানি ঘোষণা-পত্র চট্টগ্রাম শহরে বিলি করে বিপ্লবীরা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা-পত্রে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা-পত্রটি নিম্নরূপ :

"ব্রিটিশ শাসকগণ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে চিরদিন দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরতম নীতি হিসাবে যুগ-যুগান্তর কাল ধরিয়া যে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে আজ এতদ্বারা ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা রুখিয়া দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে। ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষের প্রভু, কেবল ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। ভারতবাসীরা একটা বিদেশী সরকারের দ্বারা সেই অধিকার হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ বঞ্চিত থাকিলেও

সেই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, কোন দিন তাহা বিলুপ্ত হইবেও না। ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনী অস্ত্রশক্তি দ্বারা বিশ্বের সম্মুখে সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পই আজ ঘোষণা করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ কার্যকরী করিতে যাইতেছে। স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে মাতৃভূমিকে মহিমামণ্ডিত করিবার জন্য সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর প্রত্যেকটি সভ্য তাহার জীবন উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে। আজ সাধারণতন্ত্রী বাহিনী দুঃখভারাক্রান্ত ও ক্রোধ-কম্পিত চিত্তে ভারতভূমিকে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ভারতবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কথা, ভারতীয় নারীদের কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার কথা, ভারতীয় যুবকদের নির্বিচারে ফাঁসি ও সুপরিকল্পিত হত্যার কথা, নিষ্ঠুর ব্রিটিশের বুটের তলায় ভারতীয় শিশুদের পিষিয়া মারিবার কথা, ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার কথা স্মরণ করিতেছে এবং ভারতের নিহত সন্তানদের হত্যার জন্য প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করিতেছে। সাধারণতন্ত্রী বাহিনী ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের সমর্থন লাভের অধিকারী বলিয়াই জাতীয় আদর্শ ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এতদ্বারা প্রত্যেকটি ভারতবাসীর সমর্থন দাবি করিতেছে এবং আশা করে যে, কোন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীই নিষ্ক্রিয়তা, কাপুরুষতা ও মনুষ্যত্বহীনতা দ্বারা এই মহান আদর্শের অবমাননা করিবে না। আজিকার এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামবাসীরা এই আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দিবে এবং তাহাদের সাহস, দেশভক্তি ও তাহাদের সন্তানদের আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার এই মহান কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্যতার প্রমাণ দিবে।"

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৮ই এপ্রিল, রাত্রি ১০ ঘটিকা। চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিস ও গণেশ ঘোষের দোকান থেকে বিপ্লবীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হন।

যে দলটির উপর য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সাহেবদের বন্দী করার কথা ছিল তাঁরা ক্লাবে গিয়ে দেখলেন ক্লাব প্রায় শূন্য, ঐ রাত্রিতে সাহেবরা অন্য কোথাও গিয়েছিল। কাজেই এই দলটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে একটি ভাগ পুলিস অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভারপ্রাপ্ত দলটির সঙ্গে এবং অপর ভাগ সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত দলের সঙ্গে মিলিত হয়।

পুলিস অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভারপ্রাপ্ত দলের সংখ্যা ছিল ৫০ জন। সকলেরই খাকির সামরিক পোশাক, কম্যানডারের পোশাক একজন সামরিক অফিসারের অনুরূপ—সব মিলিয়ে যেন একটি নিয়মিত সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মার্চ করে চলেছে। দলটি পুলিস অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র দলের কম্যানডার ও আর কয়েকজন বিপ্লবী অস্ত্রাগার-রক্ষী সান্ত্রীর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাকে গুলি করেন। রক্ষীটি ধরাশায়ী হওয়া মাত্র বিপ্লবীরা দরজা ভেঙ্গে অস্ত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করেন।

তাঁরা অস্ত্রাগার থেকে রিভলভার ও মাস্কেট বন্দুক এবং বহু গুলি সংগ্রহ করে নেন এবং পুলিস-লাইনের মধ্যে প্রবেশ করে নিরস্ত্র পুলিসদের লাইন থেকে বিতাড়িত করেন।

সামরিক অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত দলটি অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র দলের কম্যানডার অস্ত্রাগার-রক্ষী সান্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ান এবং চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রীটিকে গুলি করেন। সান্ত্রীটি ধরাশায়ী হয়। গুলির শব্দ শুনে আর একজন সান্ত্রী দৌড়ে আসা মাত্র সেও বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই সময় সার্জেণ্ট-মেজর ফ্যারেল গুলির শব্দ শুনে তার কোয়ার্টার থেকে দৌড়ে আসামাত্র সেও বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। তারপর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের ফটক ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং বহু রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল ও একটি লুইস গান (একপ্রকার মেসিনগান) সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে বিপ্লবীরা একটি মারাত্মক ভুল করেন। এই সব অস্ত্রের গোলাগুলি ছিল গুলি-বারুদের ঘরে (ম্যাগাজিনে) আবদ্ধ। এই ঘরের কথা বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভুলে যান[১]। এই ভুলের জন্য বিপ্লবীদের হস্তগত অস্ত্রশস্ত্রগুলি, বিশেষ করে রাইফেলগুলি ও মেসিনগানটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে থাকে।

অস্ত্রাগার অধিকার করে থাকার সময় ঐ পথে যে সব সরকারী কর্মচারীদের গাড়ী প্রভৃতি যান-বাহন চলাচল করেছে তার উপরই বিপ্লবীরা গুলি বর্ষণ করেছে। এর ফলে একজন রেলগার্ড, দুইজন ট্যাক্সি-চালক ও ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ীর একজন কনেস্টবল নিহত হয়। এর পর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারটিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন এবং লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র গাড়ীতে বোঝাই করে অন্য দলগুলির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পুলিস-লাইনের দিকে চলে যান। ইতিমধ্যে ব্যারাক থেকে বার বার বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ চালান হয়। কিন্তু সব আক্রমণ প্রতিহত করে তাঁরা সরে যেতে সক্ষম হন।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-অফিসের ভারপ্রাপ্ত দল (সংখ্যায় ৬ জন) অফিসের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং টেলিফোন-অপারেটরকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে অজ্ঞান করে রাখেন। তারপর বিপ্লবীরা টেলিফোন-বোর্ডটিকে ভেঙে চুরমার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। টেলিগ্রাফ-মাস্টার সেখানে দৌড়ে আসামাত্র বিপ্লবীরা তাকে গুলি করেন। আহত হয়েও সে ফিরে গিয়ে একটি বন্দুক নিয়ে এসে প্রাণপণে গুলি ছুঁড়তে থাকে। বন্দুকের সঙ্গে রিভলভার দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝে বিপ্লবীরা সেখান থেকে সরে যান। এর ফলে টেলিগ্রাফ-অফিসটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। তারপর বিপ্লবীদের এই দলটি পুলিস-লাইনের দিকে গিয়ে প্রধান দলের সঙ্গে মিলিত হয়। পুলিস-লাইনে বসে নেতারা সকল বিপ্লবীকে পুলিস-অস্ত্রাগার থেকে সংগৃহীত মাস্কেট বন্দুক চালনা শিক্ষা দেন।

১। Indian in 1930 (Govt. Publication).

'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'

বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল পুলিস-লাইনে এসে জড় হবার পর সকলে সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে এই অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক সূর্য সেনকে রাষ্ট্রপতি করে 'ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' ঘোষণা করা হয়। সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান বিপ্লবীরা অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপতিকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করেন।

পশ্চাৎ অপসরণ

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বাংলাদেশের পুলিসের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ফারমার, চট্টগ্রামের পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জনসন ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার—এই চারজন একত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটির অস্ত্রাগার থেকে একটি মেসিনগান সংগ্রহ করে। তারা একটি উঁচু জলের ট্যাঙ্কের উপর উঠে বিপ্লবীদের উপর মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করে। অন্য দিকে বিপ্লবীরা মাস্কেট বন্দুক থেকে পাল্টা গুলি বর্ষণ করে জবাব দেন এবং তাদের দিকে বোমাও ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু বোমাটি ফাটেনি। তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করে দুইবার শত্রুপক্ষকে নিস্তব্ধ করে দেন।

বিপ্লবীরা পুলিস অফিসারদের মেসিনগানের গুলি বর্ষণের মুখে দাঁড়াতে না পেরে ক্রমশ হটে গিয়ে শহরের উত্তর দিকের পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নেন। হটে যাবার সময় তাঁরা পুলিস ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যান। হিমাংশু সেন নামে একজন অল্পবয়স্ক বিপ্লবী পুলিস ব্যারাকে আগুন ধরাবার সময় মারাত্মক রকমে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। তাকে বাঁচাবার জন্য দুইজন প্রধান নেতা, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আহত হিমাংশুকে মোটরে করে অন্যত্র সরিয়ে নেন। কিন্তু সময় মত ফিরতে না পেরে তাঁরা প্রধান দলের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি। পরে হিমাংশুর মৃত্যু হয়।

বিপ্লবীরা পাহাড়ের মধ্যে থেকে পুলিস ও সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা যখন পাহাড়ের দিকে হটে যান তখন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি করে মাস্কেট বন্দুক, একটি রিভলভার বা পিস্তল আর ঝুলি বোঝাই গুলি। এই সম্বল করেই তাঁরা ইংরেজ রাজের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের উন্নত রাইফেল ও মেসিনগানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুত হন।

এদিকে ১৮ই এপ্রিল রাত্রেই বিপ্লবীদের আর একটি দল চট্টগ্রাম শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী ধুম নামক স্থানে রেল-লাইন তুলে আর টেলিগ্রাফ-লাইন কেটে চট্টগ্রাম শহরকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। অন্য একটি দল সত্তর মাইল দূরবর্তী লাকসাম জংসনের কাছে টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলেন এবং একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মালগাড়ী লাইনচ্যুত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়ের একটি জাহাজের বেতার মারফত এই অভ্যুত্থান ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়। এই ভয়ঙ্কর সংবাদে বাংলাদেশের শাসকগণ আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে "চট্টগ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে" দলে দলে সৈন্য পাঠাতে থাকে।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে মোট ৫৭ জন বিপ্লবী পাহাড়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা ১৮ই এপ্রিল শেষ রাত্রে ও পরের দিন এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে ঘুরে অবশেষে জালালাবাদ পাহাড়ে এসে উপস্থিত হন। পাহাড়টি উঁচু ও খাড়া, শত্রু-বাহিনীকে বাধা দেবার পক্ষে সুবিধাজনক স্থান। এই পাহাড়ে থেকে বিপ্লবীরা শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে বিপ্লবীরা পাহাড়ে প্রবেশ করার পর পশ্চাৎ-ধাবনকারী পুলিস ও সৈন্যরা তাঁদের সূত্র হারিয়ে ফেলে। ২০শে এপ্রিল সকালবেলা লেফ্‌টানান্ট স্মিথ-এর নেতৃত্বে 'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী'র একদল সৈন্য চট্টগ্রামে উপস্থিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবীদের খুঁজতে থাকে। এই খোঁজাখুঁজির ফলে ২২শে এপ্রিল তারিখে সৈন্যরা দুপুর বেলায় জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সন্ধান পায় এবং বিকাল ৫টার সময় পাহাড়ের নীচু থেকে বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। বিপ্লবীরাও পাল্টা-আক্রমণ করে জবাব দেন। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে ইংরেজ-দলের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তারা বাধ্য হয়ে পিছু হটে। এই যুদ্ধে বিপ্লবীদের দুইজন গুরুতর রূপে আহত হন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইংরেজ পক্ষ আবার আক্রমণ আরম্ভ করে। এবার তারা এক সঙ্গে নীচের ও পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে মেসিনগান প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ চালায়। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আক্রমণে ইংরেজ সৈন্যদের এই আক্রমণও ব্যর্থ হয়। ইংরেজ পক্ষ রাত্রি ৮টার সময় আবার হটে যায়।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিপ্লবীদের ১০ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হন, আর ইংরেজ পক্ষের ৭৪ জন নিহত ও প্রায় দেড়শত জন আহত হয়। ২৩শে এপ্রিল শত্রুপক্ষ উড়োজাহাজ থেকে বিপ্লবীদের উপর বোমা ও মেসিনগানের গুলি বর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত

জালালাবাদের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন যে, এই অল্প-সংখ্যক লোক নিয়ে বিরাট ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। নেতারা পরামর্শ করে স্থির করলেন, এইবার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে গুপ্তভাবে হঠাৎ আক্রমণে শত্রু সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের অধিকাংশকে শহরে পাঠিয়ে দিয়ে অল্প কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সূর্য সেন পাহাড় থেকে নেমে গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেন।

২৩শে এপ্রিল চারজন বিপ্লবী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ এবং আরও দুজন বাইরে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে নোয়াখালি জেলার ফেণী রেল স্টেশনে উপস্থিত

হলে স্টেশনের পুলিস তাঁদের অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। পুলিস তাঁদের দেহ তল্লাস করবার জন্য অগ্রসর হওয়া মাত্র বিপ্লবীরা পুলিসের দিকে গুলি বর্ষণ করে পলায়ন করেন। এই গুলিবর্ষণে একজন দারোগা ও দুইজন কনেস্টবল আহত হয়।

এই সময় বিপ্লবীরা বিশেষ অর্থাভাবে পড়লে কেউ কেউ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রধান নায়ক সূর্য সেন ডাকাতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাঁরা দলের সভ্য ও সমর্থকদের সাহায্যের উপরেই নির্ভর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে রাত্রিকালে বের হয়ে দলের পুনর্গঠন করতে থাকেন। কয়েক দিন পর দলের সভ্য ফকির সেন গ্রেপ্তার হয়ে পুলিসের কাছে সকল সংবাদ ফাঁস করে দেয়।

কালারপোলের যুদ্ধ

গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬ই মে তারিখে বিপ্লবীদের একটি দল কর্ণফুলী নদীর তীরে ইংরেজ কর্মচারীদের বাসভবনগুলি আক্রমণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হন। তাঁরা রাত্রিকালে নদীর তীরে পৌঁছামাত্র কয়েকজন গুণ্ডা তাঁদের চিনে ফেলে এবং পুলিসে সংবাদ দেয়। এরপর কয়েকজন সশস্ত্র পুলিস বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। বিপ্লবীদের অস্ত্র কেবল রিভলভার। তাই তাঁরা পুলিসের রাইফেল বন্দুকের মুখে দাঁড়াতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তাঁদের ৬ জন একখানি নৌকায় আরোহণ করে নদীর অপর তীরে পৌঁছার জন্য যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে পোর্ট-পুলিসের একটি বড় দল স্টিমলঞ্চে করে বিপ্লবীদের পিছু তাড়া করে। মাঝ নদীতে পুলিসের লঞ্চখানি বিপ্লবীদের নৌকার নিকটবর্তী হওয়া মাত্র বিপ্লবীরা গুলিবর্ষণ আরম্ভ করেন। পুলিস দলও রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে বিপ্লবীরা নদীর তীরে পৌঁছে একটি কাঠের গাদা ও একটি মাটির টিপির আড়ালে থেকে বহুক্ষণ যুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে পুলিসের গুলিতে বিপ্লবীদের চারজন—স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত নিহত হয়েছেন। তখন বাকি দুইজন, সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী, আর যুদ্ধ করা বৃথা মনে করে তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন।

চন্দননগরের সংঘর্ষ

২৮শে জুন অস্ত্রগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহ বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর গোপন আশ্রয় ত্যাগ করে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে ধরা দেন। তাঁকে একখানি স্পেশাল ট্রেনে করে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-এর অভিযোগে মামলা আরম্ভ করা হয়।

এদিকে কলিকাতার গোয়েন্দা-বিভাগ সংবাদ পায় যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকজন পলাতক বিপ্লবী চন্দননগরের এক বাড়িতে লুকিয়ে আছেন। এই সংবাদ

পেয়ে ৩১শে আগস্ট পুলিস-কমিশনার টেগার্ট একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে চন্দননগরের এই বাড়ি ঘেরাও করে। এখানে পুলিসের সঙ্গে বিপ্লবীদের এক খণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তাতে জীবন ঘোষাল নামে চট্টগ্রামের একজন বিপ্লবী নিহত হন, আর দুইজন বিপ্লবী সঙ্গীসহ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল গ্রেপ্তার হন। এঁদেরও চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়।

যখন এই সব ঘটনা ঘটছিল তখন অন্য দিকে প্রধান নায়ক সূর্য সেন অবশিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে নূতন নূতন পরিকল্পনা করে চট্টগ্রামের ইংরেজ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন। আর ইংরেজ সরকার এই বিপ্লবীদের ভয়ে দিশাহারা হয়ে চারদিক থেকে চট্টগ্রামে বহু সৈন্য জড় করছিল। তারা সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীদের খুঁজে বের করার জন্যে সমগ্র চট্টগ্রাম তোলপাড় করতে থাকে এবং জনসাধারণ বিপ্লবীদের সাহায্য করছে মনে করে সারা চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিতে থাকে।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই চারদিক থেকে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে আটক করা হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি নেতাদেরও গ্রেপ্তার করে এই জেলে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই বন্দী বিপ্লবীরা প্রথম থেকেই জেলখানা থেকে বাইরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং ডিনামাইট প্রভৃতির সাহায্যে জেলখানা উড়িয়ে দিয়ে পলায়নের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে চট্টগ্রাম শহরের প্রধান সরকারী অফিস, জেলখানা, বিচারালয় প্রভৃতি স্থান উড়িয়ে দেবার জন্য ডিনামাইট তৈরীর ব্যবস্থা হয়। বন্দীদের পলায়ন ও চট্টগ্রামের গোটা শাসন-যন্ত্রটাকে বিকল করে দেওয়াই ছিল এই ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুসারে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দলের কোন সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ষড়যন্ত্রের সকল সংবাদ পুলিস জেনে ফেলে এবং ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। শোনা যায়, এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হবার পর সরকার নাকি এত ভয় পেয়েছিল যে, তারা বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা আপস করে। এই আপস অনুসারে স্থির হয়, বন্দীরা সকল অপরাধ স্বীকার করবেন, আর সরকার পক্ষ তাদের সামান্য শাস্তি দিয়ে নিষ্কৃতি দেবে। এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কাউকেই তিন বছরের বেশী শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আশানুল্লা হত্যা

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে পুলিসের উৎপীড়নে চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে। সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে পুলিস ধরে নেয় যে, সাধারণ লোক পলাতক বিপ্লবীদের সাহায্য করে বলেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। এই ধারণা নিয়ে চট্টগ্রামের জন-সাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুলিস তাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ

করে। পুলিস কর্মচারীদের মধ্যে ইনস্পেক্টর খানবাহাদুর আশানুল্লার অত্যাচারে বহু লোক গৃহহীন-সম্পত্তিহীন হয়ে পথের ভিখারী হয়, বহু লোক রুজি-রোজগার হারায়, তার অত্যাচার জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। বিপ্লবীরা আশানুল্লার অত্যাচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩০শে আগস্ট এক বিপ্লবী যুবকের গুলিতে আশানুল্লা নিহত হয়। পুলিস সন্দেহ-বশে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক এক অল্পবয়স্ক যুবককে গ্রেপ্তার করে। এই হত্যার পর চট্টগ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও তাদের নৈতিক বল লোপ করার উদ্দেশ্যে জেলার শাসকগণ এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। নিহত খান-বাহাদুর আশানুল্লা মুসলমান আর হত্যাকারী বলে কথিত যুবকটি হিন্দু। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করছে—পুলিসের এই দুষ্ট প্রচারের পর মুসলমান গুণ্ডারা পুলিসের সাহায্যে হিন্দুদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। এর কয়েক দিন পরেই আশানুল্লাকে হত্যার অভিযোগে হরিপদর বিচার হয় এবং বিচারে হরিপদ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচার

ইতিমধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ধৃত বিপ্লবীদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল। এই মামলা সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ মামলার রায় বের হয়। বিচারে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস; রণধীর দাসগুপ্ত, সুবোধ রায় ও সুখেন্দু দস্তিদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পৃথক বিচারে অম্বিকা চক্রবর্তী এবং সরোজ গুহও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর এবং আরও কয়েকজন তখনও পলাতক অবস্থায় ছিলেন।

ধলঘাটের যুদ্ধ

বাংলাদেশের সরকার বিপ্লবীদের দমনের জন্য ১৯৩১ সালের ৩০শে নভেম্বর '১১নং বেঙ্গল ইমার্জেন্সি পাওয়ার্স অর্ডিনান্স' নামে যে বিশেষ আইন চালু করেছিল তা অবিলম্বে চট্টগ্রাম জেলায় প্রয়োগ করা হয়। এই বিশেষ আইন অনুসারে সৈন্যবাহিনী ও পুলিস একত্রে চট্টগ্রাম জেলার সর্বত্র পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য হানা দিতে থাকে। এই বিশেষ আইন অনুসারে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে যে কোন লোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, যে কোন রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা, যে কোন গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা, যে কোন লোকের গৃহে প্রবেশ এবং যে কোন লোককে যে কোন সময় গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

১৯৩২ সালের ১৪ই জুন চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট থানার পটিয়া নামক গ্রামে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে আছেন—এই সংবাদ পেয়ে সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের অধীনে একদল সৈন্য ও পুলিস পটিয়া গ্রামে হানা দেয়। সৈন্য ও পুলিসের দল সারা গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসারকে সঙ্গে

নিয়ে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন প্রত্যেক বাড়িতে প্রবেশ করে পলাতক বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করতে থাকে।

সূর্য সেন, তাঁর সহকর্মী নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত ও অপূর্ব সেনের সঙ্গে ঐ গ্রামের সাবিত্রী দেবী নাম্নী এক বিধবা মহিলার বাড়িতে গোপনে বাস করছিলেন। ১৪ই জুন রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ক্যামেরনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য এসে এই বাড়ি ঘেরাও করে। বিপ্লবীরা তখন এই বাড়ির নীচের তলায় বসে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সৈন্যদল বাড়ি ঘেরাও করেছে—এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বিপ্লবীরা সকলে উপর তলায় উঠে যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল, এমন সময় বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে সে নিহত হয়। এর পর বহুক্ষণ ধরে দুই পক্ষে গুলিবর্ষণ চলে এবং সূর্য সেনের দুই বিশিষ্ট সহকর্মী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। এই দুই বিপ্লবীর আত্মদানের ফলে অন্য তিনজনের পলায়নের পথ সুগম হয়। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের ফলে হতভম্ব ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের অলক্ষ্যে সূর্য সেন, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে গৃহকর্ত্রী বুড়ি মা যে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেন তা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরদিন অম্লান থাকবে।

য়ুরোপীয়ান ইনস্টিটিউট আক্রমণ

২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রাম শহরের 'পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনস্টিটিউট'-এ বহু ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব একত্রিত হয়ে নাচগান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল। এমন সময় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী বোমা ও রিভলভার নিয়ে এই ইনস্টিটিউটের উপর আক্রমণ করেন। ইনস্টিটিউটের হলঘরের মধ্যে একটি বোমা ও রিভলভারের গুলি বর্ষিত হয়। এই আকস্মিক আক্রমণে একজন ইংরেজ মহিলা নিহত ও বহু ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব গুরুতররূপে আহত হয়। সাহেবরাও রিভলভার থেকে গুলি বর্ষণ করে ও চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে পাল্টা-আক্রমণ করে। বিপ্লবীদের নায়িকা প্রীতিলতা রিভলভারের গুলিতে ভীষণ আহত হন। নিকটে অবস্থিত সৈন্যদল ছুটে আসার পূর্বেই আক্রমণ শেষ করে বিপ্লবীরা উধাও হয়ে যান। কিন্তু আক্রমণকারীদের পরিচালিকা প্রীতিলতা আহত অবস্থায় পলায়ন অসম্ভব বুঝে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য ইনস্টিটিউটের বাইরেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

গৈরালার যুদ্ধ

সূর্য সেনের গ্রেপ্তার

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিস আবার সূর্য সেনের সন্ধান পায়। এই সময় তিনি চট্টগ্রাম শহরের নিকটস্থ গৈরালা গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে আত্ম-গোপন করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত ও মণি দত্ত। জনৈক বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসীর কাছ থেকে এই সংবাদ পেয়ে রাত্রিকালে

একটি প্রকাণ্ড গোর্খা সৈন্যদল তাঁদের গ্রেপ্তার করতে আসে। ঐদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার সময় বাড়ির চারদিকে গোর্খা সৈন্যের বেষ্টনী দেখে সূর্য সেন সঙ্গীদের গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। বহুক্ষণ দুই পক্ষের গুলিবর্ষণ চলে। এই গুলিবর্ষণে বাড়ির মালিক পূর্ণ তালুকদার ও তাঁর ছোটভাই নিহত হন। গুলিবর্ষণের আড়ালে সকলের অলক্ষ্যে সূর্য সেন ও তাঁর সঙ্গীরা পালাবার জন্য পথে বের হন। সঙ্গীরা নির্বিঘ্নে সরে পড়েন, কিন্তু সূর্য সেন যখন একটি পুকুরের জলে নেমে আত্মগোপন করছিলেন, তখন একটা গোর্খা সৈন্য তাঁকে জাপ্টে ধরে। এইভাবে সূর্য সেন অবশেষে বন্দী হন।

যে বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসী পুলিসকে সূর্য সেনের সংবাদ দিয়েছিল, কয়েকদিন পরেই সে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। গ্রামবাসীরা হত্যাকারীদের নাম জেনেও পুলিসকে বলে দেয়নি।

গহিরার সংঘর্ষ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকজন নেতা ঐ জেলার মধ্যেই পলাতক থেকে আবার জেলার যুবকদের সংগঠিত করবার চেষ্টা করছিলেন। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী শত চেষ্টা করেও এপর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ১৯৩৩ সালের মে মাসের ১৮ তারিখে পুলিস সংবাদ পায় যে, চট্টগ্রামের গহিরা নামক স্থানে কয়েকজন বিপ্লবী আত্মগোপন করে আছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যদের একটা বড় দল ঐ স্থানে উপস্থিত হয়ে সমগ্র অঞ্চল ঘিরে ফেলে। এর পর পুলিস ও সৈন্যদের অফিসারগণ প্রত্যেক বাড়িতে প্রবেশ করে খানাতল্লাস করতে থাকে। এইভাবে এক বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র দুইজন পলাতক বিপ্লবী এক ঘরের মধ্য থেকে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ করেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত দুইপক্ষের গুলি বিনিময় হওয়ার পর বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে যায়। এর পর বিপ্লবীরা পলায়নের কোন উপায় নেই দেখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এই দুইজন বিপ্লবীর একজন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম প্রধান নায়ক তারকেশ্বর দস্তিদার ও অপরজন কল্পনা দত্ত। বিচারে তারকেশ্বরের প্রাণদণ্ড ও কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

খেলার মাঠে ইংরেজদের উপর আক্রমণ

১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম শহরের ইংরেজ সাহেবরা একটি ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে। শহরের সব ইংরেজ সাহেব খেলা দেখতে সমবেত হয়েছে খেলার মাঠে। চট্টগ্রামের কয়েকজন বিপ্লবী এই সুযোগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন পূর্ব থেকেই। খেলা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন যুবক বোমা ও রিভলভার নিয়ে সাহেবদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করলেন। তাঁদের আকস্মিক আক্রমণে কয়েকজন সাহেব আহত হয়ে ধরাশায়ী হল, অবশিষ্ট সাহেবরা এদিক ওদিক পালাতে লাগল। খেলার মাঠে পুলিস-সুপারও উপস্থিত ছিলেন এবং বিপ্লবীদের আক্রমণের আশঙ্কা করে কয়েকজন সাহেব সশস্ত্র পুলিস নিয়ে এসেছিল।

আক্রমণ আরম্ভ হবার পর পুলিস-সুপার ও সশস্ত্র পুলিসদল বিপ্লবীদের উপর রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করল। পুলিসের গুলিতে নৃত্যগোপাল ও হিমাংশু নামক দুইজন যুবক নিহত হলেন এবং বাকি সবাই আহত হয়ে ধরা পড়লেন। পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্বয়ং একজন যুবককে গ্রেপ্তার করতে গেলে সে উক্ত যুবকের গুলিতে আহত হয়, কিন্তু উক্ত যুবকও গ্রেপ্তার হয়। পরে ধৃত যুবকদের নিয়ে এক মামলা আরম্ভ হয়। মামলার বিচারে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী নামে দুইজন যুবকের প্রাণদণ্ড হয়।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসি

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী সমগ্র চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঐদিন ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কদের অন্যতম সূর্য সেন ও তাঁর প্রধান সহকর্মীদের অন্যতম তারকেশ্বর দস্তিদার ইংরেজ রাজের ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন আহুতি দেন। সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ ও আবেদন সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার সূর্য সেনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে। ফাঁসির সময় ধার্য হয়েছিল ১৩ই জানুয়ারী ভোর ৫ ঘটিকা। ১২ তারিখে বিকাল থেকেই চট্টগ্রামের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের ভয়ে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ-ভার গ্রহণ করে এবং বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিস রাজপথে টহল দিতে থাকে। সন্ধ্যা ৬টায় জেলগেটের প্রহরী সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনসাধারণ নানাপ্রকার বৈপ্লবিক ধ্বনি দিয়ে তাদের প্রিয় নেতা মাস্টার-দা ও তারকেশ্বরকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে থাকে।

এদিকে জেলের মধ্যে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জেলের অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর তারকেশ্বর একটি বিপ্লবী সঙ্গীত গেয়ে জেলের বন্দীদের এবং চট্টগ্রাম তথা সমগ্র দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে শেষবারের মত বিদায় গ্রহণ করেন। ভোর ৫টার সময় চিরস্মরণীয় বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ও তাঁর যোগ্য সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম জেলের ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। ১৩ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম ও বাংলার জনসাধারণ উপবাসী থেকে এই দুই বিপ্লবী বীরের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

নির্ঘণ্ট

স

হ

বিদ্রোহী ভারত

সুপ্রকাশ রায়

